Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল। [১ম সংখ্যা।

উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মূল্য হ্রাস।

আমরা গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১॥০ দিয়া আসিতেছি। কিন্তু যাঁহারা ১৩৩৪ সালের গ্রাহক হইয়াছেন এবং পরে হইবেন, তাহারা ১॥০ স্থলে ১৲ এবং ১৩২৭ সাল হইতে ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৩৲ স্থলে ২৲ পাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

নববর্ষে নিবেদন।

বর্ষ যায়, বর্ষ আইসে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উঠে ও ভাঙ্গে। দেখিতে দেখিতে "উৎসব"ও দ্বাবিংশ বর্ষ হইতে ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম তিনি যেন "উৎসবের" গ্রাহক, গ্রাহিকা ও অনুগ্রাহক আমাদিগকে শুভপথে চালিত করেন। আমরা "উৎসব" প্রচার কল্পে ইহার গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনয়াবনত—
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

নির্ম্মাল্য।

২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম বাঁধাই। মূল্য মাত্র এক টাকা।

"ভাই ও ভগিনী" প্রণেতা শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

আমাদের নূতন গ্রন্থ নির্ম্মাল্য সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সুদীর্ঘ সমালোচনার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নির্ম্মাল্য" শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় রচিত একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপা লাভ না করিলে এমন সাধকোচিত অনুভূতিও লাভ হয় না; তা সে সাধনা ইহজন্মেরই হউক বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরই হউক। এক একটী প্রবন্ধে লেখকের প্রাণের এক একটী উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাস গদ্যে লেখা বটে, কিন্তু সে গদ্যের ভাষা এমন অলঙ্কৃত যে, সে লেখাকে গদ্য কাব্য বলা যাইতে পারে। ভাষা অলঙ্কৃত বলিয়া ভাব লুকায়িত নহে, পরন্তু অলঙ্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ঝঙ্কৃত।"

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
"উৎসব" অফিস।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।
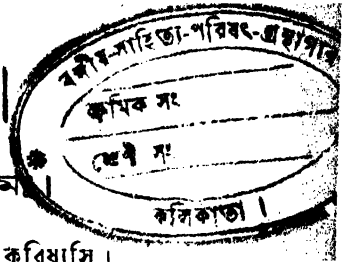
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বর্গাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২৩শ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল। { ১ম সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে—নূতন প্রার্থনা।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

কৃতজ্ঞতা—কবে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাতে ভরিত হইবে? যাহার কাছে যা উপকার পাইয়াছি, পাইতেছি কবে আমি তাহার জন্য সকলের সমক্ষে বলিতে পারিব ইহাঁদের নিকট হইতে উপকার পাইয়া আমি আজ দাঁড়াইতে পারিয়াছি। আজ আমি যে আশা করিতেও পারি আমি তোমার দিকে ফিরিলেও ফিরিতে পারি সে কেবল পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শাস্ত্র, গুরু—ইহাদের নিকট উপকার পাইয়া।

আহা! আমি কাহার নিকট না উপকার পাইয়াছি? কাহারও সমালোচনা করিবার অধিকার কি আমার আছে? যিনি আজ অতি কদর্য্য ব্যবহারও করিতেছেন, তিনিও অনেক ভাল উপদেশ দিয়াছেন। আমি কাহারও সমালোচনার যোগ্য নই। যিনি যাহাই কেন করুন না যদি তিনি আমার একটি উপকারও করিয়া থাকেন তবে আমার উচিত তাঁহার সেই একটি উপকার স্মরণ করিয়া অন্য অপকারগুলি উপেক্ষা করা। এইরূপ করিতে পারিলে হৃদয় শুদ্ধ হয়। তাই বলি ভগবান আমাকে, আমাদের এই জাতিটাকে তুমি কৃতজ্ঞ করিয়া দাও—তবেই আমরা আবার মানুষ হইতে পারিব।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীভগবানের নিকট আমায় কত কৃতজ্ঞ হইতে হয়? তিনি যে কত উপকার করিতেছেন, করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা ত করা যায় না। তবে কেন তাঁহার প্রদত্ত উপকারের জন্য আমার হৃদয় ভরিয়া উঠে না? হায় আমি কত অকৃতজ্ঞ! যে অকৃতজ্ঞ সে কি কখন ভাল হইতে পারে? না সে লোক কখন লোককে ভাল করিতে পারে? না সে লোক কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে?

আহা! যখন কোন জনশূন্য স্থানে একা বসিয়া আমি চিন্তা করি ঠাকুর! কত উপকার তুমি করিয়াছ, কত উপকার তুমি প্রতিনিয়ত করিতেছ—আমার জীবন ধারণের জন্য কত সুবিধা তুমি দিয়াছ, দিতেছ—তখন কি আমার নিজ কৃত মন্দকর্ম্মের ফল ভোগের জন্য তোমার প্রতি আমার মনোমালিন্য থাকিতে পারে? মনুষ্য কৃত একটি মাত্র উপকার স্মরণ করিয়া যখন মানুষের শত অপকার বিস্মৃত হইয়া কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠে তখন তোমার উপকার স্মরণ করিতে পারিলে আমি যে কোথায় চলিয়া যাই তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা যায়?

কৃতজ্ঞতা—তোমায় আমি নমস্কার করি—শত শত নমস্কার করি। কৃতজ্ঞতা! তুমিই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুণ। তোমার মত চিত্তশুদ্ধিকর আর কি আছে? মানুষকে ভক্ত করিতে, জ্ঞানী করিতে, পরহিতকর কর্ম্ম করিতে —কৃতজ্ঞতা তুমি বুঝি প্রধান অবলম্বন। যে মানুষ পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন —ইহাঁদের নিকট কৃতঘ্ন—ইঁহাদের নিকট উপকৃত হইয়াও উপকার স্বীকার করেনা, সে বুঝি ঈশ্বরের নিকটেও কৃতজ্ঞ হইতে পারে না। যে মানুষ ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে পারে না—সে মানুষ মনুষ্য থাকিবার বুঝি উপযোগী নহে।

কৃতজ্ঞ হই এস—তবেই আমরা ঈশ্বরের সকল বস্তুর কাছে নম্র হইতে পারিব—ঈশ্বরের বস্তু মাত্রকেই ভাল বাসিতে পারিব—ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু মাত্রকেই সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিব। কৃতজ্ঞতাই ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিবার প্রথম সোপান। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া নির্জ্জনে এই কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া প্রাণকে ভরিত করা আবশ্যক।

নব-বর্ষে।

(১)

এসেছে নবীন বর্ষ, ওগো এসেছে নবীন বর্ষ ;
জাগাও শুষ্ক-হৃদয়-মাঝে জাগাও নবীন হর্ষ।
দেখ' তুমি আজি চাহিয়া, সবাই উঠিছে জাগিয়া,
অলস-শয়নে থাকিওনা আর দৈবে ভিক্ষা মাগিয়া।
প্রাণপনে কর কর্ম্ম, পালি' সনাতন ধর্ম্ম,
নিষ্কামী হও, তৃপ্তিতে ভরি' যাইবে তোমার মর্ম্ম।

(২)

অতীতের কথা যাওহে ভুলিয়া সার কর শুধু বর্ত্তমান ;
ভবিষ্যতে কি হবে ভাবিয়া গাহিওনা আর দুখের গান।
সকল ঝঞ্ঝা দলিয়া, সম্মুখে যাও চলিয়া,
হ'কনা পতন, ভয় কিবা তাতে ? চল "জয় তারা" বলিয়া।
সম্মুখে হও আগুয়ান, নবীন-হর্ষে জাগাও প্রাণ,
দুঃখ দৈন্য রোধিলে পন্থা, ভুলোনা রাখিতে আপন মান।

(৩)

সুদূর দেশের যাত্রী মোরা, সুদূর দেশের যাত্রী,
অবিরাম শুধু চ'লেছি ছুটিয়া নাহি জানি দিবারাত্রি।
নাহি অবসর থামিতে, অবিরাম হবে চলিতে,
কালস্রোত নাহি চাহি' কারো পানে চলিয়াছে ভীমগতিতে।
সাহসে বক্ষ বাঁধিয়া, কাল স্রোতে চল ভাসিয়া,
পরপারে তুমি হবে উপনীত একদিন ওগো আসিয়া,

(৪)

যেই পথে গেছে মহাজন, সেই পথে যাও চলিয়া,
স্বেচ্ছাচারী হবেনা কভু, বীর হও বিঘ্ন দলিয়া।
চরিত্র হইবে অস্ত্র, দুঃখে হবেনা ত্রস্ত,
বিবেক তোমার হইবে সঙ্গী, হবেনা বিপদ-গ্রস্থ।
এইভাবে যদি চল, আর কিবা ভয় বল?
সাধনা সফল হইবে তোমার পাবে বাঞ্ছিত ফল।

শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

নববর্ষে—স্মরণ রহস্য ও নালিশ।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

তোমার, আমার, সকলের "কি করিলে হয়" ইহাইত আলোচনার বিষয়। কত কর্ম্মইত করা হইল কত প্রকার ভোগের জন্য, শেষে দেখা গেল সমস্তই দুঃখ। যে সুখের লোভে পাপ পুণ্য কত কি করা হইল—সবইত ক্ষণিক। তার পরে যাহাদিগকে আপনার ভাবি, যাহাদিগকে দেখিলে সুখ পাই, যাহারা আমাকে দেখিলে সুখ পায়, যাহাদিগকে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা সংসার ভাবিয়া সুখে থাকিব মনে করিয়াছিলাম তাহাদের কতক কতক ত চলিয়া গেল, এখনও যাহারা আছে তাহারাও বা কখন চলিয়া যাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, ইহাতে ত সুখ হইল না, সর্ব্বদা ভয়, সর্ব্বদা অশান্তি; উর্ম্মির মত সমস্তই অধ্রুব; স্ত্রী বল, সুখ বল, আয়ু বল—সমস্তই অল্প, সমস্তই স্বপ্নের সমান। ক্রমে দেহ জীর্ণ হইল, জরা ব্যাঘ্রীর মতন সম্মুখে তর্জ্জন করিতেছে—শেষে মৃত্যু। মৃত্যুর পরে কোথায় যাইব, কি হইবে—অহো! কি ভীষণ যাতনা। যাহা যাহা করিয়াছ তাহার ভোগত হইবেই। বরাবর হইতেছে, মৃত্যুর পরেও না হইবে কেন? এই সমস্ত চিন্তায়

প্রাণ কি ব্যাকুল হয় না? না হয় এ.সব চিন্তা তুমি করিলে না কিন্তু সুখ—স্থায়ী—সুখত পাও নাই, পাইতেছ না। সর্ব্বদা অশান্তি ত ভোগ করিতেছ। তাই বলিতেছি "কি করিলে হয়" ইহার আলোচনাইত প্রয়োজন।

আচ্ছা, যদি তুমি এমন কোন বন্ধু পাও—যাঁহার শক্তি অনন্ত, যাঁহার দয়া অসীম, যাঁহার ক্ষমা সীমাশূন্য—তুমি যে চরিত্রের লোক হওনা, যিনি তোমাকে স্থায়ী সুখে ডুবাইয়া দিতে পারেন, যিনি তোমাকে সকল ভয় হইতে নির্ভয় করিতে পারেন, যিনি তোমাকে তাঁহার শান্তি নিকেতনে চির-দিন রাখিতে পারেন, যেখানে শোক মোহ নাই, যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, যেখানে রোগ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; যেখানে কোন উদ্বেগ নাই; অথবা যেখানে সুবিধা অসুবিধা, সুখ দুঃখ, জরা ব্যাধি—এ সকল মায়া মিথ্যা হইয়া যায়—এসকলে মানুষ বিচলিত হয় না; যেখানে সেই বন্ধুকে স্মরিলেও কোন উৎপাৎ আর বিচলিত করিতে পারে না; শরীর সুখাই থাক বা বৃদ্ধই হউক—এই সমস্তই মায়ার খেলা হইয়া যায়, বলিতেছিলাম—এমন বন্ধু যদি পাও তবেত তোমার হয়; যদি তাঁহাকে দেখিতে নাও পাও তথাপি যদি বিশ্বাস কর এমন বন্ধু তোমার আছে তবে বলনা তাঁহার স্মরণে তোমার সব হয় কিনা? তাঁহাকে স্মরণ করিলে মানুষের কোন ভয় আর থাকে না—ইহার নজীরও পাওয়া যায়।

শুধু স্মরণ করিলেই সে তোমার সহায় হয়—তোমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া সেই দিতে পারে। প্রহ্লাদের জীবনে কত দুঃখ আসিয়াছিল, সে কিন্তু প্রহ্লাদকে সকল দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। এখনও কোটি কোটি নরনারী তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেই ডাকে, বিপদে পড়িয়া বলে "উদ্ধর গো উদ্ধর"—এসমা এই একটী বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবার অভ্যাস করিয়া ফেলি।

যাঁহাকে স্মরণ করিতে যাইতেছি তিনি কিন্তু সর্ব্বত্র আছেন, তিনি কিন্তু সর্ব্বনরনারীর হৃদিস্থ। অহো! তাঁহার অভাব কোথাও নাই—উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি আছেন। করিবে তাঁহার স্মরণ? দুঃখ আসিলে তাঁহাকে স্মরণ কর—যে কেহ ভয় দেখায়, বিঘ্ন আচরণ করে, অসম্বন্ধ প্রলাপ বকায়, তাহার সম্বন্ধে তাঁহাকে নালিশ করিয়া দাও—তোমাকে সে তখন এক্ষণেই সুস্থ করিয়া দিবে।

এমন বন্ধুর কথা সকলেই শুনিয়াছে। কেন তবে স্মরণ করে না?

তাহাকে ভাল করিয়া জানেনা বলিয়াই স্মরণ করেনা। যেমন নির্জ্জন আশ্রমে যতদিন সর্প না দেখা যায় ততদিন বেশ স্বচ্ছন্দে থাকা যায় কিন্তু সর্প আছে দেখিলে মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা অশান্তি হয়, সেইরূপ যতদিন না জানা যায় বন্ধু আছেন ততদিন উৎপাৎ, ভয়, অশান্তি যায়না, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান, দয়ার সাগর, ক্ষমার সার, প্রেমময় বন্ধু আছেন জানিলে, বন্ধুকে বন্ধু বলিয়া জানিলে, আমার বন্ধু আমার, আমারই আছেন, সর্ব্বদা আছেন, আমার ভিতরে আছেন, বাহিরে আছেন, আত্মা যেমন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন সেইরূপ তিনিও সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন জানিলে মানুষের সব জুড়াইয়া যায়, মানুষ সব উৎপাৎকে, সকল কর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া বন্ধুকে স্মরণ করিতে পারে; শেষে বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেশে গিয়া সকল দুঃখের হস্ত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পায়।

যাইবে সেই বন্ধুর দেশে? যাইতে হইলে বন্ধুকে এ দেশেও সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। যত যত বন্ধুকে জানা যাইবে ততই ভাল করিয়া স্মরণ হইবে। আহা! এই বন্ধু সদা চেতন। চেতনকে জানিতে হইলে চেতন হইতে হয়। চৈতন্যকে জানিতে হইলে চৈতন্য লাভ করা চাই। জড় হইয়া থাকিলে চেতনকে জানাও যায় না—চেতনকে স্মরণ করাও যায় না।

যিনি আপনাকে আপনি জানেন এবং পরকেও জানেন তিনি চেতন। আর জড় যে সে, আপনাকে আপনি জানেনা আপনি পরকেও জানেনা। যিনি যত চেতন হইয়াছেন তিনি ততই চেতনকে জানিয়াছেন। তুমি তত জড়, যত তুমি আপনাকে আপনি জাননা এবং আপনি পরকেও জাননা।

বলিতেছিলাম এই চেতন বন্ধুকে স্মরণ করিতে হইলে ইঁহাকে কিছু কিছু করিয়া জানা চাই এবং ইঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ইহার উপদেশ মত কিছু করাও চাই।

করার কথা না হয় পরে বলা যাইবে এখন জানার কথা অগ্রে আলোচনা করা যাউক তাহা হইলে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞামত কর্ম্মও করা যাইবে। আর বিঘ্ন, উৎপাৎ, আধিব্যাধি, জরামৃত্যু প্রভৃতি ভয়ের ব্যাপারে সেই আপনার হইতে আপনার প্রাণের বন্ধুকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সুস্থ থাকা যাইবে।

বেদ বলেন ইনি সগুণ ব্রহ্ম, তন্ত্র বলেন ইনি কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী। নির্গুণ ব্রহ্ম, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মও যখন তাঁহাতে মিলাইয়া যায় তখন থাকেন। যখন মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকেনা তখন তাঁহাকে কে বলিবে

তিনি প্রকাশ বা অপ্রকাশ, চেতন বা জড়, জ্ঞান স্বরূপ বা অজ্ঞান স্বরূপ, সদ্ অসদ বা সদসৎ—তাই বলা হয় যন্ন বেদ। বিজ্ঞানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম ন যত্র বাক্ প্রভবতি। এই নিগুর্ণ ব্রহ্মের কথা যখন বলাই যায় না তখন আর তাঁহার বিচার কি হইবে? মহাপ্রলয়ে সমস্ত নাশ করিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ভক্ষণ করিয়া তিনি আপনি আপনি থাকেন। বেদের এই উপদেশ শুনিয়া রাখা ভাল। এখন আমরা এই শক্তিমাখা চৈতন্য বা সগুণব্রহ্মের কথা কহিব। ইঁহাকেই স্মরণ করিতে হইবে। ইহাঁতেই আমাদের প্রয়োজন।

এই যে বাহিরে জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে এটা কি? উপরে সমন্তাৎ প্রসারিত আকাশ আর নীচে এই বিপুলা পৃথ্বী এই জগৎটা কি? আর এই ভিতরে জগতের নরনারী সদাসর্ব্বদা যে "আমি" 'আমি" করিতেছে, এই "আমিই" বা কে?

ঈশ্বর জগৎরূপ ধরিয়া বাহিরে আর ইনিই "আমি" "আমি" রূপে ভিতরে। যতদিন এই "আমিকে" এই "আত্মাকে" ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস না করিবে ততদিন সেই আপনার হতেও আপনাকে ভাল করিয়া স্মরণের সুবিধা করিতে পারিবে না; যত দিন এই বাহিরের জগৎটাকে ঈশ্বরের উপরে প্রতিবিম্ব স্বরূপে না বুঝিবে, যতদিন অতিবিস্তৃত সীমাশূন্য স্ফটিকশীলাবৎ অতি শুদ্ধ অতি নির্ম্মল চৈতন্য পুরুষে জগৎ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া নিরাকারকে আকার দিতেছে এই বোধ না জন্মিবে ততদিন সর্ব্বদা স্মরণের সুবিধা হইবে না। আরও যতদিন না এই নিরাকার চৈতন্য স্বরূপের চিৎ-ঘন প্রকাশ মূর্ত্তির ধারণ করিতে না পারিবে ততদিন সর্ব্বহৃদিস্থ ভগবানের সর্ব্বদা স্মরণের সুবিধা হইবে না।

যাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া জানিবার জন্য এই শক্তিজড়িত চৈতন্যের কথা একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

শক্তি ও ভর্গ একই। ভর্গ যেমন বরণীয় ও অবরণীয় দুইই, শক্তিও সেই রূপ স্পন্দ ও অস্পন্দ দুইই। বরণীয় ভর্গ যেমন ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্তকরান সেইরূপ অস্পন্দ শক্তিও ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করান। স্পন্দশক্তি বহির্ম্মুখে আসিয়া অন্তর্নিহিত কল্পনা দ্বারা অতিশুদ্ধা অতিনির্ম্মলা চিন্ময়ীর উপরে প্রতিবিম্ব ছড়াইয়া দেন। চিৎদর্পণে কল্পনা ও কল্পনার ঘনমূর্ত্তি এই জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া পরচিন্ময়ী গায়ত্রী জগন্মাতাকে জগদাকার দিতেছে। নামরূপ বিশিষ্ট

জগদাকার এই মায়াযবনিকা অন্তরালে প্রকাশরূপিণী জগজ্জননী অথবা প্রকাশ স্বরূপ চিৎ সর্ব্বদাই বিরাজমানা। মানুষ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া এই ঘনচিৎ প্রকাশের উপরে যে সমস্ত মায়ার চিত্র ভাসিয়াছে তাহাদের খেলা দেখিয়া, সেই অসত্য জগচ্চিত্রকে সত্য মনে করিয়া নিরন্তর ক্লেশভোগ করে। যিনি কিন্তু প্রতিবিম্ব সমূহকে অসত্য বোধে অগ্রাহ্য করিয়া সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ঘনচিৎ প্রকাশকে লইয়া থাকিতে পারেন তিনি সংসারে থাকিয়াও কোন কিছুতে আসক্ত হন না—তিনি সংসার দ্বারা আর পরাজিত হন না। বাহিরে অসত্য সংসারে একটা অসত্য কর্তৃত্ব রাখিয়াও তিনি ভিতরে আপনার নির্লিপ্ত পূর্ণ স্বরূপে জগদম্বার কৃপাতেই স্থিতি লাভ করিতে পারেন।

বলিতেছিলাম আত্মা যেমন সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গে থাকেন, সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন ফিরেন সেইরূপ এই জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রী দেবী, এই ঘনচিৎ প্রকাশ পরমপুরুষ সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গে আছেন, সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গে ঘুরিতেছেন ফিরিতেছেন—আকাশ যেমন সর্ব্বদাই মানুষকে দেখে, সেইরূপ ইনি সর্ব্বদাই সকল নরনারীকে সাগ্রহে দেখিতেছেন। এইটিই মানুষের স্বরূপ। মানুষ এই স্বরূপটি ভুলিয়া মায়ার অসত্য পুতুলী সমূহকে এত সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে যে কিছুতেই মানুষ মনে করে না যে স্বরূপটিই আমি। এখন স্বরূপ হইতে পৃথক সাজিয়া মায়ার মুখস্ পরিয়া যে নাচিতেছে সে যখন সাধু সঙ্গে আপনার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারে, সে এই মিথ্যাকে সত্য স্বরূপ দেখাই-বার জন্য সর্ব্বদা যখন ইঁহারই কাছে প্রার্থনা করে, ইঁহারই কাছে সর্ব্বদা নালিশ করে এক কথায় তখন মানুষ আপনার এই পূর্ণ স্বরূপকে সর্ব্বদা স্মরণ করে।

সর্ব্বদা এই মায়া যবনিকার অন্তরালস্থিত, এই স্পন্দ শক্তির বিচিত্র চিত্র ঢাকা এই সূর্য্যকোটিসমপ্রভ এই চন্দ্রকোটিসুশীতল ঘনচিৎ প্রকাশকেই স্মরণ করিতে হইবে। আত্মাকে যেমন মানুষ সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে পারে সেইরূপে আপনার স্বরূপ আত্মাকেও মানুষ সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারে। ইহার কাছে সর্ব্বদা আপন দুঃখ জানাইতেও পারে এবং প্রতীকারও পাইয়া থাকে।

যিনি ইঁহাকে কিছু বুঝিয়াছেন, যিনি ইঁহার সহিত কথা কহিতে দুই চারিদিনও অভ্যাস করিয়াছেন, যিনি ইঁহাকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তিনি ইঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন কি?

তাই বলিতেছিলাম এই একবৎসর ধরিয়া একটি অভ্যাস করিতে। এই অভ্যাসটি হইতেছে ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কথা কওয়া। আদরিণী স্ত্রী

যেমন স্বামীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ তুমি ও যখন ইঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কথা কওয়ার অভ্যাসটি পাকা করিতে পারিবে তখন তুমি ইহঁাকে ভাল বাসিয়া ইঁহারই ভক্ত হইয়া যাইবে।

মনকে ভ্রূমধ্যে সেই জ্যোতি রাশির ভিতরে সেই ঘনচিৎপ্রকাশের মূর্ত্তিতে ধারণা করিয়া সর্ব্বদাই ইঁহার সহিত কথা কওয়া, সর্ব্বদাই ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যের সহিত কথা কওয়া, সর্ব্বদাই কোন কিছু করিতে গিয়া ইঁহার সহিত নেত্রান্ত সংজ্ঞা করা যেমন কঠিন, তেমনি ইহা রসের সাধনা। ইঁহার আজ্ঞা পালন করায় যে কত সুখ তাহা বলা যায় না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ইঁহারই আজ্ঞা। যাঁহাকে ভালবাসা যায়—তাঁহার সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার সমস্ত অভিপ্রায় ধরিতে না পারিলেও, তিনি যাহা করিতে বলেন তাহা কখন অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি যাহা নিষেধ করেন তাহাও কখন করা যায় না। যতদিন মনুষ্যত্ব থাকে ততদিন ইহাই হয়। মনুষ্যত্ব যখন বিকৃত হয় তখন তাঁহার আজ্ঞা পালন না করার পক্ষে অনেক যুক্তি উঠে—এই সমস্ত যুক্তিই অসার, এই সমস্ত যুক্তিই মানুষকে কুটিল, খল, কামী করিয়া ফেলে।

ধারণার স্থানে মনকে পুনঃ পুনঃ আনাই ত পুরুষার্থ। মন ত লাগিয়া থাকিতেই চাহিবে না, মন ত নিত্য নূতন দেখিলেই মজিবার জন্য লালসা করিবেই কিন্তু মনের এই ব্যভিচারকে, মনের এই বেশ্যাবৃত্তিকে মিথ্যা মায়া—অজস্রভাবে অসত্য অসত্য করিয়া একদিকে ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করা অন্যদিকে সেই সত্যকে সর্ব্বদা স্মরণ করা ইহাই জীবনকে ধন্য করিবার একমাত্র উপায়। ঘন ঘন উৎপাৎ আসিলে ঘন ঘন নালীশ করা— আর বলা "কটু কইকি সাজা পাবি মাকে দিব কয়ে—সে যে দনুজদলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে।" আর যদি কখন ভক্ত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে তখন আবদার করিয়াও বলা চলিবে "দুটা দুখের কথা কই, আমি কি দিয়াছি মা তোর পাকা ধানে মই।"

মূল তত্ত্ব ধরিয়া স্মরণের কথা বলা হইল। কিন্তু এই স্বরূপ চিন্তা করিবার পুণ্য এই পাপভরা কলিযুগের কয়জনের আছে? তথাপি যে বলা হইল ইহা সাধুমুখে ও সৎশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। আমাদের মত মন্দ বুদ্ধির জন্য ইষ্টদেবতার স্মরণ অভ্যাসই লঘু উপায়।

শাস্ত্র বলেন—

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকোপি বা।

ত্যজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্॥

ইষ্ট দেবতার স্মরণটির পাকা অভ্যাস করিয়া ফেলা চাই। কি করিলে ইহা হইবে তাহা যথাসাধ্য বলিতে চেষ্টা করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

স্বরূপ চিন্তায় যেমন নির্গুণ, সগুণ, আত্মা এবং অবতারের চিন্তা সমকালে করিতে হয়, যেমন ভাবনা করিতে হয় এক অখণ্ড জ্যোতি, এক অখণ্ড প্রকাশ সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া আছেন, আর কিছুই নাই, শুধু প্রকাশ, জগৎ নাই, জগতের কোন কিছু নাই, জগৎ তখনও একটা সমন্তাৎ প্রসারিত অন্ধকার মাত্র, পূর্ণ প্রকাশে এই পরিপূর্ণ অন্ধকারটা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, পরে এই পূর্ণ প্রকাশ যখন আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, নির্গুণ ব্রহ্ম যখন সগুণ হইতে ইচ্ছা করেন তখন, যন্ত্র না হইলে যেমন শক্তির প্রকাশ হয় না, সেইরূপ সৃষ্টি না হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তার আত্মপ্রকাশ হয় না—সেই জন্য সৃষ্টি যবনিকার অন্তরালে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই—শক্তি জড়িত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে সমষ্টি সৃষ্টির ভিত্তিরূপে দাঁড়ান। কাজেই জগতের সমস্ত বস্তুই সেই জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ চৈতন্যের উপরেই ভাসে, তাঁহার চেতনাতেই জগৎ চৈতন্য মত প্রকাশ পায়; ইহাতেও হয় না, তিনি তখন "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের প্রতি বস্তুর মধ্যে তিনি আত্মারূপে প্রবেশ করেন—সমষ্টি ব্যষ্টির আত্মা সেই ভরিত চৈতন্যই। পূর্ণ চৈতন্য চিরদিনই পূর্ণ চৈতন্যই আছেন, ছিলেন, থাকেন, থাকিবেন তথাপি ঘট উঠিলে ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশকে যেমন ঘটাকাশ নাম দেওয়া যায়, ঘটের মধ্যে আকাশের খণ্ড হওয়া যেমন কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই কল্পনা যেমন মিথ্যা বুদ্ধি মাত্র সেইরূপ পূর্ণপ্রকাশের জীবভাবে আত্মপ্রকাশও মিথ্যাবুদ্ধি মাত্র, পূর্ণ আত্মার বদ্ধজীবআত্মা সাজাও মৃষাবুদ্ধি মাত্র। নির্গুণ, সগুণ, আত্মা হইয়াও হয়না—এই নির্গুণ সগুণ, আত্মাই—ঘনচিৎ প্রকাশ হইয়া অবতার হয়েন; মানুষের বুদ্ধি আপ্যায়িত হইতে পারে এই চৈতন্য বিচারে, এই আত্মবিচারে, এই বিম্বশূন্য প্রতিবিম্ব জগৎ বিচারে কিন্তু ভক্তের হৃদয় পূর্ণ করিতে, ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত করিতে, জগৎকে আপন আচরণ দিয়া আপ্যায়িত করিতে, জগতের পাপান্ধকার দূর করিয়া জগতকে সত্য ধরাইতে এক অবতার ভিন্ন অন্য কোনরূপে হইতে পারে না।

বলিতেছিলাম এই অবতারের, এই ইষ্ট দেবতার স্মরণ করিয়া যে কেহ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, সে দ্বিজ হউক, রাক্ষস হউক, পাপী হউক বা ধার্ম্মিক হউক, মৃত্যুকালে এই রামের স্মরণে, এই রামকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারিলে সে পরমপদ লাভ করিবেই। আবার ৺কাশীধামের লোকবিশ্রুত মাহাত্ম্য হইতেছে মহাদেব স্বয়ং মৃত্যুকালে নরনারীকে এই তারকব্রহ্ম নাম শুনাইয়া—এই রামের স্মরণে ভরিত করিয়া—এই ভাবে মুমূর্ষুর চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে মহাদেব শ্রীরাম চন্দ্রকে বলিতেছেন—

অহং ভবন্নাম গৃণন্কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥

মহাদেব বলিতেছেন আমি দিবানিশি—হে রাম—ভবানির সহিত আপনার নাম করিয়া করিয়া কৃতার্থ হইয়া ৺কাশীতে বাস করিতেছি। কেন করি? ৺কাশীতে যে মরিতেছে তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য ভবানীর সহিত আমি আপনার রাম নামরূপ মন্ত্র ঐ মুমূর্ষুর কর্ণে শুনাইয়া থাকি।

মৃত্যুকালে স্মরণ তাঁহার কৃপায় ত হইবে কিন্তু জীবিতকালে যে কেহ জীবন ধরিয়া এই স্মরণের অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে—তাঁহার উপরে শ্রীভগবানের কৃপা কি হইবে না? একজন বলিয়াছিলেন কৃ=করা আর পা=পাওয়া; কর পাইবে। না করিলে পাইবে কিরূপে? জীবন ধরিয়া তাই স্মরণের অভ্যাসের চেষ্টা করিতে বলি—তাহা হইলে শেষের দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে।

বলিতেছি ইষ্টমূর্ত্তিটি ঘনচিৎপ্রকাশ। নিরাকার আত্মজ্যোতিই ঘন হইয়া এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করেন। ইঁহারই ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। মনকে ভ্রূমধ্যে অথবা হৃদয়পদ্মে অথবা সহস্রারে ধারণ করিয়া ঐ সুন্দর ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে হয়। ইষ্টদেবের এক এক অঙ্গে তাঁহার লীলা জড়িত। সেই জন্য শাস্ত্র বলেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেই তাঁহার লীলাগ্রন্থ ভাগবতের সমস্ত লীলা বিজড়িত। রামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই শ্রীরামায়ণ। চণ্ডীর অঙ্গে প্রত্যঙ্গেই সপ্তশতী বিজড়িত। এক এক অঙ্গ ধরিয়া ইষ্টের লীলা চিন্তা কর—চরণ ধরিয়া এই চরণ স্পর্শে কত পাষাণী মানুষ হইল ভাবনা কর, এই হস্ত কত ভক্তকে অভয় দিল স্মরণ কর, কত পাপীকে বিনাশ করিল ভাবনা কর—এইভাবে স্মরণ

করিয়া করিয়া নামটি সরস কর আর সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে নাম কর। নাম করিয়া করিয়া তোমার জন্য গৃহ পরিষ্কার করিতেছি ভাবনা কর, তোমার জন্যই রন্ধনাদি করিতেছি, শয্যা প্রস্তুত করিতেছি, তোমার অঙ্গেই তৈল মর্দ্দন করিতেছি, তোমার দেহকেই স্নান করাইতেছি ভাবনা কর। ইহাই ত নমোনমঃ করা—ইহাই ত আমার কিছু নয় সব তোমার ভাবনা করা। এই অভ্যাস করিয়া করিয়া যখন সব তোমাকে দেওয়া হইয়া যাইবে আহা! তখন কত সুখ। এই চক্ষু আমার নহে তোমার; এই চক্ষু দিয়া তুমি দেখিতেছ, এই কর্ণ দিয়া তুমি শুনিতেছ, এই চরণ দিয়া তুমি চলিতেছ, এই হস্ত দিয়া তুমি গ্রহণ করিতেছ, এই মুখ দিয়া তুমি আহার করিতেছ, এই নাসিকা দিয়া তুমি আঘ্রাণ করিতেছ—এইভাবে যদি সমস্তই তোমাকে দেওয়া হইয়া যায় তবেই ত স্মরণ অভ্যাসটি পাকা হইল। তখন জগতের যত নারীনর সকলই তোমার মূর্ত্তি, আকাশ তোমার মূর্ত্তি, বায়ু তোমার মূর্ত্তি, অগ্নি, জল, পৃথ্বী তোমার মূর্ত্তি—বিচিত্র জগচ্চিত্রে গা ঢাকা দিয়া তুমিই পরচিন্ময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, কারণানন্দরূপিণী, গায়ত্রী, মা হইয়া দাঁড়াইয়া আছ আর এই মা-ই—এই বরণীয় ভর্গই—এই অস্পন্দ শক্তিই সেই পরম পদ।

আর কি বলিব—ঠাকুর আমাদিগকে এই ভাবে স্মরণ চেষ্টায় ভরিত করিয়া তোমার করিয়া লও এই প্রার্থনা। যেন আমরা এই বর্ষ ধরিয়া তোমার হইবার জন্য এই অভ্যাস করিতে পারি ইহাই তুমি করিয়া দাও।

সাধু কে? এবং সাধুসঙ্গ পায় কে?

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

সাধু পুরুষের সঙ্গ—ইহাই সংসার মুক্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু সাধু কে? সাধু যিনি তিনি সমচিত্ত—তিনি শত্রু ও মিত্রে বৈর ও প্রীতিভাব রহিত। সাধু যিনি তিনি নিস্পৃহ—কোন কিছুতে তাঁর ইচ্ছা নাই। তার পুত্র ধনজন যদিও বিদ্যমান থাকে তাহাতেও তাঁহার কোন আসক্তি নাই, ইনি ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন করিয়াছেন বলিয়া দান্ত; ইনি মনকে বশ করিয়া সর্ব্বদা

প্রশান্ত ; ইনি শ্রীভগবানের ভক্ত ; ইনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছেন ; ইষ্টবস্তুর প্রাপ্তি ও নাশ উভয়ই তাঁহার নিকট সমান, অর্থাৎ তিনি হর্ষ বিষাদ রহিত ; তিনি দুঃসঙ্গ একবারে ত্যাগ করেন ; তিনি সমস্ত কর্ম্ম সম্যকরূপে ন্যাস করিয়া সন্ন্যাসী ; তিনি সর্ব্বদা "আমি কে এবং জগৎ কি" এই বিচার তৎপর ; তিনি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমস্ত যোগশাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন ; দৈবযোগে যাহা কিছু মিলে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ; ভগবান্ অগস্ত্য বলিতেছেন হে রাম ! এইরূপ সাধুপুরুষের সঙ্গে সৎসঙ্গ যখন হয় তখন তোমার কথা শ্রবণমাত্র প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাতেই তোমাতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তি হইলেই নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে। ঐ জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে—এইরূপ সৎসঙ্গ কলির জীবের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? যাঁহারা এইরূপ গুরু পান নাই, এইরূপ সৎসঙ্গও যাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহারা কি করিবেন ?

সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র—সাধকের ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার উভয় উপায়ই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৎশাস্ত্র দ্বারা সৎসঙ্গের স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। যোগবাশিষ্ঠাদি শাস্ত্রে দেখা যায় সাধক মাত্রেরই উচিৎ নিত্য কোন সৎশাস্ত্র শ্রবণ করা ও মনন করা। যাঁহারা ইহা করেন তাঁহারাই জানেন সৎশাস্ত্র জ্ঞান ও ভক্তিপথের কত সহায়ক। সৎশাস্ত্রের মধ্যে গীতা, শ্রীমৎভাগবত, দেবী ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, মহাভারত এবং যাঁহারা অধিকারী তাহাদের জন্য উপনিষদ্—এই সমস্ত প্রধানতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ফলে যতদিন না একনিষ্ঠা জন্মিতেছে, ততদিন শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা হয় নাই। একনিষ্ঠা শূন্য সাধনা—ইহা "তুষাণাং কণ্ডনং যথা" ইহা তুষ কাঁড়া মাত্র। একনিষ্ঠাতে একমাত্র ঈশ্বরই থাকিবেন অন্য সমস্তই উপেক্ষার বস্তু। মানুষ বাহিরে যাহা কিছু প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে ছুটিয়া যায়, মন্ত্র, ইষ্ট ও গুরু স্মরিয়া স্মরিয়া মন হইতে তাহা বাহির করিয়া দিতে হইবে। বাহিরে গ্রহণের আড়ম্বর দেখাইয়াও ভিতরে সেই মন্ত্র, ইষ্ট ও গুরু ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না।

কোন কোন সাধককে বলিতে শুনা যায়—আমার কর্ম্ম যদি আমাকে কোথাও টানিয়া লইয়া যায় তাহার উপর আমার হাত কি ? অনাদি সঞ্চিত

কর্ম্মসংস্কারের সহিত সংগ্রাম করাই সাধনা। অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারই প্রকৃতি। প্রকৃতিও যেমন মানুষের সঙ্গে আছেন পুরুষও সেইরূপ সঙ্গে আছেন। পুরুষের স্থানীয় হইতেছেন ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু। ইঁহাদের সাহায্য লইয়া কর্ম্মসংস্কার জয় করিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ করেন তাঁহারাই সাধক শ্রেণীভুক্ত—যাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা ভোগ লাম্পট্যে সংসারই করেন—ইহাঁদের সাধক শ্রেণীভুক্ত হওয়া হয় নাই।

ভাবির।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন M A.

সাহিত্যগগন ভালে তুমি দীপ্ত রবি,
ওজস্বী ভাবুক শ্রেষ্ঠ হে কবি ভারবি!
কঠিন শীতল স্পর্শ রত্ন মহোপল
কাব্য লক্ষ্মীচূড়া করে মণ্ডিত উজ্জ্বল।

(২)

সিন্ধুবীচি ধৌত তব দ্রাবিড় জননী,
"*দামোদর"—প্রিয় কিন্তু শৈব চূড়ামণি,
করে তোমা রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন সম্মান,
বাণীর প্রভব তুমি মেধাবী মহান্।

(৩)

নারিকেল ফল তুল্য সসার বচন,
অর্থের গৌরবে পূর্ণ, হরে তৃষা, মন,
তৃপ্ত হয় সুধারসে প্রসন্ন উন্নত,
নৈরাশ্য দৌর্ব্বল্য গ্লানি হয় অপগত;

(৪)

আত্মাদর সম্মানের আদর্শে ভূষিত,
হীনতা ক্ষুদ্রতা দৈন্য হয় অন্তর্হিত,

---

* 'দামোদর'—কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডীর প্রপিতামহ, পক্ষে বিষ্ণু।

উৎসাহ-আশার পুণ্য সঞ্জীবনী বাণী,
ঝঙ্কারে হৃদয়ে নিত্য, অবসাদ হানি।

(৫)

কামিনীও গর্জ্জি উঠে ফণিনীর প্রায়,
তেজমনস্বিতা কথা পুরুষে শুনায়,
হৃদয় ক্ষতের রক্তে অরির নিকারে
উদ্দীপিত করে মত্ত রঞ্জিত সবারে।

(৬)

রাজধর্ম্ম বর্ণনার অপূর্ব্ব পাটব,
"গুণ প্রিয়ত্বের হেতু নহেক সংস্তব",
"হিত মনোহারী বাক্য কে পেয়েছে কবে ?
কত সত্য কত তত্ত্ব শিখালে মানবে।

(৭)

প্রিয়াদৃষ্টি নিভ শুভ্র শফরী লুণ্ঠন,
গোপী গীতা সক্তা মৃগী, কল হংস স্বন,
চক্রসীমন্তিত সান্দ্রকর্দ্দমের সারি,
পদ্মরেণু লিপ্তস্তনী শালি গোপ্ত্রী নারী ;

(৮)

কঠোর কর্ত্তব্য ব্রত বর্ণিলে সুন্দর,
প্রমাদ ভীরুতা যেথা লুপ্ত হতাদর ;
রাজপুত্র তপঃ ক্লেশ সমাধি সংযম
প্রলোভন বহ্নি তাপ সহিয়া বিষম,

(৯)

স্বপদবী নিজস্বত্ব না ছাড়িয়া লভে
ইষ্ট, শিবরূপী তোষি' কিরাত—বল্লভে ;
সামর্থ্য যোগ্যতা শুধু শক্তি অবদান,
তন্দ্রাভয় ভিক্ষা নহে, করে সিদ্ধিদান।

শিবরাত্রি

বঙ্গবাসী হইতে।

[শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ মহাশয় লিখিত]

যার তার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া ক্ষুদ্র হইয়া যাও কেন? ব্যক্তি-মধ্যে বল, পরিবার মধ্যে বল, সমাজ-মধ্যে বল, জাতি-মধ্যে বল, চারিধারে দুঃখের সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে। এই কালে ইহাই হইবে। এ দুঃখের প্রতিকার করিবে কে? কেহই পারিবে না। কেহই কি পারিবেন না? একথা বলি না। কোন মানুষে পারিবে না। তবে যিনি পারিবেন তাঁহাকেই বলিলে কাজ হইবে, অন্যত্র বিফল।

এই প্রবল দুঃখের প্রতিকার শ্রীভগবান্ ভিন্ন কেহই করিতে পারিবে না। তাই দুঃখের কথা তোমাকেই জানাইতে চাই। সকল দ্বারে বিফলমনোরথ হইয়া আজ তোমার দ্বারে আসিয়াছি দুঃখের কথা বলিতে। তুমি বধিরও নও, তুমি অন্ধও নও। তুমি সব দেখিতেছ, তুমি সব শুনিতেছ। আর আমার আত্মার মত তুমি আমার হৃদয়ের রাজা হইয়া রহিয়াছ। তবু আমার দুঃখ যায় না কেন? তুমি প্রতিকার কর না কেন? আমি সব ছাড়িয়া তোমার আশ্রয় লই না বলিয়াই তুমি এস না। হায়! আমার দুর্ব্বল বিশ্বাস! আমার বিশ্বাসে কোথাও বুঝি একটু চিড় আছে—কোথাও যেন কোন অবিশ্বাসের বীজ আছে—আমি বুঝি সংশয়াত্মা হইয়া আছি, তাই দুঃখে দুঃখে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছি। তুমি ভিন্ন আমার দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে আর কেহ পারিবে না। তুমি পারিবে, আর তুমি ভিন্ন যাহার আর কেহ নাই, যিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, অনুভব করিতেছেন, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই—বলিতেছি তুমি আর তোমার যথার্থ ভক্ত ভিন্ন চারিধারের দুঃখ সরাইতে আর কেহই পারিবে না। মানুষ তোমার আশ্রয়ে না আসিয়া কোনও বুদ্ধি কৌশলে জীবের দুঃখ দূর করিতে পারিবে না।

তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে আছ সত্য, কিন্তু কালে কালে বিশেষ বিশেষ ভাবে নিজের সত্তা উপলব্ধি করাইয়া থাক। শিবরাত্রি একটি সেইরূপ সময়। শিবরাত্রিতে শিবপূজা করিয়া আশুতোষ তুমি—তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে 'নমো নমঃ' করিয়া প্রার্থনা করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সকল দুঃখ দূর করিয়া

থাক। যিনি হৃদয়ের ঐকান্তিকতার সহিত 'নমো নমঃ' করিতে পারেন ঠাকুর আমার কিছুই নাই সব তোমার—আমি কেহ নই—আমিও তোমার,—হৃদয়ে এই ভাব আনিয়া—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া এই ভাব হৃদয়ে আনিয়া—যিনি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁর জন্য তোমার অভয় হস্ত সর্ব্বদা বরপ্রদ। তবে তোমার স্বভাবটিও গুরুমুখে এবং শাস্ত্র মুখে শুনিয়া রাখা চাই। আমাদের জাতির কে না জানে ঠাকুর তুমি অগতির গতি, তুমি শরণাগতের অভয়-দাতা, তুমি ভবভীতের ভয়ত্রাতা, তুমি পাপীতাপীকেও উপেক্ষা কর না, তুমি কাঙ্গালের বন্ধু—তুমি যথার্থ আর্ত্তজনার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তুমি যথার্থ বিপন্নের আহ্বান শ্রবণ কর—তুমি—যে তোমাকে ঠিক ঠিক বলিতে পারে আমার কেহ নাই, আমার তুমিই আছ—তুমি তাহাকে দেখা দাও, তাহার পূজা তুমি গ্রহণ কর, তাহার সকল দুঃখ দূর কর।

বলিতেছিলাম শিবরাত্রির রাত্রি বড় প্রশস্ত সময়। যেমন রাত্রি যায় দিন আসে, এই সন্ধিকালে সন্ধ্যা বা সম্যক ধ্যান করিতে হয়, সেইরূপ শিবরাত্রির রাত্রিও এক বৎসর যাইতেছে অন্য বৎসর আসিতেছে ইহার সন্ধিকাল। এই সন্ধিকালে পূজা সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। যিনি সত্য, যিনি সর্ব্বগত, যিনি সূক্ষ্ম, যিনি সদানন্দ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি নির্ব্বিকার, যিনি সাক্ষী আর যিনি নিজশক্তি গ্রহণ করিয়া—শিবরাত্রি হইয়া শিব শিবা হইয়া সকলের প্রভু, জগন্ময়, সর্ব্ব-কর্ত্তা, সর্ব্ব-ভোক্তা, সর্ব্বসংহর্ত্তা—সেই তিনিই—সেই পরব্রহ্মই শক্তিময় হইয়া জগদাকার ধারণ করিয়া জগতের নিয়ন্তা হইয়া জগৎবাসীর দুঃখ দূর করেন। ইনি যেমন নির্গুণ হইয়াও শক্তি জাগাইয়া সগুণ, ইনি সেইরূপ আত্মা হইয়াও ভক্তচিত্তানুসারে রূপ ধারণ করেন—অবতার হয়েন। শিব-পূজাতে—চারিবর্ণেরই অধিকার আছে। 'নমো নমঃ' করিয়া হৃদয় গলাইয়া ভক্তি-উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে এই "বামাঙ্গে দধতং" শিবচরণে নিপতিত হইয়া বলি এস—

"বিশ্বেশ্বর! বিরূপাক্ষ! বিশ্বরূপ! সদাশিব।
শরণং ভব ভূতেশ করুণাকর শঙ্কর॥
হর শম্ভো মহাদেব বিশ্বেশামরবল্লভ।
শিব শঙ্কর সর্ব্বাত্মন্ নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে॥
মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় নীলকণ্ঠায় শম্ভবে।
অমৃতেশায় শর্ব্বায় মহাদেবায় তে নমঃ॥"

আহা এই তুমিই—

"রাজসেন স্বয়ং ব্রহ্মা সাত্বিকেন স্বয়ং হরিঃ।
তামসেন স্বয়ং রুদ্রস্ত্রিতয়ং ত্বয়ি সংস্থিতম্ ॥
নমামি ত্বাং বিরূপাক্ষ নীলগ্রীব নমোঽস্তু তে।
ত্রিনেত্রায় নমস্তুভ্যমুমাদেহার্দ্ধধারিণে ॥
ত্রিশূলধারিণে তুভ্যং ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
পিনাকিনে নমস্তুভ্যং মীঢ়ুষ্টমায় তে নমঃ ॥
নমামি ত্বাং মহাদেব পতয়ে ত্বাং নমাম্যহম্।
ভোক্তা ভোজ্যং ত্বমেবেহ ভক্তানাং শর্ম্মদঃ স্বয়ম্ ॥
সূর্য্যরূপং সমাসাদ্য দেহিনাং দেহধারকঃ।
মুনীনাং মুক্তিদাতা চ ভক্তানাং ভক্তিদঃ স্বয়ম্ ॥
যদৃচ্ছয়া সর্ব্বমিদং ত্বামভ্যেতি চ যাতি চ।
নান্যস্য বিজয়ং দাতুং শক্তিরস্তি ত্বয়া বিনা ॥"

আহা! এই নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার তুমি - আর সকল অবতারও এই নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে। কাজেই সর্ব্বপ্রকার সাধকের ইষ্ট দেবতা এই একই তুমি। কাজেই বিরোধ কোথাও নাই। যাহাকেই পূজা কর, সেই একেরই পূজা সর্ব্বত্র। বেদ বলেন—

"যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্ ॥
যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্।
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্ ॥"

(রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ)

যাঁহারা গোবিন্দকে নমস্কার করেন, তাঁহারা শঙ্করকে নমস্কার করেন, যাঁহারা শ্রীহরিকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা শিবের উপাসনা করেন। যাঁহারা শিবকে দ্বেষ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে দ্বেষ করেন। যাঁহারা রুদ্রকে জানেন না, তাঁহারা কৃষ্ণকে জানেন না।

উপরে যাহা লেখা হইল, সেইরূপ ভাবে অথবা যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনি আরও ভাল ভাবে হৃদয়কে কাতর করিয়া—এস এস আমরা যদি শিবপূজা পূর্ব্বে নাও করিয়া থাকি তবে এই শিবরাত্রির রাত্রিতে চারি প্রহরে শিব-শিবার পূজা করিয়া নিত্য এই শিবপূজা করি এস।

শিবপূজা করিতে করিতে ভাবনা করি এস—শিব সম্মুখেই শিবার সহিত আসিয়াছেন। অবোধ শিশু গোপনে যখন পিতার ছবি একা বসিয়া আঁকে তখন তাহার পিতা যেমন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আনন্দে ভরিত হয়েন, আর বলেন, আহা এই বালক আমাকে বড়ই ভাল বাসে, সেইরূপ তোমার গড়া এই শিবলিঙ্গের সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়া সেইরূপ আনন্দ করেন। এই খানেই শিব পার্ব্বতীর সহিত আসিয়াছেন—বিশেষভাবে ভাবনা কর। করিয়া বেশ করিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিব - এই সঙ্কল্প প্রথমেই করিয়া লও।

প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা কর "মম সর্ব্বারিষ্টনিবৃত্তিপূর্ব্বক তথা পূর্ব্বজন্মনি কৃত ইহ জন্মনি অর্জ্জিত—কায়িক, বাচিক, মানসিক, সাংসর্গিক, জ্ঞাতাজ্ঞাত, মহাপাতক উপপাতকানাং নানাব্যাধিরূপেণ পরিপচ্যমানানাং বিনাশার্থং ভগবতঃ শ্রীসদাশিবস্য প্রীত্যর্থং শিবপূজনমহং করিষ্যে।

"পাবনং সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মরূপিণঃ।
অনুগৃহ্নন্তু মাং সদ্যো শিবপূজাখ্য কর্ম্মণি॥"

হে পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা, হে ক্ষমার আধার, হে দয়ার সাগর, হে কাঙ্গালের আশ্রয়দাতা আমার সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত কর, আমার পূর্ব্বজন্মকৃত, ইহজন্মে অর্জ্জিত, কায়িক, বাচিক, মানসিক জ্ঞাত অজ্ঞাত, মহাপাতক উপপাতকাদি—যাহারা নানাবিধ ব্যাধিরূপে আমাকে ক্লেশের উপর ক্লেশ দিতেছে—যাহারা আমাকে নানাবিধ মনের জ্বালায় জ্বালাইতেছে,—যাহারা আমাকে তোমায় ভুলাইয়া তোমার চরণ হইতে দূরে আনিতেছে—সেই সমস্ত পাপ তাপ তুমি বিনাশ করিয়া দাও—তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে আমাকে ভক্তি দাও, আমি সেইজন্য—তোমার প্রীতিলাভ জন্য তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি। করনা এই ভাবে প্রার্থনা। করনা এই ভাবে প্রাণ ভরিয়া পূজা। ঐ যে বলিতে-ছিলাম, সেই তোমার পূজার স্থানে দাঁড়াইয়া—এই মনে করিয়া পাঠ কর না—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং
সংসারদুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

এই স্তবটি সমস্ত পাঠ কর আর ধ্যান কর—

"বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্য-শশাঙ্ক-বহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥"

বিধিমত পূজা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করনা—

"আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনম্।
পূজাঞ্চৈব ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥
অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর।"

কর এই সব; আপনিই বুঝিবে আশুতোষ তোমার প্রতি তুষ্ট হইতেছেন-তোমার দুঃখও দূর হইতেছে।

বুদ্ধি ও হৃদয়।

বুদ্ধি ও হৃদয়ের খেলা প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই চলিতেছে। ঐ খেলাতে বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ে উভয়ের প্রতিপক্ষ। হৃদয় চাহে বুদ্ধিকে এড়াইয়া তাহার আপন লক্ষ্যস্থলে যেমন তেমন করিয়া উপস্থিত হইতে, আর বুদ্ধি চাহে হৃদয়কে দাবড়াইয়া রাখিয়া নিজের কাজটুকু হাসিল করিয়া কি করাইয়া লইতে। হৃদয় বুদ্ধিকে উপেক্ষা করে,—বুদ্ধি হৃদয়কে সন্দেহ করে। যাহাকে ভাল লাগিল, হৃদয় হয়ত তাহাকে ভাল বাসিয়াই ফেলিল,—বুদ্ধি বিচার করিতে বসিয়া গেল,—ভাল যাহা লাগিল তাহা সত্য সত্যই ভাল কিনা। হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক চাপিয়া ধরার ভাব আছে, আর বুদ্ধির ভিতর একটা অস্বাভাবিক ছাড়াইয়া-লওয়ার ভাব আছে। হৃদয় বলে—'ধর'; বুদ্ধি বলে—'ছাড়'।

হৃদয় বলে—'ভালবাসিব' ; বুদ্ধি বলে—'ভাল হও'। হৃদয় বলে—'ভাল করিব', বুদ্ধি বলে—'ভাল থাক'।

মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে এই প্রকার বুদ্ধি ও হৃদয়ে অহরহ টানাটানি চলিতে থাকে। কোন সময় বুদ্ধির টান হয়ত বাড়িয়া হৃদয়ের টানকে কমাইয়া দেয় ; আবার কোন সময় হৃদয়ের টানে বুদ্ধি হয়ত দুর্ব্বল হইয়া দুম্‌ড়াইয়া পড়ে। হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ-স্রোতে বুদ্ধি হয়ত ভাসিয়াই গেল, আবার বুদ্ধির প্রচণ্ড উদ্বেগে হৃদয়টা হয়ত একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণতঃ মানুষের মনের ঝোঁক হৃদয়ের দিকে একটু বেশী। সেই জন্য হৃদয়বান্ লোক লোকের যতটা প্রিয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঠিক ততটা নয়। ভাল লাগিলে মানুষের গ্রহণ করিতে দেরি হয় না, কিন্তু ভাল-হইবে কি ভাল-করিবে এই ভরসায় মানুষ অত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে পারে না। ভাল-লাগানটা হৃদয়েরই কাজ, আর ভাল-করানটা বুদ্ধির কাজ। তাই আমরা দেখি, হৃদয়বান্‌কে লোকে করে শ্রদ্ধা, আর বুদ্ধিমান্‌কে করে সম্মান ; এক জনের সহিত করে আলিঙ্গন, আর, আর এক জনের সহিত করে কর মর্দ্দন।

মানুষের এই বাহ্যপক্ষপাতিত্বটুকুকে যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে, যে এই হৃদয়কে অধিকতর-প্রীতিদানের ভিতরও বুদ্ধির একটা গুপ্ত চাল বর্ত্তমান আছে। হৃদয়বানের প্রতি প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টির মধ্যে মানুষের বুদ্ধির অপর রূপ যে অনুভূতি, তাহারই প্রকাশ্য লীলা চলিতেছে। হৃদয়ের হৃদয়ত্বটুকুর সত্ত্বা অনুভব করিবার জন্য বুদ্ধির শরণাপন্ন হইতেই হইবে। হৃদয়বান্‌কেত কেবল হৃদয়বানেরাই প্রিয় বলিয়া জানেন না। হৃদয়বান্‌কে প্রিয় বলিয়া যাঁহারা জানেন, কি বুঝেন, তাঁহারা হৃদয়বান্ নাও হইতে পারেন কিন্তু তাঁহারা যে বুদ্ধিমান্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হৃদয়ের বেগ যতই হউক, বুদ্ধিকে সে ভাসাইয়াই লইয়া যাউক, তথাপি বুদ্ধিকে সে একেবারে বাদ কিছুতেই দিতে পারিবে না। ভাসাইয়া নিলেও স্রোতের উপর বুদ্ধি ঘুরাফেরা করিতে থাকিবেই। হৃদয়ের আবেগে শিশুকে জননী আপন বুকে জড়াইয়া ধরে, তাহার মধ্যে শিশুর শ্বাসরুদ্ধ না হওয়ার প্রতি লক্ষ্য থাকাটা ইহার একটা ছোটখাট প্রমাণ। হৃদয় যাহাকে গ্রহণ করিল, তাহার সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধির আবশ্যক হয়। এককথায় হৃদয় বুদ্ধিকে বাদ দিয়া কিছুতেই চলিতে পারে না। তবে হয়ত বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে সে ইচ্ছুক নাও হইতে পারে। গ্রহণের

মধ্যে উচিত অনুচিতের নীতিকথা সে শুনিতে নারাজ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিও ঠিক ঠিক হৃদয়কে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। বুদ্ধির যে ভাল করিবার, ভাল হইবার দিকে—এত ঝোঁক, ভাল-মন্দ বিচার, ঔচিত্যবোধ এই সব বুদ্ধির-ভিতর-লুকাইয়া-থাকা হৃদয়েরই বাহ্যস্ফুরণ। বুদ্ধিকে ব্যাপিয়া হৃদয় থাকে না, তাই বুদ্ধির প্রতি পদবিক্ষেপেই হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি নাও হইতে পারে। একজন আধুনিক তথাকথিত রাজনৈতিকের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে আপন দেশের প্রতি সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দেশের প্রতি হৃদয়হীনতার প্রকাশ্য কি প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া কৌশল বর্ত্তমান থাকে। এখন ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে, যে হৃদয় ও বুদ্ধি যদি এক না হইয়া কাজ করে, তবে পূর্ণত্বের আস্বাদ কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না।

বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়েই উভয় দ্বারা চালিত হউক। বুদ্ধি হয় পূর্ব্বে বিচার করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিক, তাহার পর হৃদয় আপন মনে অগ্রসর হউক, অথবা হৃদয় গ্রহণ করুক, তাহার পর গ্রহণ-পথের প্রকৃত অন্তরায় যাহা তাহাকে অপসৃত করিয়া দিবার ভার বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিক। হয় বুদ্ধি ভালবাসার বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া হৃদয়কে তাহার প্রতি প্রেরিত করুক, অথবা হৃদয়ের ভালবাসার বস্তুর ভিতর হইতে অবস্তু বা আবর্জ্জনাগুলিকে বুদ্ধি তাহার কৌশল দ্বারা বহিষ্কৃত এবং পরিষ্কৃত করিয়া দিক্।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

স্রষ্টার বিশ্বরাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দর্শনে নয়নের তৃপ্তিসাধন করিব ও তাঁর প্রিয়ভক্ত প্রকৃত সাধুদের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া জীবন মন সার্থক করিব, এ সাধ চিরদিনই অন্তঃকরণে প্রবলভাবে জাগরুক। বহুদেশ ভ্রমণ না হইলেও তাঁর কৃপায় যতটুকু দেখা হইয়াছে ও তাঁর প্রিয় মনোনীত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যতটুকু আসিয়াছি তাহাতেই এ ক্ষুধিত

অন্তরের প্রচুর তৃপ্তিসাধন হইয়াছে। আজ যে মহাত্মার বিষয় লিখিব মনে করিয়া বসিয়াছি তিনি বহু বৎসর অবধি বহু তীর্থস্থান কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান করিয়া ইনি সম্পূর্ণ অনাবৃত গাত্রে নগ্ন পদে উত্তর অঞ্চলের প্রবল শীতপ্রধান স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া শীত উষ্ণ ও বর্ষার অবিরাম ধারাপাত নির্ব্বিকারচিত্তে প্রসন্ন বদনে সহ্য করিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে জসিডিতে একটী নির্জ্জন ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বাস করিবেন মনস্থ করিয়া ২।৩ বৎসর হইল সেখানে আসিয়াছেন। বাবা ৺বৈদ্য-নাথের কৃপায় জসিডিতে আমাদের একটী বাড়ী থাকায় আমরা প্রত্যেক বৎসর ৺পূজার পর সেখানে গিয়া ২।৩ মাস সময় ওই বাড়ীতে বাস করি। ১৩৩২ সালে ৺পূজার পর জসিডিতে গিয়া শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কিরূপ ভাবে প্রথম দর্শন পাইলাম সেই কথা এখন বলি।

আমরা ১৩৩২ সালে জসিডিতে ভ্রমণে গিয়া সেখান হইতে একদিন দ্বিপ্রহরে ট্রেণে দেওঘর গিয়াছিলাম। কিন্তু ট্রেণখানি ষ্টেশনে পৌছাইলে শুনিলাম সেদিন ঘোড়গাড়ীর কোচ্‌ম্যান্‌গণ ধর্ম্মঘট-করায় সমস্ত দিনের মধ্যে আর ঘোড়গাড়ী পাওয়া যাইবে না। যে উদ্দেশ্যে আমরা সেদিন রওনা হইয়াছি তাহাতে এই স্বল্প বিঘ্নে আমাদের অবশ্য ভগ্নোৎসাহ করিতে পারিল না। সে দিন আমাদের গন্তব্য স্থান গুরু মহারাজ শ্রীমৎ আচার্য্য শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীজীর রাম নিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। যদিও পূর্ব্বে আমরা সে স্থান বহুবার গিয়াছি কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কোন দিন ষ্টেশন হইতে পদব্রজে সেস্থানে না যাওয়ায় ভালরূপ পথ চেনা ছিল না। তাই ট্রেণ হইতে নামিয়া অল্প একটু পথ আসিয়া যখন ইতঃস্তত করণীপদ রাস্তার পথ অন্বেষণ করিতেছি তখন সম্মুখেই দীর্ঘ কলেবর গৌরবর্ণ প্রশান্ত বদন সৌম্যকান্তি এক ব্যক্তি হস্ত উত্তোলন করিয়া করণীপদ আশ্রমের সংক্ষেপ পথ আমাদের দেখাইয়া দিলেন। তখন তাঁহার পরিচয় না জানা থাকিলেও সেই দিনই তাঁহার দণ্ডধারী সুদীর্ঘ কলেবর, মুণ্ডিত মস্তক ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পারিপাট্য বিহীন হইলেও বেশভূষা সাধারণ ব্যক্তি হইতে অন্যরূপ।

আমাদের বাড়ীর অতি নিকটেই দেওঘরের ছোট ট্রেণ লাইনের ওধারে লক্ষ্মীনারায়ণ সরাব নামক একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের বাগানের এক প্রান্তে প্রত্যহ রাত্রে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আলো জ্বলে দেখিয়া আমরা কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম কিছুদিন হইল ওখানে একটী সাধু আসিয়া বাস

করিতেছেন। আমরা স্থির করিলাম একদিন গিয়া ওই সাধুকে দর্শন করিয়া আসিব।

আমরা যে দিন দ্বিপ্রহরে ট্রেণে দেওঘর গিয়াছিলাম তাহার কয়েকদিন পর বেলা দ্বিপ্রহরে সাধু সন্দর্শন মানসে বাগানের নির্জ্জন প্রান্তে যে ক্ষুদ্র একখানি ঘরে সাধু বাস করেন সেখানে চলিলাম। সাধু তখন আহারাদি শেষ করিয়া ঘরের মধ্যে চৌকিখানির উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমরা ওই স্থানে পৌছাইয়া সাধুকে দর্শন করিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ ইনিই সেই দিনের আমাদের সেই করণীপদ আশ্রমের পথ প্রদর্শক ব্যক্তি। ঘরখানির দরজার সম্মুখেই বাহিরে একখানি চৌকি পাতা ছিল, সাধু আমাদের আসিতে দেখিয়া প্রসন্ন বদনে অভ্যর্থনা করিয়া বাহিরের চৌকিখানির উপর বসিতে বলিলেন। আমরা সকলে প্রণাম করিয়া উহার উপর বসিলাম ও কিছু সৎ কথা শুনিবার জন্য যে তাঁহার নিকট আসিয়াছি তাহা জানাইলাম।

সে দিন তাঁহার সহিত যে সব কথা হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান উপদেশ এই যে মায়িক বস্তুর সেবা করিলে কখনই নিত্য বস্তু লাভ হয় না। কাজেই যে নিত্য বস্তুর প্রার্থী তাহার বিচার পৃথক ; অনিত্য অস্থায়ী বস্তুর চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করা প্রয়োজন। সকল বস্তুই যে ক্ষণস্থায়ী নশ্বর প্রকৃতস্থায়ী আনন্দ দিতে অপারগ তাহা বিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইবে ও সেই জ্ঞান যত পাকা হইবে অর্থাৎ দৃঢ় হইবে ততই সে সব ক্ষণধ্বংসী আপাত মধুর মায়িক পদার্থ হইতে আসক্তি দূর হইয়া যাইবে। আসক্তিই জীবের যত বন্ধনের হেতু।

এতদ্ভিন্ন সাধু সেদিন আমাদের তুইটী গল্প করিয়াও শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার আধা হিন্দি আধা বাঙ্গলায় মিশ্রিত কোমল মধুর বাক্যাবলী আমাদের বড় মিষ্ট বোধ হইতেছিল। তিনি বাঙ্গলা ভাষা নিজে ভালমত না বলিতে পারিলেও আমাদের ওঁর বাক্য বুঝিবার কোন অন্তরায় হইতেছিল না, কারণ কথাগুলি অতি সুন্দর ধীরে ধীরে আমাদের বুঝাইয়া বুঝাইয়া বলিতেছিলেন।

এই মহাত্মার নাম শ্রীশ্রীহংস মহারাজ। কিন্তু আমরা এঁর বিষয় বলিতে হইলে সাধু বাবা বলিয়া বলিব। কারণ প্রথম দর্শনাবধিই তাঁহার সস্নেহমিষ্ট ব্যবহারে আমরা যেন তাঁহাকে অতি আপনার জন মনে করি। তিনিও যেন আমাদের অতি অন্তরঙ্গ মনে করেন ও সেইরূপ ভাবে উপদেশাদি দেন।

সে যাক, সাধু বাবা যে গল্প বলিয়া শুনাইলেন তাহা এইরূপ :—

একস্থানে একটী বড় সাধু বাস করেন। তাঁহার নিকট এক কুক্কুরী তাহার ৫টী বাচ্চা লইয়া বাস করে। যে কেন ব্যক্তি সাধু সন্দর্শন আকাঙ্খায় জোর করিয়া সাধুর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যায় সকলেই কুক্কুরী ও তাহার বাচ্চাদের অত্যাচারে বিফল মনোরথ হয়। কারণ কুক্কুরী ও তাহার শাবক ৫টী ভয়ানক উচ্চ শব্দ করিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিয়া সাধুর নিকট যাইতে বাধা প্রদান করে। কাজেই আহত হইবার আশঙ্কায় সকলকেই ফিরিয়া আসতে হয়। কুক্কুরী ও তাহার শাবকগুলির প্রতাপে কেহ আর সাধুর নিকট পৌছাইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জোর করিয়া দম্ভের সহিত সাধুর নিকট পৌছাইবার চেষ্টা না করিয়া প্রথমেই অতি দীন ভাবে সাধুর শরণ লয়। সাধু দর্শনে সে ব্যক্তির আন্তরিক ইচ্ছা ও তাহার অত্যন্ত কাকুতি মিনতিতে সাধু প্রীত হইয়া যখন কুক্কুরীকে পথ হইতে সরাইয়া দেন তখন নিরাপদে সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া সাধু দর্শনে সমর্থ হয়।

এই গল্পটী করিয়া সাধু বাবা তাহার অর্থ আমাদের এইরূপ বুঝইয়া দিলেন যে এই সাধু হইলেন ভগবান। কুক্কুরী হইল মায়া মোহ, আর বাচ্চাগুলি হইল আমাদের দুরন্ত দুর্দ্দমনীয় রিপুগণ। ৫টী বাচ্চা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও বিদ্বেষ বা হিংসা। অবিদ্যার মোহ হইতেই এই পঞ্চ রিপুর উদ্ভব। যদি কেহ এই রিপুগণের আক্রমণ এড়াইয়া ভগবানের নিকট যাইতে চায় তবে এই মায়া মোহ ও রিপুগণ যাহা তাঁহার নিকট যাইবার বিষম প্রতিবন্ধক স্বরূপ তাহাদের সহিত জবরদস্তি করিয়া কখনই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। দীন ভাবে ভগবানের শরণ লইয়া একান্তভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইলে তিনি করুণা করিয়া পথের বিঘ্ন অপসারিত করিয়া দিবেন ও তাঁহার কৃপায় তবে তাঁহার নিকট যাওয়া সম্ভবপর হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে"।

পরে আর একদিন এই মায়া মোহ সম্বন্ধে সাধু বাবা এইরূপ বলিয়াছিলেন। মোহ মানে আমাদের মমত্ব বুদ্ধি বা স্বতন্ত্র আমিত্ব জ্ঞান, ইহাই সকল দুঃখের কারণ। মোহই রাজা, ইহা হইতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার ও দ্বেষ জন্মে। এই মোহ বা আমিত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিলেই শান্তি। এই মোহ বা অজ্ঞানতা পরাজ্ঞান লাভ হইলে তবে দূর হয়। অথবা এক ব্রহ্ম ভগবানের কৃপায় দূর হইতে পারে।

দ্বিতীয় গল্পটী এইরূপ:—একদা এক ব্যক্তি কণ্ঠ হইতে তাহার বহুমূল্য

রত্নহারটী ঘাটের সোপানের উপর খুলিয়া রাখিয়া জ.ল স্নান করিতে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে একটী চিল উহা খাদ্য বস্তু মনে করিয়া ছোঁ মারিয়া উহা লইয়া গিয়া অপর একটী জলাশয়ের নিকট বৃক্ষের ডালের উপর বসিল। কিন্তু রত্নহারটীতে চিল চঞ্চু দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া যখন বুঝিল এটী তাহার খাদ্য বস্তু নয় তখন উহা ত্যাগ করিয়া সে অন্যত্র উড়িয়া গেল। অপর একব্যক্তি ঐ স্থানে স্নান করিতে আসিয়া জলের মধ্যে ওই হারের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রত্নহারটী সংগ্রহ করিবার জন্য খুব ব্যগ্র হইয়া পড়িল ও সেটী সংগ্রহ করিবার জন্য ওই ব্যক্তিটী জলাশয়ে নামিয়া পড়িল। অবোধ ব্যক্তিটী রত্নহার লাভ প্রত্যাশায় জলে নামিয়া উহা অন্বেষণ করিবার জন্য জল যত তোলপাড় করিতে লাগিল, জলে তরঙ্গ হওয়ায় ও জলাশয়ের নীচে হইতে কাদা মাটি উঠিয়া জল অপরিষ্কার হইয়া যাওয়ার জন্য রত্নহার লাভ দূরের কথা, রত্নহারের প্রতিবিম্বটী পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। বহুক্ষণ অন্বেষণের পর সেই অবোধ ব্যক্তিটী শ্রান্ত ক্লান্ত বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে রত্নহার লাভে সক্ষম হইল না। পরে একজন বুদ্ধিমাম ব্যক্তি ওই স্থানে স্নান করিতে আসিয়া ওইরূপ মালার প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও উহা কোথায় আছে ও কি প্রকারে উহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে প্রথমে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইল। পরে উহা বৃক্ষের উপর আছে বুঝিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল ও অল্প চেষ্টাতেই রত্নহারটী লাভে সক্ষম হইল।

এই গল্প করিয়া সাধু বাবা ইহার অর্থ আমাদের এই বুঝাইয়া দিলেন যে এই রত্নহার হইল আমাদের মনের আনন্দ। আনন্দ লাভ করিবার জন্য সকল প্রাণীই ব্যাকুল। অথচ এই আনন্দ লাভ করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়। কেবল এ আনন্দের উৎস কোথায় প্রথমে স্থিরভাবে তাহা ওই বুদ্ধিমান ব্যক্তির মত অন্বেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। তাহা হইলেই উহার লাভ সুলভ হইবে। সাধু বাবা বলিলেন আনন্দের উৎস আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যেই লুক্কাইত ভাবে আছে; কেবল উহা কিরূপ উপায়ে লাভ করিতে হয় জানা না থাকায় জীব উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে। নিজের স্বার্থ কামনা বিসর্জ্জন দিয়া পরহিতার্থে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পবিত্র হয় ও সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হয়। জল সিন্ধুর সুখ যাহা জল বিন্দুরও তাহাই সুখ, কেবল "এই মহা সুখতত্ত্ব না জানিয়া দুঃখ পূর্ণ জগৎ করিছে হাহাকার"। আমরা কেবল সেই অবোধ ব্যক্তির রত্নহার অন্বেষণ জন্য

বিপরীত দিকে যাওয়ার মত বৃথা কেবল বিপরীত দিকে আনন্দের অন্বেষণে যাইতেছি ও তাহাতে শ্রান্ত ক্লান্ত বিফলমনোরথ হওয়াই সার হইতেছে। বাহিরের আপাত মধুর স্বল্পকালস্থায়ী সামান্য বিষয়ানন্দের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া ইহাতেই বুঝি প্রকৃত আনন্দলাভ হইবে মনে করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইতেছি। তাহার ফলে কিন্তু প্রকৃত আনন্দ হইতে আরও বহুদূরে গিয়া পড়িতেছি।

১৩৩১ সালে যখন আমরা ৺কাশীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন সেখানে এক সাধু মায়ের সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার স্বরচিত একটী গান শুনিয়াছিলাম, সেইটী আজ মনে পড়িতেছে গানটী এইরূপ :—

সুখ পেতে ধরণীতে কে বল ভাই চায় না,
সুখের আলেয়া ধরে, সকলেই ছুটে মরে,
সুখ থাকে তবু দূরে কেউ ধরা পায় না॥
সুখ যদি পেতে চাও বাহিরেতে খুঁজ না,
সে নহে মুকুট মণি সে নহে গো জ্যোছনা॥
বাসনা নিবৃত্ত করে, খোঁজনা হৃদয় পুরে।
ভিতরে তাহার খনি, বাহিরে বিকায় না॥
আপনার ক্ষুদ্র সীমা প্রেমেতে ভাঙ্গিয়া।
বিশ্বে আপন কর, সরল প্রেম বিলায়ে॥
প্রেমে যার আছে মূল, সে পায় আনন্দ কূল।
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দাহে সে তরু শুকায় না॥

(ক্রমশঃ)

রাজসাহী জেলার কোন রাজবাটীর জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক লিখিত।

ক্ষেপার ঝুলি।

পরশমণি (খ)।

"পরশমণি তুমি বড় দুষ্ট"

"কেনরে আমায় দুষ্ট বল্‌ছিস্‌"

"দুষ্ট বল্‌ব না এই তোমায় নিয়ে তোমার হয়ে কত কাজ কর্‌ছিলাম ওমা পিছু ফিরে দেখি তুমি সরে গেছ অত পালাই পালাই মন কেন তোমার? "তোমায় এবার বেঁধে রাখ্‌ব"।

"আমায় কি দিয়ে বাঁধ্‌বি"?

"কেন দড়ি দিয়ে বাঁধব"।

"সে দড়ি কোথায় পাবি"।

"তুমি দেবে"।

"আমি তোকে দড়ি দিব আর তুই আমায় বাঁধবি বেশ কথা"।

"দেখ এ দড়ি তুমি না দিলে পাবার উপায় নাই; মনে করেছিলাম বুঝি শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা এ দড়ি মিলে কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পার্‌ছি তা মিলে না; তোমার কৃপা ব্যতীত কিছু হবে না, বহু অপরাধে অপরাধী আমি আমায় ক্ষমা কর আমি তোমার শরণাপন্ন আমায় তোমার করে নাও"।

"চুপ কর কাঁদিস্‌ না। দেখ্‌ লোকের দিকে চাহিস্‌ না আমার দিকে চেয়ে থাক, তোর চোখ যেন আমা ছাড়া অন্য কোন জিনিষ না দেখে, সকল জিনিষে আমায় দেখ্‌তে আরম্ভ কর, সকল শব্দে আমায় শোন, সকল স্পর্শে আমার স্পর্শ কর, সকল রসে আমায় আস্বাদ কর, সকল গন্ধে আমায় আঘ্রাণ কর; দেখ্‌ আমি তোকে বড় ভালবাসি আমি তোকে কোলে করে রেখেছি শুধু ফিরে দেখ্‌।

আবার চলে যাচ্ছ কেন?

কোথায় চলে যাবো, বল্‌ দেখি আমি কে?

তুমি আমার সর্ব্বস্ব তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুইত জীবিত আমি

তবে তোকে ছেড়ে গেলাম কি করে? আমি ছেড়ে গেলেত তুই মরে যেতিস আমি ঠিক আছিরে আমি আছি আমি কে বল্ দেখি?

তুমি আমার ইষ্ট।

তোর ইষ্ট কি খুব ছোট?

কেন?

সকলের ইষ্ট ত একজন তোর ইষ্ট কি সে নয়?

আমার ইষ্টও তিনি।

তাই যদি হয় তবে আমি ছাড়া জগতে কিছু নাই আমি আবার যাব কোথায়? আমিই শুধু আছি, আর কিছু নাই আর কিছু নাই। বাহ্যভাব উপেক্ষা কর, সব উপেক্ষা কর, সব উপেক্ষা কর, আমার দ্বারা আচ্ছাদন কর "ঈশাবাস্যমিদংসর্ব্বং" "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম" নেহনানাস্তি কিঞ্চন" তোর সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধে অধে ভিতরে বাহিরে মনে ইন্দ্রিয়ে শত্রুতে মিত্রে রোগে শোকে অভাবে স্বচ্ছলতায় আমি আছি সব আমি সব আমি—মাভৈঃ মাভৈঃ সুখ দুঃখ সব মাথা পেতে নিয়ে সর্ব্বদা রাম রাম কর।

(গ)

পরশমণি কোথায় তুমি?

ডাক্‌ছিস?

হাঁ তোমায় ডাক্‌ছি, ক্রমশঃ সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।—

কোন চিন্তা নাই সব আমি। তোর সে ভাব ও আমি, তোর এভাবও আমি, তোর সঙ্কীর্ত্তনও আমি, তোর মানস জপও আমি, কোন বিষয়ে চিন্তার কিছু নাই, নিশ্চিন্ত হয়ে আমার নাম কর, আর সকল ভূতে সকল দ্রব্যে আমায় দেখ। চোখে তুই বাহিরের ভূত দেখিস্ না ভিতর দেখতে অভ্যাস কর; নানা সাজ পোষাক দেখে ভুলিস্ না, কে সাজ পোষাক পরেছে তাকে দেখ্। ওই পাখী ডাক্‌ছে ওর স্বর কোথায় মিলায়ে গেল ওই আমি।

এ কি ব্যাপার হঠাৎ কুকুর সেজে এসে একি ব্যাপার? আমি কি অপরাধ কর্‌লাম জপটা নষ্ট করে দিলে।

কে তুই আমায় ধর্‌তে পাল্লি না তুই থাক্ থাক্ কর্‌লি কেন? যাক্ কোন চিন্তা নাই তুই ডাকা ছাড়িস্ না ডাক্ ডাক্ কেবল ডাক্।

ডাক্‌লে তুমি যদি এস তা'হলে ডাক্‌তে ইচ্ছা করে তা না হ'লে ডেকে ডেকে চুপ করে যেতে হয়।

আসি বৈকি তুই কি সাড়া পাস্ না?

সব সময় ত পাই না—সে সাড়া তোমার সাড়া কি মনের কীর্ত্তি কি করে বুঝব?

যে সাড়ায় তুই সব কথা ভুলে যাবি শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌বে নয়নের জল ঝর ঝর করে পড়বে, প্রাণ পূর্ণ হয়ে যাবে, সেই আমার সাড়া। তুই কি একথা শুনিস্ নাই?

শুনেছি অনেক এখন সব ভুলিয়ে দিয়ে তোমার করে লও দেখি।

তুইত আমারি তুই তোর কোন খানটা বল?

সবটাই এই আমার দেহ আমার গেহ স্ত্রীপুত্র সংসার সবই আমার, আমি তাদের; তবে আর আমি তোমার কি করে?

যে জিনিষ যার তা'তে তার অধিকার আছে; তোর দেহ গেহ আত্মীয় স্বজন স্ত্রীপুত্র এদের উপর কি তোর কোন অধিকার আছে? তোর উপরই কি তাদের কোন অধিকার আছে? সকলকে তুই কি ইচ্ছামত চালিত কর্‌তে পারিস? অথবা তোকে কেহ ইচ্ছামত চালিত কর্‌তে পারে? বেশ করে বুঝে বল।

না কাহাকেও ইচ্ছামত চালিত কর্‌তে পারি না, আমাকেও কেহ ইচ্ছামত চালিত কর্‌তে পারে না, আত্মীয় স্বজন কেহ আমার বশ নয়।

তোর দেহ ইন্দ্রিয় মন তারা বশ ত?

না তারাও বশ নয়।

যারা তোর বশ নয় তারা তবে তোর কি করে হ'ল? ওসব আমার আমিই। তোর দেহ গেহ আত্মীয় স্বজন স্ত্রীপুত্রকে এবং তোকে ইচ্ছামত চালিত করি তবে তুই আমার নহিস কিসে?

তাও ত বটে।

তা হ'লে তোর কিছু নাই সব আমার, কেমন এখন বুঝেছিস্ ত? কোন চিন্তা নাই আমার কোলে আছিস ভয় কি? এ জগৎ রঙ্গমঞ্চে আত্মীয় স্বজন অভিনেতা একা আমিই; নানাসাজে তোর সঙ্গে খেলা কর্‌ছি। তোর রোগে শোকে দুঃখে দৈন্যে মানে অপমানে শত্রুতে মিত্রে উর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে

বামে দক্ষিণে তোর স্ত্রী পুত্রে দেহে গেহে ইন্দ্রিয়ে মনবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারে আমি আছি—আমি—আমি—শুধু আমি আছি।

(ঘ)

তুই আমায় ডাকছিস্?

কৈ না তোমায় ত ডাকিনি।

ঐযে জপ কর্ছিস্।

জপ কর্লে কি হয়—জপও করছিলাম এ দেহটার কথাও ভাবছিলাম কৈ তোমায় ত ডাকিনি—তোমায় ডাক্তে হ'লে যেরূপ একাগ্রতার প্রয়োজন আমার তাহা নাই তথাপি তুমি এসেছ—এস এস দেখ তুমি আমার পূজা লও—এই ফুল এই চন্দন এই সব তুমি লও।

তোকে আর পূজা কর্তে হবে না।

না না পূজা কর্ব বৈকি, ওরকম লুকিয়ে চুরিয়ে বল্লে তোমার কথা শুনব না, যদি কিছু বল্তে হয় রূপ ধরে এসে বল।

"হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও," আর দেহাভিমানে ভুলে থেকনা তুমি দেহ নও তুমি মন নও তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও।

কে কাকে কি বল্ছে? কে তুমি? কে ঘুমায়েছে কাকে জাগাচ্ছ?

হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও।

এ কি—কে তুমি? কাকে ডাকছ? আমার শরীরটা রোমাঞ্চিত হচ্ছে কেন? আমার চোখে জল আসছে কেন? ওগো তুমি কাকে ডাকছ? তিনি কোথায় থাকেন?

অন্তর্হৃদয়ে।

কি নাম তাঁর?

আত্মারাম।

তাঁকে দেখ্তে কেমন?

অণু হ'তেও অণু মহৎ হইতেও মহান্।

কতদিন ঘুমায়েছেন?

বহুদিন। তিনখানা কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে আমি কতদিন ধরে ডাকছি ঘুমের ঘোরে শেষের স্থূল কাপড়খানা ফেলে দেয়, নূতন একখানা কাপড় লয়, আবার ঘুমায়—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত স্বপ্ন দেখে আর কাঁদে, কখন পশু কখন পক্ষী

কখন বৃক্ষ কখন লতা কখন ব্রাহ্মণ কখন ক্ষত্রিয় ; বৈশ্য কখন শূদ্র কখন, কখন পুরুষ কখন স্ত্রী কখন অমর কখন কিন্নর কখন গন্ধর্ব্ব কখন অপ্সর এই সব আপনাকে মনে করে আর কাঁদে তাহা তার কান্না দেখে বড় দুঃখ হয় তাই আমি পিছু পিছু ডাকৃতে ডাকৃতে চলেছি।

আচ্ছা কাপড় তিনখানার নাম কি ?

শেষের খানার নাম স্থূল মাঝের খানার নাম সূক্ষ্ম প্রথম খানার নাম কারণ।

স্থূল কাপড়খানা কি দিয়ে তৈরী ?

ভূত দিয়ে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চীকৃত পাঁচ ভূত দিয়ে তৈরী, মাঝের খানা অপঞ্চীকৃত পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে তৈরী, প্রথম খানা সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ দিয়ে তৈরী। এবার স্থূল খানার নাম ব্রাহ্মণ এই স্থূল খানার স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে গেছে স্বপ্নে ঠাকুর দেবতা ঘরদ্বার আত্মীয়স্বজন কত কি দেখছে কখন হাসছে কখন কাঁদছে কখন সাধু সেজে রাম রাম করছে কখন গৃহস্থ হয়ে কোদাল পাড়ছে কখনও গঙ্গার ধারে বসে গঙ্গা দেখছে কখনও পয়সার জন্য ছুটাছুটী করছে যাহাই করুক সে রাম রাম করে কিনা তাই তাকে ডাকৃছি—

হে চৈতন্যময় মহাপুরুষ জাগরিত হও, তুমি পরিচ্ছিন্ন মন নও, তুমি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর নও তুমি নিত্য বুদ্ধ নিত্য মুক্ত সচ্চিদানন্দময় অবাঙ্মনসগোচর পুরুষ জাগ জাগ হরিওঁ আহা বড় মিষ্ট তোমার ডাক্ হরি ওঁ হরিওঁ।

আহা আহা হরিওঁ হরিওঁ বল বল তার ঘুম কি করে ভাঙ্গবে ?

সদাসর্ব্বদা হরি ওঁ হরি ওঁ জপ করলে।

স্থূলে হরি ওঁ হরিওঁ বললে কি হবে ?

আত্মারামের স্থূল অভিমান যাবে—তখন সূক্ষ্মে হরি ওঁ হরি ওঁ করবে—তারদ্বারা সূক্ষ্মের অভিমান যাবে তারপর কারণে হরি ওঁ হরি ওঁ করবে কারণের অভিমান গেলেই আর কি—আনন্দের রাজ্য হরিওঁ হরিওঁ।

হাঁগা আমি বলব ?

বলনা হরি ওঁ হরিওঁ।

হরিওঁ হরিওঁ হরিওঁ আহা আহা

হরিওঁ হরিওঁ হরিওঁ আহা আহা

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ও ম্

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্।

ভগবানের দয়া।

(সত্য ঘটনা।)

লোকে বলে, বিপদ না আসিলে ভগবানের দয়ার অনুভূতি আসে না। বিপদের সময়েই আমরা প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ডাকি এবং তাঁহার অনুকম্পা অনুভব করি। অন্য সময় তাঁহার দয়া পাইয়াও বুঝিতে পারি না, মনে করি, বুঝি আমাদের সুখ সৌভাগ্য সব আপনা হইতেই আসিতেছে! কিন্তু বিপদের সময় নিতান্ত নাস্তিকের মনেও একবার বিপদহারী ভগবানের নাম না আসিয়া যায় না। এই প্রবন্ধে সেই বিপদহারী ভগবানেরই আশ্রিত বাৎসল্যের একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। সন ১৩০৪ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। এ সময়ে যে এক ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কি পরিমাণ দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কত পরিবার আশ্রয়হীন, কত প্রাচীন কীর্ত্তি বিধ্বস্ত, কত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার কত গবাদি পশু ও মনুষ্য গৃহের বাহির হইতে না পারিয়া ভগ্নগৃহের অভ্যন্তরেই জীবন্তে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারও সীমা সংখ্যা করা যায় না। এইরূপ মহা বিপদের সময়ে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে কলিকাতার এক বাসা বাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার গৌরীপুরস্থ নিজ বাটীতে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ প্রতিষ্ঠিত এবং বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বোকাইনগর গ্রামে তাঁহাদের ইষ্টদেবী শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী মাতা পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধ আসনে অধিষ্ঠিতা। ইঁহাদের নিত্যসেবা এবং বিষয়-কর্ম্ম পরিচালনের জন্য প্রধান কার্য্যকারক দেওয়ানজী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ সহ গৌরীপুরের বাটীতেই অবস্থান করিতেন এবং জমীদার বংশের কুলপুরোহিত-গণও এ সময় গৌরীপুরে উপস্থিত ছিলেন। ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ার অনতিকাল পরেই প্রলয়ের সূচনা দেখা দিল। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি চিহ্ন পুরাতন অট্টালিকাগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাকা উঠান ফাটিয়া গিয়া ভূগর্ভ হইতে মাটী ও জল উত্থিত হইতে লাগিল। পুষ্করিণীর জল রাশি ভূকম্পন বেগে সমুদ্রতরঙ্গের মত তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল। কত দরিদ্র গৃহস্থ প্রজার আশ্রয়-কুটীর ভূমিসাৎ হইল, কত প্রজা আশ্রয়হীন, গৃহহীন,

আত্মীয় বন্ধুহীন হইয়া পড়িল, তাহার সীমা নাই। বড় বড় গাছগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। যেখানে পূর্ব্বে নয়নরঞ্জন উদ্যান ছিল, তাহা এক্ষণে শ্মশানে পরিণত হইল। গবাদি পশুগণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল।

আকাশের পাখীগুলিও দারুণ ভয়ে কোলাহল করিতে করিতে আকাশে উড়িতে লাগিল। শুনিয়াছি, জলাশয়ের প্রবল আন্দোলনে জলচর মৎস্যাদিও নাকি অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তীরে আসিয়া পড়িতেছিল। ফলতঃ জল, স্থল, অন্তরীক্ষ কুত্রাপি শান্তির লেশও রহিল না। চারিদিকেই হাহাকার ধ্বনি, কে কাহাকে রক্ষা করে? সকলেই আপন আপন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত। কেহ আপন শিশুসন্তানগুলিকে বাঁচাইবার জন্য আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে, কেহ আপনার প্রাণ লইয়াই ব্যস্তভাবে পলায়ন করিতেছে, কেহ বা অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু কে কাহাকে সাহায্য দান করে, কে কাহাকে আশ্রয় দেয়? অনেকেই ঘড়বাড়ী ছাড়িয়া প্রান্তরে আশ্রয় লইতেছে, তাহাতেও নিস্তার নাই! প্রান্তর ফাটিয়া দুইভাগ হইয়া যাইতেছে, তন্মধ্য হইতে ক্রমাগত উষ্ণ জল ও বালুকারাশি উঠিতেছে। এক একবার মাটী ফাঁক হইয়া চিরিয়া চিরিয়া যাইয়া আবার বন্ধ হইতেছে, সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তেই সশরীরে পাতাল প্রবেশের আশঙ্কা। এইরূপে সেই গৃহবিহীন নিরাশ্রয়দের তরুতল তো দূরের কথা, শূন্য প্রান্তরে অবস্থানও নিরাপদ হইল না। বিপদ আসিলেই সুবুদ্ধি আসে! গৌরীপুরবাসী প্রজাগণ আপন জীবন ও প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকলত্র বান্ধবাদির প্রাণরক্ষার উপায়ন্তর না দেখিয়া অবশেষে দলে দলে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ জীউর বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সে দুর্দ্দিনে বুঝি আর জাতিকুলাদি বিচারের অবকাশও ছিল না। উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দেবের শ্রীচরণ প্রান্তে শরণাগত হইল। "দোহাই গোবিন্দ নাথ! রক্ষা কর, এই মাত্র সকলের মুখে। সেই অসহায় অনাথ নরনারীর সমবেত কাতর প্রার্থনা, সেই সরল ভক্তি বিশ্বাসের ঐকান্তিক আবেদন, সেই অসংখ্য জীবের বুকফাটা করুণ আর্ত্তনাদ, বুঝি শ্রীশ্রীগোবিন্দ নাথের পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করিল। তখন প্রকৃতির সেই বিভীষিকাময় তাণ্ডবের মাঝে এমন এক বিস্ময়কর অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নিতান্ত অবিশ্বাসী নাস্তিকের মনও মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হইয়া পারিল না।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ রৌপ্যমণ্ডিত বিমানে বিরাজমান, তাঁহাদের

সম্মুখে প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপাল দেব, (শ্বেতপাষাণময়) আর একটি শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ (ধাতুময়) এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলা অনেক মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন; ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুল ক্ষুদ্রাকৃতি বিগ্রহ যথা, শ্রীশ্রীগণেশ প্রভৃতিও আছেন। পাশের ঘরে শ্রীশ্রীবিঘ্নরাজ গণপতি দেবের শ্বেতপাষাণময় বৃহৎ শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত; তাঁহার সম্মুখে শ্রীশ্রীবাণলিঙ্গ মহাদেব কয়েক মূর্ত্তি আছেন। অন্য দালানে শ্রীশ্রীঅষ্টমূর্ত্তি মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের কৃষ্ণপ্রস্তরময় বিগ্রহ একটি কাষ্ঠফলকের সহিত বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। সহসা তাহার গ্রন্থি আলগা হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আন্দোলনে সেই গুরুভার পাষাণ বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ বিমান হইতে তাঁহার সম্মুখস্থ অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগুলিকে অতিক্রম করিয়া প্রায় ৩।৪ হাত তফাতে বারান্দার মেজের উপর আসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত সকলেই আপন আপন বিপদ ভুলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। কারণ, অত উচ্চ সিংহাসন হইতে পাষাণ বিগ্রহ পতিত হইলে তাঁহার অঙ্গক্ষতি অনিবার্য্য এবং তাহা দারুণ অমঙ্গল ও মনোবেদনার কারণ। দেবালয়ের পরিচারক ব্রাহ্মণগণ সশব্যস্তে আসিয়া ভূপতিত শ্রীবিগ্রহকে ধরিয়া উঠাইলেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভীষণ ভূমিকম্প একেবারে থামিয়া গেল। জগৎ শান্তিময় হইল। গৌরীপুরবাসী—তথা পূর্ব্ববঙ্গবাসী রক্ষা পাইল। তখন সকলে দেখিলেন, ভূপতিত শ্রীবিগ্রহের কিছুমাত্র অঙ্গ-হানি হয় নাই। সামান্য ক্ষত চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত শ্রীঅঙ্গের কুত্রাপি নাই। শ্রীবিগ্রহ সম্পূর্ণ অক্ষত, অবিকৃত, শ্রীমুখে সেই সদাপ্রসন্ন মধুরিমা সমভাবে বিরাজমান। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারকে পল্লীবৃদ্ধগণ অনেকেই দৈবঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কারণ, এই ভূমিকম্পেই নাটোরের বিখ্যাত মহাদেবী শ্রীশ্রী৺জয়-কালীমাতা, কালীপুরের শ্রীশ্রী৺সিদ্ধিকালী মাতা এবং অন্যান্য স্থানের বহু দেববিগ্রহ ক্ষতাঙ্গ হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের দালানের মেজের কিয়দংশ সামান্য ফাটিয়া গেলেও দেবালয়ের কোনরূপ হানি হয় নাই। ৺শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী মাতাও এই ভূমিকম্পে অবিকৃত অবস্থায় আছেন। তদবধি গৌরীপুরবাসী জনসাধারণের ধারণা, শ্রীশ্রীগোবিন্দ নাথই তাহাদের রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিতেছেন এবং শান্তির আশ্রয়ে রাখিয়াছেন। অদ্যাপি তথাকার পল্লীবৃদ্ধগণের মুখে এই ঘটনার বিবরণ সহ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সুপবিত্র নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

শ্রীমতী সতী দেবী—মানিকতলা।

মানসী মর্ম্মবাণীর সমালোচনার প্রত্যুত্তর

(প্রাপ্ত)

শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র বি, এ (সহকারী প্রধান শিক্ষক মালদহ)

গত পৌষের "উৎসবে" প্রকাশিত "ভারতের আদর্শ ও কর্ম্মের সাড়া" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই যে ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে, যে সকল বিশৃঙ্খলা উপস্থিতসময়ে দেখা যাইতেছে, তাহার একমাত্র মীমাংসা—এই উদ্দেশ্যেই ভারতের আদর্শ কি ও সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপে কর্ম্ম করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ আলোচনা আজ ২২ বৎসর ধরিয়া উৎসব পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব করিয়াছে—এবং শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীগীতার ন্যায় সমস্যাও জটীলতাপূর্ণ গ্রন্থের সমন্বয় ভাষ্য ও প্রশ্নোত্তরছলে যে শ্রীগীতার সংস্করণ বাহির করিয়াছেন—তাহাতেও ভারতের সনাতন আদর্শ ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া সমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তথাপি ইহা যে বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাই সৌভাগ্য বিষয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য গল্প সাহিত্যের পুষ্টি ও পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা আপনাদের দৈন্য পরিপূরণ করিয়া গৌরব অর্জ্জনেই ব্যস্ত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবও আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি—আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়ে—সভা সমিতিতে প্রসঙ্গ ক্রমে ব্যাস বাল্মীকি বা কালিদাসকে আসরে অবতারণা না করিয়া গতি নাই বলিয়া তাঁহাদের উল্লেখ করি, কিন্তু সৎ সাহিত্য প্রচারকল্পে দেশে কত কষ্ট জানিলেও তাহার সমর্থক ও পাঠকের দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। কেহ যদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বলে প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা ও তদনুযায়ী পথ নির্দ্দেশ করিতে চান তাহা হইলেও সমালোচকগণের তীব্র কটাক্ষের হাত হইতে রক্ষা নাই। এরূপ উৎসবে প্রকাশিত প্রবন্ধে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র বড় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। গত ফাল্গুন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন—"আজকাল রাজনৈতিকগণের কর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই সব কথার অবতারণা করা একটা ঢং হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের যে

আদর্শ প্রাচীনকালে কার্য্যকর ছিল সেই আদর্শ এখনও কার্য্যকর হইবে, এরকম ধারণা করা ভুল”—ইত্যাদি। এরূপ শ্লেষোক্তিপূর্ণ সমালোচনা দেখিয়া মনে হয় যে সমালোচক লেখকের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়িয়াছেন—ধান্ ভান্‌তে শিবের গীতের সূচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সমালোচক ধৈর্য্য সহকারে সমগ্র প্রবন্ধটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ না করিয়াই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের এই ধারণাই যদি সত্য হয়—তবে সমালোচক প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে কাল্পনিক বা মনগড়া ভাব লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া বাচালতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন যে প্রবন্ধ লেখক আজকালকার বঙ্গভাষার সাধারণ সাহিত্য সেবিগণের ন্যায় বাকচাতুর্য্য ও সমালোচনায় পটু; তিনি প্রাচীন আদর্শকে খাড়া করিতে গিয়া নবীনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন, কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অলসতার প্রশ্রয় দিতে চাহিয়াছেন। দেখুন, লেখক উক্ত প্রবন্ধে বলিতেছেন “শুধু জগতের অভ্যুদয় জন্য যদি পরিশ্রম কর—তাহা হইলে তোমার প্রাণে শান্তি আসিবে না; কারণ তুমি তোমার আপনার প্রতি আর একটী কর্ম্ম আছে তাহা কর নাই বলিয়া। এই কর্ম্মটী হইতেছে নিঃশ্রেয়সের জন্য কর্ম্ম।” “তুমি আত্মকর্ম্ম ও লোকহিতকর কর্ম্ম সমকালে সাধন করিয়া প্রতি কর্ম্মে আপ্যায়িত হইবে।” ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে লেখক কর্ম্মের সাড়াকে নিন্দা করিতেছে না, বরং লোক-হিতকর ও সমাজ হিতকর কর্ম্মকে স্থায়ীভাবে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের কথা বলিতে পারি না—বাঙ্গালা দেশেই যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে অনেক প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক চেষ্টার ফলে আবির্ভাব হয় কিন্তু প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই—উদ্দেশ্য লাভ হইবার বহুপূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়। পরে শোনা যায় যে সহানুভূতির অভাবে কাজে আর অগ্রসর হওয়া গেল না—ইহাই কি আমাদের লোকহিতৈষণা ও কর্ম্মের জন্য আকুল আগ্রহ!! এই সকল ব্যাপার নিত্যই চক্ষের সম্মুখে অভিনীত হইতেছে এবং সভ্য-জগতের নিকট আমাদের জাতীয় চরিত্রের কি ভয়াবহ চিত্র আনিয়া দিতেছে। বলিতে কি পারা যায় না—বাঙ্গালী জাতি মেরুদণ্ডবিহীন এবং ভাবের নেশায় কখন কোন কাজ করিলেও—তাহাতে স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করে না? তাই লেখক স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন “যে ভাবে

সমাজ কর্ম্ম করিতেছে তাহাতে সাময়িক উপকার কিছু হইতেছে—কিন্তু কয়জন দরিদ্রকে তুমি অন্নবস্ত্র দিবে?" ইত্যাদি বলিয়া বর্ত্তমান জীবনে আমাদের সমস্যার মীমাংসার জন্য নবীন ভারতকে প্রাচীন আদর্শের অনুযায়ী চলিবার জন্য বেদোক্ত সাধনা সম্পূর্ণরূপে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন। প্রথমেই আত্মকল্যাণের জন্য সচেষ্ট হও এবং পরে সমাজ হিতকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর—ইহা ছাড়া যে পথ তাহা তোমাকে ভ্রান্তির পথে লইয়া যাইবে। ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিক্ষা দ্বারা সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়া যদি একটী জীবের দুঃখ দূর করিতে পার—তুমি কৃতকৃত্য হইবে এবং যাহার জন্য তোমার চেষ্টা সেও সুখী হইবে। এই উদ্দেশ্যই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বাসনাক্ষয়, মনোনাশ, ও তত্ত্বাভ্যাস সুন্দররূপে বুঝাইয়া পরে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের শিক্ষার জন্য লঘুপায় বা সহজ উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন "তপস্যাই ভারতের বিশেষত্ব।...ঋষিগণের সিদ্ধান্ত—তপস্যা কর, যাহা চাও পাইবে। সদা সর্ব্বদা ভগবান লইয়া থাকিতে চাও—তপস্যা কর; জীবের দুঃখ দূর করিতে চাও, জীবসেবায় ভগবানের সেবা করিতেছি ভাবিয়া ভাবিয়া তপস্যা কর। সমস্ত দুঃখ দূর করিতে চাও—তপস্যা কর।" ......"উপসংহারে আমরা বলি ভারতকে ভারত রাখিতে নিজে সাধনা করা চাই এবং লোকহিতকর কার্য্যে সেই সাধনাকে জীবন্ত করিয়া অনুভব করা চাই।"

(২)

সমালোচক এই প্রবন্ধ সমালোচনা কালে বলিয়াছেন—"ভারতের যে আদর্শ প্রাচীনকালে কার্য্যকর ছিল, সে আদর্শ এখনও কার্য্যকর হইবে এরূপ ধারণা করা ভুল।" প্রথমেই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় আদর্শ কাহাকে বলে? ভারতের আদর্শ কি? ঋষিগণ ভারতে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা পরিবর্ত্তনীয় কি না? দেশ কাল পাত্রের দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না? শ্রুতি বলিতেছেন—

"আত্মানং বিদ্ধি"

আপনার স্বরূপকে জান।

"অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানং"। গীতা ১০।

বিদ্যাসকলের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যাতেই ভগবানের প্রকাশ।

"ত্যাগেন এব অমৃতত্বং।"

ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে হমৃতং।"

এই সকল মহাবাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ধর্ম্মই ভারতের সনাতন আদর্শ। ইহাই এই জাতির অস্থি মজ্জায় নিহিত বলিয়া প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তিরূপে হৃদয়ে হৃদয়ে বর্দ্ধমান তাহাই ভারতের সনাতন ও শাশ্বত সম্পদ। আপনাকে জানাই সকল জ্ঞানের সার, ত্যাগই কর্ম্মের নিয়ামক এবং আত্মলাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভই যাহার আদর্শ তাহার আবার পরিবর্ত্তন কোথায়? যে সকল জাতি নানা ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের কোন কালেও পাত্রের পরিবর্ত্তনে কর্ম্মের নীতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু তাহাকে আদর্শ বলা যায় না। আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইলে—তাহা আদর্শ নয়, আদর্শের নামে আর কিছু। আজকাল ত শিক্ষিত সমাজ এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবের সাম্মোহনের ফলে আমাদের যে মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—তাহা হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যাইবে—তাহাই আলোচ্য বিষয়। তাই আজকাল শুনিতে পাই—'ধর্ম্ম প্রাচীনকালের আদর্শ কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে পাশ্চাত্য অনুকরণে কর্ম্ম বা উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টার শরণ লইতে হইবে।' কিন্তু ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দুইটী কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন? কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের মিলন কি অসম্ভব? ধর্ম্ম কি কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারে না? ভারতের আদর্শ বলিতেছেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।

শ্রীভগবানে কর্ম্ম সকল অর্পণ করিয়া সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত কর্ম্মী। ইহাতে কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সমন্বয়।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিতেছেন—

"দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স হেতু র্যঃ সঃ ধর্ম্মঃ। ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ বর্ণিভিঃ আশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাদ্ হীয়মান বিবেক বিজ্ঞানহেতুকেন অধর্ম্মেণ অভিভূয়মানে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে।" ইত্যাদি

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু যাহা তাহাই ধর্ম্ম। ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। দীর্ঘকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইহার বিকার করিয়া জীব বহুবিধ কামনায় জড়িত হয়। তখন বিবেকজ্ঞান হীন হইয়া পড়ে। ইহাতে অধর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হয় এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়।

আচার্য্য শঙ্কর বার শত বৎসর পূর্ব্বে গীতাভাষ্য উপক্রমণিকায় দ্বাপরের কর্ম্ম বিশৃঙ্খলায় পথনির্দ্দেশের জন্য যাহা বলিয়াছেন—তাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রযোজ্য কিনা? এই সমস্যা সর্ব্বকালের শুধু নহে সর্ব্বদেশের। সম্যক প্রাণপণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় এই উভয়ই মানবের কল্যাণ কর। আত্মকল্যাণ সংকৃত যে অভ্যুদয় তাহাই প্রার্থনীয়। আত্ম-কল্যাণ বিরহিত যে অভ্যুদয় তাহা উন্মত্তচেষ্টা।

উপসংহারে আমরা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিদায় লইতে চাই।

"There are many who lamenting the by-gone glories of this great and aneient nation, speak as if the Rishis of old, the inspired creators of thought and civilization were a miracle of our past age.........This is an error and thrice an error. Ours is the eternal land, the eternal people, eternal religion whose strength, greatness, holinese may be over clouded but never for a moment utterly cease."

প্রবন্ধ লেখক ১৩৩৪ গত চৈত্র মাসের উৎসবে "বর্ষশেষে পৃথিবীর কর্ম্ম ঝঞ্ঝা ও পথনির্দ্ধারণ" প্রবন্ধে Romain Roland এর উক্তি হইতে নিজ আলোচ্য বিষয় কি ভাবে অবতারণ করিয়াছেন—তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অলমতি বিস্তরেণ।

জাতিসমস্যা।

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।]

যখন লোকের শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরাগ ছিল পরকাল ও পুনর্জন্মে আস্থা ছিল, তখন সমাজে এই জাতিসমস্যার কোনও কারণ ছিল না। ইহকালের সুকৃতিবশতঃ পর জন্মে "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" জন্মগ্রহণ হইবে—এই বিশ্বাসে লোক সাধারণে পাপ পথ পরিহার করিয়া স্ব স্ব জাতি নির্দ্দিষ্ট আচার প্রতিপালন করিত—নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণকে হিংসার চক্ষে দেখিত না। কালিদাসের ধীবরকে রাজশ্যালক "বিশুদ্ধ ইদানীম্ আজীবঃ" বলিয়া বিদ্রূপ করিলে সে জবাব দিয়াছিল—

"ভর্ত্তঃ, সহজং কিল যদ্বিনিন্দিতং নহিতৎকর্ম্ম বিবর্জ্জনীয়ম্।
পশুমারণ কর্ম্ম দারুণঃ অনুকম্পা মৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ॥" *

প্রভো - জন্মতঃ সিদ্ধ (আপাত দৃষ্টিতে) নিন্দিত কার্য্যও (কাহারও পক্ষেই) বর্জ্জনীয় নহে। (দেখুন) (স্বভাবতঃ) দয়ার্দ্রচিত্ত ব্রাহ্মণও (যজ্ঞকালে) পশু বধরূপ দারুণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে—যে সামান্য মৎসজীবী ধীবরও তাহার 'ব্যবসা'—যাহাতে তাহার জন্মগত অধিকার—তাহা অন্যের চক্ষে নিন্দনীয় হইলেও, তাহার পক্ষে প্রতিপালনীয় মনে করিত। শাস্ত্রানুগত আচারশীল "বিস্রগন্ধী গোধাদী" হইলেও এই জালিকের মুখে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত—সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ—এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে।

তখন ছিল ঐ অবস্থা। রাজার পরম প্রশংসা ছিল—তাঁহার রাজ্যে—

"ন কশ্চিদ্ বর্ণানাম পথ মপকৃষ্টোঽপি ভজতে॥" †

মহাকবি কালিদাস—ধীবরের কথায়ও ইহারই উদাহরণ দিয়াছেন।

আর আজ কলির প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইতেছে লোকে স্বধর্ম্ম ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট

---

* মূল প্রাকৃতের সংস্কৃতানুবাদ (শকুন্তলা ৬ষ্ঠ অঙ্ক প্রবেশক)

† শকুন্তলা—৫ম অঙ্ক।

আচার প্রতিপালনে ততই পরাঙ্মুখ হইতেছে। মোসলমানদের অমোলে উহাদের স্বধর্ম্ম পালনে দৃঢ়তা দেখিয়া হিন্দুরাও আপন ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া যথাসম্ভব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিত। কিন্তু ইংরেজ অধিকারে রাজার জাতিকে স্বধর্ম্মপালনে নিষ্ঠাবান্ দেখিতে না পাওয়ায়—হিন্দু (এবং মোসলমানেও কিয়ৎপরিমাণে) স্বকীয় ধর্ম্মাচার প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছে।

একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দুরা ঈশ্বর নাম না লিখিয়া কোনও চিঠি পত্র দলিল ইত্যাদি লিখিত না—মোসলমান্গণও 'বিশ্মাল্লা'—পূর্ব্বকই ঐ সব কাজ কর্ম্ম করিত। ইংরেজ তো তাহা করেই না—ইহাতে উৎসাহ দিতেও পরাঙ্মুখ। আমরা বাল্যকালে রো-সাহেবের হিন্টস্ (Hints on the Study of English) পড়িতাম; ইহাতে পরীক্ষার্থিগণের প্রতি উপদেশ ব্যপদেশে ঐ সাহেব পরীক্ষার কাগজের উপর ঈশ্বর নাম লিখিতে স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছিলেন। *

'যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ'

তাই ঐরূপে উপদিষ্ট নব্যযুবকেরা সর্ব্বকর্ম্মে ঈশ্বরের নামোল্লেখ বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে ভগবদ্ভক্তি, শাস্ত্র বিশ্বাস, সদাচারপালনে আসক্তি সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। শহরে বিশেষতঃ,—এখন এমন হইয়াছে যে আচারনিষ্ঠ লোক পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এদিকে তো এই। পরন্তু এখন আবার আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়াছে; এখন আপন জাতিকে উচ্চতর বর্ণের বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য নানা জাতীয় লোকই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। বৈদ্য মহোদয়গণ এতদিন 'অম্বষ্ঠ' নামে পরিচিত হইয়া এখন 'ব্রাহ্মণ' সাজিতে সমুৎসুক। কায়স্থ মহাশয়েরা এতদিন শূদ্রাচার পরিপালন করিতেন—এখন 'ক্ষত্রিয়, সাজিয়া পৈতা নিতেছেন। এই 'ক্ষত্রিয়ত্ব' লাভের জন্য যে আরো কত জাতি লোলুপ—তাহার সংখ্যা হয় না। ক্ষাত্র প্রকৃতি সম্পন্ন অনেক পার্ব্বত্য জাতি হিন্দুর সমাজ গণ্ডীতে প্রবেশ

---

* ইংরেজ রো-সাহেব উপদেশ পাইয়াছেন "বৃথা ভগবানের নাম নিওনা (do not take the name of God in vain) তাই সংস্কারানুরূপ উপদেশও দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রোপদেশ অন্যরূপ 'যৎকরোষি যদশ্নাসি তৎকুরুস্ব মদর্পণম্ "যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তবপূজনম্" তাই সর্ব্বকার্য্যেই ভগবন্নাম গ্রহণ সমাজের সংস্কারবদ্ধ বিষয় হইয়াছিল।

করিবার জন্য 'ক্ষত্রিয়' হইয়াছে—যথা কাছাড়ী, ত্রিপুরা, মণিপুরী ইত্যাদি। তবে সেখানে ব্রাহ্মণগণ খুব সাবধানতা সহকারে ইহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাদের রাজারাই সর্ব্বাদৌ ঘটোৎকচ, দ্রুহ্য, বভ্রুবাহণদের বংশীয় বলিয়া 'ক্ষত্রিয়' রূপে পরিগৃহীত হন—পরে ক্রমশঃ সেই সেই জাতির অপরেরাও ম্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মানিয়া 'ক্ষত্রিয়' হইয়াছে—কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ইহাদের 'জলাচরণ' করেন নাই। এস্থলে লক্ষ্যের বিষয় এই যে (১) যাহারা এ ভাবে ক্ষত্রিয় হইয়াছে তাহারা হিন্দুসমাজ অন্তর্গত কোনও নিম্নতর জাতীয় ছিল না; এবং (২) ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহারা রাজ্য জয় করিয়া প্রজাপালনে অধিকৃত ছিল। কিন্তু আজকাল যাহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার তাহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যায় না—তাহারা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত একটা সুনির্দ্দিষ্ট জাতি বলিয়াই পরিগণিত, এবং ইদানীং ক্ষত্রিয়োচিত বিশিষ্ট গুণের কোনও পরিচয় তাহাদের পাওয়া যায় নাই।

আবার সাহু জাতি 'বৈশ্য' হইবার জন্য ব্যগ্র। 'নাথ' বা 'যুগী' ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও উচ্চতর স্থানাধিকারী বলিয়া খ্যাপন করিতেছে।

আমি এই প্রবন্ধে 'সাহু' বা 'নাথ' সম্বন্ধে কোনও কথা বলিব না—কেননা তাহাদের তাদৃশ ঘোষণায় আমাদের বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই। ব্রাহ্মণদের সহিত তাহাদের সামাজিক সম্পর্ক বিশেষ কিছু নাই। এবং 'rose will smell as sweet in any other name'—গোলাপের আর কোনও নাম দিলেও উহার সৌরভ তেমনই মনোহর থাকিবে।

কিন্তু বৈদ্য কায়স্থ সম্বন্ধে সেকথা বলিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের যাজ্য এবং জলাচরণীয়। বৈদ্য যদি পোনর দিনস্থলে দশদিন অশৌচ ধারণ করিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধ করেন, অথবা কায়স্থ যদি একমাসের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করেন—তাহা হইলে উহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাহে কোনও ব্রাহ্মণের গিয়া যাজন করা অথবা ভোজন করা পাতিত্য জনক।

এই সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলতার জন্যে ব্রাহ্মণগণও কিছুটা দায়ী—কেননা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জাতি বিপর্য্যয়ের অনুকূলে ব্যবস্থা দিয়াছেন—কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়মন্ত্র বৈশ্য কায়স্থকে যজাইয়াও থাকেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ যদি সকলেই প্রকৃতাচারে থাকিতেন, তবে ঐরূপ জাতিবিভ্রাট ঘটিত না। সকল যুগেই ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু এখনকার ন্যায় এত

অধিক ছিল না। পূর্ব্বে সমাজের প্রধানদের সম্মান ছিল—তাঁহারা যাহা বলিতেন সকলে অবনত মস্তকে মানিয়া নিত। এখন সেইটুকু নাই—সমাজও তাই শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহা হউক পণ্ডিতবর শ্রীযুত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "জাতিতত্ত্ব" লিখিয়া, নিম্নজাতিরা উচ্চতর জাতি বলিয়া খ্যাপনার্থ শাস্ত্রের যে সব প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার অসারতা সম্যক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তাঁহার ঐ পুস্তক বঙ্গের বিশিষ্ট পণ্ডিত বর্গের অনুমোদন লাভও করিয়াছে।

সমধিক সুখের বিষয় এই যে বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ কেহ স্বজাতীয়গণের এই উন্মার্গগামিতার প্রতিবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মহারাজ রাজবল্লভের সন্ততি, গৌহাটীর সুপ্রসিদ্ধ উকিল ধর্ম্মভূষণ শ্রীযুক্ত রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর "বৈদ্য" গ্রন্থ লিখিয়া এবং খুলনা শ্রীপুরের বিখ্যাত জমিদার বংশীয় কাব্যতীর্থ শ্রীযুত ভূপতি গীষ্পতি * রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় "কায়স্থ" নামে পত্রিকা প্রচার করিয়া যথাক্রমে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের এবং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদ খুব বিচক্ষণতা সহকারে করিয়াছেন।

আপাততঃ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপন পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণের ঝোকটা যেন কিছু কমিয়াছে বোধ হয়। অন্ততঃ মফঃসল অঞ্চলে খুব কমই ক্ষত্রিয়বাদী দেখা যায়। কিন্তু বৈদ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব খ্যাপনের হুজুক যেন ইদানীং বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে সকল "বৈদ্য" বহু পুরুষ যাবৎ কায়স্থদের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়াছেন—এবং এতদিন অম্বষ্ঠোচিত উপবীত গ্রহণ করিবার নামও নেন্ নাই—ইঁহাদের মধ্যেও অনেকে পৈতা নিয়া ব্রাহ্মণ সাজিতেছেন। আবার এই পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে শুনিতেছি জোরজুলুমও চলিতেছে। অনেক ধর্ম্মবিশ্বাসী বৈদ্য যাঁহারা কোনও দিন ঐ হুজুকে মাতেন নাই—কাশীধামে আসিয়া মারা গেলে তাঁহার সন্তান সন্ততি যাহাতে একাদশাহে শ্রাদ্ধ করেন এবং 'গুপ্ত' না

---

* বড়ই পরিতাপের বিষয় যে ধর্ম্মনিষ্ঠ সমাজ ভক্ত সুপণ্ডিত বাগ্মী গীষ্পতিরায় চৌধুরী মহাশয় কিয়দ্দিন হইল লোকান্তর গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান তদীয় পারলৌকিক কল্যাণ বিধান করুন। উৎসব—সম্পাদক।

বলিয়া 'শর্ম্মা' বলেন, সেই জন্য নাকি পীড়াপীড়ি করা হয়। অনেকেই বাধ্য হইয়া ঐরূপ করিতে সম্মত হন—নচেৎ শবদাহ হয় না—শ্রাদ্ধে কেহ যোগ দেন না।

অথচ ইঁহারা এ কথা ভাবেন না যে নিজেরা ব্রাহ্মণ বলিলেই 'ব্রাহ্মণ' হওয়া যায় না। 'ব্রাহ্মণ' যেদিন বৈদ্যের সঙ্গে বিবাহাদি সূত্রে সম্বদ্ধ * হইবেন—এমন কি যে দিন বয়ঃ কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ বৈদ্যকে 'নমস্কার' করিবেন—সেইদিন ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে—নচেৎ "কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ" পার্থক্য থাকিবেই। ব্রহ্মার বরে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইলেও যে পর্য্যন্ত নাকি বশিষ্ঠ তাঁহার নমস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি নমস্কার করেন নাই—সেই পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্র নিজকে 'ব্রাহ্মণ' মনে করিতে পারেন নাই—ইহা যেন বৈদ্য মহাশয়দের মনে থাকে।

আমার কোনও ধর্ম্মভীরু আচার নিষ্ঠ বৈদ্য বন্ধু ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়াছেন; সন্ধ্যা পূজা নাই-সদাচার নাই—মান মর্য্যাদা বোধ নাই অথচ 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইবে। আবার যে বৈদ্য নিজকে ব্রাহ্মণ বলিবে না—জোর করিয়া তাহার দ্বারা ব্রাহ্মণ বলাইতে হইবে—এসব ঘটিতেছে দেখিয়া বন্ধুবর বড়ই অবসাদ গ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভয় নাই—"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—দিল সাচ্চা রাখিয়া পিতৃপিতামহের আচরিত সৎপথে চলিতে থাকিলে "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"—ধর্ম্মই স্বয়ং ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

অধর্ম্মেণৈধতে সম্যক্ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তে—তারপর চরম পাদে বলিয়াছেন—

সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অতএব অধর্ম্মের ক্ষণিক প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ভীত হইবার কোনও কারণ নাই; ধর্ম্মকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিলে পরিণামে জয় হইবেই—আর অধর্ম্মের পরিণামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

বৈদ্য ও কায়স্থ এই উভয় জাতিই খুব সম্ভ্রান্ত—ব্রাহ্মণের নীচেই তাঁহারা সমাজে সম্মানিত। পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে (ময়মনসিংহে—ত্রিপুরায়—শ্রীহট্টে এমন কি ঢাকায় মহেশ্বরাদি অঞ্চলেও) কায়স্থে বৈদ্যে পরস্পর সম্বন্ধ সুপ্রচলিত।

* "অসবর্ণ বিবাহ আইন" মতে রেজিষ্টারী করিয়া বিবাহ হইতে পারে—কিন্তু ইহা 'সামাজিক' আচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টে জাতির মর্য্যাদানুসারে স্থান নির্ণয় (precedence in position) নিয়াই সর্ব্বপ্রথম বৈদ্য কায়স্থে দ্বেষাদ্বেষির সৃষ্টি হয়; এবং যদিও পূর্ব্বাবধিই, কোনও কোনও বৈদ্য নিজ জাতিকে ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—এবং কায়স্থও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে উৎসাহ সম্পন্ন ছিলেন তথাপি ঐ সেন্‌সাসের পর হইতেই কায়স্থগণ পৈতা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিতে আরম্ভ করিলেন—এবং তাঁহাদের পরিভবার্থ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তবে দেবদ্বিজে ভক্তিমান্‌ শাস্ত্র ও পরকালে বিশ্বাসী বৈদ্য কায়স্থ অনেকেই যে ঐরূপ করেন নাই—তাহার উদাহরণ ধর্ম্মভূষণ রায় বাহাদুর শ্রীযুত কালীচরণ সেন এবং কাব্যতীর্থ শ্রীযুত ভূপতি গীষ্পতি রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়—যাঁহাদের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বৈদ্য কায়স্থ উভয়েরই সম্মান প্রধানতঃ তাঁহাদের পেশা হইতেই হইয়াছে। বৈদ্য নামটিতেই বিদ্যার সংস্রব দেখা যায়—বিদ্বান্‌ সর্ব্বত্র পূজ্যতে —চিকিৎসা ব্যবসায় ইউরোপেও লার্ণেড প্রফেশন (Learned profession) বলিয়া সম্মানিত। কাব্য নাটকাদিতে 'বৈদ্য ভিষক্‌' ইত্যাদি চিকিৎসক বাচক শব্দ হইতে জাতি সূচক কিছু পাওয়া যায় না—কিন্তু একটি তাম্রশাসনে 'বৈদ্য' শব্দ জাতিবাচকরূপে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট ভাটেরায় প্রাপ্ত কেশব দেবের তাম্র শাসনে * আছে

এতস্য পৃথিবী ভর্ত্তৃ রাজ পট্টনিকঃ কৃতী।
বৈদ্যবংশ-প্রদীপ শ্রীবনমালি করোঽভবৎ॥

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "পট্টনিক" অর্থ করিয়াছেন মন্ত্রী (minister) † উড়িষ্যাদিতে আজও "পট্টনায়ক" শব্দ শুনা যায়।

'কায়স্থ' শব্দও নাটকাদিতেও তাম্র শাসনে উল্লিখিত আছে। মুদ্রা রাক্ষসে চাণক্য "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা" বলিলেও কায়স্থ শকট দাস কথা বার্ত্তায়

* এই শাসনের সময় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়া অক্ষর দৃষ্টে অনুমিত হয়। ইহা ১৮৮০ অব্দে (আগষ্ট মাসে) এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড—২য় অধ্যায় পুনরালোচিত হইয়াছে।

† পুরুষাগ্রামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্‌ সাহিত্য দর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করাতে তিনি যে উচ্চশ্রেণীর লোক এবং পণ্ডিতব্যক্তি তাহাই সূচিত হইয়াছে। লক্ষ্যের বিষয় যে প্রাচীনতর মৃচ্ছকটিকে কায়স্থকে প্রাকৃতভাষী করা হইয়াছে—তথাপি ধর্ম্মাধিকরণিকের বিচারের সহায়রূপে মর্য্যাদাপন্নভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন; মুদ্রারাক্ষসের আমোলে সংস্কৃত ভাষী হওয়াতে ঐ মর্য্যাদা বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। ভাস্কর বর্ম্মার শাসনে (৭ম শতাব্দীতে) কায়স্থ সম্মানিত পদাধিকৃত ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন।* তদানীং ইহা সম্ভবতঃ পেশা বাচক হইলেও, যে 'জাতি' নাম সহ ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আজিও সমাজে সম্মানিত তাঁহারা এবং বৈদ্য মহাশয়েরা যে মান বাড়াইবারজন্য উদ্ভট উপায় অবলম্বন করিতেছেন—ইহা দুঃখেরই বিষয়।

শ্রীশ্রীনাম।

গোরক্ষপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বক্সী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

ভাই হরিবল! মহৎ ব্যক্তির আজ্ঞাপালন অতি কর্ত্তব্য—নচেৎ আমি নরাধম, পতিত, তাপিত, মাহামোহবিজড়িত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, মূর্খ, বৈষ্ণবদাসানুদাসের উপযুক্ত নই, পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব 'নাম' ধর্ম্মের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতাম না। বৈষ্ণব প্রভুগণের শ্রীচরণে শতকোটী নমস্কার পূর্ব্বক মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

'নাম' ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই নামাবতার ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের নাম স্মরণ ও বন্দন কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ও

* "ন্যায় করণিক জনার্দ্দন স্বামী ব্যবহারিক হরদত্ত কায়স্থ দুন্দুনাথ প্রভৃতয়ঃ"। অন্ত্যফলক ভাস্কর বর্ম্মার তাম্র শাসন। (Epigraphia Indica Vol XII no 13; বিজয়া আষাঢ় ১৩২০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ণনে মো হেন অধম অক্ষম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—বৈষ্ণব কি ? গৌরধর্ম্ম --গৌরাঙ্গদেব কি, বর্ণনা করিতে হইলে যেমন রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবানকে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল—তদ্রূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম—বৈষ্ণব কি, গৌরধর্ম্ম—গৌরাঙ্গদেব কি, বর্ণনা করিতে হইলে পুনরায় তাঁহার দেহ ধারণের প্রয়োজন। বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবই জানেন। গৌরাঙ্গদেব কি গৌরাঙ্গদেবই জানেন। গৌরাঙ্গদেবের উপমা গৌরাঙ্গদেব। "তোমারি তুলনা প্রভু তুমি এ মহীমণ্ডলে।" বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম গৌরাঙ্গদেবের বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা একটী স্থূলাকার পুস্তকেও হয় না। এ প্রবন্ধেও নিষ্প্রয়োজন। তবে সর্ব্বপ্রধান যে চারি সম্প্রদায় এক্ষণে বর্ত্তমান আছে ; যথা —রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য এই চারি সম্প্রদায়ই আচণ্ডালে আলিঙ্গন দানে প্রস্তুত নন। ভক্তি ব্যাখ্যা মায়াবাদ খণ্ডন প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনা এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু কেবল গৌরভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই আচণ্ডালে আলিঙ্গন দেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে কেহই আচণ্ডালে নাম বিতরণ করেন নাই এবং নাম ধর্ম্মের বহুল প্রচারও হয় নাই।

আমি এ বিষয় নূতন কিছু যে প্রকাশ করিতেছি তাহা নয় তবে সাধু, সন্ন্যাসী মহাত্মাদের নিকট যে শাস্ত্রের উপদেশ পাইয়াছি এবং উপদেশগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও আমাদের বিশেষ উপকারী বলিয়াই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। হিন্দু শাস্ত্র খেলার জিনিষ নয় বা অনুমানের উপর স্থাপিত নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য জানিবেন। পাঠক পাঠিকে! আমার ভাষার ভুল না ধরিয়া বিষয়টির দোষ গুণ বিচার করিলেই সার্থক মনে করিব।

হে প্রভু! হে ইচ্ছাময়! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, সাধকহৃদয়নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ! তোমার "তত্ত্ব" তুমি নিজে না বুঝাইলে কে বুঝিতে পারে? কৃপাময়! ইচ্ছাময়! তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমার সেই সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হইলে কি এই মো হেন পাপপরিক্লান্ত চির-নিরুদ্যম জীবনের সন্ধানে তোমার "তত্ত্ব" বুঝা যায়?—অসম্ভব। কৃপানিধান! দয়াময়! তুমি নিজেই কৃপা করিয়া ও সদয় হইয়া যদি এ দগ্ধ হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হও তাহা হইলেই তোমার "তত্ত্ব" এ জগতে বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। প্রভু! তাই তোমায় সূচনায় স্মরণ করিতেছি, হে পাপিত্রাতা—দীনদয়াল ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু! দয়া করিয়া তোমার সেই দিব্য মূর্ত্তিতে একবার এ হৃদয় মরুভূমিতে আসিয়া আসন পরিগ্রহ কর—মরুক্ষেত্র শান্তিক্ষেত্রে পরিণত হউক। এবং সঙ্গে

সঙ্গে তোমারই দয়ায়, তোমারই ভাষায়, তোমারই "তত্ত্ব" জগতে প্রচারিত হউক ও বুঝুক। নতুবা একি বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু?

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথা জগতে কেই বা অবিদিত আছেন? তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় অবশ্য উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাতে আমার মৌলিকতা কিছুই নাই বা এক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও বিষয়ের প্রয়াসী নহি। যিনি আপন স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যে-আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিত, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য লৌকিক ভাব ও ভাষার যে কোনও উপযোগীতা আছে, একথা আমি স্বীকার করি না। তবে কেন যে আমি কিঞ্চিৎকালের জন্য আমার এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মধ্যে, এই অমৃতাস্বাদনে উদ্‌ভ্রান্ত পাঠক পাঠিকাগণকে সংবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হইতেছি, তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে, 'নাম'রূপ এই অমৃতের পরে একবিন্দু কর্পূরের সংযোজনাই আমার উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে ও কীর্ত্তনে প্রাণের মাঝে কি যেন কি এক নব ভাব জাগাইয়া দেয়, হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, অশ্রুধারায় বুক ভরিয়া যায়, চন্দ্রালোকের সুশীতল স্পর্শের ন্যায় এক অজানা আনন্দের স্নিগ্ধ স্পর্শ যেন দেহের প্রতি অণুতে অণুতে অনুভব হইতে থাকে, সেই অমূল্য নিধি সমূহ প্রবন্ধের উপকরণরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায়, আমার ইচ্ছা সেই ভগবান মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের পাষাণ গলান সুমধুর পতিতোদ্ধারণ লীলা কথা আত্মশুদ্ধির বাসনায় এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আশা করি অমৃতের পূরে এই কর্পূর বিন্দুর প্রয়োগ ভক্তজন মাত্রেরই প্রীতিবর্দ্ধক হইবে।

অতি শৈশবকাল হইতেই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক গুণাবলী ও অসাধারণ প্রতিভায় ভূষিত ছিলেন। আপামর যে কেহ তাঁহাকে সন্দর্শন করিত সেই যেন কি একটা স্নিগ্ধ মধুর ভাব উপলব্ধি করিত। মহাপ্রভুর নব ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতভূমিকে আকুল করিয়া দিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হাস্য, ক্রন্দন, উদ্বেগ, দৈন্য ইত্যাদি অপূর্ব্ব সাত্বিক ভাব সমূহ সন্দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে এমন কি তাঁহার জনক জননী পর্য্যন্ত মনে করিতেন নিমাই আমার পাগল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এ সাধারণ উন্মত্ততা নহে ইহা ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন প্রেমকৌমুদীর পূর্ণ বিকাশ। আহা! যে প্রেম মদিরা পান করিয়া পাগল হইবার জন্য, শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ অনাদিকাল ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রাদি সুদুর্লভ সেই প্রেমোন্মাদনায় মহাপ্রভু সতত

উন্মত্ত! এই সময় হইতে মঙ্গলময় সুমধুর শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ হয়। সে সময় ভারতভূমি এক নূতন শোভা ধারণ করিয়াছিল-নাম সংকীর্ত্তনের মধুর রোলে, খোলকরতালের সুমধুর তালে, বঙ্গভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আহা! মহাপ্রভুর নূতন পদে, নূতন ভাবে চতুর্দ্দিকে একটা নূতন মাধুরী ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর নাম ও প্রেম কল্লোল বারিধির ঘাত প্রতিঘাতে ভারতবর্ষ টলমল করিয়াছিল। প্রাণমাতান সুমধুর ভুবনমঙ্গল হরিনামের উচ্ছ্বাস বঙ্গভূমিকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়াছিল। গৌরলীলার কি অত্যদ্ভুত প্রভাব, যাহা (শান্তিসুধা লীলাকথা) শুনিতে শুনিতে মরজগতের ত্রিতাপদগ্ধ মনুষ্যগণ অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিতেন। কথিত আছে যখন মহাপ্রভু সপার্ষদে কীর্ত্তন করিতেন তখন গোলক ও ভূলোক এক হইয়া যাইত। ধন্য সেই কীর্ত্তন! ধন্য সেই সম্মিলন! ধন্য আমাদের সেই মহাসংকীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ! যাঁহার নাম সংকীর্ত্তনে যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, সাধু, সন্ন্যাসী, উদাসী, ফকির, মহাজন, পতিত, ঘৃণিত, অধম, আচণ্ডাল সকলেই উদ্ধার পায়। আমি মহাসংকীর্ত্তনের কথা প্রকৃত ভাষায় বলিতে অসমর্থ। ভাবুক ভক্ত পাঠক-পাঠিকে! আপনারা ভাবনেত্রে সে অপূর্ব্ব চিত্র বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রতি যুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সংকীর্ত্তন। এইরূপে যুগ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'নাম' সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম হইবে, তখন আপনি অনায়াসে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বরতত্ত্ব কি—তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়। যিনি গৌরপ্রেমে না মজিয়াছেন—তিনি কেমন করিয়া জানিবেন—কেমন করিয়া বলিবেন এ কিসের ভাব! এ কোন আনন্দ সাগরের প্রবল ঘাত প্রতিঘাত! শ্রীশ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুর্য্য শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অত্যদ্ভুত প্রভাব তাঁহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে অনুভব করিতেন,সেই অনুভূতিই জগতে ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।

গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তার স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥"

মহাপ্রভুর প্রকটকালীন বাণী ঃ—এসো দীন হীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ, এসো এসো দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম দিবার জন্য ডাকিতেছেন। শুনিছে না, মধুর স্বরে নিতাই গাহিতেছেন—

" 'ধর' নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়॥"

পতিত শোন,—বৈষ্ণবগণ উচ্চনাদে বলিতেছেন,—

"যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়,
তারা তারা দু'ভাই এসেছেরে।"

তবে আর ভয় কি? ভব সাগর ত গোষ্পদ! বিশ্বাস করো, বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা নয়। তাই বলি ভাই "নাম কর"।

বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছেন,— "জপাৎ সিদ্ধিঃ"। কিন্তু কলির দুর্দ্দম শাসনে ক্রমে দুর্ব্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও কঠিন। মহাপ্রভু দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়াল প্রভু এই নিমিত্ত অতি গুহ্যতর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন,—"নাম" নামই সর্ব্বস্ব, নামই ব্রহ্ম, নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান করো, ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হও। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধির বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কিন্তু কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু। পতিত পাবন গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, জীবে দয়া রাখো, কোটী কোটী কঠোর তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে; নাম ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবে মানব জন্ম সার্থক হইবে। নাম ধর্ম্ম চারি যুগে বর্ত্তমান থাকিলেও প্রচার ছিল না। পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় হইতে ইহার বহুল প্রচার ও নাম ধর্ম্মের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। নামাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই নূতন নাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে

অর্থাৎ ইং ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান হয়।

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ,
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।" চৈতন্যচরিতামৃত।

নামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব ও প্রেমলহরী পূর্ণ জীবনী-সিন্ধুর একবিন্দুও যে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি, ইহা মনে হয় না। তবে কোন দিন যদি সাধু বৈষ্ণব ভক্তগণের কৃপাকণা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে সেই কৃপারত্নের প্রভাবে, ভবিষ্যতে জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। গৌরাঙ্গদেব ও গৌরধর্ম্মের বিষয় আমূল অবগত হইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক "চৈতন্যচরিতামৃত" ও "চৈতন্যভাগবত" পাঠ করেন, ইহাই বিনীত নিবেদন। গৌরধর্ম্মের তুল্য উদার মহান ধর্ম্ম আর নাই।

হায়! হায়! দীন হীন অধম আমি, আমার আপনাদের উপদেশ দিবার ক্ষমতা নাই তবে গললগ্নীকৃতবাসে অনুরোধ করি, যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ভগবানের ভাণ্ডারে নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সহজ ও মনোরম সেই 'নাম' আপনারা করুন। আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ নাম করুন। নাম করা অপেক্ষা প্রধান যজ্ঞ, মহা তপস্যা, প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, প্রধান পূজা, শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কিছুই নাই; সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া খেতে, শুতে, জাগিতে ঘুমাতে সুধামাখা হরিনামটী করুন। নামের জন্য আসন, প্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি করন্যাস, অঙ্গন্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। গঙ্গাজলের জন্য কোন মন্ত্রশুদ্ধির আবশ্যক হয় না কেননা নিত্যশুদ্ধ; 'নাম' তাহা অপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এশুদ্ধতা, পবিত্রতা কেবল বিষ্ণুপাদ স্পর্শ নিমিত্ত, কিন্তু নাম গঙ্গা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র সে কথা ধ্রুবসত্য তাহার জন্য কোন বিচারের আবশ্যক নাই। অতএব পাঠক পাঠিকাগণ! সব ছেড়ে নামে মগ্ন থাকুন। নামই আপনাদের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবেন কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক হইবে না। অন্ধকারের আলো, নাম; হৃদয়ান্ধকারের মধ্যে পবিত্র নির্দ্দিষ্ট পথ নাম আলোর সাহায্যে দেখিতে পাইবেন। তাই বলি নাম করুন, নাম করিবার জন্য কোন প্রকার পদ্ধতি বা খাস নিয়ম নাই; শুচি অশুচির প্রয়োজন নাই—যে কোন প্রকারে নাম লেন আর যাঁহারা নামে মগ্ন তাঁহাদের সঙ্গী করুন পরম কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

"নামতত্ত্ব" কি বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু ? নামী স্বয়ং বুঝাইয়া না দিলে, নামী স্বয়ং হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া "নামতত্ত্ব" বুঝিবার জন্য হৃদয়ের তন্ময়ত্ব-ভাব জন্মাইয়া না দিলে, আর কাহার সাধ্য যে "নামতত্ত্ব" বুঝিতে পারে বা বুঝাইতে পারে ? দয়াল ! প্রভু ! নামতত্ত্ব যে বাঙ্‌মনোবুদ্ধির অগোচর, চিন্তার বহির্ভূত, কল্পনার অতীত। যাহাকে তুমি জানাও সেই তাহা জানে, যাহাকে তুমি বুঝাও সেই তাহা বুঝে ; যাহাকে তুমি মজাইয়াছ সেই তাহাতে মজিয়াছে। নচেৎ তোমার "নামতত্ত্ব" কে বুঝিবে প্রভু ! এ অধম দুর্ভাগ্য পাপীর সাধ্য কি যে বুঝিবে বা বুঝাইবে। তুমি যে প্রভু পতিত পাবন ! গতি মুক্তির উপায় ও পতিতোদ্ধারের ভার চিরকালই তোমার উপর। একমাত্র ভরসা তুমি প্রভু ! হে সর্ব্বনিয়ন্তা ! হে জগদীশ্বর ! তুমি অকুলকাণ্ডারী অনাথবন্ধু, "নামতত্ত্ব" হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় বিধান তুমিই কর দয়াময় !

কৃপাময় ! আর কিছুই চাহিনা—কেবলমাত্র তোমার সেই শক্তি চাই, যে শক্তির বলে তোমার "নামতত্ত্ব" আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। দয়াল ! আমার আর কোন অভিলাষ নাই ; মাত্র এই অভিলাষ—যেন তোমার নামতত্ত্বে চিরদিন মতি থাকে।

নামাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই—নামাশ্রয় করিয়া চলিলেই প্রেম আসিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই - প্রেম আসিলেই প্রেমময় ভগবান দর্শন দিবে— "নাম" ছাড়িলে চলিবে না—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব অবস্থায় নামটী স্মরণ থাকা চাই— নতুবা কোন সন্ধান মিলিবে না ; নাম সৎ, নাম চিৎ, নামই আনন্দ। নামের দ্বারাই সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সম্ভব। পূজ্যপাদ, প্রেমিক ভক্তচূড়ামণি সাধকশ্রেষ্ঠ, নামোন্মত্ত শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের উক্তি :—

"অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গোকটি কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

শুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণ নাম হরি নাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর॥"

মো হেন দীন হীন মূর্খের একান্ত অনুরোধ আপনারা সর্ব্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নামাশ্রয় গ্রহণ করুন। আপনাদের ভয়ই বা কি ভাবনাই বা কি! নাম করিলে ভব ভয় দূর হয়—ঐহিক ভয় কোন ছার? দয়াল! বাঞ্ছা কল্পতরু আপনাদের সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন যেন নাম বিস্মরণ না হয়। নামকারীর ভয় জন্মায় এরূপ ভয় আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই—মা ভৈঃ! আহা! আহা! নামাশ্রয়ে যে কি আনন্দ, কি শান্তি তাহা প্রকাশ করিবার বা বুঝাইবার যোগ্যতা আমার নাই। এসব জিনিস বাক্য দ্বারা বুঝান বা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। বাক্য ভাষায় ইহার কিছুই প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র সাধনের দ্বারাই ইহা প্রস্ফুটিত ও অনুভূত হয়। জন্মান্ধকে কি কখনও কোন দৃশ্য বস্তু ও কারুকার্য্য উদাহরণের দ্বারা বুঝান যায়? চিনির মিষ্টত্ব কি ভাষায় উপলব্ধি হয়? অসম্ভব। নামাশ্রয়ের আনন্দ ও শান্তি বুঝান তদ্রূপ। তবে ভ্রাতৃবৃন্দ! 'নাম' করুন নামে মগ্ন হউন অচিরেই সমস্ত উপলব্ধি হইবে।

নাম সর্ব্বত্র, আকাশ ব্যাপিয়া নাম, হৃদয় ভরিয়া নাম, অন্তরে বাহিরে নাম, প্রতি জিনিবে নাম, প্রতি কর্ম্মে নাম, প্রতি ধর্ম্মে নাম, এই কথাই সর্ব্বশাস্ত্রে প্রকাশ। সাধু মহাজনদের সহিত এই কথাই শুনি—তথাপি আমাদের চৈতন্য কোথায়? আমরা মিথ্যা অসার পদার্থেই সর্ব্বদা মগ্ন—প্রকৃত সত্য, বিশুদ্ধ সর্ব্বদুঃখহর নামকে অন্তর হইতে অন্তর রাখিয়াছি। হায়রে মানব! ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে? "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"—

পাঠকপাঠিকাগণ! আপনারা মহাদস্যু রত্নাকরের নাম সকলেই জানেন—তিনি নামের গুণে দস্যু হইতে বাল্মীকিতে পরিণত হয়ে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

"কাজ কি জপে, কাজ কি তপে, গুরুপদ ভাবনা।
শ্রীগুরু স্মরণে কি ভয় মরণে,

গুরুদত্ত মন্ত্রে যাবে যম যাতনা॥
সহিত সাধনা সে ধনে সাধনা,
মহাদস্যু রত্নাকর দেখরে তার তুলনা,
উল্টা রাম নামে বাল্মীকির পরিমাণে,
মরা মরা বুলি ব'লে গেল পাপ লাঞ্ছনা।"

আহা! তাই বলি নাম ভিন্ন কি জীবের তরিবার উপায় আছে! নাম ব্রহ্ম, নাম সার, নাম ভিন্ন অন্য গতি নাই। কি সত্যযুগে, কি ত্রেতাযুগে, কি দ্বাপরযুগে, কি কলিযুগে চারি যুগেই নামের মহিমা; নাম ব্যতীত ধরিবার উপায় নাই নাম ব্যতীত তরিবার উপায় নাই, জগতে যাহা কিছু দেখুন সব নাম ময়। কোন কোন ঋষি বলেন, সত্যতে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে দান, আর কলিতে নাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস তা নয়; নামের মহিমা চারি যুগেই আছে। সৃষ্টির আদিতে মধুকৈটভ জন্মগ্রহণ ক'রে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তার সে নাম কি কখনও লয় হবে? ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ হরিনাম ক'রে পিতৃবাক্য অবহেলা করেছিল, কিন্তু সেই প্রহ্লাদের নাম কি পৃথিবীতে কেহ কখনও বিস্মরণ হবে না হয়েছে? পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ভক্তোত্তম ধ্রুবের নাম-গান কি কেহ ভুলেছে? ভগবান ভোলানাথ যোগীশ্রেষ্ঠ নামের জন্য, দেবর্ষি নারদ ভক্তশ্রেষ্ঠ নামের জন্য, শ্রীশ্রীউদ্ধব, নামাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, সাধককুলচূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন, সর্ব্বজনপূজ্য ভক্তবীর ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বরণীয় ও পূজনীয় হয়েছেন কেবল নামের জন্য। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, সকলেই নামাশ্রয় করিতে চায়, কেউ কেউ বা নিজ নাম রক্ষা করিবার জন্য অতুলকীর্ত্তি রেখে যায়। যার পরিণাম জ্ঞান আছে, সেইজানে নাম ভিন্ন গতি নাই। কেন কোন পুষ্করিণীর তীরে তাল বৃক্ষ থাকে, কিন্তু সেই তালবৃক্ষ ধ্বংস হ'লেও তালপুকুর নামটী কখনও যায় না, যে পুষ্করিণীতে পদ্ম থাকে, পদ্ম লয় হ'লেও পদ্মপুকুর নাম কখনও যায় না; নামের উপর নির্ভর করেই সাধন, নামের উপর নির্ভর ক'রেই ভজন। সাধন করিতে হইলেই গুরু যে নাম দিয়েছেন, সেই নাম অবলম্বন করেই নামগান ক'র্‌তে হয়। জগতে যা কিছু দেখুন নাম ছাড়া কিছুই নাই। যিনি হরিনাম আশ্রয় ক'রে নাম রক্ষা করিতে পারেন তিনিই **নরোত্তম,** আর যার নাম লোপ হয় সেই **নরাধম**

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য।/০ আনা। নমুনার জন্য।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

২৩শ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩৩[illegible] সাল। [২য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মূল্য হ্রাস।

আমরা গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬।২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৷৽ দিয়া আসিতেছি। কিন্তু যাঁহারা ১৩৩৪ সালের গ্রাহক হইয়াছেন এবং পরে হইবেন, তাহারা ১৷৽ স্থলে ১৲ এবং ১৩২৮ সাল হইতে ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৩৲ স্থলে ২৲ পাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

নির্ম্মাল্য।

২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম বাঁধাই। মূল্য মাত্র এক টাকা।

"ভাই ও ভগিনী" প্রণেতা শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

আমাদের নূতন গ্রন্থ **নির্ম্মাল্য** সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সুদীর্ঘ সমালোচনার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নির্ম্মাল্য" শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় রচিত একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপা লাভ না করিলে এমন সাধকোচিত অনুভূতিও লাভ হয় না; তা সে সাধনা ইহজন্মেরই হউক বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরই হউক। এক একটী প্রবন্ধে লেখকের প্রাণের এক একটী উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাস গদ্যে লেখা বটে, কিন্তু সে গদ্যের ভাষা এমন অলঙ্কৃত যে, সে লেখাকে গদ্য কাব্য বলা যাইতে পারে। ভাষা অলঙ্কৃত বলিয়া ভাব লুকায়িত নহে, পরন্তু অলঙ্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ব্যক্ত।"

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
"উৎসব" অফিস।

মহেশ লাইব্রেরি।

১৯৫।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ (হেদুয়া) কলিকাতা।

এইস্থানেও "উৎসব" অফিসের যাবতীয় পুস্তক এবং হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ পুস্তক পাওয়া যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২৩শ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল। { ২য় সংখ্যা

৺বিশ্বনাথের পূজা।

করেছি হে বিশ্বনাথ পূজা আয়োজন।
ভোলানাথ আশুতোষ যাহে তুমি পরিতোষ
এনেছি সে সকলি ত করিয়ে যতন।
কামনা অনলে হৃদি পুড়িয়া হয়েছে ছাই,
লেপিতে শ্রীঅঙ্গে তব লইয়া এসেছি তাই,
হিংসা বাঘ ছাল লয়ে, তোমারে পরায়ে দিয়ে,
তাহাতে জড়ায়ে দিব খল মন ভুজঙ্গম।
নির্গন্ধ আকন্দ সম শুষ্ক জীবন ফুল
আনন্দে সঁপিব পদে, ওহে প্রভু বিশ্বমূল,
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে, ত্রিপত্র করেছি তিনে
অনুতাপ অশ্রুবারি জাহ্নবী সলিল সম।
মথিয়া সংসার সিন্ধু লভেছি যে হলাহল
নৈবেদ্য করেছি তাই, নাহি যে অন্য সম্বল,
হতাশার তপ্তশ্বাস, হইবে ধূপের বাস
আরতি করিবে মোর জ্যোতিহীন দুনয়ন।

পরাইতে হাড়মালা অস্থিমাত্র আছে শেষ,
ধরিবে কি বক্ষে তাহা দয়াময় পরমেশ,
তোমার এ পূজার ভার কেহ ত নিবেনা আর
ধর নাথ ধর ধর, দাও পদ অনুপম।

৺কাশীধাম

ত্রিপুরারহস্যে কর্ম্মী, ভক্ত ও জ্ঞানীর করণীয়।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

হতাশ হইবে কেন? তুমি যে অবস্থার লোক কেন না হও তোমারও উদ্ধারের পথ ঋষিগণ দেখাইয়া দিয়াছেন। এস দেখি তাহাই আচরণ করি। দেখ দেখি ইহাতে জীবন গঠন হয় কিনা? যাহার জন্য অশান্ত হইতেছে, যাহার জন্য জ্বলিতেছ পুড়িতেছ তাহার উপশম হয় কিনা? সমস্ত পুস্তক যদি না বাহির করিতে পার তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঋষিগণ ক্ষণিক একটু আমোদ দিবার জন্য গল্প লিখিতেন না। তাঁহারা জীবনের উদ্দেশ্য একবারও বিস্মৃত হন নাই। গল্প শেষ না করিতে পারিলে ভাল হয় না বটে কিন্তু যাহা দিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে তাহার অতি অল্প অংশেও জীবনের কার্য্য হয়। গীতা বলেন স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ইহা শেষ না করিতে পারিলেও কোন প্রত্যবায় হয় না। পুস্তক শেষ হইল আর আলমারির শোভা বৃদ্ধি হইল ইহা না করিয়া ঋষিগণের শাস্ত্রে যতটুকু পাইলে তাহাতেই জীবন গঠনের যাহা পাইলে তাহার আচরণ করিয়া—জীবনে তাহার ব্যবহার করিয়া ধন্য হইয়া যাও।

তন্ত্রশাস্ত্র (ত্রিপুরা রহস্য) বলিতেছেন মাণিক আছে প্রতি অন্তঃকরণের ভিতরে। মাণিক যদি পাও তবে সাতরাজার ধন পাইয়া গেলে—তুমি পূর্ণ হইয়া গেলে—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" যাহা লাভ

করিলে অন্য লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হইবে না। সার বস্তু পাইলে দেখিবে তাহার মধ্যেই সব আছে। একটি বস্তু পাইলেই সব পাওয়া হইল। এই সার বস্তুটিই মাণিক—এইটিই আত্মরত্ন। এই রত্ন সকল নরনারীর অন্তরেই আছে। ইহার লাভের জন্য আবার কি পরিশ্রম করিবে? ইহাত আছেই। কিন্তু এই মাণিক ঢাকা পড়িয়াছে তোমার বাসনা দ্বারা। এই বাসনার আবরণ সরানই সাধনা।

কিন্তু তুমি যে জন্য যাহা করিতে চাও তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না যদি তজ্জন্য প্রথমেই তীব্র ইচ্ছা জাগাইতে না পার। বৃথা তোমার সাধন ভজন আর বৃথা তোমার শাস্ত্রালোচনা আর স্বাধ্যায় যদি তোমার সংসার সাগর পার হইয়া শ্রীভগবানকে লাভ করিবার তীব্র ইচ্ছা না থাকে। ত্রিপুরারহস্য বলেন তীব্র মুক্তিইচ্ছা বা মুমুক্ষা না রাখিয়া শাস্ত্রালোচনা বৃথা। মন্দ-মুমুক্ষাতেও কার্য্য হয় না। সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন হইতেছে তীব্র মুমুক্ষা। তৎপরতাই মুমুক্ষা। মুক্ত হইব এই তীব্র ইচ্ছা যেখানে সেইখানে তৎপরতা জন্মিবেই। দগ্ধশরীর পুরুষের শীতপরায়ণতা যেমন প্রয়োজন সেইরূপ সংসার দগ্ধ জীবের মোক্ষশীতলতাই প্রয়োজন। সমস্ত বিষয়ে দোষ দৃষ্টি জন্মিলে তীব্র মুক্তিইচ্ছা জন্মে। তীব্র বৈরাগ্য হইলেই তীব্র মুমুক্ষা জন্মিল তাহা হইতেই তীব্র প্রবৃত্তি আসিবে।

মুক্ত হইব এই তীব্র ইচ্ছা জন্মিলে আত্মরত্ন লাভে মানুষের তীব্র যত্ন হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞানসিদ্ধির কোন সাধনা নাই—সাধনা শুধু অজ্ঞান আবরণ সরাইবার জন্য। অজ্ঞান সরানই হইতেছে বাসনাপঙ্ক ধৌত করা। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, বাসনাকর্দ্দমে আবৃত। বাসনাকর্দ্দম ধৌত করিয়া ফেল, মাণিক পাইয়া মুক্ত হইয়া যাইবে। ত্রিপুরারহস্য দেখাইতেছেন বাসনা তিন প্রকার।
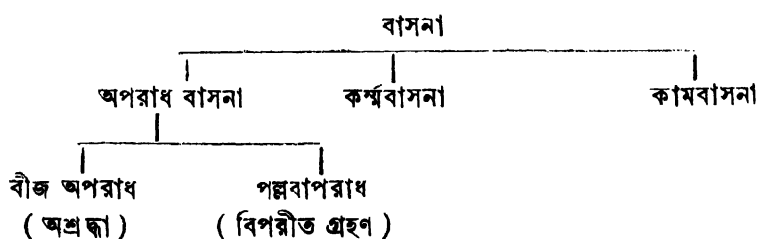
(১) অপরাধের বীজ হইতেছে অশ্রদ্ধা। যখন শ্রদ্ধা জন্মিল তখন মানুষ নিশ্চিন্ত হইল। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হইতেছে (শ্রৎ+ধা) শ্রৎ বা সত্যকে ধারণ করা। সত্যকে যে যেমন ভাবে ধারণ করে তার শ্রদ্ধাও সেইরূপ হয়। মানুষ সৎসঙ্গ করে, সৎশাস্ত্রও দেখে, তপস্যাও করে কিন্তু অশ্রদ্ধা ছাড়েনা বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এত করিলাম, এতদিন ধরিয়া করিলাম তথাপি হইল না—আর কবে হইবে এই ভাবে শিথিলপ্রযত্ন হইবার মূলে আছে অশ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধা, শাস্ত্রবাক্যে অশ্রদ্ধা। হইবেই নিশ্চয়—আমার পূর্ব্বকৃত পাপ বিস্তর আছে, সেই পাপক্ষয়ের জন্য তেমন করিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ করা হইতেছে না তাই হইতেছেনা—মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষকার বাড়াও—হইবার পথে চলিলে। নাম জপে হয়—যাহার গুরু এই শিক্ষা দিয়াছেন—সে যদি লোক খুঁজিয়া বেড়ায় জপে কাহার হইল—তবে বলিতে হইবে গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা নাই বা সংশয়জড়িত বিশ্বাস একটা আছে। ইহাতে হইবে না! কিন্তু যাঁহার শ্রদ্ধা আছে তিনি বলিবেন—"জপই জপই নাম ছার তনু করব বিনাশ" —নাম করিয়া করিয়া এই দেহ বিনাশ করিব এই তীব্র ইচ্ছা যাঁর জন্মিল—সে কি আর এখানে সেখানে ছুটিবে—না এর মনোরক্ষা তার মনোরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইবে? ছার তনু করব বিনাশ বলিয়া যে জপ লইয়া বসিল সে কি আর ভদ্রতা রক্ষা করিবে—না আমার ব্যবহারে বুঝি অন্যে অসন্তুষ্ট হইল ইহা দেখিবে? অথচ এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট সাধকেরও অভদ্রতা করা বা রুক্ষব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নাই। আমার আর অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই—এই যাহার ধারণা হইয়াছে সে আর কাহারও পশ্চাতে ছুটিবেনা, অথচ কেহ আসিলেও প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন অন্য কথাই কহিবেনা—যে ঈশ্বর চায় সে কি গল্প করিতে পারে? সে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইলেও—লোক চলিয়া গেলে মন হইতে সবই বাহির করিয়া দিতে পারিবে। যে মরিতে যাইতেছে সে খাতির রাখিবে কার? তাই বলিতেছি "ছার তনু করব বিনাশ" এই যাহার তীব্র বাসনা জন্মিল সে আপনার পথ আপনিই দেখিয়া লইতে পারিবে—তাহাকে আর সাবধান হইবার পথ দেখাইতে হইবে না। এই যে অশ্রদ্ধা অপরাধের কথা বলা হইল—ইহা দূর হইবে শাস্ত্রশ্রদ্ধা দ্বারা এবং সৎসঙ্গ দ্বারা। এই দুই উপায়ের মধ্যে সৎ সঙ্গই প্রধান উপায়।

(২) **কর্ম্মবাসনা**—চেষ্টা করিতেছি কিন্তু স্থির জলাশয়ে বুদ্‌বুদ্ উঠার মত নানান কথা মনে ভাসিয়া উঠিতেছে, কখন বা অসম্বদ্ধ প্রলাপের মাত্রা এত

বাড়িয়া যাইতেছে যাহাতে মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ব দুষ্কৃত সংস্কার জন্য বুদ্ধিতে এই কর্ম্মবাসনা সঞ্চিত থাকে। যখন অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার বুদ্ধিতে থাকে তখন গুরু উপদেশও ঠিক ভাবে গ্রহীত হইতে পারে না। তথাপি গুরুকে শ্রদ্ধা করিয়া যিনি কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করেন তিনি অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিলেই গুরুরূপী, মন্ত্ররূপী, ইষ্টদেবতার কাছে নালিশ করিবেন—প্রার্থনা করিবেন—আর দৃঢ়ভাবে গুরুবাক্য পালন করিতে চেষ্টা করিবেন যে নাম ভিন্ন অন্য যাহা কিছু মনে উঠিবে তাহাকেই মায়া, মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে আর পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে ঠাকুর আমি আর এসব ভাবিতে পারিনা আমি তোমার নাম করি তুমি যাহা ভাল তাহাই করিয়া দিও। এই নালিশ ও প্রার্থনা করিতে করিতে যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব সীমায় আসিবে তখন জানিতে হইবে কর্ম্মবাসনা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে এবং শেষে যে একেবারে ইহা থাকিবেনা তাহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

অশ্রদ্ধা থাকিলেই বস্তুকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করা হয় ইহা ত স্পষ্টই এজন্য এ সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

(৩) **কামবাসনা**—কামবাসনা আকাশ হইতেও বিস্তীর্ণ। ইহার অন্য নাম আশাপিশাচী। মানুষ উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। আশাপিশাচী যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেনা তিনি সর্ব্বাঙ্গশীতল। কামবাসনা যতদিন আছে ততদিন মানুষ নিরন্তর বলিবে আমায় এই করিতে হইবে আমার ঐ করিতে হইবে, এটা করা হইল না, ওটা এখনও বাকী আছে—কর্ত্তব্যশেষ যতদিন আছে ততদিন কামবাসনা নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। যখন মনে হইয়া গেল—দৃশ্যতে, শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা—যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা স্মরণ করি সমস্তই মায়া—সমস্তই অগ্রাহ্য করিবার বস্তু, একমাত্র নাম ও নামীই গ্রহণের বস্তু—এই অভ্যাস যখন পাকা হইল তখন কামবাসনার অন্ত হইল। বিষয় অনিত্য, বিষয় ক্ষণস্থায়ী জানিয়া দৃঢ়ভাবে বিষয়দোষদর্শন অভ্যাস করিতে করিতে কামবাসনার মূলোচ্ছেদ হয়।

এই ভাবে সৎসঙ্গ দ্বারা অশ্রদ্ধা বাসনা, ঈশ্বর অনুগ্রহ দ্বারা কর্ম্মবাসনা এবং বিষয়দোষদর্শন দ্বারা কামবাসনা ধৌত করিবার সাধনা করিতে পারিলে বাসনা কর্দ্দমাবৃত মণিটি উজ্জল ভাবে বুদ্ধিদর্পণে ভাসিতে থাকিবে আর তুমি আপনার ভিতরে আপনাকে দেখিয়া পূর্ণ হইয়া যাইবে।

ত্রিপুরারহস্য বাসনা ধৌত করিবার সাধনার কথা উল্লেখ করিয়া পরে সৎসঙ্গ হইতেই সব হয় বলিতেছেন।

জগতে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় সকলেই পরতন্ত্র, একমাত্র পরাচিতিই স্বতন্ত্র। পরাচিতি তাঁহার স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে—তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা—নিজের মধ্যে বিচিত্রজগৎ উদ্ভাসিত করেন; এবং সেই সময়ে সেই চৈতন্যময়ী দেবী হিরণ্যগর্ভ নাম ধারণ করেন, করিয়া অনাদিঅজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের হিত কামনা করিয়া আগম সমুদ্র উদ্ঘাটিত করেন। হিরণ্যগর্ভই কাম্যকর্ম্ম সৃজন করেন। এই সমস্ত কাম্যকর্ম্মের ফল বিচিত্র।

জীব কামনা বশতঃ নানা কর্ম্ম করিয়া যখন ফল লাভ করিতে পারে না—পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিয়াও যখন শুভ ফল প্রাপ্ত হয় না, তখন জীব আপনার পুরুষার্থ দ্বারা কিছুই হয় না জানিয়া ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখী হইয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধা স্থাপন করে। এবং এই সময়ে জীব সৎপুরুষের অনুসন্ধান করে। ক্রমে ভগবৎমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে। তবেই হইল সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আশ্রয় করিবার মূল কারণ হইতেছে কাম্যকর্ম্মের শুভফল না পাওয়া।

ত্রিপুরারহস্য এখন জ্ঞানীর স্থিতি সম্বন্ধে যে ভিন্নতা আছে তাহাই দেখাইতেছেন।

যাঁহার বাসনা স্বভাবতঃ অল্প, অল্প আয়াসেই তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত কিন্তু বাসনা-নিবিড় তাঁহার জ্ঞান হইলেও তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার স্থিতি হয় না। জ্ঞান হইলেও আবরণ পেটকের তারতম্য অনুসারে জ্ঞানীর স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বভাব-জ্ঞানী হইলেও যে যে স্বভাবে জ্ঞানী থাকেন তদনুসারে তাঁহার কার্য্য হয়। গৌর দেহ যেমন শ্যাম হয় না সেইরূপ জ্ঞান হইলেও চিত্তস্বভাববশতঃ জ্ঞানে স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়।

ভগবান্ দত্তাত্রেয় তখন পরশুরামকে বলিতেছেন দেখ রাম আমি, দুর্ব্বাসা এবং চন্দ্রমা—আমরা অত্রি ভগবানের পুত্র। আমরা তিন জনেই জ্ঞানী। জ্ঞানী হইলেও চিত্তস্বভাববশতঃ আমাদের স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। দুর্ব্বাসা ক্রোধী, চন্দ্রমা কামী এবং আমি সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন। আবার জ্ঞানী হইলেও বশিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ, নারদ ভক্ত, সনকাদি সন্ন্যাসী; শুক্রাচার্য্য দৈত্য পক্ষে, বৃহস্পতি দেব পক্ষে, ব্যাস শাস্ত্রনির্ম্মাতা, জনক, রাজা এবং জড়ভরত ত্যাগী। জ্ঞানে স্থিতির তারতম্য চিত্তস্বভাববশতঃই হইয়া থাকে।

একটি ভাবের গান শ্রবণে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার লিখিত

এই ত চিত্ত জড়ভাবে ছিল—কোন কিছুর স্ফুরণ ছিল না। অকস্মাৎ একটি গানের অংশবিশেষ কর্ণে প্রবেশ করিল—এক মুহূর্ত্তে তমঃ পলাইল। যে বৈষ্ণবের শুদ্ধহৃদয় হইতে এই গীত বাহির হইয়াছে তাঁহাকে কোটি কোটি নমস্কার করিলাম।

আহা! কি সুন্দর। "আমি সুখ দুঃখ তব, পদধূলি বলে, মাথায় তুলিয়া লব॥ আমি কি আর কব॥"

যে তোমার দর্শনে চলিয়াছে সে কি সুখ দুঃখ গ্রাহ্য করে? হে পান্থ! হে পথিক! তুমি ত সংসার পথে চলিয়াছ তার দর্শনে। যে আশ্রম লইয়াই থাক, চলিয়াছ কিন্তু তার দর্শনে। তার দর্শনে চলিয়াছি যদি মনে রাখিতে না পার তবে জীবন বিফলে গেল জানিও। জীবনপথে যে অবস্থায় আইস না কেন—সেখানে যত দুঃখ আসুক না কেন, যত সুখ বা আসুক না কেন—তুমি যার দর্শনে বাহির হইয়াছ এই সুখ দুঃখ, এই বিঘ্ন বিপত্তি—এ সব তোমারই পদধূলি—ইহা মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য। সত্য কথা—আমি কি আর কব। আমি সুখ দুঃখ তব, পদধূলি বলে, মাথায় তুলিয়া লব॥

জীবন পথে যাত্রা এক দীর্ঘ অভিসার। এই অভিসার যিনি প্রেমময়ী হইয়া দেখাইয়াছেন তিনি ত পথভোলা পথিককে জীবনপথ দেখাইবার জন্যই এই আচরণ করিয়াছেন। দ্বাপরযুগে যেমন এই অভিসার আবার ত্রেতাযুগের আচরণ জীবনের প্রবলতম দুঃখ অতিক্রম করিবারই জন্য। আহা! তোমা ছাড়া হইয়াছি, সেই নয়নাভিরাম মনোভিরাম প্রেমের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কামের প্রাকৃত মূর্ত্তি নিরন্তর ব্যথা দিতেছে, প্রেমের মনঃ প্রাণরসায়ন মধুর বাক্যের পরিবর্ত্তে নিরন্তর কামের কর্ণজ্বালাকর ইন্দ্রিয়ের বিলাসের কথা শুনিতেছি—এই সমস্ত সহ্য করিবার—এই সমস্ত অগ্রাহ্য করিবার একমাত্র উপায় তোমার নাম করা। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া নিরন্তর তোমার নাম করিতেছি আর বলিতেছি উদ্ধার কর, উদ্ধার কর! কবে তোমার দয়া হইবে

কবে তুমি আসিবে উদ্ধার করিতে? জীবনপরিশ্রান্তপান্থ—এই ভাবে সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া নাম কর দেখিবে সেও তোমার জন্য বড় ব্যাকুল—সেও তোমার উদ্ধারের জন্য দূত পাঠাইতেছে। শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, প্রতিদিনের দুঃখে আকাঙ্ক্ষা তীব্র কর, সে আসিবেই, সে আসিতেছে, সে দূত পাঠাইতেছে তুমি ততদিন সব অগ্রাহ্য করিয়া নিরন্তর "শোয়ত আঁচাওত" নাম করিতে থাক। ইহা বলিওনা জীবনত শেষ হইয়া গেল কৈ আসিল? এখনও যে আসিল না—তাতে তারে দোষ দিওনা—সে তোমার পাপ ধৌত করিয়া দিয়া তবে আসিবে, নতুবা পাবার মতন করিয়া তুমি তারে পাইবে না। যদি তোমার জীবনের অবসানই হয়, তোমার নাম করা কিন্তু বৃথা হইবে না জানিও। সেই বলিতেছে "মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ" মরণে—প্রাণপ্রয়াণকালে তুমি আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে, আমি আসিয়া তোমাকে আমার নাম শুনাইয়া আমার লোকে তোমাকে লইয়া যাইব। হারাইওনা এই বিশ্বাস। সে কখন দুই কথা বলে না। সে যাহা বলে তাহাই করে। ধৈর্য্য অবলম্বন কর—করিয়া নাম করিতে করিতে, কাতর হইয়া, উদ্ধার কর বলিয়া, স্মরণ করিতে করিতে নাম করিয়া যাও। হতাশ হও কেন? এইটা যে পাপের চিহ্ন। সে আছে, সে আসে, সে উদ্ধার করে, সে এখনও নিকটে, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, ছাই রাই মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া উপস্থিতে তার নাম লইয়া আছ কিনা তাই দেখ আর কিছুই ভাবিওনা শুধু তারে স্মরিতে স্মরিতে—উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিতে বলিতে কর্ত্তব্য করিয়া যাও—তাহাকে ডাকা কখন বিফল হয় না জানিও। আবার যদি সত্যযুগ দেখ সেখানকার অভিনয় একেবারে অসি ধরিয়া, রণতাণ্ডবে মগ্ন হইয়া তোমার শত্রু নাশ করা। হাসিতে হাসিতে অভয় দেওয়া—আমি তোমার আছি—যখন বিপদ হইবে তখনই আমায় স্মরণ করিও আমি তৎক্ষাৎ তোমাকে নিরাপদ করিয়া দিব।

বলিতেছিলাম সেই গানের কথা। সব শুনিতে পাই নাই। যতটুকু শুনিলাম তাহাতেই প্রাণ অমৃতময় হইয়া উঠিল। শুনিলাম—

আমি কি আর কব॥
আমি সুখ দুখ তব পদধূলি বলে
মাথায় তুলিয়া লব॥
আমি তোমার প্রেম মূরতি হৃদয়ে লয়ে
নীরবে যাব॥ ইত্যাদি

সত্যই তোমার প্রেমমূরতি হৃদয়ে লয়ে নীরবে যাইতে হইবে। তোমার প্রেমমূরতি কি দেখিয়াছি? মিথ্যা সংশয়, দেখিয়াছ বৈকি!

এই যে তোমার সম্মুখে তোমার উপাস্য মূরতি—এ মূর্ত্তি যে তারই। হউক না পটের ছবি, হউক না ট্যাড়া ব্যাঁকা মূর্ত্তি। তার মূর্ত্তি কে আঁকিতে পারে? তেমন করিয়া ভরিত করিয়া আঁকিবার সামর্থ্য কার আছে? সে কৃপা না করিলে তার মূর্ত্তি কি তেমটি হইবে? না হউক—যেমন মূর্ত্তি পাওনা কেন—এ যে তারই মূর্ত্তির আভাস। ঋষিগণ তাঁর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—তিনি দেখা দিয়াছিলেন বলিয়া। তাই তাঁরা ধ্যানে তাঁর মূর্ত্তি ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তোমার উপকারের জন্য—তোমার সুবিধার জন্য। পটের ছবিটিই তোমার প্রয়োজনের বস্তু নহে। এ ছবি যাঁকে স্মরণ করিয়া দেয় তাহাতেই তোমার প্রয়োজন।

নাম করিবার পূর্ব্বে ত ধ্যান করিতে হয়। প্রতি দিন সম্মুখে এই মূর্ত্তি ধরিয়া ধ্যান কর—এই ধ্যান বাহিরে হইবে। শেষে চক্ষু বুঝিয়া নাম কর—ধ্যান আসিবে ভিতরে। আবার সৎসঙ্গে সৎশাস্ত্রে সে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইবে হৃদয়ে। মানসে এই শ্যামল মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে এই প্রেমের মূর্ত্তি নিরন্তর দেখিতে দেখিতে দেখিবে ইহাও জীবন্ত হইয়া আসিয়াছে। যাহা কিছু কর এই শ্যামলমূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া কর। যখন অভিসারে যাইবে তখন বলিতে পারিবে "আমি তোমার প্রেম মূরতি হৃদয়ে লইয়া নীরবে যাব" "আমি কি আর কব" আমি সুখ দুঃখ তব পদধূলি বলে মাথায় তুলিয়া লব"।

ধ্যানের একটী শ্লোক

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

অন্তস্থমেকং ঘনচিৎপ্রকাশং
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়স্বরূপম্।
বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদব্জে
সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্॥

কবে হইবে? কখন হইবে কি? সেই যে কৌশল্যা জননীর যাহা হইয়াছিল? রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন মা কিন্তু কিছুই দেখিতেছেন না। কিছুই দেখিতেছেন না বলিলে ঠিক বলা হয় না। ভিতরে কিছু দেখিতেছেন—আর বাহিরে কিছুই দেখিতেছেন না। সকল ইন্দ্রিয়—বা সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক—সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা স্থির হইয়া এক প্রকাশে ডুবিয়া গিয়াছে।

আহা! এই ভিতরে চিৎঘনপ্রকাশ—কি এইটী? আহা! এই জ্ঞানঘন জ্যোতিঃস্বরূপ ভিতরের বস্তুটি কিন্তু সর্ব্বব্যাপী—এই বস্তুটিতে আর কোন কিছু নাই। সমস্ত জড়জগৎ—সমস্ত দৃশ্য দর্শন—নিরস্ত হইয়াছে—শুধু জ্ঞানঘন প্রকাশটি মাত্র দাঁড়াইয়াছেন। জ্ঞানঘন প্রকাশটি কিরূপ? জ্ঞান আবার ঘন কিরূপে? জ্ঞানটিত সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। ব্রহ্ম ত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী। এই নিরাকার নিরবয়বের ধ্যান হইবে কিরূপে? নিরাকারের ধ্যান হয় না—নিরাকারের উপাসনা হয় না- নিরাকারের কাছে বসা যায় না। নিরাকার যিনি তাঁহাতে বিশ্বাস মাত্র হইতে পারে—বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা মাত্র চলিতে পারে। কিন্তু এই প্রার্থনাতে "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বল মিন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বানি"—সমস্ত অঙ্গ—বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়—আপ্যায়িত হয় কি? তৃপ্তিলাভ করে কি? ভরিত হইয়া যায় কি? বুঝি নিরাকারের উপরে আরও কিছুর প্রয়োজন হয়। চক্ষু কতই ত দেখিয়াছে আপ্যায়িত হইয়াছে কি? যাহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু পাইয়াছ তাহাকে না দেখা পর্য্যন্ত চক্ষু কখন ভরিত হইয়া যাইবে না। বাহিরের কোন কিছু দৃশ্য দর্শনে চক্ষু আপ্যায়িত হইয়া যায় না চক্ষুর এই পিপাসা মিটাইবে কে? সকল ইন্দ্রিয় যাঁহার জন্য লালায়িত হয়—তিনি যদি নিরাকারই থাকেন

তবে ত ইন্দ্রিয় লাভের যথার্থ উদ্দেশ্য কখন সফল হয় না—তবে বুঝি মানুষের কাতর ইন্দ্রিয় কখন জুড়াইয়া যায় না। আহা! মানুষের বুদ্ধি, না হয় ব্রহ্মবিচারে শান্ত হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় শান্ত হইবে কিরূপে? হৃদয়কে ইন্দ্রিয়াদি পরিবারবর্গের সহিত আপ্যায়িত করিতে হইলে জ্ঞানস্বরূপের, আনন্দস্বরূপের ঘনীভূত মূর্ত্তি চাই, জ্ঞানস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে কথা কহিতে হয়, নতুবা কর্ণ আর কোন্ কথা শুনিয়া আপ্যায়িত হইবে, ভরিতহইবে? চিৎস্বরূপ যিনি, অনেজং একং যিনি, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যিনি তিনি শান্তং শিবং সুন্দরং পরিপূর্ণ যিনি তিনি অখণ্ড স্বরূপে থাকিয়াও উপাধি ধরিয়া নয়নাভিরাম বচোভিরাম শ্রবণাভিরাম মনোভিরাম সদাভিরাম সততাভিরাম রূপ না ধরিলে হৃদয় আপ্যায়িত হইবার আর ত কিছুই নাই। যখন রূপ লাগি আঁখি ঝুরে আর গুণে মনোভোর হইয়া উঠিতে চায়, যখন প্রতি অঙ্গ আপ্যায়নের জন্য প্রতি অঙ্গ কাঁদিতে থাকে, যখন হিয়ার পরশ লাগি হিয়া বড়ই কাঁদিতে থাকে, যখন প্রাণ স্পর্শ বিনা কিছুতেই আর স্থির হয় না—কবি তুমিই বল মানুষের হৃদয়কে স্থির করিবে কে? এই ব্যাকুল প্রার্থনাতে, এই কাতরতা পূর্ণ করিতে সেই নিরস্তসর্ব্বাতিশয়স্বরূপং সেই অস্তস্তমেকং চিৎস্বরূপং ঘন হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করেন তাই বলা হয় "ভক্ত চিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" ভক্তের চিত্তকে আপ্যায়িত করিতে সেই দয়াময় জগৎব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চৈতন্য পুরুষই সুন্দর সাজে সাজিয়া হৃদয়ে উদয় হয়েন—আবার বাহিরে আসিয়া শ্রবণ রসায়ন কি যেন অমৃতময় কথা কহিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করেন, সেই চন্দ্রকোটি ভানুকোটি কোটিমদনহারো মূর্ত্তি না দেখিলে কি কখন সব ইন্দ্রিয় ভিতরে ডুবিয়া যায়? ভিতরে ঐ সুন্দর না দেখিলে কি বাহিরের দৃশ্য দর্শন মুছিয়া যায়? তাইত ভগবান আপনি ভক্ত বাসনা তৃপ্তি জন্য অবতার হয়েন। তুমি অবতার মানিতে পার না এ তোমার দুর্ভাগ্য। ঋষিরা অদ্বৈতবাদী হইয়াও অবতার পূজা করিবার উপদেশ দিয়াছেন—ফলে অবতারের উপাসনা না করিলে জীবের হৃদয় ও বুদ্ধি কখন শান্ত হইতে পারে না। দ্বৈতভাবে সাধনা করিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে পারিলে তবে অদ্বৈতভাবে স্থিতি লাভ করা যায়।

আজকাল ভালবাসার কথা মানুষ কতই কয়। কিন্তু ভালবাসার লক্ষ্য বাহিরের রঙ্গরসে নহে, ভালবাসা যদি এই চিৎঘন প্রকাশে ডুবিতে না পারে তবে ইহা কামবিলাস মাত্র। দেবী কৌশল্যা হৃৎপদ্মে এই সদানন্দময় শ্রীবিষ্ণু

শ্রীরামকে ভাবিতে ছিলেন তাই রাম বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেও রামকে দেখিতে পাইলেন না। তুমিও দেখিতে দেখিতে যদি সেই ভিতরের ঘনচিৎপ্রকাশে ডুবিয়া গিয়া বাহিরে কিছু না দেখ—যদি বলিতে পার "বাহ্যং বিস্মৃতবানহং" তবে জানিব তুমি সাধক নতুবা তুমি শরীর ভোগের জন্য অহর্নিশ কাহার পশ্চাতে ছুটিতেছ বেশ করিয়া বিচার কর, করিয়া আত্মপ্রতারণা ছাড়িয়া সত্য সত্য ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়া জীবন সফল কর। বেশ করিয়া ধারণা করিও যে ভালবাসায় বিরহ নাই সেটা ভালবাসা নহে সেটা কাম। আবার যে বিরহে সংযম নাই সেটাও বিরহ নহে শরীর ভোগের জন্য ছুটাছুটি মাত্র। যদি ভালবাসা বুঝিয়া থাক তবে বাহিরের সব ছাড়িয়া সংযমী হইয়া কৌশল্যার মত ন দদর্শ রামং হইয়া যাও।

বুঝিলে—ধ্যানের বস্তুটি কি? ধ্যানের বস্তুটি যদি না ধারণা করিয়া থাক তবে জপের সময়ে বহু অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিবেই। সেই জন্য ধ্যান করিয়া জপ করিবার বিধি।

সামান্য চৈতন্য যিনি তিনি ধ্যানের বস্তু নহেন। সামান্য চৈতন্য যখন মায়িক উপাধি ধরিয়া বিশেষ চৈতন্য হয়েন তখন ইনিই ধ্যানের বস্তু। নির্গুণব্রহ্ম, উপাসনার বস্তু নহেন কিন্তু ইনিই যখন উপাধি ধরিয়া সগুণ হয়েন ইনি যখন ঘনচিৎপ্রকাশ হয়েন তখন এই ঘনচিৎপ্রকাশই উপাসনার বস্তু। ইঁহার সুন্দর আকার, ইঁহার সুন্দর প্রকার, ইঁহার সুন্দর কথা—ইঁহার সবই সুন্দর। ঘনচিৎপ্রকাশ যিনি তিনি সবকালে সর্ব্বব্যাপী আবার মূর্ত্তিধারী। সকল স্থানে তিনি আছেন আবার সর্ব্বত্র মূর্ত্তি ধরিয়াও প্রকাশমান—ইঁনিই ধ্যানের বস্তু।
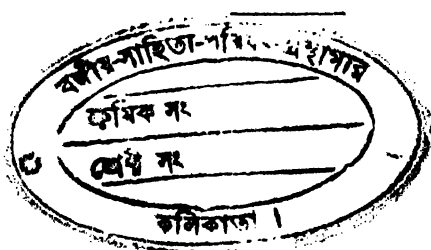
অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ভরত—পরাজয়।

তদাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ।

*　　*　　* ॥

চতুর্দ্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।

ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাস্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ বাল্মীকি।

রমণীয় চিত্রকূটাশ্রমের রমণীয় আকাশ—আকাশে থাকিয়া কে কি করেন সাধারণ মানুষে তাহা জানিবে কি করিয়া? ভগবান্ বাল্মীকি দেখিয়াছিলেন ভ্রাতৃদ্বয়ের রোমহর্ষণ সমাগম দেখিতে মহর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণ সেবাশ্রমের উপরে আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। বিস্মিত হইয়া তাঁহারা দুই ভ্রাতার প্রশংসা করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মবিক্রম এই দুই ভ্রাতা যাঁহার পুত্র তিনিই ধন্য। ইঁহাদের অপূর্ব্ব কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি-লাভ করিলাম। ভিতরে দশাননের বধের আকাঙ্ক্ষা—ঋষিগণ ভরতকে বলিতে লাগিলেন বীর! তুমি বিজ্ঞ, যশস্বী এবং সদ্বংশোদ্ভব। যদি পিতারদিকে দৃষ্টিপাত কর তবে রামের কথামত কার্য্য করাই তোমার উচিত। সত্যপালন-পূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে রাম মুক্ত হন ইহা আমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ। রাম প্রতিজ্ঞা করাতেই রাজা কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ঋষিগণ এই বলিয়া সহর্ষচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণকে সকলে দেখিতে পান নাই, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র দেখিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত প্রহৃষ্টবদনে পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীভরতের ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আসিতেছে কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত

হইতেছে না। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন আর্য্য! আপনি আমাদের বংশের চিরপ্রচলিত কুলধর্ম্ম বিচার করিয়া জননী কৌশল্যার অভিলাষ পূর্ণ করুন। সুমহৎ এই রাজ্য আমি রক্ষা করিতে উৎসাহী হইতেছি না। অনুরক্ত পৌর ও জানপদগণের মনোরঞ্জনেও আমার সামর্থ্য নাই। কৃষকগণ যেমন বারিবর্ষণের জন্য জলধরের প্রতীক্ষা করে সেইরূপ সমস্ত প্রজা, সমস্ত বন্ধু বান্ধব এই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত কাহারও হস্তে ইহা সমর্পণ করুন।

ভরত ভ্রাতার পদতলে পড়িলেন এবং প্রিয়বাক্যে পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাম তখন শ্যাম নলিনপত্রাক্ষ ভ্রাতাকে ক্রোড়ে লইয়া কলহংস সদৃশ মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন বৎস, তোমার এই যে স্বাভাবিকী গুরুসেবা প্রাপ্ত বিনয়—তজ্জনিত তোমার এই যে বুদ্ধি আসিয়াছে ইহাতেই দেখিতেছি পৃথিবী পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার সামর্থ্যও তোমার আসিয়াছে। অমাত্য, সুহৃৎ, বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী ইহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তুমি গুরুতর কার্য্য সকলও কর।

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥
কামাদ্বা তাত লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং বর্ত্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ॥

চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমাচলও হিম ত্যাগ করিতে পারেন, সাগরেও বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারেন আমি কিন্তু পিতৃসত্য পালনে কিছুতেই বিরত হইব না। কামবশেই হউক বা লোভ বশেই হউক, তাত! তোমার মাতা তোমার জন্য যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য তুমি কিছুই মনে করিও না প্রত্যুত মাতার মতই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে।

ভরতের মন সম্পূর্ণরূপে শান্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। ভগবান্ বাল্মীকি দেখাইয়াছেন নারদাদি দেবর্ষিগণ অদৃশ্যভাবে আসিয়াছিলেন, আর ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে দেখাইলেন—

"নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ॥

রঘুনন্দন শ্রীগুরু শ্রীবশিষ্ট দেবকে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিলেন। জগতের জ্ঞান গুরু তখন ভরতকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন—ভরত! তুমি জানিও

রামো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা।
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ॥
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
শেষোঽপি লক্ষ্মণো জাতো রামমন্বেতি সর্ব্বদা॥
রাবণং হন্তু কামাস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
কৈকেয়্যা বরদানানি যদ্ যদ্ নিষ্ঠুর ভাষণম্॥
সর্ব্বং দেবকৃতং নোচেদেবং সা ভাষয়েৎ কথম্।
তস্মাত্ত্যজাগ্রহং তাত রামস্য বিনিবর্ত্তনে॥
নিবর্ত্তস্ব মহাসৈন্যৈ র্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুরম্।
রাবণং সকুলং হত্বা শীঘ্রমেবাগমিষ্যতি॥

ভরত তুমি জানিও রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণ। রাবণ বধের জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রার্থনা করায় ইনি দশরথের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন। যোগমায়াই জনকনন্দিনী সীতা হইয়া জন্মিয়াছেন। আর শেষ নাগ অনন্ত দেব লক্ষ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই রামের সঙ্গে আছেন। প্রতি নরনারীর মেরুদণ্ড যেমন সর্পাকারে ফণাতলে সীতারামকে রক্ষা করেন সেইরূপ "যাবন্ত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়য়াঃ সম্ভবন্তি হি। তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ। মায়াশক্ত্যা ভবেৎ কিং বা শেষাংশস্য হরেস্তনোঃ।" ত্রিলোকে মায়ার যত শক্তি প্রকটিত হয়; সেই সমস্ত শক্তির আধার মহাত্মা লক্ষণ; তিনি অনন্তের অংশ—শ্রীহরির তনু। শক্তিশেলে তাঁহার কি হইবে? পূর্ব্বে বিংশ অধ্যায়েও ইহা বলা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ আলোচনা ভিন্ন তত্ত্বকথা হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইবে না। রাবণ বিনাশে ইচ্ছা করিয়া ইহাঁরা বনে যাইতেছেন এ বিষয়ে সংশয় করিও না। কৈকেয়ী বরদান ব্যাপারে দেবী যাহা যাহা নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন সমস্তই দেবতাকৃত নতুবা এমন কঠিন কথা কি রামগতপ্রাণা দেবী কৈকেয়ী বলিতে পারেন? তাত! ইহা জানিয়া তুমি রাম বিনিবর্ত্তনের আগ্রহ ত্যাগ কর। সৈন্য সমূহের সহিত ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে লইয়া তুমি অযোধ্যায় যাও। রাম রাবণকে সকুলে বধ করিয়া শীঘ্রই অযোধ্যায় আগমন করিবেন।

শ্রীগুরুর মুখ হইতে এই বাক্য শুনিয়া ভরতের কি হইল? ভরতের উপাস্য ত এই রাম। উপাস্যত শিষ্যের সর্ব্বস্ব—শিষ্টের নিকটে উপাস্যইত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ --উপাস্যই যে শিষ্যের নিকটে নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম, আত্মা ও অবতার সমকালে ইহা ভরত জানিতেন। জানিয়াও গুরুমুখে এই কথা শ্রবণ করায় ভরতের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—ভরত বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে রামের নিকটে আগমন করিলেন।

রামের নিকটে আসিয়া ভরত কি দেখিতেছেন? এ দেখা যেন অন্যরূপ। তেজে আদিত্যের মত, প্রতিপদ চন্দ্রের মত রমণীয়-দর্শন—ভরত যেন আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। একবার সীতার মুখকমলে, পরক্ষণে রামের কমল নয়নে দৃষ্টি রাখিয়া রাখিয়া ভরতের চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া আসিল। তখনও ভরত নিকটেই আছেন ভরত সমস্তই বুঝিয়াছেন, তথাপি চতুর্দ্দশ বর্ষের ভাবি বিরহে ভরত অভিভূত হইতেছিলেন। কোনরূপে প্রাণকে স্থির করিয়া শ্রীভরত বলিলেন—

অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্ব্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ॥

আর্য্য! হেমভূষিত এই পাদুকা যুগলে চরণার্পণ করিয়া আমাকে প্রদান করুন। আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ এই পাদুকা যুগল সর্ব্বলোকের যোগক্ষেম—সকল লোকের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ—ইহা বিধান করিবে। শ্রীভগবান্ তাহাই করিলেন। ইহা হইতে কি এখনও এই পতিতযুগে কোথাও কোথাও সতীস্ত্রী স্বামীর পাদুকা পূজা করিয়া থাকেন? হইতেও পারে। শ্রীভরত পাদুকা যুগলকে প্রণাম করিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন—বীর! রঘুনন্দন! আমি অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর জটাধারণ করিব, চীরখণ্ড পরিধান করিব, ফল মূল ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করিব না। পরন্তপ! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে অর্পণ করিয়া, আপনার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া নগরের বাহিরে বাস করিব। যেদিন চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবে রঘূত্তম! সেই দিবস যদি আপনার দর্শন না পাই, তবে আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব।

শ্রীভগবান্ সম্মত হইলেন। পাদুকাকে সমস্ত নিবেদন—ইহা কিরূপ? সর্ব্বকর্ম্মার্পণ শ্রীভগবানে করিলে যাহা হয় তাহা কি এই জড় বস্তুতেও হইবে? হইবে না কেন? ভগবৎস্পর্শে অচেতনও যে জীবন্ত হইয়া যায় ইহা ভক্ত ভিন্ন আর কে ধারণা করিতে পারে? পটের ছবিই বল আর ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিই বল—এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া ইহাদের মধ্যে শ্রীভগবানকে

আহ্বান করিতে হয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি ভক্তের কাতর আহ্বানে জড়ের মধ্যেও আগমন করেন—তাই পটের ছবিও জীবন্ত হইয়া উঠে, ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিও কথা কয়। ভরত-দত্ত পাদুকাতে ত শ্রীভগবান শ্রীচরণ অর্পণ করিয়াছিলেন—ইহা জীবন্ত হইবে না কেন?

রাম তখন স্নেহভরে শ্রীভরতকে আলিঙ্গন করিলেন, শত্রুঘ্নকেও আলিঙ্গন করিলেন। মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়া কর্ম্ম করিতে আর কে জানে? কে জানিতে পারে? আর একজন বাকী রহিলেন দেবতার চক্রে আজ ইনি অপরাধিনী—দেবতার কার্য্যে আজ ইঁহার মস্তকে কলঙ্কের ডালি অর্পিত হইয়াছে। রাম ইঁহাকে ত একবারও ভুলেন নাই—ইঁহার উপর একবারও রাগ করেন নাই। রাম বলিলেন—

মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি॥

মাতা কৈকেয়ীকে তুমি রক্ষা করিও। তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিও না। এই বিষয়ে আমার ও সীতার দিব্য তোমার প্রতি রহিল। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু তখন "ভ্রাতরং বিসর্জ্জহ" ভ্রাতাকে বিদায় দিলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই মহোজ্জ্বল অলঙ্কৃত পাদুকা যুগল গ্রহণ করিয়া রাঘবকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রাজহস্তীর মস্তকে সেই পাদুকা দ্বয় স্থাপন করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিদায়ে—কৈকেয়ী।

"প্রথম রাম ভেঁটেউ কৈকেয়ী। সরল স্বভাব ভক্তিমতি ভেই।"

তুলসীদাস।

"গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্।
"সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষসেহচিরাৎ॥"

* * * *

স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ॥

বাল্মীকি।

ভরত পরাজয় হইয়া গেল। এখন বিদায়। সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহার অন্যথা কে করিতে পারে? ভগবান ত আপন কর্ম্মে চলিলেন, কিন্তু এই বিদায়? মানুষের দেহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ বিদায়, হৃদয় কি সহ্য করিতে

পারে? তথাপি বিদায় দিতে হয়! তথাপি সবই সহ্য করিতে হয়! বুঝি এই বিদায় অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য—বুঝি এই বিদায় বৈরাগ্য আনয়ন জন্য!

ভগবান্ সনাতনরীতি অনুসারে সকলকে পূজা করিলেন; গুরু, মন্ত্রী, সমবেত প্রজাবর্গ, অনুজদ্বয়—কোথাও পূজা, কোথাও সম্বর্দ্ধনা, কোথাও আদর—সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। রঘুবংশবর্দ্ধন সকলকে বিদায় দিলেন। আহা! ভগবান হিমাচলের ন্যায় সর্ব্বকালেই স্বধর্ম্মে অবস্থিত। মানুষ যতদিন স্বধর্ম্মে স্থিতিলাভ না করিবে ততদিন ইহাদের কিছুতেই কল্যাণ হইবেনা।

আর মাতৃগণ? বাষ্পগৃহীত কণ্ঠা মাতাগণ—গুরু শোকে সকলের কণ্ঠ অবরুদ্ধ—কেহ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না—কেবল তাঁহাদের সজল নয়ন প্রাণের সব ব্যাকুলতা সেখানে রাখিয়া গেল। ভগবান্ও অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারিতেছেননা—সকলকে অভিবাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্ কুটীরে যাইবেন—এমন সময়ে আর এক ব্যাপার ঘটিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে কৈকেয়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কি যেন কি তিনি বলিবেন কিন্তু সকলের সমক্ষে বলা ত হয় না। ভগবান্ অপরাধের ব্যথা বুঝিলেন।

অযোধ্যাধিপতিস্মেহস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা।
য দ্বামাঙ্কে স্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা॥

যাঁহার বামাঙ্কে শ্রীসীতা সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন—মেঘের মধ্যে তড়িল্লতা যেমন সেইরূপ সীতা জড়িত এই অযোধ্যাপতি রাঘব সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে থাকুন।

———

মরণ-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

এই ঘটনার পরেই হউক আর পূর্ব্ব হইতেই হউক মরণের পরে নূতন দেহ ধারণ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা মিশর দেশবাসী পণ্ডিতগণ সমস্বরে মানিয়া লইয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহারা ইহাও মানিয়া লইয়াছিলেন যে জীবের জন্মান্তরে ইহজীবনের শুভাশুভ কর্ম্মাচরণের ফলভোগ করিতে হয়। (১) আমাদের মনে হয় মিশর রাজা সমিসটিক্‌সের সদ্যপ্রসূত শিশুগণের পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই মিশর দেশবাসীগণের জন্মান্তর বিশ্বাস ছিল, আর সেই জন্মান্তর বিশ্বাসের উৎপত্তি স্থান এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। সমিসটিকসের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা এই কঠিন সমস্যার সাময়িক কিঞ্চিৎ চর্চ্চা মাত্র। ইহুদিগণ বহুকাল মিশর দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। সেই জন্যই হউক আর অপর কোন কারণেই হউক তাহারাও জন্মান্তর, এবং ইহজন্মের আচরিত ভালমন্দ কর্ম্মের পুরস্কার দান বা দণ্ডপ্রাপ্তি যে জগতের নিয়ম তাহা বিশ্বাস করিতেন। আর জেন্দা-অভেস্তা, ডেসাটির (Zenda-Avesta, Desatir) আদি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে আরব রাজ্যে যৎকালে মহম্মদ আপন ধর্ম্ম বিস্তার করেন তৎকালে পারশিকগণ কেবলমাত্র মরণের পরে যে পুনর্জন্ম হয় ইহা বিশ্বাস করিতেন এমত নহে, ইহজন্মের কর্ম্মের পুরস্কার ও দণ্ডপ্রাপ্ত যে বিশ্বনিয়ন্তার চিরন্তন

---

(১) "The Egyptians are said to have been the first to recognise the doctrine of a future life, or at least to base the principles of human conduct on such a doctrine."

Rawlinson's History of ancient Egypt.

"with an idea of mitampsychosis they joined an idea of future recompense and punishment."

The Spirit of Islam by Mr. Syed Amir Ali.

বিধান ইহাও বিশ্বাস করিতেন। (২) পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে যে যিশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে চীনদেশের অধিবাসীগণও তাহাদের পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গলোকে বিচরণ করেন এবং সেই স্বর্গলোক হইতে তাহাদের বংশধরগণের মঙ্গল কামনা করেন, এই বিশ্বাস সমভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সেই হেতু তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন।

পণ্ডিতপ্রবর মিলম্যান (Milman) তাঁহার প্রণীত খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন, যে যিশুখ্রীষ্টের উচ্চারিত বাক্য সকল ও কর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে যে সকল পরম্পরাগত প্রবাদ আছে, কালের স্রোতে তাহাতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু পিতামাতার সেবা, পত্নীকে ভালবাসা, পুত্র কন্যাগণের প্রতিপালন, দরিদ্রকে দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান যে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ ইহা যিশু স্বীকার করিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, আর এই এই জগতে ভূমি, গৃহ, অর্থ এমন কি পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বস্ব তাঁহার নামে অর্পণ বুদ্ধিতে ত্যাগ করিতে পারিলে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ ফলপ্রাপ্তি হয় ও তাহার চিরকালের জন্য পুনর্জন্ম নিবৃত্তি বা মুক্তি হয়, ইহা যিশু স্বয়ং বলিতেন। এই দুই কথাই বাইবেলের ম্যাথিওখণ্ডে (S. Mathew) লিখিত আছে। (৩) সেণ্টপল (St Paul)

---

(১) "About the time of the Prophet of Arabia, the Persians had a strong and developed conception of future life. The remains of Zend Avesta which have come down to us expressly reccognise a belief in future rewards and punishments"—The Spirit of Islam.

'If a man does good work in the material body and has a good knowledge and religion he is Hartasp...As soon as he leaves his material body, I (God) take him up to the world of angels, that he may have an interview with the angels and behold me.

"Death and After" by Annie Besant.

(৩) "And every one that hath forsaken houses or brethern,

যিশুর পদানুসরণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে মানব যে প্রকারের বীজ বপন করে সে তদ্রূপ ফল পায়, অর্থাৎ মানবগণের এক জন্মের কর্ম্মানুযায়ী জন্মান্তরে পুরস্কার প্রাপ্তি হয়। (৪) ফলে যিশুর পূর্ব্বোক্ত মত ও সেণ্ট পল প্রভৃতিগণের মত ভারতক্ষেত্রের ঋষিযোগিগণের মতের সহিত এক বলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

যিশুর প্রাদুর্ভাবের বহুকাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চার আরম্ভ হয় ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কিয়দ্দিবস পর হইতেই ঐ চর্চ্চা প্রবল হইতে থাকে। হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্স্লে, কোঁমত, চার্লস ডারউইন, হেনেরি ড্রামণ্ড প্রভৃতি মনস্বিগণ প্রাণপণে পদার্থবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানাদির চর্চ্চা আরম্ভ করেন। আমাদের মনে হয় চার্লস ডারউইন বিবর্ত্তনবাদিগণের মধ্যে একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মতে জগতের বা সৃষ্টির সকলই এক আদি বস্তু হইতে উদ্ভূত। প্রথমে সকলই অপ্রাণীয় বস্তু ছিল, ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তন বশে ঐ সকল অপ্রাণীয় বস্তু নানাপ্রকার রাসায়নিক যোগের ফলে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়াছে, তবে মানব জাতি ও পুচ্ছবিহীন বানর জাতি ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। তাঁহার মতে পুচ্ছবিহীন বা চারিহস্ত বিশিষ্ট বানরজাতি ও মানবজাতির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, এমন কি তিনি মনে করিতেন যে উক্তবিধ বানর জাতি ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া মনুষ্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫) পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল ঔষধ

sisters or father or wife or children or lands for my name's sake shall receive an hundred fold and shall inherit everlasting life." S. Mathew 19—Bible.

---

(৪) "Amid the perplexites of many words we learn that Theosophy teaches what St paul indicates as the divine order of morals by the words—"Whatsoever a man soweth, that shall he also reap."

"How to thought read" by James Coates P. H. D.

(৫) "In 1877 he published the Descent of Man in which he traced back the origin of human species to a quadrumanous animal related to the anthropoid apes."

Political History of England by Sidney Low Vol XII.

মানবের বিশেষ বিশেষ পীড়ায় উপকার হয়, সেই সকল ঔষধই বানর জাতির তদ্রুপ পীড়ার উপকারক। (৬) আবার যেমন কোন মানবের চা, তামাক, কফি ইত্যাদি পানে স্পৃহা প্রবল, সেই মত কোন কোন বানরেরও ঐ সকল দ্রব্য পানের স্পৃহা প্রবল বলিয়া লক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তৎ সমুদায়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অন্তর্গত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace) নামক জনৈক পণ্ডিত ডারউইনের বৈজ্ঞানিক মতের সমালোচনা করিতে বসিয়া সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন যে ডারউইনের মতে মানবের উৎপত্তির আদিকারণ নির্ণয় করা অতি কঠিন। উহা অদৃশ্য দেবতাগণই জ্ঞাত থাকিতে পারেন, কিন্তু ইহা স্থির যে চেষ্টার বলে বা প্রয়াসে (৭) মানব বহুগুণে ভূষিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মা (রায় চৌধুরী)
৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কপিলমুনি ডারউইনের মতের বিরোধী। তিনি বলেন মানবগণ কর্ম্ম দোষে স্থাবরত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। স্মৃতিও ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। যথা:—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈ যাতি স্থাবরতাং নরঃ। স্মৃতি। ১২৩ সূত্র সাংখ্য। কঠোপনিষদেও ঐ মত লিখিত আছে। যথা: "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্। ৫ম বল্লী,—

---

(৬) "Medicines produced the same effect upon them as upon us."

(৭) "The noblest faculties of man are strengthened and perefected by struggle and effort. We find that the Darwinian theory even when carried out to its extreme logical conclusion lends a decided support to a belief in the Spiritual nature of man" * * * * "and for this origin we can only find an adequate cause in the unseen universe of Spirit."

Darwinism as appleid to Man
by Alfred Russel Wallace.
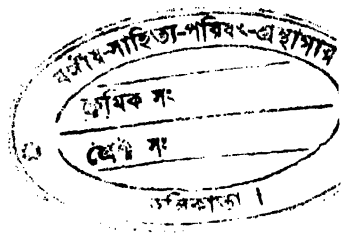
শ্রীশ্রীনাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহ জগতে নামই নিত্য। এই নিত্য নাম যিনি নিত্য নিত্য জপ করিয়া থাকেন তাঁর চিত্তকে আর অনিত্য কাম ক্রোধে বশীভূত করিতে পারে না। নামে যাঁর মন মাতে তিনি প্রাণের ভয় করেন না, যমের ভয় করেন না, শক্রর ভয় করেন না, তিনি ভগবানের নাম করিয়া নির্ব্বাণের উপায় করিয়া লয়েন। আহা! আহা! আমার সেই নামে কবে মতি হবে! দেখুন জলের উপর দিয়ে নৌকা যায়, নৌকা জলেই সংলগ্ন থাকে, কিন্তু নৌকাস্থিত আরোহিগণকে জল স্পর্শ করে না, তদ্রূপ মায়াময় সংসারে যিনি হরি নাম আশ্রয় করেন তাঁহাকে কখনও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না অর্থাৎ তিনি সংসার মায়ায় আবদ্ধ হন না। বল্‌তে পারেন নৌকার আরোহী নৌকাডুবলে জলমগ্ন হ'তে পারে কিন্তু সে সামান্য তরির ডুববার ভয় আছে, হরিনাম তরির ডুববার ভয় নাই; সে তরিতে মানব কর্ণধার, আর এ তরিতে প্রণবরূপী গুরু কর্ণধার। যে তরির এমন কর্ণধার সে তরিকে আশ্রয় করিলে কি কেউ নিমগ্ন হয়? গুরুদত্ত নাম তরিতে, কর্ণধার গুরু, হাল তাতে দীক্ষা, দাঁড় তাতে শিক্ষা, দাঁড়ী তাতে সাধন, বাতাস তাতে অনুরাগ। যিনি ভজন পাল্ তুলে দিয়ে, নাম তরিতে উঠতে পারেন তাঁহাকে আর মায়া জালে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে হয় না, তাই বলি নাম অবলম্বন করাই বিধি।

শাস্ত্রে ব্যবস্থিত যে পাঁচ প্রকার উপাসনা আছে ঐ সমস্ত উপাসনা কলির মনুষ্যের পক্ষে কঠিন, এজন্য কেবল 'নাম' অবলম্বন প্রত্যেক উপাসনাই ব্যবস্থা দিয়াছেন, কলির দুরবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শাস্ত্রকর্ত্তাগণ কেবল হরি নাম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু চিরদিন ধর্ম্মভীরু জাতি হিন্দুর ভিত্তি ধর্ম্মের উপর, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, বিচার, রীতি, নীতি, পদ্ধতি সমস্তই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধুনা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আমাদের এ দুর্গতি—ভারতবর্ষ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। মনুষ্যগণ দিন দিনই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে—কি শোচনীয় পরিণাম, এ আধুনিক শিক্ষামাহাত্ম্য ভিন্ন কিছুই নহে। আধুনিক শিক্ষাই মনুষ্যদিগকে দিন দিন এমনতর বিপথে লইয়া যাইতেছে। এ পতন হইতে মনুষ্যের উদ্ধারের উপায়

"নামধর্ম্ম" ভিন্ন আর কিছুতেই হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এক মাত্র নামোচ্ছ্বাস ব্যতীত এ পঙ্কিলময় পাপরাশি বিধৌত হইবার আর কোন উপায়ই দেখি না। ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, শাস্ত্র বিধির বিষম অবমাননা করা আমি শ্রেয়ঃ মনে করি না। এক্ষণে কেবল এই নির্ণয় করা উচিত যে, এই সময়ের মধ্যেও মনুষ্যের গতি মুক্তির উপায় কিছু আছে কি না? কিরূপে মানুষের মনে ধর্ম্মবীজ পুনরোপন করা যায়? একমাত্র নাম ধর্ম্মের প্রচারে সকল বিশৃঙ্খলারই নিবারণ হইবে। ভারত শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। মানুষ ধর্ম্মকম্মে মতিমান্ হয় ইহা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। সর্ব্বকালেই এই দিকে যত্ন করা হইয়াছে। সৃষ্টির নিয়মই এই। সর্ব্বলোক হিতকর অনুষ্ঠানই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।

বর্ত্তমান দৈন্যের কারণ বোধ হয় সুধীজনসমাজে কেহই অবিদিত নহেন। বিকৃত শিক্ষা, দীক্ষা, সর্ব্বোপরি **ধর্ম্মলোপ**। আজ ভারতের প্রতি ঘরে হাহাকার, রোগ, শোক, দারিদ্রের নিষ্পেষণ কেন? ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষার জন্য। নানারূপ পাপ, তাপ, অশান্তিতে ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আমরা হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলি না, হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করি না বা হিন্দুশাস্ত্র বুঝি না এবং ধর্ম্মরক্ষার সহজ প্রণালী জানি না। হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আচার ব্যবহার ব্যতীত কিছুতেই ভারতের উদ্ধার হইবে না। ধর্ম্ম শিক্ষা একে একে সব লোপ পাইতেছে। আজ আমরা জাতি গঠন লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু জাতি গঠন হইবে কিসে? সমস্ত জাতি আজ অশিক্ষায় মূক ও অন্ধ। সর্ব্বাগ্রে জনসাধারণকে চক্ষুষ্মান ও মানুষ করিতে হইবে—বর্ত্তমান দুরবস্থার স্পষ্ট ধারণা জাগাইতে হইবে নতুবা জাতিগঠন হইতে পারে না। জাতি গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মের দ্বারস্থ হইতে হইবে। নাম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠানে জাতি গঠিত হইবে ও লক্ষ্যের সন্ধান মিলিবে। ধর্ম্মের পথই প্রকৃত পথ, একমাত্র ধর্ম্মই জাতিকে এক সূত্রে বন্ধন করে অন্যথা অসম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব মানবকে শান্তির পথ দেখাইয়াছেন। আহা এমন সুন্দর ও সহজ পথ আর নাই। আমরা দুর্ব্বল মূর্খ জীব—নাম জপ করিলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিতাই ও নিমাই প্রদত্ত নাম যথা:—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

এই দ্বাত্রিংশদক্ষরময় ষোড়শ নামই কলির প্রকৃত পন্থা।—নামই নিখিল জীবের

একমাত্র গতি। নাম ভিন্ন জীবের দুঃখ দূর হইতে পারে না। হরি নামের অর্থ কি জানেন? যে নামে উদ্ধার হওয়া যায়—পাপ হরণ হয় তাহাই হরিনাম। যিনি যে নামে বিশ্বাসী, তার তাই হরিনাম।—নাম নামী অভেদ। নামের সঙ্গে নামীকে বুঝিতে চেষ্টা করা অতীব প্রয়োজনীয়। সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে বলিয়াছেন, কলিতে নাম জপ একমাত্র উপায়।

'নামের' অমৃত ফল, নামে মোক্ষ—একথা মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবেন। বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, উপনিষদ সকল ধর্ম্মগ্রন্থেও একথার ভূয়োভূয়ঃ প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ প্রকটিত আছে। আমরা নাম মহিমা, প্রমাণ, উপদেশ বাণী—মানি আর না মানি কিন্তু শৈশব কাল হইতেই শ্রুত হইয়া আছি। হিন্দুধর্ম্মের কি অপার মহিমা, কি অভাবনীয় আকর্ষণীশক্তি, আমাদের শোণিত শুক্রের সংযোগ-পোষণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রতত্ত্ব ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় প্রবেশিত হয় এবং তাহা সতত পরিস্ফুট হইতে চেষ্টিত। কিন্তু কি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কালমাহাত্ম্য, স্ফুরণের ইচ্ছামাত্রই বিপর্য্যয় হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, কোথায় আমরা দিনের দিন সাগ্রহে সাধুপথে অগ্রসর হইব না বর্ত্তমান সমাজের দোষে, বিপথেই চালিত হইতেছি। আজকাল আমরা এ সকল তো মানিই না—জানিও না; যাহা কিছু জানি তাও স্মরণ রাখি না। অধিক কি পিতৃপুরুষগণ যে সকল তত্ত্ব জানাইয়া গিয়াছেন, যত্ন করিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন আজকাল তাহাও আমাদের কাছে—"উপকথা"! এই ধরুন, ধর্ম্মকথা, সৎকথা! ইহার উত্থাপন মাত্রেই নব্য বাবুরা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন—তাহার পর হয় তো বলিবেন "ড্যামধর্ম্ম! ড্যামসাধু! আপনি ঠিক হলেই সব ঠিক। শৌণ্ডিকালয়ে বেশ্যালয়ে থাকিয়াও ঈশ্বরাধনা হইতে পারে।" এই ধর্ম্মকথা পাড়িলে তাঁহারা তো বিদ্রূপ করিয়াই উড়াইয়া দিবেন! আপনাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যেন আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের নামটি পড়িয়াই ভ্রান্তিবশে ড্যাম গহ্বরে নিক্ষেপ না করেন—অন্ততঃ একবার পাঠ করেন তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক হইবে।

জগৎকে একমাত্র 'নাম' উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু কাহার নাম ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হয়। এক নামে অনেক বস্তু বুঝায়। হরি শব্দে চন্দ্র, সূর্য্য, সিংহ, অশ্ব, বানর এসমস্ত বুঝায় এবং পাপহারী ভগবানকেও বুঝায়। এজন্য নামের সঙ্গে সেই নামের বাচ্যকে সুন্দররূপে বুঝা আবশ্যক। বিশ্বাস

সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দৃঢ় বিশ্বাস করিলে আর কোন ভয় থাকে না। ভগবান আছেন বা এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন এই বিশ্বাস যাঁহার আছে, তাঁহাকে কেবল নাম উপদেশ দিলেই হয়। অন্য উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সকলেই মুখে বলেন ভগবান আছেন; ইহা বিশ্বাস নহে। কারণ একটু বিপদ আপদ হইলেই আর বিশ্বাস ভগবানের প্রতি রাখিতে পারেন না—লোপ পাইয়া যায়। ইহাকে বিশ্বাস বলে না—এরূপে নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শিশু যেরূপ অন্য কিছুই জানে না কেবল রোদন করে, সেই শিশুর ন্যায় অন্তরের অবস্থা হইলেই এক নামেই নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাম যত অধিক করিবেন ততই শীঘ্র উপকার পাইবেন। এক হরি নামে যে ফল হয় তাহা আর কিছুতেই হয় না। তৃণের মত নীচ হ'য়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হ'য়ে নিজ অভিমান ত্যাগ ক'রে নাম করিলে নামের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাই সাবধান—নাম ক'রে পাপ করিতে নাই। নাম করে, পাপ করে, তাহাদিগকে ভয়ানক অপরাধী বলেছেন। নাম অপরাধের মত পাপ আর নাই। কেবল ভগবৎ নামই সমস্ত ক্রিয়ার মূল। কোন বস্তু দ্বারা কিছু হয় না।

"কি আছেরে নাম ভিন্ন।
দেখ পরিণামে এই ধরাধামে নাম ভিন্ন কিছু থাকেনা চিহ্ন॥
কর্ণমূলে গুরু নামে দেন দীক্ষা, দ্বারে দ্বারে দুঃখী করে নামে ভিক্ষা,
নামেতেই শিক্ষা, নামেতেই পরীক্ষা,
হরিনামে ভব বন্ধন ছিন্ন॥
বস্তু বসুমতী পশু কিম্বা পাখী,
নাম আছে ব'লেই নামে ডাকাডাকি;
নামে মতি রাখি, কালে দাও ফাঁকি,
এভব সাগর হবে উত্তীর্ণ॥
ইষ্ট কৃষ্ণ নাম মুখে যারা বলে,
তারা কিরে যায় কালের কবলে;
ধর্ম্মদাস বলে, কৃষ্ণনাম-বলে,
ভব-রোগে কেউ হবে না শীর্ণ॥"

তাই বলি ভাই জয়গুরু বলে নাম রসে ঝাঁপ দাও, একটানে, একপ্রাণে ভেসে যাও। আকুল হ'য়ো না কা'রো পানে ফিরে চেওনা—দেখিবে অকুলকাণ্ডারী অকুলে কূল দিবেন। আহা! সেই পাষাণ গলান নাম গান

কর, নাম পাথারে ঝাঁপ দিয়ে অতুল প্রেমরত্ন লাভ কর; এই নাম সাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় যাবে জান ভাই? যেখানে মায়া নাই, মোহ নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, কুটিলতা নাই, যেখানে কেবল শান্তিময় ও প্রেমময় অসীম শান্তি ও প্রেমমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে জীবগণ প্রাণের জ্বালা ভুলে, প্রেমের খেলা খেল্‌ছে সেইখানে যাবে। যাও ভাই একপ্রাণে নামসাগরে ভেসে যাও।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ করাই পরম সাধন। সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই একথার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। সমস্ত দিন নাম করা যাঁহার অভ্যাস হয় তাঁহার কর্ম্ম আপনা হইতে ছুটিয়া যায়। নাম না করিয়া বসিয়া থাকিলে হয় পাপ চিন্তা না হয় পরনিন্দা, কি বৃথা চিন্তা অথবা বিবাদে দিন কাটিবে। মাদক বস্তু দ্বারা ক্রিয়া করা নিষেধ। নামই শ্রেষ্ঠ মাদক। ইষ্টনাম করিতে করিতে যে নেশা হয়, তাহার কাছে ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, সুরা ইত্যাদি যতপ্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা ছোটে না; সর্ব্বদা স্থায়ী। কলিকালে নাম করিতে পাপী তাপী আচণ্ডাল সকলেই সমান অধিকারী। নাম ভিন্ন কলিকালে জীবের অন্যগতি নাই–নাই—নাই। নামের ব'লেই তোমাকে লাভ করা যায়। নামেতেই সব হয়। এত নামের মহিমা–কিন্তু দয়াল! আমার এমনি কর্ম্মফল—নামে রুচি হইল না। আমরা নানা কার্য্যে সময় দিতে পারি কিন্তু যাহাতে মন প্রাণ শীতল হইবে, পাপ তাপ দূর হইবে সেই নাম গানের সময় করিতে পারি না। প্রভু! তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যেন নামে শ্রদ্ধা—রুচি—বিশ্বাস রাখিয়া দিবানিশি নাম জপ করিতে পারি—এই কৃপা কর।

ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, "**শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর** তাহা হইলেই সব হইবে।" শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তা বলপূর্ব্বক কেহই নিবারণ কর্‌তে পারে না। কত ইন্দ্র চন্দ্র এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়াছেন। কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হ'য়ে নাম করিলেও সহজেই প্রবৃত্তি দমন হয়। বাহ্যিক উপায় কিছু নয়, **নাম** করিতে করিতে আপনিই সমস্ত চ'লে যাবে। প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। ভগবৎ নামের গুণে সহজে মুক্তি হয়। কিন্তু বিঘ্ন এই যে, নামে রুচি হয় না। দুঃখ কষ্ট সমস্ত চারিদিকে, অগ্নিকুণ্ডে পড়ে নাম করিতে হবে। প্রহ্লাদ চরিত্র ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

আহারের বস্তুতে বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস, হস্তীপদতলে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ, চারিদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত; **সহায় কেবল হরিনাম!** অবশেষে প্রহ্লাদেরই জয় হলো। নাম করিতে থাকুন চোখ খুলিয়া যাইবে তখন সকল বুঝিবেন। একমাত্র নাম জপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ সংশয় নষ্ট হবে। ভগবানকে লাভ করিতে **'নাম'** অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। সর্ব্বদা বিচার করিয়া চলিতে হবে। যাহাতে অভিমান হয় এমন কিছুই করিবেন না। ধর্ম্মাভিমান বড় ভয়ানক। যত রকম অপরাধ আছে—তার পার আছে কিন্তু ধর্ম্মাভিমানের পার নাই। ধর্ম্মাভিমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। আমরও করযোড়ে আপনাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া কেবল নাম করুন। ইহা শাস্ত্রেরই উপদেশ। ইহা হইতে সহজ উপায় আর কিছু দেখি না।

দৈনন্দিন ব্যাপারে নাম কালীন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখিবেন।ঃ—১। সর্ব্বদা সৎ চিন্তা করিবেন। ২। অসৎ সংসর্গ যাহাতে না হয় তাহার সতত চেষ্টা করিবেন। ৩। কাহারও সহিত তর্ক করিবেন না বা বেশী কথা বলিবেন না। ৪। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি করিবেন না। পরকে কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিবেন না। ৫। নাম ভুলিবেন না। ৬। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবেন। ৭। কায় মন ও বাক্য দ্বারা পরপোকার চেষ্টা করিবেন। ৮। কাহারও পাপের বিষয় মনে করিবেন না নিজের দোষ সর্ব্বদা দেখিবেন। ইহাতে মনে দীনতা আসিবে ও শান্তি পাইবেন। ৯। অসৎ চিন্তা বিষবৎ ত্যাজ্য। ১০। নাম করিবার সময় প্রাণের আকুলতাকে সঙ্গী করিবেন। ১১। সর্ব্বজীবে দয়া ও স্নেহ করিবেন। ১২। স্বার্থই মৃত্যু—সত্যই জীবন। ১৩। যাহা আপনার পীড়া দেয় তাহা অন্যের প্রতি ব্যবহার করিবেন না। ১৪। নির্জ্জন বাস ভালবাসিবেন। ১৫। মহত্ত্বের প্রধান লক্ষণ **অকপটতা** মুখে বাহিরে এক। যদি কোন পাঠক পাঠিকা নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের এতদূর পর্য্যন্ত পাঠ করেন তাঁহার সহিষ্ণুতাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের নানা প্রকার দোষ ত্রুটী বিচ্যুতি প্রভৃতির জন্য সবিনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া এই প্রবন্ধের এইস্থলে উপসংহার করিতেছি। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমলে বার বার প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্ব্বে আসুন পাঠক আমরা মিলিত-কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া একবার বলি :—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥"

এই নাম ধ্বনিতে ত্রিতাপ তাপিত জগজনের হৃদয়ে শান্তি বারি বর্ষিত হউক। ওঁ গুরু। ইতি—

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন হীন—
শ্রীশিশির কুমার বক্‌সী।
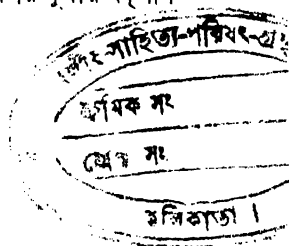
শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আমাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে E. I. R. এর বড় ট্রেন লাইনের ওধারে পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড দেওগিরি পাহাড়। এখন সকলে চলিত কথায় পাহাড়টীকে দিগিরি বা দিগিরিয়া পাহাড় বলিয়া থাকে। পাহাড়টী আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বৈকালে যখন ওই পাহাড়ের উপর আকাশের চতুর্দ্দিক বহুদূর পর্য্যন্ত রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া প্রকাণ্ড স্বর্ণথালার মত সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন তখন ওদিকের শোভা অতিশয় মনোরম হয়। উহার বামধারে বহুদূরে অবস্থিত পরেশনাথ পাহাড় আকাশের গায়ে অস্পষ্ট ধূসর বর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে গগনগাত্রে মিশিয়া যাইবার উপক্রম হয় ও তাহার উপরিভাগে চতুর্দ্দিক বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড মেঘের উপর লোহিত বর্ণ আলোকের অপরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল খেলা দেখিতে সাতিশয় চমৎকার বোধ হয়। প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর ও নয়ন তৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বৈকালে পশ্চিম দিকে অনেক সময় আমাদের বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা খুব প্রবল হয় বটে কিন্তু ওধারটা বড় নির্জ্জন, মনুষ্য সমাগম শূন্য বলিয়া বৈকাল বেলা ওদিকটা বিশেষ আমাদের যাওয়া ঘটে না। তাহাতে আবার শীতকালে জসিডিতে বিলক্ষণ ব্যাঘ্রভীতি থাকায় বৈকালে পশ্চিম দিকে বেড়াইতে যাইতে সাহসও হয় না।

একদিন প্রাতে আমরা স্বেচ্ছামত ভ্রমণে বাহির হইয়া ওই পশ্চিম দিকে

বেড়াইতে বেড়াইতে গিয়া E. I. R. এর ট্রেণ লাইনের মাইল খানেক দূরে যে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে তাহাতে গিয়া উঠিলাম। প্রতি বৎসরই আমরা এ পাহাড়ে বেড়াইতে যাই কিন্তু এবার ওই পাহাড়টীতে উঠিয়া দেখি পাহাড়ের মাথার একদিকে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থানে একখানি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। গৃহখানি শ্বেতবর্ণ চূণকাম করা দেওয়ালের উপর লোহিত বর্ণের খোলার আচ্ছাদন দেওয়া, সম্প্রতি শেষ করিয়া তখন গৃহখানির চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া যে বারাণ্ডা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সিমেণ্ট করিতে লাগিয়াছে। এরূপ নির্জ্জন মনুষ্য সমাগম শূন্য স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে দেখিয়া আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেস্থানে দেখিতে গেলাম ও উহার কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম এক পশ্চিম দেশীয় সাধু আসিয়া এস্থানে বাস করিবেন বলিয়া এই গৃহখানি কয়েক জন ভক্ত মাড়োয়ারি ভদ্রলোক মিলিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন। এরূপ জনশূন্য স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্রে একাকী বাস কোনও সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে একেবারে অসম্ভব, তাহা হইলে এই সাধু নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অবস্থার হইবেন মনে করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কবে এইস্থানে সাধু বাস করিতে আসিবেন জিজ্ঞাসা করায় লোকগুলি তাহা ঠিক বলিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে পুনরায় আর একদিন আমরা ওই সাধুবাবার সন্দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আমাদের বাড়ী হইতে অল্প দূরে লক্ষ্মীনারায়ণ সরাবের বাগানের কোনায় অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সেই সাধুবাবার ঘরখানির দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে পৌছিয়া শুনিলাম স ধু সেখানে হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া প্রথমে কিছু হতাশ হইলাম বটে কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া বড় ট্রেণ লাইনের মাইল খানেক দূরে পশ্চিমে যে ছোট্ট পাহাড়টীর উপর এক পশ্চিম দেশীয় সাধু বাস করিবেন বলিয়া গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে দেখিয়া আসিয়াছিলাম সেই কথা মনে পড়িল। হয়ত বা ইনিই সেখানে গিয়াছেন মনে অনুমান করিয়া পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত সাধুর উদ্দেশ্যে সেই দিকে চলিলাম। গিয়া পাহাড়ে উঠিয়া দেখি আমাদের অনুমান বাস্তবিকই সত্য। ইনিই সেই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সাধু এই স্থানে আসিয়াছেন। সাধুবাবা আমাদের দেখিয়া পূর্ব্বদিনের মত তেমনি প্রসন্ন মুখে মৃদু হাস্যের সহিত বসিতে বলিলেন। আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থানে গিয়া সেস্থানে তাঁহার দর্শন না পাওয়ায় এখানে আসিয়াছি তাহা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি

বলিলেন এই পূর্ণিমার দিন এ পাহাড়ের নূতন গৃহে তিনি আসিয়াছেন। লোকালয়ের মধ্যে বাস করিতে ইনি মোটেই ইচ্ছুক নন, এই স্থানটীই তাঁহার মনোনীত, কেবল এস্থানে এ গৃহখানি প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া বাধ্য হইয়া কিছুদিন মাত্র ওই লোকালায়ের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। হিন্দুস্থানীতে আমরা কথা বলিতে অসুবিধা বোধ করিতেছি বুঝিতে পারিয়া সাধুবাবা বলিলেন যে আমরা বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিলেও তিনি বুঝিতে পারিবেন। যদিও বাঙ্গলা ভাষায় ইনি নিজে কথা বলিতে পারেন না কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বোধ হয় পড়িতে পারেন। কারণ পরে একদিন আমরা তাঁহার নিকট গেলে সাধুবাবা উঠিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া সেখান হইতে "মহাত্মা তুলসী দাস" নামক একখানি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত পুস্তক আমাদের পড়িবার জন্য আনিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি সাহিত্য সম্রাট শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ সুলেখক শ্রীশচীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত। তিনিও বোধ হয় এই সাধু হংস মহারাজের একজন শিষ্য। তিনি তাঁহার প্রণীত এই বইখানি সাধুবাবাকে দিয়াছিলেন। আমরা বইখানি পড়িয়া দেখিলাম উহার বিষয়ও যেমন চমৎকার, ভাষাও তেমনি সুন্দর। আর বই খানি সম্পূর্ণ পাঠ করিলে উহার মধ্যেকার ভক্তিপূর্ণ গানগুলিতেও উহার ভাবে বইখানি যে কোন ভক্ত ব্যক্তির লেখা তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। "মহাত্মা তুলসী দাস" বইখানি বাড়ী আসিয়া সমস্ত পড়িয়া সাধুবাবার নিকট পরে একদিন গিয়া আমরা উহার প্রশংসা করায় সাধুবাবা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সে যাক, আমরা যখন সেদিন পাহাড়ে গিয়াছিলাম সেই সময় সাধুবাবা পৌষ মাসের সেই অতি ভয়ানক কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে সামান্য পাতলা একটী গেরুয়া রংকরা আলখেল্লা মাত্র গায়ে দিয়া বারাণ্ডায় অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে দেওয়া প্রায় সিক্ত সিমেণ্টের উপর বসিয়া সানন্দচিত্তে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত সেদিন যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম এই যে তাঁহাদের অন্য কর্ম্ম নাই, সর্ব্বক্ষণ ভগবানের স্মরণই কেবল তাঁহাদের একমাত্র কর্ম্ম। তাই জপ ধ্যান উপাসনা ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত হইলেও সব সময় একরূপ ভাবে কাটিলে একঘেয়ে মত লাগিতে পারে বলিয়া সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য কখনো ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, কখনো বা ভগবৎ স্তব স্তুতি পাঠ কিম্বা আবৃত্তিতে সময় অতিবাহিত করেন। এতদ্ভিন্ন এই সাধুবাবা লোক হিতার্থে ইহাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত ঔষধাদিও বিতরণ করেন দেখিয়াছি। সাধুবাবার

ঔষধে স্থানীয় অনেক ব্যক্তির বহু উপকার সাধিত হয়। ইনি কেবল লোকের উপকারার্থেই নিষ্কাম ভাবে ঔষধাদি প্রদান করেন, কেহ ওঁকে অর্থাদি দিতে গেলে তাহা গ্রহণ করেন না। কেহ অর্থ লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে মৃদু হাসিয়া বলেন এই অর্থ লোভে কোন দুষ্ট লোক আসিয়া কি এই নির্জ্জন পাহাড়ে আমাকে খুন করিবে? কাজেই তখন বাধ্য হইয়া নীরব হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু কেহ যদি ভক্তিপূর্ব্বক দুগ্ধ, ফল কিম্বা অন্য কোন আহার্য্য সামগ্রী দেয়, তবে তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ইনি সদানন্দ পুরুষ, সর্ব্বসময়ই বদনে প্রসন্ন মৃদু হাস্য লাগিয়াই রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দিন সাধুবাবা আমাদের নিকট রাণী মদালসার গল্প বলিয়া শোনাইয়াছিলেন। গল্পটী এইরূপ—

রাণী মদালসা অতিশয় ঈশ্বর পরায়ণা ভক্তিমতি রমণী ছিলেন। রাণী তাঁহার পুত্রদের অতি শৈশবাবস্থায় যেমন অতি স্নেহের সহিত লালন পালন করিতেন তেমনি তাহাদের খুব সুন্দর সুন্দর বৈরাগ্য পূর্ণ সৎউপদেশ সকল দান করিতেন। এমন কি অতি শিশুকালে যখন তাহাদের কোলে লইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া ঘুম পাড়াইতেন তখনও যে সকল শ্লোক বলিতেন তাহাও অতি চমৎকার তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। পুত্রগণ বড় হইয়া উঠিলে জননীর সৎশিক্ষা ও সৎউপদেশের গুণে মনে তীব্র বৈরাগ্য সঞ্চার হওয়ায় গৃহত্যাগ করিয়া পরম ধনের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া পড়িত। কয়েকটী পুত্র এইরূপ সাধু হইয়া গৃহত্যাগী হওয়ার পর রাণীর ক্রোড়ে যখন আর একটী ক্ষুদ্র শিশুর আগমন হইল তখন রাজা রাণীকে মিনতি করিয়া বলিলেন এপুত্র আমার রাজসিংহাসনের উত্তরাধীকারী হইবে, ইহাকে তুমি কোনরূপে বৈরাগ্যপূর্ণ তত্ত্ব উপদেশাবলী শুনাইতে পারিবে না। রাজার এবম্প্রকার অনুরোধ বাক্যে রাণী সম্মত হইলেন। এই রাজপুত্রের নাম রাখা হইল অলর্ক। এই পুত্রটী ক্রমে ক্রমে বড় হইলে অতি ভক্তিমতি রাণী মদালসা তাঁহার পুত্রের হস্তে একখানি কবচ দিয়া বলিলেন, হে পুত্র, এই কবচের মধ্যে দুঃখ নিবারণের মহৌষধি রহিল। যদি কোন দিন সংসারের দুঃখ কষ্টে অভিভূত হইয়া দিক্ নির্ণয়ে অসমর্থ হও, তবে মাতৃদত্ত এই কবচখানি খুলিয়া দেখিও, তাহা হইলে দুঃখ নিবৃত্তির ও চির শান্তির উপায় ইহার মধ্যে পাইবে। রাজা এই পুত্রকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ নানাবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন

অবশেষে যথাকালে বৃদ্ধ বয়সে রাজা ও রাণী দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন রাজপুত্র অলর্ক সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে কিন্তু সংসারের চিরনিয়মানুসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে কাহারও অধিকদিন কাটে না। রাজা অলর্কেরও ক্রমে ক্রমে বহু আপদ বিপদ অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় তিনি মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই দুঃখের সংস্পর্শে আসায় রাজার মনে ক্রমে ক্রমে সংসার সুখের অনিত্যতা উপলব্ধি হওয়ায় হৃদয়ে ধীরে ধীরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে লাগিল। এমন সময় রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজার যে জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা একবার রাজ্যের ও কে বর্ত্তমান সময় রাজসিংহাসন অরোহণ করিয়াছেন তাহার সন্ধান লইবার জন্য সেই রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন সংসারের বিবিধ যন্ত্রণায় অতিশয় ব্যতিব্যস্ত ও এই দুঃখ কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। রাজার অবস্থা দেখিয়া ও মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রাজার জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণ বলিলেন, "এ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য মা কি কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই?" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের এইরূপ বাক্যে অলর্কের সেই মাতৃদত্ত কবচের কথা স্মরণ হইল ও উহা খুলিয়া মায়ের লেখা যে সৎউপদেশগুলি পাঠ করিলেন তাহাতে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সৎসঙ্গ ও সংউপদেশেরগুণে হৃদয়ে চৈতন্যের উন্মেষ হওয়ায় অন্তঃকরণে সত্য জ্ঞান লাভের প্রবল বাসনা জাগরুক হইল। অবশেষে তিনিও নিত্য বস্তুর অনুসন্ধানে অনিত্য মায়িক তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই কাহিনীটী সমাপ্ত করিয়া সাধুবাবা রাণী মদালসার তৈয়ারি একটী শ্লোক অতি মধুর সুরে বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শ্লোকটী এইরূপ—

"শুদ্ধোঽহসি বুদ্ধোঽহসি নিরঞ্জনোঽহসি
সংসার মায়া পরিবর্জ্জিতোঽহসি
সংসার স্বপ্নং ত্যজ মোহ নিদ্রাং
মদালসা বাক্যমুবাচ পুত্রং।"

অর্থাৎ মদালসা পুত্রদের বলিতেছেন, হে পুত্র, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন সদৃশ। সংসার মায়া তুমি বর্জ্জন কর। সংসাররূপ স্বপ্ন তুমি পরিত্যাগ করিয়া মোহ

নিদ্রা হইতে উত্থিত হও। হে পুত্র, তুমি মায়া মোহাদি সম্পূর্ণরূপ পরিবর্জ্জন কর।

আর একদিন সাধুবাবার নিকট ওই পাহাড়ে যাওয়ায় তিনি আমাদের আর একটী গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সে গল্পটী এইরূপ—

এক রাজা তাঁহার নিজ রাজত্বে বাস করিতেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বিবিধ অস্ত্রাদি ছিল। এমন কি যে পালঙ্কে তিনি রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন তাহার নিম্নেও বহু প্রকার অস্ত্রাদি সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। একদা সেই রাজা পালঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র ও তাহার ৫টা শাবক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। রাজার চতুর্দ্দিকে অত যে সব অস্ত্রাদি সজ্জিত আছে কাজের সময় রাজা সে সকল বিস্মৃত হইয়া গেলেন ও শঙ্কিত চিত্তে পলাইবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যতই তিনি দৌড়াইতে লাগিলেন ব্যাঘ্রও তাহার শাবকগুলিও ততই রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে রাজা তাঁহার সম্মুখে একটী বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়ায় তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বিপদের অন্ত হইল না। রাজার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাৎ হওয়ায় বৃক্ষের উপরিভাগে ভয়ানক একটী বিষধর কালসর্প দৃষ্টি গোচর হইল। হঠাৎ তাঁহার বৃক্ষের নিম্নদিকে দৃষ্টিপাৎ হওয়ায় তিনি দেখিতে পাইলেন সেখানে একটী প্রকাণ্ড সুগভীর কূপ। আরও তিনি দেখিলেন যে যে বৃক্ষ শাখাটী তিনি আশ্রয় করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তাহার মূলদেশ একটী কৃষ্ণবর্ণ মূষিক ও একটী শ্বেতবর্ণ মূষিক নিয়ত কর্ত্তন করিতেছে। দুইটী মূষিকে মিলিয়া কর্ত্তন করিতে করিতে যখন শাখার মূলদেশ সম্পূর্ণ কর্ত্তন শেষ হইবে তখন নিম্নের সেই গভীর কূপটীর মধ্যে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার বৃক্ষোপরি উঠাও রাজার পক্ষে অসম্ভব, কারণ উপর দিকে একটী বৃহৎ কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আবার ওই বৃক্ষ হইতে নামিয়া পলাইতে গেলেও ব্যাঘ্রগণদ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। যখন রাজা চতুর্দ্দিকে শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত, উদ্ধারের আর কোন উপায় আছে কিনা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দর্শন করিতেছেন ও উপায় অন্বেষণ জন্য পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধ মুখ হইতেছেন তখন ওই বৃক্ষের বহু উর্দ্ধে যে একখানি মৌচাক ছিল ও তাহার কোনে একটী ছিদ্র থাকায় তাহা হইতে গড়াইয়া এক ফোঁটা মধু আসিয়া রাজার মুখ বিবরে পড়িল। ওই এক ফোঁটা

মধু রাজার মুখে পড়ায় উহা রাজার নিকট বড় মিষ্ট বোধ হইল। পুনরায় তিনি ওই মধুর প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আবার বহু বিলম্বে এক ফোঁটা মধু আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িল। ক্ষণিক মধুর মিষ্টতার লোভে কত যে শত্রু চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে তাহা রাজা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এদিকে কিন্তু শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মূষিকদ্বয় অনবরত বৃক্ষ শাখা কর্ত্তন করিতেছিল, যেই শাখাটীর সম্পূর্ণ কর্ত্তন শেষ হইয়া গেল আর রাজা নীচের সেই ভীষণ কূপে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেলেন। পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও তাহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। যাহারা নিকটে ছিল তাহারা রাজার চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা তাহাদের নিকট এই ভয়াবহ স্বপ্ন বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন'।

সাধুবাবা এই গল্প শুনাইয়া তাহার অর্থ এইরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে সংসারী ব্যক্তিদেরও ঠিক এইরূপ অবস্থা। যেরূপ বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য নানারূপ অস্ত্র শস্ত্রাদি আছে সেইরূপ এই দেহের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুগণকে দমন করিবার জন্য ও বিবিধ উপায় আছে, কিন্তু সংসারী জীবগণ সে উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবল অলসভাবে জড়ের মত নিদ্রামগ্ন থাকিতেই ভালবাসে। নিদ্রিত না হইয়া চেতন থাকিলে যেরূপ অস্ত্রাদিদ্বারা বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব পর হয় তেমনি অজ্ঞানতাদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীবগণও সমস্ত উপায় বিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছে। এদিকে সংসাররূপ যে বৃক্ষশাখাটী যে আশ্রয় করিয়া আছে তাহারও মূলদেশ শ্বেতবর্ণও কৃষ্ণবর্ণরূপী মূষিকদ্বয় নিয়ত কর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ এক একটী যে দিন রাত্রি গত হইতেছে তাহাতে জীবের পরমায়ু প্রত্যহই ক্ষয় হইতেছে। জীবগণ সংসার হইতে যে কখনও ক্বচিৎ সামান্য সুখ বহু বিলম্বে পাইতেছে তাহারই প্রত্যাশায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। কালসর্পরূপী মৃত্যু যে শিয়রে নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে ও চতুর্দ্দিকে যে সে বহু শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত, শ্বেত কৃষ্ণরূপী মূষিক সদৃশ্য দিন রাত্রিগুলি যে নির্দ্দিষ্ট দিনের সংখ্যা প্রত্যহ কমাইয়া দিতেছে, সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। গুণা দিন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইয়া গেলে সকল প্রাণীরই মৃত্যুরূপ গভীর কূপে পতন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য বহু বিলম্বে বিষয়ানন্দরূপ এক ফোঁটা আবিল মধুর লোভে সংসার বা আত্মীয় স্বজন হইতে কখনও কদাচিৎ ক্ষণিক সুখের প্রত্যাশায় শেষের সে দিনের জন্য প্রস্তুত না থাকা মূর্খের কার্য্য। পূর্ব্ব হইতে উপায় চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলে সংসারের বিবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগান্তে মৃত্যুরূপ গভীর কূপে পতন ও পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়ারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনিবার্য্য।

রাজবাটীর জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা

রাজসাহী।

ক্রমশঃ

ক্ষেপারঝুলি পরশমণি।

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণরত্ন)

(৬)

পরশমণি সাধ করে কি তোমায় দুষ্ট বলি ?

কেন দুষ্টামির কি দেখ্‌লি ?

সবটাই দুষ্টামি কত রকম বিরকমের তরঙ্গ তুল্‌ছ দেখতে দেখতে যেন কেমন হয়ে যাই যেন এ তরঙ্গের মধ্যে আমাকে হারিয়ে ফেলি ; কি দুরত্যয়া তোমার মায়া, বলিহারি যাই।

তুই অভিনয়কে সত্য মনে করে যদি কাঁদিস্ হাসিস্ সে দোষ কি আমার ? তুই যদি স্বপ্নে রাজা হ'য়ে পাগলের মত নৃত্য করিস সে দোষ কার ?

তোমার তুমি অভিনয় দেখাও কেন তুমি স্বপ্নকে সত্য বলে মনে করাও কেন ? তুমি কি ইচ্ছা কর্‌লে আজিই এ অভিনয় শেষ করে দিতে পার না ? তুমি কি স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে দিতে পার না, তুমি দেবে না মাঝে মাঝে এসে মজা দেখবে।

কেন আমি ত বলছি "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" এখানে নানা কিছু নাই এক আমি আছি, সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-তারা আমি, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম আমি, বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ আমি, নরনারী পাপী-পুণ্যবান্ আমি, সাধু অসাধু আমি, সুখ দুঃখ পাপতাপ রোগশোক আমি, হাসি কান্না তিরস্কার পুরস্কার আমি, উত্তম আলস্য সুন্দর কুৎসিৎ সব আমি, অভাব অভিযোগ স্বাচ্ছল্য অনাটন সব আমি, সব আমি, দেখ দেখি কেমন রূপ আমার।

সুন্দর সুন্দর বড় সুন্দর তুমি, এ এক অভিনব রূপ তোমার, বড় সুন্দর বড় সুন্দর, দেখ যেন আমার বলবার কথা সব ফুরিয়ে যাচ্ছে, কাজ আর নাই ; তোমার পরশের সঙ্গে সঙ্গে যেন সব ফাঁক হয়ে যায় কিছু যেন করবার থাকে না ;

কি এক রকম হয়ে যাই। জপ আর করতে পারছি না তুমি সবকেড়ে নিচ্ছে কেন? দেখ তখন একটা প্রাণপোরা আনন্দ থাকত সে আনন্দ আর পাচ্ছি না কেন? লীলাচিন্তায় তেমন আনন্দ পাই না, যেন সব সরে যাচ্ছে। চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করছে কিছু নিজে কল্পনা করতে ইচ্ছা করছেনা চুপ করে বসে থাকি তুমি যা হয় কর।

স্বাধ্যায় কর, যে মন্ত্র আসছে সে মন্ত্র জপ কর, আমার স্বরূপ শ্রুতির সাহায্যে জেনে নিয়ে স্বরূপ চিন্তা কর। জগতটা মায়া জেনে আমায় আশ্রয় কর এই তুমিই সব বললে আবার বলছ জগৎটা মায়া তা'হলে কি আশ্রয় করব?

জগৎ হ'তে নাম রূপ বাদ দে সব আমি ইহা ঠিকই তবে নামরূপ আমি নই সকল দ্রব্য হতে নামরূপ বাদ দিলে যা থাকবে তাই আমি। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, গ্রহণ করা যায়, স্পর্শ করা যায় তাহা আমি নই যাহা দেখা যায় না যাহা শুনা যায় না স্পর্শ করা যায় না গ্রহণ করা যায় না আস্বাদ করা যায় না তাহাই আমি। বাক্য আমাকে প্রকাশ করতে পারে না আমি বাক্যের বাক্য স্বরূপ।

দেখ আমার ইচ্ছা করে মূর্ত্তি ধরে তুমি এস আমার এ ক্ষুদ্র আধারে তোমার ও নির্গুণ নির্ব্বিকার নিরাকার রূপ আমি ধরতে পারি না।

তুই কিসের অধিকারী তোর চেয়ে আমি বেশী জানি; ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আধার তাহা আমি বুঝব।

আর আমি কি করব?

তুই জপ করবি হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ।

তবে বলি হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ; তুমি কি করবে?

আমি নিদ্রিত পুরুষকে জাগরিত করব 'হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও' তুমি দেহ নও তুমি পরিচ্ছন্ন নও উত্তিষ্ঠত জাগ্রত উঠ জাগ।

দেখ তোমার ঐ আহ্বানের মধ্যে কি শক্তি লুকানো আছে জানি না আমার শরীরটা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে।

"হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও"।

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ।

যেন কিসের একটা আবরণ, বল বল কি করে এ আবরণ যায়?

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ জপ কর সব আবরণ দূর হয়ে যাবে।

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ।

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁম্ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ও ওঁম্ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁম্॥

(চ)

কেন এমন হয়,

যতদিন অহংতা মমতা থাক্‌বে ততদিন এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তেই হবে। তুই সব ত্যাগ কর; ত্যাগ ভিন্ন মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে না। একমাত্র ত্যাগের দ্বারা মানুষ মোক্ষলাভ করে, তুই সব ত্যাগ কর। অসত্য ত্যাগ ব্যতীত সত্য লাভ কর্‌তে কেহ পারে না। যেমন স্বপ্ন মিথ্যা তেমনি জাগ্রৎ মিথ্যা এ দুটাই উপেক্ষার জিনিষ।

ওগো আমি যে ত্যাগ কর্‌তে পারি না কি কর্‌ব কি উপায় কর্‌লে ত্যাগের যোগ্যতা আস্‌বে।

নাম কর্‌লে, অবিরাম নাম কর আর কা'রও কথা কাণে নিস্‌না, আর কাহাকেও কোন কথা বলিস না শুধু রাম রাম কর আমি সব সুব্যবস্থা কর্‌ব। যাহা দুঃখের বলে মনে করছিস তাহা স্বপ্ন যাহা সুখের বলে মনে কর্‌ছিস, তাহা স্বপ্ন। যে অভিনয় চল্‌ছে এ অভিনয়ের তুই অভিনেতা নহিস, দ্রষ্টামাত্র। তোর অশান্তির তীব্র দাব দাহ আমি, তোর শান্তির মলয় পবন আমি, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এ ভাব তিনটাকে উপেক্ষা করে মহাকারণ আমায় দেখ আমি আমি আমি সব আমি সব আমি দ্রষ্টা তুই, অভিনয় দেখে আর হাসিস কাঁদিস না স্বপ্নকে সত্য বলে আর হাহাকার করিস না তুই ক্ষণমাত্র ভুলিস না তুই দ্রষ্টা, তুই অভিনেতা নহিস ইহা যেন স্থির থাকে।

ভয়কিরে আমায় যে আশ্রয় করে আমার যে নাম করে তাকে যে আমি বুকে করে রাখি। যা দেখে চঞ্চল হচ্ছিস উহা যে আমার মঙ্গল হস্ত। এ বিশ্ব যে মঙ্গল দিয়ে গড়া এ বিশ্বে বিন্দুমাত্র অমঙ্গল নাই, নাম কর।

রাম রাম রাম আঃ প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

হাঁ আমার আশ্রিত যে সে ভোগের দিকে চাইবে কেন, আমার ভক্ত ভোগবিষ্ঠার কৃমি হইতে পারে না, ভোগের উপাদান অর্থ স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি, তোর স্তূপীকৃত অর্থ তোকে মৃত্যু সংসার হ'তে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না। অর্থে কেবল অনর্থ আনবে, অর্থকে উপেক্ষা কর। ঐ যে পচা গলা নারীদেহ মরে গেলে যাতে পোকা বিজ বিজ করে ঐ নারীদেহ কি ভোগের জিনিস, ছি ছি ওটা নরক নরক, ওদিকে অমন করে তাকাস্ না, ফিরে আয় ফিরে আয়, ঐ যে শত রোগের আকর দুঃখ কষ্টের আগার পচা গলা তোর দেহ

ওদেহ কখন যাবে স্থির নাই, আর তুই নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস্, মাঝে মাঝে অভিনয় দেখে শিউরে উঠছিস্ ছিঃ ছি ছি সাজ সাজ মরণের জন্য প্রস্তুত হ কি কর্‌ছিস্ ছেড়ে দে।

সব ছাড়া যায়?

যায় বৈকি। সব আমি একা আমি সব সেজে তোর কর্ম্ম ক্ষয় করে দিচ্ছি। আমিই তোর আত্মীয় স্বজন মাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্র আদি, আমিই তোর গুরু, আমিই তোর শিষ্য ভক্ত, আমিই নিন্দা করে তোর দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় করে দিই, আমিই তোর সুখ্যাতি করে সুকর্ম্ম ক্ষয় করি। কার উপর রাগ করবি আমি আমি আমি, কাকে ভাল বাসবি, আমি আমি আমি, আয় উঠে আয় স্থূলের রাজ্য ছেড়ে সূক্ষ্মে আয় চোক বুজে তোর দ্বিদলে দৃষ্টি স্থির কর, ঐ যে নীচের তলায় পাগলা মাগী ঘুমাচ্ছে দে, ধাক্কা মেরে তুলে দে ওর সঙ্গে উপরি উপরি সাজান ছতলার ঘরগুলা বেশ করে দেখ আর ছতলার ঘরখানার উপরেই প্রণবের স্থান ঐ আমার প্রিয় নাম প্রণব, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমায় ডাক, ঐ বিন্দু ঐ নাদ যা ছ তলার উপর চুপ করে বস্‌গে ওখানে থাক্‌তে পছন্দ হচ্ছেনা যা সহস্রারে সূর্য্যরশ্মি আছে ঐ রশ্মি ধরে সূর্য্য মণ্ডলে যা যদি সহস্রারে সূর্য্যরশ্মিতে ধ্যান রাখ্‌তে পারিস্ তাহ'লে তোর ইচ্ছা মৃত্যু হবে। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে যখন ইচ্ছ তখন দেহত্যাগ কর্‌তে পার্‌বি।

অনেক কথাই বল্‌ছ আমি ত কিছু কুল কিনারা পাচ্ছি না।

আমিই কুল আমিই কিনারা জপ কর জপান্মুক্তি।

বল ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

বলি ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

বল ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

বলি ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

ও ও ওঁ ওঁ ওঁ ম ম ম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

দেবতা ও প্রতিমা।

[৺সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত।]

একদিন ভারতে এমন দিন ছিল, যে দিন কেবল প্রতিমা বলিলেই লোকে দেবতার প্রতিমা বুঝিত। তারপর একদিন আসিয়াছিল, যে দিন দেবতার প্রতিমা বুঝাইতে হইলে দেবতা-প্রতিমা বলিতে হইত। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দিন আসিয়াছে যাহাতে এক্ষণে না দেবতা, না প্রতিমা, অথবা দেবতা-প্রতিমা ইহার কিছুই বলিবার উপায় নাই। তাই আজ বাধ্য হইয়া আমা-দিগকে বলিতে হইতেছে "দেবতা ও প্রতিমা"। ভক্তির আতিশয্য বশতঃ যাঁহারা দেবতা-প্রতিমাকে সমভাবেই দেবতা-প্রতিমা দেখিয়া বা বলিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যশালী পুরুষ, আমরা কিন্তু দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তী-তায় আজ আর প্রতিমা মাত্রেই দেবতা-প্রতিমা বলিয়া সুস্থ থাকিতে পারিতেছি না। এখনকার প্রতিমা দেখিলে অনেক স্থলেই দেবতা ও প্রতিমা দুই পদার্থ যেন নিতান্ত নিঃসম্বন্ধ অথবা নিতান্তই বিকট সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সাধক সমাজের সর্ব্বনাশবশতঃ জীবজগতের অন্তর্দৃষ্টি যতই বিলুপ্ত হইতেছে, বাহ্যদৃষ্টির ঘটাঘটা ততই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। দেবতার মূর্ত্তি বলিলে আজকাল দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া আমাদের মনে হউক, বা না হউক, অনেক স্থলেই মূর্ত্তির দেবতা বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, যে দেবতার যাহা স্বরূপ, তাঁহার মূর্ত্তি তাহারই অনুরূপ হইবে; কিন্তু লোক ব্যব-হারে দেখিতে পাই, দেবতার স্বরূপ যেমনই হউক না কেন, আমার গঠিত মূর্ত্তি যেমন হইবে দেবতা তাঁহার স্বরূপ ও তেমনই করিতে হইবে। শাস্ত্রের মুখে দেবতার স্বরূপের অবগতি আজ এ হতভাগ্য দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বা-পর সিদ্ধিক্রমে যিনি যেমন দেখিয়া আসিতেছেন, তিনি জানেন তাহাই দেব-তার স্বরূপ যথা—সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা মূর্ত্তি হইলেই তাঁহার নাম দুর্গা, শবাসনা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা হইলেই তাঁহার নাম কালী, লম্বোদর শ্বেতবর্ণ ত্রিনয়ন দ্বিভুজ হইলেই তাঁহার নাম শিব। শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি হইলেই তাঁহার নাম কৃষ্ণ, দ্বিভুজা গৌরাঙ্গী মূর্ত্তি কৃষ্ণের নিকট থাকিলেই তাঁহার নাম রাধিকা; একা একেশ্বরী থাকিলেই তাঁহার নাম লক্ষ্মী, ইত্যাদি

ইত্যাদি। এখন কালী দুর্গা রাধাকৃষ্ণ চিনিতে হয় প্রতিমার হাত পায়ের সংখ্যা ও রং দেখিয়া। সাধনার বিভ্রাট ও সাধকের দুর্গতির পরিণাম, ইহা অপেক্ষা আর আছে কি না, তাহা জানি না। মূর্ত্তির স্থলে শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ধ্যানানুরূপিণীং কৃত্বা" দেবমূর্ত্তিকে ধ্যানের অনুরূপ করিতে হইবে।" তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি।"

অর্চ্চকের তপোযোগ, অর্চ্চনার উপকরণ দ্রব্যাদির আতিশয্য, আর বিম্ব অর্থাৎ প্রতিমার আভিরূপ্য—অনুরূপতা, এই তিন কারণ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইলেই পূজাক্ষেত্রে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অর্চ্চকের তপোযোগ, আর অর্চ্চনের আতিশয্য, এই দুই বিষয় এক্ষণে লক্ষ্য নহে, কেবল প্রতিমার আভিরূপ্যই এক্ষণে আলোচ্য। আজ কাল্‌কার পূজাঅর্চ্চায় প্রতিমার আভিরূপ্য যে পূজাসিদ্ধির বিশেষ কারণ, তাহা হয়ত অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন, অনেকেই শুনেন নাই অথবা অনেকেই এই নূতন শুনিতেছেন। আজ কাল ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে দেখিতে পাই, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, দেবতার মূর্ত্তি যেমনই হউক্ না কেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার করা মহাপাপ। এইটুকু যদি মুখের কথা না হইয়া প্রাণের কথা হইত, তাহা হইলে আর আজ আমাদিগকে এ দুঃখের গাথা গাহিতে হইত না। ভক্ত যজমানের বাড়ীতে আজ দুর্গোৎসবের ব্যয় যেখানে হাজার টাকা, দুঃখের কথা বলিতে কি, প্রতিমার ব্যয় সে স্থানে পঞ্চাশ টাকার উপরে নহে। এ পঞ্চাশ টাকাও আবার প্রতিমার ব্যয় নহে, প্রতিমার কল্যাণে হয় ৫৲ টাকা, না হয় ১০৲ টাকা, আর অবশিষ্ট ৪৫৲ বা ৪০৲ টাকা প্রতিমার সাজসজ্জায়। এ সাজসজ্জাও শাস্ত্রোক্ত অলঙ্কার বা বসন ভূষণ নহে, ইহার নাম ডাকের সাজ। যে সাজে নামডাকে, আর দেবতা ঢাকে, এ সাজ, সেই ডাকের সাজ। ইহা দেবতারও সাজ নহে, প্রতিমার সাজ, সুতরাং এ স্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, এ সাজ পূজার সাজ না হইয়া প্রকারান্তরে পূজকেরই সাজ। সে যাহা হউক, সাজপরিচ্ছদে আমরা তাহার আলোচনা যাহা পারি করিব; এক্ষণে প্রতিমাতত্ত্বই আলোচ্য। তাহাতেই বলিতেছি—সাধকের তপোবল, পূজার দ্রব্যাদি, আর প্রতিমার সুসদৃশ সৌন্দর্য্য, পূজাক্ষেত্রে এই তিন ভাগকে সমভাবে

রাখিতে হইলে ঐ হাজার টাকা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ অর্চ্চকের তপো-যোগে—নিজে পূজা করিতে সম্যক্ সমর্থ না হইলে অথবা গুরুদেবের দ্বারা পূজা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা না থাকিলে, কিংবা স্বতঃ করুণাপর (যিনি যজমানের প্রতি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ংই পূজাদি করিয়া দিতে ইচ্ছুক) ভক্ত জ্ঞানী সাধকের অভাব হইলে, ঐ হাজার টাকার এক ভাগ তপোবলসম্পন্ন উপযুক্ত পুরোহিতের দক্ষিণা হইবে। আর পূজার উপকরণাদির জন্য ঐ হাজার টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ব্যয়িত হইবে। আর অবশিষ্ট একভাগ প্রতিমার জন্য দিলে, তবে যেন যথাশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তাহা লইলে প্রায় সাড়ে তিন শত টাকা যেখানে প্রতিমার জন্য ব্যয় করিবার কথা, সেইখানে ৩।০ টাকা অথবা ৪৲ টাকা ৫৲ টাকায় প্রতিমার গঠন হইলে সত্য সত্যই প্রাণে যেন আঘাত লাগে। প্রতিমার মূল্য অল্প হইলে, যে প্রতিমা গড়িল সে অল্প টাকা পাইল, ইহার জন্য দুঃখ করি না, দুঃখ করি—যাঁহার বাড়ীতে পূজা, তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ও শাস্ত্র-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া। হাজার টাকার পূজায় যেখানে প্রতিমা, প্রতিমার সাজ, পূজার উপকরণ দ্রব্যাদি, মায় মণ্ডপের আলো. পুরোহিতের দক্ষিণা, বাদ্যকর, বিসর্জ্জনের বেহারা, নৌকার মাঝিমাল্লা ইত্যাদি সবশুদ্ধ ধরিয়া মণ্ডপ খরচা নামে এক শত টাকা ব্যয়, আর অবশিষ্ট নয় শত টাকা খাদ্যদ্রব্য, বাড়ীর পোষাক, গান-বাজনা, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির ব্যয়, সেইখানে যে, "প্রতিমা-খানি তেমন হয় নাই"বলিলেই যজমান! তুমি ভক্তির ভ্রূকুটীভঙ্গী দেখাইয়া শাস্ত্র-নিষ্ঠার দাম্ভিকতায় বলিয়া উঠ—"দেবমূর্ত্তির ভালমন্দ বিচার করা মহাপাপ" বুঝিতে পারি না, এ নিষ্ঠা তোমার কোন্ নিষ্ঠা? এই ভক্তিবলে তুমি যদি ভক্ত হও, তবে ভাবিয়া দেখ ভক্তি কাহার নাম? ভক্তির আবরণে অন্তর্নাস্তিকতা ঢাকিয়া তুমি লোকলোচনে ভক্ত বলিয়া লক্ষিত হইতে পার, কিন্তু তাহা ত দ্বিলোচনের সমালোচনার ফল; যিনি অন্তর্ব্বহিঃ সমদর্শনা ত্রিলোচনা, তাঁহার সমালোচনায় তোমার সেই ভাক্ত ভক্তি টিঁকিবে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি? ভক্তির কথায় যখন কাটাইতে না পার, তখনই আবার বলিয়া থাক, আমার যাহা সাধ্য তাহাই আমি করি। এখন বুঝিনা, হাজার টাকার উপরে তোমার ব্যয় করাই অসাধ্য, কি হাজার টাকার মধ্যে গান বাজনা সাজ পোষাকের টাকা কমাইয়া প্রতিমার কল্যাণে ৫৲ টাকার অধিক ব্যয় করাই তোমার অসাধ্য?

আজকাল্কার কর্ত্তাদের মধ্যে মত ভেদে অনেকেই অনেক প্রকারে প্রতি-

মার খরচটা বাজে খরচ অথবা অপব্যয়ের মধ্যেই গণ্য করিয়া রাখেন। নিষ্ঠা রুচিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞান-গৌরবিত সৎকার্য্য-কৃপণ অনেক মহাত্মা বলিয়া থাকেন—"চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাই প্রতিমা ইত্যাদিতে এ সকল তামসিক অর্থদণ্ড, নইলে যথাশাস্ত্র পূজা ঘটে করিলেই ভাল হয়।" কাহারও মতে—"প্রতিমা, ওটা একটা বাহিরের ঠাট বইত নয়? পূজা যাহা, তাহা ঘটেই হয়, ওটা একটা লোক দেখান আমোদ বই আর কিছুই নহে।" কেহ বলেন—প্রতিমা যেমনই হউক না কেন তাহাতে একটা কি আসে যায়, অন্তরে যদি ভক্তি থাকে, প্রতিমা কানা হউক, খোঁড়া হউক, মা তাহারই মধ্যে আসিয়া পূজা গ্রহণ করেন। অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—"আমাদের এ মণ্ডপের এমনই মহিমা যে, যে ইচ্ছা সে গড়ুক না কেন, প্রতিমা ভাল মন্দ যেমনই হউক না কেন, আসনে উঠাইলে সেই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ঠাকুরের সময় হইতে মা যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনই হইয়া দাঁড়ান।" বস্তুতঃ এ সকল কথা কি ধর্ম্মের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ নহে? মণ্ডপের মহিমা, আসনের শক্তি, এ সকল কথা অবিশ্বাস করিবারও নহে, অবিশ্বাস করিতেছিও না; ভাবিয়া দেখ মণ্ডপে আসনে যদি এই শক্তি থাকে যে, ব্যঙ্গ বা বিকৃত—প্রতিমা যেমনই কেন না হউক, পূর্ব্বপুরুষের সিদ্ধি সাধনার গুণে তাহাতে জগদম্বার আবির্ভাব-প্রভা চিরকালই সমান আছে, তাহা হইলেও সেই জাগ্রৎপীঠ সিদ্ধক্ষেত্রে মায়ের ব্যঙ্গ বিকৃত প্রতিমা সংস্থাপিত করিয়া তুমি আজ কি গুরুতর অপরাধেরই না সৃষ্টি করিলে? যে মূর্ত্তিতে তিনি তোমার সাধনার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সাকাররূপে অধিষ্ঠিত হইবেন, তুমি আজ ভক্ত হইয়া—সাধক হইয়া, আর্য্য হইয়া আস্তিক হইয়া, কোন্ প্রাণে তাঁহার সেই মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভঙ্গ করিয়া পূজার আসনে বসাইলে? কোন্ প্রাণে মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহার প্রসাদ করুণাপূর্ণ কটাক্ষের ভিখারী হইলে? কোন্ প্রাণে বলিলে যে, "মা আমি তোমার যথাসাধ্য পূজা করিতেছি?" ভাই যজমান! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্রী যিনি, তুমি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করিবে, ইহা একদিকে যেমন হাসির কথা, অন্যদিকে তেমনই তোমার পূর্ব্বপুরুষের সিদ্ধি সাধনার এ গৌরবকীর্ত্তিধ্বজা ত্রিজগতে অতুলনীয়, যাহার কল্যাণে তুমি আজ, সেই যোগীন্দ্র দুর্ল্লভা জগদম্বার ভক্ত হৃদয়বাঞ্ছাময়ী মায়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণের অধিকারী। পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তিরূপে এই সিদ্ধি হাতে পাইয়াও তুমি যদি আজ তাহাতে বঞ্চিত হও, সে সৌভাগ্যের গৌরব

বুঝিবার বা ধারণা করিবার অধিকারী না হও, তবে জানিও—তোমার মত দুর্ভাগ্যও এ জগতে আর কেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শান্তি চাও?

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

আমাকে সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ বলিয়া জান—শান্তি পাইবে। গীতা, ৫ম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এই শিক্ষা দিতেছেন—বলিতেছেন "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি" আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোগকর্ত্তা, ঈশ্বর সমূহেরও মহেশ্বর এবং প্রাণীসমূহের নিকটে কোন প্রত্যুপকার না চাহিয়াও তাহাদের উপকার করি এইরূপ জানিয়া—আমাকে আত্মভাবে সাক্ষাৎ করিয়া সংসার উপরতি বা শান্তি লাভ কর।

জানার সঙ্গে একটু দেখার কথাও আলোচনাকরা যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু, যং চ রামো ন পশ্যতি।নিন্দিতঃ সর্ব্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে। অযো—১৭ সর্গ ১৪ শ্লোক ভগবান বাল্মীকি বলিতেছেন "রামকে যে আত্মস্বরূপে—অন্তর্যামীরূপে নিগু'ণ অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণরূপে—সগুণ জগৎব্যাপী অব্যক্তরূপে আর ধনুর্ধারী, কর্ণান্ত দীর্ঘনয়ন, শ্যামসুন্দর অবতাররূপে না দেখিয়াছেন, আবার রাম যাঁহাকে না দেখেন—একনিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত রামের দৃষ্টি যে কাহারও উপর পতিত হইয়াছে ইহা তাহার অনুভবে আসিবে না- এইরূপ মানুষ সর্ব্বলোকের নিন্দাস্পদ; এরূপ লোকের নিজের অন্তঃকরণও তাহাকে নিন্দা করে—বলে ধিক্ আমাকে, আমি ভগবৎ জ্ঞানের অযোগ্য হইয়াই রহিলাম

রামকে যিনি না দেখেন, রামও যাঁহাকে না দেখেন—এই দুই ব্যাপারে অনেক জানিবার কথা আছে।

সব জানিতে পারে কে? যাহা জানিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ তাহা লইয়াই

ভজন কর, উপাসনা কর—ক্রমে শাস্ত্রের শুনা কথা অনুভবে আসিবে, যাহা জানিয়াছ তাহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে। ভজিতে হইবে উপাসনা করিতে হইবে তবে হইবে তাই গীতা বলিতেছেন—

সততং কীর্ত্তিয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাংভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন কর, গুণ কীর্ত্তন কর—নাম করিতে করিতে মনের ঘসর মসর মন হইতে বাহির করিয়া দাও, আর দৃঢ়ব্রত হইয়া—দৃঢ় নিয়ম করিয়া মন যখন যখন সে ছাড়া অন্য বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে চাহিবে তখনই রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ভ্রূমধ্যে জপ করিয়া মনকে চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ ইষ্টদেব দেবীতে আনিবে; তার পরে বাহিরে তার কত বিভূতি—সব বিভূতি দেখিয়া দেখিয়া সর্ব্বত্র নাম করা অভ্যাস করিবে এই ভাবে নিত্য তাহাতে যুক্ত হইয়া উপাসনা কর। এই ভাবে কার্য্য করিলে তার কৃপায় তাকে জানিবে—জানিবে যে সেই তোমার আত্মা। তবেই সব হইয়া যাইবে। ইহাতেই শান্তি। তখনই বুঝিবে তুমি তাহাকে দেখিলেই—একনিষ্ঠ হইয়া দেখিতে পারিলেই বুঝিবে যে সেও তোমাকে দেখিতেছে—আর সেই তোমার সুহৃৎ, সকলের সুহৃদ্। আমার তুমি আছ, তুমি সর্ব্বদা আছ, আমার হৃদয়ে আছ, সকলের হৃদয়ে আছ, তবে আর আমার ভয়ই বা কোথায়? আর অশান্তিই বা কি? শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

করিতে দেয়না কে ?

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

কাহাকে আর বলিব—তাই তোমাকেই বলি। সকল রকম কথা তোমার সঙ্গেই কহিতে হইবে এই তোমার আজ্ঞা, ইহাতে আমি বা আমার মন অন্তর্মুখী থাকিবে তুমি বলিয়াছ—কিছু কিছু করাইয়াও বুঝাইয়াছ—হয়। তাই কিছু মনের কথা—প্রাণের কথা তোমায় বলিতে আসিলাম।

কল্যাণকর কর্ম্ম কি বুঝাইলে, কিছু কিছু করাইয়াও দেখাইলে—তবু ও যে শুভকর্ম্ম করা হয় না—তা, করিতে দেয়না কে ? একি তুমি ? না, আর কেহ ?

শাস্ত্র ত বলেন একমাত্র তুমিই সত্য আর সমস্ত মিথ্যা—মায়িক। তবে মিথ্যা যাহা, অজ্ঞান যাহা, অন্ধকার যাহা, মায়িক যাহা তাহা করিতে দেয়না এই কথা কি ঠিক ?

তুমিই শুভকর্ম্ম করিতে বলিতেছ আবার যদি বলি তুমি করিতে দাওনা—ইহা ত হইতেই পারেনা। তবে করিতে দেয়না কে ? কখন বহুলোকের নানাপ্রকার সঙ্গে কর্ত্তব্য হয় না, কখন লোকের খাতির রাখিতে গিয়া হয় না, কভু বা ভদ্রতা করিতে গিয়া হয়না—এ সব ত বাহিরের বিঘ্ন, এতদ্ভিন্ন ভিতরের বিঘ্ন ও আছে। শরীরের অসুস্থতা, আলস্য, অনিচ্ছা, অপারগতা—এই সমস্ত ভিতরের বিঘ্ন।

এই সব বিঘ্ন কি ? এ সব আসে কেন ? বিঘ্ন যাহা তাহা তোমারই কৃতকর্ম্মের অন্য প্রকার আবৃত্তি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা পাপ করিয়াছ তাহাই বিঘ্নরূপে আসিয়া তোমাকে শুভ অধ্যবসায়ের পথে যাইতে দিবেনা। ইহারা তোমাকে ক্লেশ দিবেই। আবার শুভ কর্ম্ম যাহা করা আছে তাহারাও কালে কালে উদয় হইয়া তোমাকে শ্রীভগবানের দিকে টানিবেই। যখন শুভকর্ম্ম ফল দিতেছে তখন ত ভগবান লইয়া থাকিতে পারিবেই—তখন ও কিন্তু আনন্দে বেহুঁস হইয়া লোকের কাছে বলিয়া বেড়ান উচিত নহে—আমার বেশ হইতেছে। আর যখন অশুভকর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে তখনই তোমার

যথার্থ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় জানিও। এই বিপদকালে বিশেষ ধৈর্য্য ধরিয়া ভগবানের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। কারণ তুমি যতই চেষ্টা করিবে ততই তোমার অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার তোমাকে তাহার অধীন করিতে চাহিবে; তোমাকে উঠিতেই দিবেনা। তুমি কিন্তু চেষ্টা ছাড়িওনা। হউক না প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব—হউক না মায়ার ভীষণ উৎপাৎ। তোমাকে ভগবান্ না আশ্বাস দিয়াছেন—"মম মায়া দুরত্যয়া" হইলেও "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"—আমার শরণাপন্ন হইলে আমিই আমার মায়াকে আমার ভক্ত হইতে সরাইয়া দিয়া থাকি।

একদিকে বৈরাগ্য অন্যদিকে অভ্যাস এইত কার্য্য। যখন দুঃসময় আসিবে তখন বিঘ্ন সমূহ মায়ার কার্য্য ইহারা মিথ্যা জানিয়া—ইহারা মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া আংশিক আশ্বস্ত হও। কিন্তু তাহাতেও ইহারা ছাড়িবেনা। তখন অভ্যাস লইয়া চেষ্টা কর। মন যাহাতে কোন ভাবনার অবসর না পায় তজ্জন্য ঘন ঘন আথালি পাথালি নাম কর। দুর্গা দুর্গা দুর্গা ঘন ঘন সংখ্যা না রাখিয়া করিতে থাক। কখন বা রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন। কখন বা হরে রাম ইত্যাদি বলিতে থাক। কখন শুধু রাম রাম কর। নাম করিয়া করিয়া মন হইতে সব বাহির করিয়া দাও। পরে কর্ত্তব্য কর।

শরণাপন্ন হওয়ার কার্য্য।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

কেহ কেহ মনে করেন ঠাকুরকে এত বলি ঠাকুর আমি তোমার শরণাপন্ন তথাপি আমার এমন হয় কেন? "জানামি ধর্ম্মং" শাস্ত্র মুখে, গুরুমুখে এবং সাধুসজ্জনের নিকট হইতে ধর্ম্ম জানিলাম কিন্তু "ন চ মে প্রবৃত্তিঃ" কিন্তু ধর্ম্ম করিতে ছুটিয়া যাই কোথায়? আবার "জানাম্যধর্ম্মং" অধর্ম্ম কি তাহাও জানিলাম—যে কার্য্য করিলে অন্তরের অন্তস্তলে গ্লানি অনুভূত হয়, যে কার্য্য

করিবার সময় তাহাকে মনে থাকেনা সেই অধর্ম্ম কর্ম্মও জানিলাম কিন্তু "ন চ মে নিবৃত্তিঃ" তাহা হইতে মন ত একেবারে সরিয়া আসিলনা—নানা কৌশলে ইন্দ্রিয়ের সুখ ভোগ করিতেই লালসা, ইন্দ্রিয় সুখ আসিয়া পড়িলে বা ইন্দ্রিয় সুখের লালসা জাগিলে নানাছন্দে তাহাই ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়—ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণিক জানিয়াও—ইন্দ্রিয় সুখে অরুচি ত হইল না। ইন্দ্রিয় দ্বারা আহার করিতে একেবারে ইচ্ছা নাই ইহাও হইলনা। অথচ মুখে বলি আমি তোমার শরণাপন্ন। তুমি আমার হৃদয়ের রাজা হইয়া আছ—তথাপি আমার অধর্ম্মে—ক্ষণিক আনন্দে এত লালসা কেন? ক্ষণিক আনন্দ ভোগে যখন ছুটিয়া যাই তখন তোমাকে কি মনে থাকে, না তখন মনে পড়ে তোমার প্রীতিই আমি চাই—আমার সুখের ইচ্ছাই কাম আর কৃষ্ণ সুখের ইচ্ছাই প্রেম। ক্ষণিকে যখন ছুটিয়া যাই তখন কি মনে পড়ে এই যে যাইতেছি একি শুধু তোমাকে তৃপ্তি দিবার জন্য? যদি তাই হইত ভিতরের তুমিকে একেবারে ভুলিয়া বাহিরে মৌখিক আরোপে ছুটি কেন? আর ভিতরের তুমি বাহিরের এই মূর্ত্তি ধরিয়াই আসিয়াছ ইহা যেন লোক বুঝাইবার জন্য বলিলাম কিন্তু ভিতরের তুমি বাহিরে যদি সত্য সত্যই আসিয়া থাক তবে তুমিই আমাকে ইন্দ্রিয়ে আনিবার জন্য এত রঙ্গরস কর কিরূপে? যদি তুমি আমাকে ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়াইয়া ভিতরে ডুবাইয়া রাখিতে পারিতে তবে বুঝিতাম—"সেই" "তুমি" হইয়া আসিয়াছ। যদি দর্শন দিয়া ভিতরে ডুবাইয়া দিতে পারিতে তবে ত আমি আত্মানন্দে ভরিয়া যাইতাম—তবে ত আমার বাহিরের দৃশ্য দর্শনও থাকিত না—তবে ত আমার দ্বারা এমন কর্ম্ম হইত না। যাহাতে আমার কোনরূপ গ্লানি আসিতে পারে—ক্ষণিক ভোগ মোহ কাটিয়া গেলে একবারও মনে উঠিতে পারিতনা আমার কি কোন অপরাধ হইল? হায় এতদিন তবে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্যই আত্মপ্রতারণা করিলাম—আত্মাকে ছলনা করিলাম। হায়! আমার শরণাপন্ন হওয়া হয় নাই, যদি হইত তবে কি তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এত গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসিতাম? তবে শরণাপন্ন কি হইলে হয়? বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ যে না করিতে জানিয়াছে, তোমার আজ্ঞা পালনে প্রবল পুরুষার্থ যাহার হয় না, সে কখন তোমার শরণাপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহাই কার্য্যে পরিণত কর—ইহা করিতে পারিলেই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি করিতে পারিবে। সংগ্রাম

করিতেই হইবে। সংগ্রামে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে কারণ তুমি শ্রীভগবানের শরণে আসিয়া তাঁহার তৃপ্তির জন্য—তাঁহার আজ্ঞা পালন জন্য যুদ্ধ করিতেছ। যতদিন তাঁহার আজ্ঞা পালন রূপ গুরুবাক্যে আনন্দ না পাও ততদিন জানিও কামরূপ দুরাসদ শত্রু জয়ে তোমার চেষ্টা নাই। তুমি কর—ভগবান তোমার সহায় বুঝিবে।

উপাস্য ও উপাসক পরিষ্কার কথা।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু। অনন্ত শাস্ত্রের, বহু বেদিতব্যের মধ্যে যাহা সারভূত তাহাই উপাসনার বস্তু—তাহাই উপাস্য।

ঋষি মহর্ষি—সকল দেশের সাধু সজ্জন—সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন চৈতন্যই উপাস্য-জড় উপাস্য নহে। জড় চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়াই ভাসে—জড়-দেহ চৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে।

চৈতন্য নিরবয়ব, চৈতন্য নিরাকার। চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করেন অবয়ব ধরিয়া—চৈতন্য আপনি প্রকটিত হয়েন উপাধির মধ্য দিয়া। উপাধি ক্ষুদ্র, উপাধি খণ্ড, চৈতন্য কিন্তু ভূমা, চৈতন্য অখণ্ড। চৈতন্যের রূপ খণ্ড মত দেখা গেলেও, রূপ চৈতন্যকে খণ্ড করিতে পারে না—অখণ্ড চৈতন্য খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও—খণ্ড খণ্ড উপাধির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইলেও চৈতন্য চিরদিনই অখণ্ড—কখন খণ্ডিত হন না।

"আমি আছি"—এই অনুভবে যে চৈতন্যকে ধরা যায় তিনিও নিরবয়ব, নিরাকার, অখণ্ড, অপরিছিন্ন। এই চৈতন্যও আত্মপ্রকাশ করেন দেহ ধরিয়া। সকল জীবেরই এই জড় দেহ আছে। কিন্তু চৈতন্য—আপন চিৎভাব দিয়া আর একটি দেহ ধারণ করেন সেটি তাঁহার চিন্ময় দেহ। এই চিন্ময় দেহবিশিষ্ট আত্মাই—এই চিন্ময় দেহধারী আত্মচৈতন্যই উপাস্য দেবতা, ইষ্টদেব।

তবেই হইল মানুষের মধ্যে দুই দেহ আছে—একটি স্থূল জড় দেহ আর একটি ভাবময় চৈতন্য উপাস্য দেহ। এই ভাবময় দেহ প্রথম অবস্থায় মন্ত্রময়, দ্বিতীয় অবস্থায় ইষ্ট দেবতা। গুরু ইহা—এই মন্ত্রময়, নামরূপ বিশিষ্ট ইষ্টের কথা বলিয়া দিয়া থাকেন। এইজন্য গুরু, মন্ত্র ইষ্টের সম্বন্ধ বড় নিকট—ইহাদিগকে এক ভাবিয়া সাধনা করিতে হয়।

মানুষের সাধনায়, সাধকের সাধনায় কি করিতে হয়, এখন সেই কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে।

স্থূলদেহধারী সাধক ইষ্টচিন্তা করিয়া করিয়া ইষ্টের স্বভাবে পৌঁছিতে পারিলেই আত্মচৈতন্যে নিত্যস্থিতি লাভ করিতে পারেন। ইষ্টদেবই আমার আত্মচৈতন্য ইহার অনুভব জন্যই সাধনা। পুনঃ পুনঃ নাম জপ যে করিতে হয় তাহাতে অভ্যাস করিতে হয়—আমি আমার স্বরূপ ছাড়িয়া যে মনোরূপে সংসার করিতেছি—সেই আমিই ইষ্টদেবতা—ইষ্টদেবতাই আমার আত্মচৈতন্য। আমিই নাম—নামই আত্মা। এইভাবে নাম করিতে করিতে ইষ্টের সাহায্যে—ইষ্টের লীলা চিন্তনে স্বরূপ আত্মায় পৌঁছিতে পারিলেই সংসারসাগর হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

এসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। এখন যে যাহা চিন্তা করেন—তাঁহার তাহাই ভাল।

(১)

উপাস্যকে পরিষ্কার ভাবে ধারণা যিনি করাইয়া দেন তিনি উপাস্যের অন্য মূর্ত্তি, তিনিই গুরু। উপাস্য—উচ্চ অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কথা কহেন না, প্রশ্নের সমাধা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করেন না—বহু কৌশলে তিনি সবই বলেন বটে কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাসী একনিষ্ঠ সাধক ভিন্ন—সবই তাঁহার দেওয়া—এই ভাব সকল সাধকে ধারণা করিতে পারে না। সাধনা করিতে করিতে যখন সাধকের নিজের ইচ্ছা আর থাকেনা—নিজের ইচ্ছামত চলিতে ইচ্ছা হয় না, যখন মনে হয় তুমি না বলিয়া দিলে আমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই করিব না, সংসারে থাকিলে—যে কর্ম্ম, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আসিয়া পড়ে—তাহা করিতেই হয় সত্য কিন্তু এই যথাপ্রাপ্তকর্ম্মে স্পন্দিত হইয়াও সাধক মনে করেন প্রারব্ধকর্ম্ম ত ভোগ করিতেই হইবে ইহাতে আমার ইচ্ছা কিন্তু নাই—ইহাতে আমার আসক্তি কিছুই নাই, ইহা ভোগই হইয়া যাইতেছে। যখন এইরূপ কর্ম্ম আসিল তখন হরি হরি করিয়া কর্ম্ম করিলাম বটে কিন্তু কর্ম্ম

শেষ হইলেই ফলাফল সমস্তই মন হইতে বাহির হইয়া গেল আমি তখন কৃতকর্ম্ম বা আগন্তুকের সঙ্গে যে আলাপ করা হইল তাহা সম্পূর্ণরূপে মন হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য—যদিই অজ্ঞাতসারে কোন আসক্তি মনের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া যায়—সেই গুপ্ত আসক্তিও ধৌত করিবার জন্য কতক্ষণ পর্য্যন্ত হরি হরি করিয়া মনকে অপর কোন কিছু চিন্তা করিবার অবসরই দিলাম না—এইভাবে মন হইতে সমস্ত ধৌত করিয়া গুরুদত্ত কার্য্যে মন দিলাম।

এই ভাবে যিনি মনকে প্রস্তুত করেন, মনকে বিঘ্ন শূন্য করেন তিনি সাধনা পথে কিছুদুর অগ্রসর হইয়াছেন বলা যায়।

যাঁহারা কাঁচা সাধক তাঁহারা পুনঃ পুনঃ গুরু দর্শন করিতে লালসা রাখেন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে এই গুরুদর্শন লালসা হইতে শিষ্যের বহু প্রকারের অনিষ্টও হইতে পারে। ভগবান দত্তাত্রেয় গুরু আর পরশুরাম শিষ্য; গুরু উপদেশ দিলেন, শিষ্য চলিয়া গেলেন সাধনা করিতে; সাধনা করিতে করিতে মনে যখন সাধনা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, সে প্রশ্নের মীমাংসা নিজে চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন পরশুরাম গুরুর নিকটে আসিয়া সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাঁহারা যথার্থ সাধক তাঁহারা গুরুর নিকটে আসিয়া গল্প করেন না। তাঁহারা জানেন গুরু দর্শনের অর্থ হইতেছে গুরুর আজ্ঞামত কার্য্য করা। গুরু ও ইষ্ট দেবতার প্রতিনিধি মাত্র। গুরুর আজ্ঞামত কার্য্য করাই যথার্থ গুরুসেবা। তদ্ভিন্ন বাহিরের সেবা যদি কখন গুরুর আবশ্যক হয় তখন করিতে হয়। ভগবান্ অগস্ত্য তপস্যা করিতেছেন, তখন ভগবান আসিয়াছেন তথাপি তিনি দর্শন করিতে অযোধ্যায় ছুটিয়া আসিলেন না—গুরু প্রদর্শিত কর্ম্মের দ্বারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—পরে গুরু আপনিই আসিলেন।

এই ভাবে শিষ্য যদি কর্ম্ম করে তবে সে শিষ্য সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গুরুর নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য প্রশ্ন থাকিবে কিন্তু গল্প কোনরূপই থাকিবে না অথবা জিজ্ঞাসা না করিলেও গুরু কিছু বলিবেন শিষ্য মাত্র শুনিবে ইহাও থাকিবে না। যে গুরু শিষ্য জিজ্ঞাসা না করিলেও বহু কথা কহেন, বহু শাস্ত্রের কথা আওড়ান তিনি শিষ্যের উপর একটা আসক্তি রাখেন—অথবা শিষ্যকে নিজের মত করিবার জন্য একটা আসক্তির প্রয়াস রাখেন মাত্র। ইহাও উপস্থিত সময়ের দোষ। শিষ্য যে গুরুর নিকটে গিয়া সেই সময়ের জন্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রশ্ন আনিবেন :ইহাতেও কোন কাজ হয় না। সাধনা করিতে করিতে বা

স্বাধ্যায় করিতে করিতে যেখানে বাধিবে, পুনঃ পুনঃ যাহা মনে উঠিবে তাহাই ধরিয়া রাখা আবশ্যক।

জীবন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। ইহা যে সাধক দেখিতেছেন তিনি কি খাতির রক্ষার জন্য বা ভদ্রতা রক্ষার জন্য কিছু কাজ করিতে পারেন? গুরু যিনি যথার্থ হইয়াছেন তিনি শিষ্যের কল্যাণ কামনাই করিবেন তিনি শিষ্য বা শিষ্য স্থানীয় ভক্তকে বলিয়া দিবেন তোমার করণীয় তুমি ত পাইয়াছ—আমার নিকটে আসিয়া তোমার সময় নষ্ট করা অপেক্ষা—এবং আমারও সময় নষ্ট না করিয়া, যাও আপনার সাধনা কর—ইহাতেই কার্য্য হইবে।

বেশ করিয়া জানিয়া রাখিও কলিযুগে শাস্ত্রমত চলিবার প্রয়াসও করিতেছে এরূপ লোক বিরল হইয়া পড়িতেছে। যাহারা শাস্ত্রমত চলে না—শাস্ত্রকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের সুবিধা মত করিয়া লয় এরূপ লোকের সঙ্গে সৎসঙ্গ হয় না। কাজেই শাস্ত্রমত কর্ম্মপরায়ণ গুরু ভিন্ন অন্য কোথাও সৎসঙ্গ হইতে পারে না জানিও। যেখানে গুরুদর্শনও ঘটে না—সেখানে সৎসঙ্গ জন্য ছুটিলে কতকগুলি শাস্ত্রের মনগড়া ব্যাখ্যা ভিন্ন কিছুই পাইবে না। এক্ষেত্রে শাস্ত্রকেই সৎসঙ্গের স্থানে বসাইয়া নির্জ্জনেই থাকিতে হয়।

ফলকথা সাধকের এই ঘোর কলিকালে লোক সঙ্গ বর্জ্জন করা প্রথমতঃ আবশ্যক। গুরুদত্ত কর্ম্মদ্বারা, স্বাধ্যায় দ্বারা মনকে ঠিক করাই সাধকের কার্য্য। যিনি আত্মতৃপ্তি আত্মকাম হইবার জন্য—আপনার ভিতরে আনন্দের আস্বাদন জন্য নির্জ্জন বাস করেন না—এখানে ওখানে ছুটেন তাঁহার সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইতে অনেক বিলম্ব।

প্রাণের মনের, ও বুদ্ধির সাধনা।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

সর্ব্বদা স্মরণ অভ্যাসের জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন তিনটী রাখিতে "জপাৎ শ্রান্তঃ-পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্তঃপুন র্জপেৎ জপধ্যানপরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ।" জপ হইতে শ্রান্ত হইলে ধ্যানে আসিতে এবং ধ্যানে শ্রান্ত হইলে আবার জপে এবং জপধ্যান দুটীতেই পরিশ্রান্ত বোধ হইলে আত্মবিচার অবলম্বন করিতে শাস্ত্র বলেন। এই তিনটীর পরস্পর সম্বন্ধও অবিচ্ছিন্ন। লোকে প্রাণ লইয়া জুড়াইতে চায়, কিন্তু প্রাণ জুড়াইবার জিনিষ কোথাও মিলে না তাই জীবের হাহাকার যায় না। প্রাণ প্রাণের সাধনা বই জুড়াইতে পারে না, প্রাণের লক্ষ্য বস্তু কোনটী, প্রাণের অন্বেষণে প্রাণের কর্ম্মেই একটু স্থির হইয়া দেখিলেই জানা যায়। প্রাণের কর্ম্ম কি? প্রাণ সর্ব্বদা কি লইয়া আছে? প্রাণ সর্ব্বদাই সোঽহং অজপার কার্য্যে নিযুক্ত, অপর সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন যেটী পায় সেইটী লইয়াই মত্ত হইয়া যায়, প্রাণ কিন্তু আপন কর্ম্ম ভুলে না। প্রাণ অহং অহং করিয়া বাহিরে যাইতে চায় কিন্তু স্বরূপ ছাড়িয়া থাকাত যায় না তাই সঃ শব্দে আপন অনুরাগের বস্তুতে আবার ফিরিয়া আসে। অনুরাগের স্বভাবে অনুরাগের বস্তু ছাড়িয়া কতক্ষণ থাকা যায়? বাহিরের কর্ম্ম ডাকাডাকি করিলেও অনুরাগের প্রিয় বস্তুতে আসিবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, "প্রিয় ছাড়িয়া কি এতক্ষণ থাকা যায়'; অন্তঃপুরচারিণী তাই বাহিরে পা বাড়াইয়াই ক্ষণসঙ্গ পরিহার করিয়া আবার প্রিয়সঙ্গ করিতে ছুটিয়া আসে। প্রাণের যেমন সাধনা আছে, মন ও বুদ্ধি ইহারাও তেমনি খোরাক চায়; মনের ক্ষুন্নিবৃত্তি না দূর হওয়া পর্য্যন্ত মনও কিছুতেই জুড়াইতে পারে না। মনের কাছে যাহা তাহা কত কি আনিয়া দিলেও মনের মতনকে না পাওয়া পর্য্যন্ত মন কিছুতেই শান্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। কাজেই মনের ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না। মন চায় মনোভিরামের সঙ্গ, মন একদিন এ সঙ্গের সুখের আস্বাদন করিয়াছে, সে কেন অল্প লইয়া জুড়াইবে? যে ভূমার তৃপ্তির সুখ বুঝিয়াছে সে ক্ষণিক লইয়া কখনই থাকিতে পারে না। তাই মনকে যদি মনের সাধনা রসময়ের রস আস্বাদন করান যায়—চিত্তভ্রমরকে একবার "মধুমাতল"

করিয়া দিতে পারিলে তখন ইহা আর "উড়ই না পার" হইতেই চাহিবে। মনের নিবৃত্তিতেই পরমোপশান্তি, তখন আর কে থাকে যে অশান্ত হইবে? আর বুদ্ধি চায় ভ্রম দূর করিতে, অবিচারের দ্বারাই অজ্ঞানের ক্লেশেই বুদ্ধি ভুলের মাঝে স্থির হইতে পারিতেছে না, কাজেই সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া তাহার বিনাশ ত আসিবেই। বিচারের জ্ঞানালোক প্রাপ্তি না হওয়াবধি এ অজ্ঞান আঁধার হইতে উদ্ধারের উপায় তাহার হইতেছে না। বুদ্ধি শক্তি বিচার প্রবণ হইলেই এই সংসারাড়ম্বররূপ মায়ার ভ্রান্তি—মনোবিলাস দূর করিয়া নিত্য ও অনিত্যের স্বরূপ দর্শনে আত্মসংস্থ হইবে, তখন আত্মরস আস্বাদনে সুস্থির হইয়া আত্মাতেই লাগিয়া থাকিবে, বুদ্ধির সংশয় মিটিয়া গেলেই আর কোন দ্বন্দ্ববোধ থাকিবে না সকল ভ্রমের নিরাশ হইবে। বুদ্ধি মোহজালে নিবদ্ধ হইয়া বড় সঙ্কটে পড়িয়াছে, তার উদ্ধারের উপায় সৎগুরুর উপদেশরূপ আলোক বর্ত্তিকা; ইহা চক্ষের সম্মুখে ধরিলে পথের সন্ধান পাইয়া সে তখন গুরুকৃপায় মুক্তির উপায় খুঁজিবে আত্মবিচারই বুদ্ধির মোহমুক্ত হইবার কৌশল।

জীবের মধ্যে এই ত্রিশক্তির কার্য্য এবং ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার স্বরূপ মন বুদ্ধি ও প্রাণ এই তিনটী শক্তিই একসঙ্গে মিলিত হইয়া সাধনার উপায় দেখাইয়া দিতেছে। প্রাণায়ামাদি, যোগ; উপাসনা মানসপূজাদি ভক্তির কার্য্য এবং সাংখ্যজ্ঞান বিচার এই তিনটীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধে একটীর সাধনায় তিনটীর যোগ দেখাইতেছে। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিনটীর মিশ্রপথই সাধনার উপযোগী। নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তিরূপে পরিণত হয়। এবং ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলেই নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞান বিচার আপনিই উদয় হইবে। জ্ঞানেই মুক্তি—নিঃশ্রেয়স লাভ। একমাত্র প্রাণের লক্ষ্যে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলেই শরণটী জাগাইবার সকল সাধনাই সাধা হয়। এখন তিনটীর কার্য্য কর্ম্ম বিভাগ করিয়া ইহাদের সাধনা দেখাইতেছ, চিত্ত ধ্যান সৌধে বিচারমার্গে স্থিতি লাভ যদি না করিতে পারে তবে তাহাকে যোগ ধারণায় কৌশলে আত্মাতে লাগাইবার কর্ম্মই প্রাণায়াম। প্রাণের সাধনায় প্রাণ স্থির হইলেই মন ভক্তিরসে অবগাহন করিয়া ধ্যানের কার্য্য করিবে; মনের চলন রোধ হইবে। আবার মনের চাঞ্চল্য আসিলে ধ্যান হইতে জপে আবার জপ হইতে ধ্যানে আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির কর্ম্ম আত্মবিচার রহিল জপ ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় —দেহ জগৎ সংসার সমস্ত বস্তুর অসারত্ব—অস্থিরত্ব বিচার করিলে বুদ্ধি দেহে আত্মবুদ্ধি—অহং এবং

মমত্বজ্ঞান না রাখিয়া অনিত্য হইতে নিত্যে আত্মসংস্থ হইতে চাহিবে। বুদ্ধি বিচার দ্বারা আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান জন্মাইয়া দিলে তখন সাধক অল্পসুখে আর মগ্ন হইতে চাহিবে না। বিচার ভূমিকায় মনোবিলাসের দ্রষ্টারূপে থাকিতে পারিলে সকল বস্তুতেই আস্থাশূন্য হইয়া ব্যবহার পরায়ণ হওয়া যায়; ইহা সহজ বোধ না হইলে মনের কার্য্য ভক্তিযোগ অবলম্বনে মানস পূজায় ইষ্টসেবায় চিত্তকে রসানুভূতিতে রাখিতে পারিলে চিত্ত দ্রবীভূত হইতে চাহিবে; ইহাও কঠিন বোধ হইলে কর্ম্ম রহিল প্রাণের সাধনা, প্রাণায়ামের সাধনায় কৌশলে চিত্তকে আবার উপরের অবস্থায় তুলিতে পারা যায়; প্রাণের সংযমেই মনের সংযম আর মনঃসংযমই বুদ্ধির স্থিরতা। স্থির বুদ্ধিই জ্ঞানের দ্বারা ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাহিবে। প্রাণের অশান্তিতেই—বায়ুর চঞ্চলতাতেই অশান্তি আইসে আর "অশান্তস্যকুতঃসুখম্"। অশান্তের সুখ কোথায়? অশান্তের ধ্যান নাই, ধ্যান না হইলে আনন্দ কোথায়? গীতা দেখাইয়াছেন কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানে থাকিয়া কর্ম্ম করা বা না করা উভয়ই সমান। মন যখন নিত্য ধ্যানানন্দ পানে স্থির হইবে তখন আর "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকংততঃ"—এ লাভ হইতে আর অপর কোন লাভকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিতে পারিবে না। জপ ধ্যান আত্মবিচারের সাধনা যাহা বুঝাইলে ইহাই কি ঠিক?

"নিবেদয়ামি চাত্মানং—" ॥

ইতি—অনুরাগ লেখিকা

"মালার পরশে।"

দয়িত আমার! বল্লভ-চির, আজি এ বাদল প্রভাতে;
স্বপনের মাঝে পেয়েছিনু সাড়া নীরব নয়ন পাতে।
প্রশান্ত দিঠির তলে তলে সে প্রাণের গভীর পাওয়া;
সুপ্তির মাঝে ঘিরেছিল মোরে আকুল নীরব চাওয়া।
বীণা তারে তব কি সুর ঝঙ্কারি দিয়েছ তোমার গানে,
জীবন প্রদীপ শিখাটি উজলি ছেয়ে গেছে সারা প্রাণে।
নবীন মেঘের ঘনিমার মত ফুলে ফুলে জাগে আশা,
কত তরুণিমা পুলকিছে তা'তে রচিয়া প্রীতির বাসা।
করুণা গলান বাদল হিয়ার আকুল মরম গন্ধে,
নব তৃণ সম সজীবতা লভি পরাণ লুটায় ছন্দে।
শ্বাসে শ্বাসে জাগে নামের বীণাটী পরশ পিয়াসে তার,
স্বপনের স্মৃতি 'মালার পরশ' আঁকে সে নয়ন কার?
ছল ছল কত করুণতাভরা কনক হাস্য উজলি,
গাঢ় অরুণিমা তুলে রাঙায়ে হানিয়া রূপের বিজলী।
এস! এস! মোর চির প্রিয় সখা! কনক মন্দিরে মোর,
পাতিয়া রেখেছি কমল আসন তোমারি স্বপনে ভোর।
অশ্রু সজল নয়ন পাদ্য তব অর্ঘ্য ডালাটী সাজায়ে,
অপেক্ষা বাসরে তৃষিত হৃদয়ে রেখেছি মালাটী গাঁথিয়ে।
তাপিত প্রাণের হোমধূপে এ আরতি প্রদীপ জ্বালিয়া।
চরণের তলে একান্ত শরণ, মরণে লব বরিয়া॥

অনুরাগ লেখিকা—শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিয়া আলোচনা করিতেছি, অথচ যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাসি বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি—শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মূল্য মাত্র ২॥৵০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্র সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা; মূল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্যে** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২৩শ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

(১)

নমামি শ্রীসূর্য্যদেব নয়ন দেবতা।
নমো নমো বায়ু নমো ত্বগেন্দ্রিয় কর্ত্তা।
রসনার রাজা নমো পয়ঃ অধীশ্বর।
অশ্বিনীকুমার নমো ঘ্রাণের ঈশ্বর।
শ্রোত্র অধিষ্ঠাতা নমো দিক মহাশয়।
এ পঞ্চ দেবতা পদে লইনু আশ্রয়।

(২)

(সে) অরুণলোচনে, স্নেহ স্নিগ্ধ ধারা
অনন্ত শশাঙ্ক প্রায়
উজ্জ্বল অলোকে জীবন কৌমুদী
ফুটিয়া উঠুক তায়
(সে) পরশ মণি, পরশ তরঙ্গে,
প্লাবিত হউক প্রাণ
(যেন) চমকি দামিনী, আর না লুকায়,
সরস মধুর দান।

স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ভরতের রথ সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিল। ভরত দেখিলেন বিড়াল ও পেচক সকল চারিদিকেই দেখা যাইতেছে। গৃহদ্বার সকল রুদ্ধ—তিমিরাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর ন্যায় অযোধ্যা শোভা শূন্য। রাহুশত্রু চন্দ্রের দিব্য ঐশ্বর্য্যযুক্তা প্রজ্বলিতা প্রভা, রোহিণী অভ্যুদিত রাহুর উৎপাতে যেমন অসহয়া হইয়া অবস্থান করে আজ অযোধ্যাও সেইরূপ অসহায়া. সেইরূপ একা। আতপতাপে কলুষিত সলিলা, গ্রীষ্মোত্তপ্ত বিহঙ্গকুল সমাকুলা, লীন মীন-ঝষ-গ্রাহা ক্ষীণপ্রবাহা গিরি নদীর মত অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থা। যজ্ঞীয় ঘৃতাহুতি গ্রহণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রথমে যেমন ধূম বিবর্জ্জিত হইয়া স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করে পরে জল সেকে আবার সহসা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় আজ রামের বিরহে অযোধ্যায় সেই দশা হইয়াছে। অযোধ্যাকে দেখিলে মনে হয় যেখানে যান বাহন চূর্ণ বিচূর্ণ, কবচ সকল ছিন্ন ভিন্ন, বীরগণ নিহত, গজ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল বিলুণ্ঠিত সেইরূপ কোন এক সমরাঙ্গন। প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গার করিয়া সমুত্থিত হইয়াছিল, আজ বায়ুর উপশমে তাহাই যেন নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক স্রুবাদি যজ্ঞীয় পাত্র নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক নাই, নিস্তব্ধ যজ্ঞবেদী যেন পড়িয়া রহিয়াছে। গোষ্ঠ মধ্যে অবস্থান করিয়াও বৃষপরিত্যক্তা তরুণী-বৃষপত্নী বৃষবিরহে একান্ত আর্ত্তা হইয়া নবীন তৃণ ভক্ষণে সমস্ত স্পৃহা ত্যাগ করিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে। নূতন মুক্তার মালা, মসৃণ উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিহীন হইয়া যেমন হয় আজ রামশূন্যা অযোধ্যাও সেইরূপ শোভা বিহীনা। পুণ্যক্ষয়ে তারা সহসা স্বস্থান হইতে বিচলিত ও স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে যেন স্খলিত হইয়াছে, সে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভা বিস্তার করে না। বসন্তের অবসানে পুষ্পগন্ধা মত্ত ভ্রমরশালিনী বনলতা যেন দ্রুত দাবানল ব্যাপ্তা হইয়া একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাজপথে লোকের গতাগতি নাই, আপণ সকলে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা যেন প্রচ্ছন্ন শশি নক্ষত্র মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পানভূমিতে মদ্যহীন ভগ্নগাত্র যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে, মদ্যপায়ী কেহ নাই, ইহা অসংস্কৃত ও বিধ্বস্ত হইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়াছে। জলসত্র যেন ভগ্ন মৃৎ পাত্র পূর্ণ, ইহার চত্বর ভূমিতে (চাতালে) মাত্র ভগ্নস্তম্ভ, কোথাও জলের লেশ মাত্র নাই অযোধ্যার এই দশা হইয়াছে। বিপুল জ্যাযুক্ত অতি বৃহৎ ধনু যেন শর হইতে স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বারোহি পরিচালিত অশ্ব যেন বিপক্ষ সৈন্য হস্তে নিহত হইয়া

পড়িয়া রহিয়াছে। ভরত পুনর্ব্বার সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন সুমন্ত্র অযোধ্যা পূর্ব্বের ন্যায় গীতবাদ্যের গভীর শব্দে কেন নিনাদিত হইতেছে না? বারুণী মদগন্ধ, পুষ্পমাল্য গন্ধ, অগুরু চন্দন গন্ধ কেন চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে না? রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, প্রমত্ত গজের বৃংহতি আর ত শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আর্য্য রাম নির্ব্বাসিত হওয়াতে তরুণ বয়স্কেরা একান্ত বিমনায়মান হইয়া রহিয়াছেন; ইঁহারা চন্দন লেপন করিয়া, বিচিত্র মাল্যধারণ করিয়া, আর বহির্গত হন না। রামশোকার্দ্দিত অযোধ্যাতে আজ কোনই উৎসব নাই। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় অযোধ্যার আর কোন শোভাই নাই। হায়! কতদিনে আমার ভ্রাতা সাক্ষাৎ মহোৎসবের ন্যায় গ্রীষ্মকালে জলধরের ন্যায় অযোধ্যার হর্ষ উৎপাদন করিবেন? হায়! অযোধ্যার মহাপথে আবার কবে তরুণ পুরুষগণ সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া আনন্দে উদ্ধত পুরুষের ন্যায় গমনাগমন করিবে?

দুঃখিত মনে ভরত সিংহহীন গুহার ন্যায় পিতার আবাসে প্রবেশ করিলেন, শুনা যায় দেবাসুর যুদ্ধে অসুরেরা দেবতাগণকে পরাস্ত করিলে, রাহু আসিয়া সূর্য্য দেবকে গ্রাস করেন সেই সময়ে দিবা যেমন নিস্প্রভ হইয়া দেবতাগণের শোক বর্দ্ধন করিয়াছিল সেইরূপ রাজার বিরহে অন্তঃপুর শোভাহীন ও সংস্কার বিহীন হইয়াছিল। ভরত ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

---
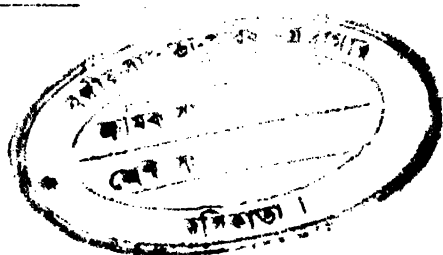
৩২ অধ্যায়।

নন্দিগ্রামে শ্রীভরত।

তদা হি যৎকার্য্যমুপৈতি কিঞ্চি—
দুপায়নঞ্চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য
চকার পশ্চাদ্ভরতো যথাবৎ॥ বাল্মীকি

মাতাগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া ভরত বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি গুরুজন সমূহকে বলিতে লাগিলেন আমি নন্দিগ্রামে যাইব—আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। রাঘব বিয়োগ জনিত দুঃখ সমূহ সেখানেই সহ্য করিব।

গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্ম্মম।
রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ॥

হায়! রাজা স্বর্গে গিয়াছেন, বনবাসী রামই আমার গুরু; আমি রাজ্যের জন্য রামের প্রতীক্ষা করিব; মহাযশস্বী তিনিই রাজা। সকলেই ভরতের কথা শুনিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন—ভরত! তোমার চরিত্রের অনুরূপ কথাই তুমি বলিয়াছ। কোন্ পুরুষ তোমার কথায় অনুমোদন না করিবে?

ভরত আর বিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ সুমন্ত্রকে রথ সজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। জননী সকলকে প্রণাম করিয়া ভরত শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। বশিষ্ঠাদি অগ্রে পূর্ব্বমুখে চলিলেন। হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণ আহূত না হইয়াও অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটেই নন্দিগ্রাম। রামপাদুকা মস্তকে ধরিয়া ভরত নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিলেন। রথ হইতে অবতরণ করিয়া গুরুজন সকলকে বলিতে লাগিলেন—রাম এই রাজ্যভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন এক্ষণে এই হেমভূষিত পাদুকাযুগলই যোগক্ষেম বহন করিবে। রামপ্রদত্ত পাদুকা মস্তকে ধরিয়াই দুঃখসন্তপ্ত ভরত সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে বলিতে লাগিলেন—তোমরা সত্বর ছত্র ধারণ কর—ইহাকেই আমি আর্য্য রামের চরণযুগল মনে করিব। ইহার প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম্মব্যবস্থা থাকিবে। এই রাজ্য আমার উপর ন্যস্ত। যতদিন তিনি ফিরিয়া না আসিতেছেন ততদিন আমি যথা বিধানে রাজ্য পালন করিব। তিনি ফিরিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা সেই চরণে

সংযোজিত করিয়া সেই শ্রীচরণে অর্পণ করিব এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিয়া গুরুচিত শুশ্রূষা করিব। এই পাদুকা, এই রাজ্য, এই অযোধ্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আমি তখন বীতপাপ হইব।

শ্রীভরত জটা-বল্কল ধারণ করিলেন, মুনিবেশ ধরিলেন, ধরিয়া সৈন্যগণসহ নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীভরত স্বয়ং চামর ব্যজন করিতেন, ছত্র ধারণ করিতেন, সমস্ত শাসন ব্যাপার পাদুকাকে নিবেদন করিতেন।

আর্য্যপাদুকাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীভরত পাদুকার অধীনে সর্ব্বদা রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তখন হইতে রাজকার্য্য যাহা উপস্থিত হইত, বহুমূল্য উপঢৌকন যাহা কিছু আসিত শ্রীভরত প্রথমেই শ্রীপাদুকাকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার করিতেন।

মানুষ এখনও যদি শ্রীভরতের সাধনা করেন তবে বুঝি রামপ্রাপ্তি এই জীবনেই লাভ হয়। পাদুকাই হউক বা পটের ছবিই হউক বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিই হউক কিছু একটি অবলম্বন করা হউক। যে রাম অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে এই জগতের বা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তি—অর্থাৎ যাঁহার উপরে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বস্তু সমূহ প্রতিবিম্বিত হইয়া যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ড আকারে আকারিত করিয়াছে—অথবা যে চিৎশক্তি-মণ্ডিত চিৎরামে—অতিবৃহৎ নির্ম্মল স্ফটিক শিলায় যেমন ঊর্দ্ধঅধঃ পার্শ্বে আকাশ সূর্য্য বন পর্ব্বত বৃক্ষলতা সমস্ত বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া নির্ম্মল স্ফটিককে আকারিত করে সেইরূপে রামকেই জগদাকারে আকারিত করিয়াছে; এক কথায় যাঁহার চিদানন্দ স্বরূপ, মায়া রচিত বিচিত্র বস্তু সমূহ দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই নির্ম্মল নিরাকার বস্তুকে রূপ ধরাইয়াছে—এই ভাবে যিনি নিরাকার নিরবয়ব তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই আবার সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মা—আবার তিনিই নরাকার রামরূপে অবতার—এই নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতারের ভাব ঐ অবলম্বনটিতে ধারণা করিয়া—ঐ অবলম্বনটিতে রামকে আহ্বান করিয়া যাহা কিছু করিতে যাও—তাহা ভাবনাই হউক, বাক্যই হউক বা কর্ম্মই হউক সমস্ত অগ্রে নিবেদন কর —যাহা কর, যাহা খাও অথবা যজ্ঞ, দান, তপস্যা—এই লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কার্য্য অগ্রে নিবেদন কর—করিয়া চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষা কর এই সাধনা কর—যদি বিনা আলস্যে, বিনা অবসাদে এই তপস্যা করিতে পার তবে নিশ্চয়ই রামকে পাওয়া যাইবেই।

৩৩ অধ্যায়।

চিত্রকূটে উপদ্রব কথা।

"ত্বং যদাপ্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্ত্তসে।
তদা প্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্ব্বন্তি তাপসান্॥ বাল্মীকি।

ভরত চলিয়া গিয়াছেন, রাম চিত্রকূটবনে বাস করিতেছেন। রাম লক্ষ্য করিলেন চিত্রকূটের তপস্বিগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং বনান্তরে গমন করিতে উৎসুক। যাঁহারা পূর্ব্বে ঐস্থানে রামকে আশ্রয় করিয়া সুখে ছিলেন তাঁহারা ভ্রূকুটী কুটীল নয়নে রামকে নির্দ্দেশ করিয়া শঙ্কিত ভাবে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহেন। রামের সন্দেহ হইয়াছে, তিনি কুলপতি ঋষিকে কৃতাঞ্জলি-পুটে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্ আপনাদের এই মনোবিকারের কারণ কি? আপনারা আমার ব্যবহারে পূর্ব্বানুচরিত রাজগণের অননুরূপ কিছু বিকৃত ভাব কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন? লক্ষ্মণ কি প্রমাদবশতঃ কোন অন্যায় আচরণ করিতেছে? সীতা অর্ঘ্যপাদ্যাদি দ্বারা সততই আপনাদের সেবা করিয়া থাকেন এক্ষণে আমার শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্তা সীতা কি স্ত্রীজনোচিত আপনাদের সেবাকার্য্যে বিরত হইয়াছেন?

তপোবৃদ্ধ জরাজীর্ণ আশ্রমস্বামী কম্পিতদেহে সর্ব্বভূতে দয়াপরতন্ত্র রাম—চন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন বৎস! শুচিস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সীতাদেবীর কাহারও প্রতি—বিশেষতঃ আমাদের প্রতি কর্ত্তব্যে কখন কি শৈথিল্য হইতে পারে? তুমি বা লক্ষণ কাহারও অন্যায় আচরণ আমরা দেখি নাই। তবে এক্ষণে তোমার নিমিত্তই ঋষিগণের উপরে রাক্ষসগণের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, সেইজন্য আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া নির্জ্জনে নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছি। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর নামে এক নিশাচর অতিশয় দুর্দ্দান্ত, নৃশংস, নির্ভীক, নরখাদক; সে জনস্থানবাসী ঋষিগণকে বড়ই উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, আর তোমাকেও সে অবজ্ঞা করিতেছে। তাত! যে অবধি তুমি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই অবধি রাক্ষসেরা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে। কখন ক্রূর ভীষণ বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়া ইহারা আইসে কখন বা নানারূপ অসুখদর্শন বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাপসদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদের উপরে পাপজনক অশুচি পদার্থ সকল নিক্ষেপ করে এবং সম্মুখে যাঁহাকে পায় তাঁহাকেই যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে। রাক্ষসেরা আশ্রমের সকল স্থানেই নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন করিয়া নিদ্রাকালে অল্পপ্রাণ তাপসদিগকে

বাহুপাশে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণসংহার করিয়া আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকে। আবার ইহারা যজ্ঞকালে স্রুক প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ সমূহ নানা স্থানে নিক্ষেপ করে, অগ্নি সকলে জলসেচন করে এবং কলস সকল ভাঙ্গিয়া দেয়। ঐ সকল দুরাত্মারা এইরূপ উপদ্রব করিতেছে বলিয়া ঋষিগণ এক্ষণে আশ্রম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবার জন্য আমাকেও ত্বরান্বিত হইতে বলিতেছেন। রাক্ষসেরা তাপসগণের প্রাণসংহার না করিতে করিতেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিব। অদূরে মহর্ষি অশ্বের (ন বিদ্যতে শ্বঃ সঞ্চয়ো যস্য তস্য মহর্ষেঃ এতেন রক্ষোভয় নিবারণক্ষমত্বং তস্য দর্শিতম্) বহু মূল ফল সম্পন্ন তপোবন, আমরা সগণে তথায় প্রস্থান করিব। খর রাক্ষস তোমার উপরেও উপদ্রব করিবে, যদি রুচি হয় তবে তৎপূর্ব্বেই তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তুমি সতত সাবধান এবং উৎপাৎ নিবারণেও সমর্থ তথাপি ভার্য্যার সহিত এই আশ্রমে সন্দেহে বাস করা নিতান্ত অসুখকর হইবে।

কুলপতি এইরূপ বলিলে রাজপুত্র রাম 'আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিব আপনাদের ভয় নাই' ইত্যাদি বাক্যেও তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। ঋষিগণ রামকে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্ত্বনা করিয়া সদলে আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

প্রস্থানকালে কুলপতি পুনঃ পুনঃ রামকে আশ্রম ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া পর্ণ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য রাম ক্ষণকালের জন্যও আশ্রম ত্যাগ করিতেন না। কতিপয় ঋষি রাঘবে বিপত্তিনাশের শক্তি আছে জানিয়া আর্য্যচরিত রামের অনুগত হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন না।

বেদও এই কথা বলিয়াছেন। অসম্বন্ধ প্রলাপের সহিত যদি তুমি মন্ত্র উচ্চারণ কর বা নাম কর তখন রাক্ষসে তোমাকে অপহরণ করে। সকল কালেই তপস্যার বিঘ্ন। ত্রেতা যুগে যাঁহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনভূমি আশ্রয় করিতেন, তাঁহাদের উপর রাক্ষসদিগের অত্যাচারের কথা শুনিয়া প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠে। যাঁহারা তপস্যার উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই সেই অল্পপ্রাণ তাপসেরা যখন নিদ্রাভিভূত হয়েন তখন নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে বিকটমূর্ত্তি ধরিয়া কোন রাক্ষস আসিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নিদ্রিত তাপসকে টানিয়া লয়, লইয়া বহু যাতনা দিতে দিতে প্রাণসংহার করে। এইরূপ যাতনা দিয়া প্রাণসংহার করিয়া রাক্ষসেরা আনন্দ করে।

আর এই কলিযুগে? মানুষ ত ক্রমশঃ একালে একান্তের তপস্যা করিতেই পারে না। লোকালয়ে থাকিয়া যতটুকু তপস্যা করিতে চেষ্টা করে তাহাতেও কত বিঘ্ন পায়? ঋষিগণ উপদ্রুত হইলে স্থান ত্যাগ করিতেন হায়! এই ঘোর কলিযুগে সর্ব্বত্রই রাক্ষসের উৎপাৎ—স্থান ত্যাগ ত মানুষ করিতেই পারে না। যদিও কেহ ভাগ্যবশে করেন সেখানেও উৎপাতের শেষ থাকে না। স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিবে স্থূলভাবে রাক্ষসে গ্রহণ না করিলেও তোমার তপস্যার সময় সূক্ষ্মভাবে তোমায় রাক্ষসে গ্রহণ করে। ভিতরে বাহিরে যেখানে উপদ্রব সেখানে মানুষ করিবে কি? প্রতাপশালী নূতন ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণে সমর্থ বিশ্বামিত্রভগবানের যজ্ঞেও অত্যাচার হইত আর ঋষিগণ যখন কোথাও স্থান করিতেন—সেখানেও উপদ্রব হইলে সব সহ্য করিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতেন। আর এই কালে মানুষ করিবে কি? সহ্য করিবারও সামার্থ্য নাই—বল—এক ভগবানের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন মানুষের আর কোন্ উপায় আছে? শত বিঘ্ন, শত উপদ্রব সহ্য করিবার জন্যও ভগবানকে ডাকা চাই! সকল দুঃখ তাঁহাকেই জানান চাই। সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতেই চেষ্টা করা চাই। হায়! কলির ব্যভিচারী মানুষ! দুঃখে দুঃখে শ্রীভগবানের কাছেই ইহারা মনে মনে নালিশ করিতে অভ্যাস করুক। মন্ত্র বল, নাম বল, বা মূর্ত্তি বল—এই সকলে শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়া ঘন ঘন নাম করুক ইহাতেই মানুষের মঙ্গল হইবে। ঐ যে লোকে বলে "নামও যে করিতে পারি না" ইহা কেন হয়? পাপের জন্য ভগবানের নাম জিহ্বায় আসে না—রাম রাম স্মরণ হয় না। কিন্তু রাম রাম করা ভিন্ন পাপ দূরত হইবে না। নিত্যকর্ম্মে রামের আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিতেছি, ঘন ঘন নাম করিয়া, আর সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি আর যাঁহারা কিছু অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা নির্ম্মল আমিকে—নির্ম্মল চৈতন্যকে—নির্ম্মল আত্মাকে লাভ করিবার জন্য "আমার" ত্যাগে "আমি" পাওয়া যায় জানিয়াও "আমার" যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহাকে অনাত্মা ভাবিয়া, "আমার"কে অনাত্মাকে অগ্রাহ্য করিয়া অনাত্মাকে ভাল লাগালাগি ত্যাগ করিয়া, নাম করুন আর আলস্য ত্যাগ করিয়া নিরন্তর স্বাধ্যায় করুন—ইহা ভিন্ন আর কোন্ উপায় ইহাঁদের আছে? তাই ভক্তবলেন এই ঘোর কলিকালে "রামহি ভজহু রে চতুর নর"। লোকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই উপদেশ মত কার্য্য করিতে করিতে জীব সেবা করুক ইহাই শুভ।

৩৪ অধ্যায়।

অত্রি তপোবনে।

"ত্বঞ্চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত" বাল্মীকি।

তাপসেরা চলিয়া গিয়াছেন। নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিলনা। রাম চিন্তা করিলেন এইখানে ভরত, মাতাগণ নগর-বাসিগণ সকলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাঁহাদের কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাকে শোকাকুল করিতেছে। ভরতের স্কন্ধাবার (শিবির) স্থাপনে এবং হস্তী অশ্বের করীষে (শুষ্কপুরীষে) আশ্রম অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র হইয়াছে। এক্ষেত্রে স্থানান্তরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। পারিবে কি শ্রীভগবানের প্রদর্শিত পথে চলিতে? যেস্থানে কুসঙ্গ হইয়া গিয়াছে, যেখানে শোকের স্মরণে প্রাণ ব্যাকুল হয়—পারিবে কি সে স্থান ত্যাগ করিতে?

যাহা হউক দণ্ডকারণ্যে কার্য্য আছে চিন্তা করিয়া রাম, রামগিরি ত্যাগ করিলেন। এখনও মানুষ কামদগিরি পরিক্রমার পর যে পথে শ্রীভগবান, ভগবান অত্রির আশ্রমে গিয়াছিলেন সেইপথে পর্ব্বত আরোহণ করেন। তখন সমস্তই বন ছিল এখন শস্যক্ষেত্র পার হইয়া পর্ব্বতে উঠিতে হয়। পর্ব্বতে উঠিয়া আবার বন পাওয়া যায়। এখনও ঐ বনপথে দুই চারিটি ময়ূর "কেও" "কেও" করিয়া যেন রামের কথা স্মরণ করে। আহা! তুমি পর্ব্বতে উঠিতে ক্লেশ বোধ কর কিন্তু মা জানকী কিরূপে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন? কিরূপে বনভূমিতে হাঁটিয়াছিলেন? শিরিষ কোমল সুকুমার অবয়বে কেমন করিয়া শীতাতপ সহ্য করিয়া দুর্গম বনপথে চলিয়াছিলেন—এই সমস্ত স্মরণেও কি তোমার ক্লেশের লাঘব হয় না? অত্রি ভগবানের তপোবনে যাইবার পথে এখনও মা জানকীর রন্ধনস্থান পাণ্ডাগণ দেখাইয়া থাকেন, এখনও পরবর্ত্তী সময়ের হনুমান ধারায় বসিয়া মানুষ বিশ্রাম করে।

শ্রীভগবান লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে অত্রি ভগবানের আশ্রমে আসিতেছেন। "সর্ব্বত্র সুখসংবাসং জনসম্বাধবর্জ্জিতম্"—তপোবনের সর্ব্বত্রই সুখে বাস করা যায় গ্রাম্য জনমানবের নাম গন্ধও সেখানে নাই।

তপোবনে আসিয়া "দণ্ডবৎপ্রণিপাত্যাহ রামোহহমভিবাদয়ে"—দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রাম বলিলেন আমি রাম আপনাকে প্রণাম করিতেছি। পিতৃআজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া আমি দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছি আপনাকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

অত্রি ভগবান্ রামকে পরমপুরুষ জানিয়া বিধিবৎ পূজা করিলেন; বন্য ফলমূলে রাম, সীতা, লক্ষ্মণের আতিথ্য করিলেন। আনন্দে বৃদ্ধ ঋষি অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন—সর্ব্বাঙ্গে পুলক; ঋষি আনন্দে ভরিত হইয়া যাইতেছেন।

অত্রি রাম সংবাদের কিছু আমরা অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে দেখাইলাম। ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন "তঞ্চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রতিপদ্যত" অত্রি ভগবান্ রামকে পুত্রবৎ আলিঙ্গন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। ঋষি স্বয়ং রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের আতিথ্য সম্পাদন করিয়া প্রেমভরিত চক্ষে ইঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন "সমসান্ত্বয়ৎ"—প্রীতিযুক্তেন চক্ষুষাপশ্যৎ। এই সময়ে অনুসূয়া তথায় আসিলেন। ঋষি তখন স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে সীতার অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন। অত্রি ভগবান্ ধর্ম্মচারিণী অনুসূয়ার পরিচয় দিয়া রামকে বলিলেন রাম! একবার দশ বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি হয় তাহাতে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। উগ্রতপস্যাযুক্ত—নিয়মধারিণী এই অনুসূয়া তখন স্বীয় কঠোর তপস্যা প্রভাবে ফলমূল সৃষ্টি করেন এবং জাহ্নবী গঙ্গাকে আনয়ন করেন। বৎস! তপস্যা ও ব্রতে ইনি নিতান্ত নিষ্ঠাবতী; দশ সহস্র বৎসর ধরিয়া উগ্র তপস্যা করেন এবং ঋষিগণের তপোবিঘ্ন দূর করেন। একদা মহর্ষি মাণ্ডব্য এক ঋষি পত্নীকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে রাত্রি প্রভাতে তুমি বিধবা হইবে। এই ঋষিপত্নী অনুসূয়ার সখী। সখীর জন্য অনুসূয়া আপন তপস্যা প্রভাবে সেই রাত্রি প্রভাত হইতে দেন নাই, সেই রাত্রিকে দশরাত্রি পরিমিত কাল স্থগিত রাখেন। এই সমস্ত কারণে ইনি সকলের নিকট মাতৃবৎ পূজনীয়া। রাম তুমি বৈদিহীকে ইঁহার সহিত মিলন করাইয়া দাও। রাম, সীতাকে তাহাই করিতে বলিলেন আরও বলিলেন মৈথিলি! ইনি পরমতপঃশালিনী, সর্ব্বলোক আদরণীয়া ইনি আপন কর্ম্মপ্রভাবে লোক মধ্যে "অনুসূয়া" নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। তুমি আত্মহিতের জন্য সত্বর এই ঋষিপত্নীর নিকটে গমন কর। জরাপ্রযুক্ত যাঁহার শরীর শিথিল হইয়া গিয়াছে, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বলি-রেখায় অঙ্কিত, অতি বৃদ্ধা বলিয়া যাঁহার কেশজাল একবারে শুক্ল হইয়া গিয়াছে, যিনি বায়ুবিকম্পিত কদলী তরুর ন্যায় সর্ব্বদা বেপমানাঙ্গী সীতা সেই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা ঋষিপত্নীকে অভিবাদন করিয়া নিজ নাম উল্লেখ করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সর্ব্ব বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিধবা বিবাহ।

বিধবা বিবাহ যাঁহারা শাস্ত্র সম্মত বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা বলেন যে মহর্ষি পরাশর ও নারদ নিম্নলিখিত বচনে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, ক্লীব হয় অথবা পতিত হয়, তাহা হইলে এই পাঁচ প্রকার আপদে ঐ কন্যার অন্য পতি বিধান করিবে।

যাঁহারা এই শ্লোকের অর্থ বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্পর্কে করেন, তাঁহারা বলেন যে এখানে পতি শব্দের অর্থ বাগ্‌দত্তার পতি, বিবাহিত পতি নহে। কোনও কন্যার বাগ্‌দান মাত্র হইয়াছে এরূপ স্থলে ঐ পাঁচ প্রকার অবস্থা ঘটিলে অন্য পাত্রে সমর্পণ করিতে পারা যায়।

এই শ্লোকের অর্থ নিয়া বহুকাল এইরূপ বিতর্ক চলিতেছে। ইহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু সমাজ কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং এই বিশাল ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই এবং ইহা যে দেশাচার বিরুদ্ধ তাহা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার বিধবা গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

এখন নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনের প্রকৃত অর্থ কি এবং ঐ পাঁচ প্রকার অবস্থায় কোন স্থলে বিবাহ আদিষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডের দিব্যা দেবীর উপাখ্যান আলোচনা করা আবশ্যক। আখ্যায়িকাটী এই :—

প্লক্ষ দ্বীপে দিবোদাস নামে এক পুণ্যধর্ম্মাত্মা মহারাজ ছিলেন। তাঁহার দিব্যাদেবী নামে এক রূপগুণসম্পন্না কন্যা ছিল। পিতা কন্যাকে প্রথম বয়সে রূপযৌবনশালিনী অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন,—কোন্ মহাত্মা সুপাত্রের করে কন্যা প্রদান করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া মহীপতি বরানুসন্ধান করিতে

লাগিলেন। অবশেষে রূপ দেশের রাজা মহাত্মা চিত্রসেনকে বর স্থির করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ধীমান চিত্রসেনের করে মহাত্মা দিবোদাস কর্ত্তৃক কন্যা অর্পিত বাগদত্তা হইল। কিন্তু বিবাহকাল উপস্থিত হইলে চিত্রসেন কাল ধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস রাজা চিন্তিত হইয়া সুব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার এই কন্যার বিবাহকালে ভাবী বর চিত্রসেন স্বর্গগমন করিয়াছেন। এই কন্যা সম্বন্ধে কিরূপ করা উচিত তাহা আপনারা বলুন।

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—রাজন্! কন্যার বৈধ বিবাহই দৃষ্ট হয়। পতি যদি স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কিম্বা অতিমাত্র আধিব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যায়, অথবা যদি প্রব্রজিত হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান এই যে, **অনুদ্বাহিত** কন্যার উদ্বাহ করা হয়; ইহাই বুধগণের মত। অপিচ যে পর্য্যন্ত না রজঃস্বলা হয় তাহার অন্য পতি গ্রহণ বিধিসঙ্গত। পিতা এইরূপ কন্যার যথাবিধি বিবাহ দিবেন। হে রাজন্! ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ বুধজনের ইহাই অভিমত। অতএব আপনি আপনার এই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে পারেন।

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

বিবাহো দৃশ্যতে রাজন্ কন্যায়াস্তু বিধানতঃ।
পতির্মৃত্যুং প্রয়াত্যস নো চেৎ সঙ্গং করোতি চ ॥৬২
মহাধিব্যাধিনা গ্রস্তস্ত্যাগং কৃত্বা প্রয়াতি চ।
প্রব্রাজিতো ভবেদ্রাজন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রেষু দৃশ্যতে ॥৬৩
অনুদ্বাহিতায়াঃ কন্যায়া উদ্বাহঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
ন স্যাদ্রজস্বলা যাবদন্যঃ পতির্বিধীয়তে ॥৬৪
বিবাহস্তু বিধানেন পিতা কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ।
এবং রাজন্ সমাদিষ্টং ধর্ম্মশাস্ত্রং বুধৈর্জনৈঃ ॥৬৫

তাহা হইলে ব্যবস্থা দাঁড়াইল অনুদ্বাহিতা কন্যার রজঃস্বলা হওয়ার পূর্ব্বে যদি বাগ্‌দত্ত স্বামীর মৃত্যু হয়, মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যায়, অথবা যদি প্রব্রজিত হয় তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান মত স্ত্রীর বিবাহ হইতে পারিবে। কাজেই নষ্টে মৃতে বচনটী যে বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্বন্ধে প্রযোজ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ রাজাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের

এইরূপই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং তাহাই সমীচীন ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ ব্যবস্থা। ঋতুদর্শনের পরে বাগ্‌দত্তা কন্যারও বিবাহ হইতে পারে না। **উদ্বাহ** অর্থাৎ বিবাহ হয় নাই অথচ বাগদত্তা হইয়াছে এরূপ কন্যা যদি রজস্বলা হইয়া না থাকে তাহা হইলে পতি মরিলে, ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অথবা প্রব্রজিত হইলে বৈধ বিবাহ হইতে পারিবে। **নারদ** স্মৃতির দ্বাদশ ব্যবহারাধ্যায় আলোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। নারদ ৭ প্রকার পর পূর্ব্বা স্ত্রীর কথা বলিয়াছেন—৩টীর নাম দিয়াছেন পুনর্ভূ ও ৪টীর নাম দিয়াছেন স্বৈরিণী।

পরপূর্ব্ব স্ত্রিয়স্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্।
পুনর্ভূস্ত্রি বিধাস্তাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা ॥৪৫

যে স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছে কিন্তু পতি সংসর্গ হয় নাই সে যদি **পুনঃ সংস্কার** দ্বারা পুরুষান্তার প্রাপ্ত হয় তাহাকে ১ম শ্রেণীর পুনর্ভূ বলে।

কন্যৈ বা ক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পূনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥৪৬

এই শ্লোকে স্পষ্টই বলিলেন যাহারা পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহের দ্বারা **দূষিতা** হইয়াছেন তাহাদের সহিত স্বামীর সংসর্গ হউক বা না হউক তাহাদের পুনর্ভূ সংস্কার দ্বারা পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহারা ১ম শ্রেণীর পুনর্ভূ হইবে। শ্লোকের "পুনঃ সংস্কার" কুমারী বিবাহের সংস্কারের ন্যায় সংস্কার নহে, ইহা এক প্রকার লোকাচার প্রচলিত ছিল তাহার নাম পুনর্ভূ সংস্কার—আসাম দেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে এই প্রকার একটা লৌকিক আচার আছে। তাহার নাম "**আগ চাউল**" ইহাতে কোন মন্ত্রাদি পাঠ হয় না এবং কোন পুরোহিত ডাকা হয় না। কতকগুলি স্ত্রী আচার আছে তাহা করিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, এইরূপ স্ত্রী সমাজের চক্ষে হেয়।—৪৭ শ্লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীয় ও ৪৮ শ্লোকে তৃতীয় শ্রেণীয় পুনর্ভূ কথা বলিলেন।

কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য যা ত্বন্যং পুরুষং শ্রিতা।
পুনঃ পত্যুর্গৃহমিয়াৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥৪৭॥

কুমার পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুকাল পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া যে স্ত্রী পুনরায় পতির নিকট আইসে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ।

অসৎ স্থ দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥৪৮॥

দেবরের অভাবে যে স্ত্রী পতির সবর্ণ সপিণ্ডকে অর্পিত হয় সে তৃতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ।

ইহার পর চার প্রকার স্বৈরিণীর কথা বলিয়াছেন। তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না।

এই কয়টী শ্লোকের দ্বারা দেখা যায় যে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকিলে সে ক্ষতযোনি বা অক্ষতযোনি হউক তাহার বিবাহ কুমারী কন্যার মত হইতে পারে না; এক প্রকার সংস্কার হইতে পারিত তাহাকে শাস্ত্রকারগণ পুনর্ভূ সংস্কার বলিয়াছেন।

এইরূপ স্ত্রীগণকে যে পুনর্ভূ বলিত তাহা সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত।

যাজ্ঞবল্ক্য—

অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ॥১।৬৭

পুনঃ সংস্কৃতা অক্ষতা এবং ক্ষতার নাম পুনর্ভূ। আর যে স্ত্রী নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া সবর্ণ কোন পুরুষকে আশ্রয় করে তাহার নাম স্বৈরিণী!

এইরূপ পুনর্ভূস্ত্রী ও তাহার সন্তান এবং স্বামীর অবস্থা কিরূপ শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আলোচ্য।

অঙ্গিরা—

অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রগীয়তে॥৬৬

এইরূপ পুনর্ভূস্ত্রীর অন্ন ভোজন নিষেধ।

বৃহৎপরাশর—অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে।
অস্যা অপি ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূ কীর্ত্তিতা হি সা॥৹

এখানে ও পুনর্ভূর অন্ন গ্রহণ নিষেধ।

যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ২২২।২২৪ শ্লোকে—

পুনর্ভূরপুত্র ও পুনর্ভূপতিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ ১৭ অধ্যায়ঃ—

যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তার মুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্বতি।

যে স্ত্রী ক্লীব পতিত বা উন্মত্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করে, অথবা এক স্বামী মরিলে অন্য স্বামী আশ্রয় করে সেই স্ত্রীকে পুনর্ভূ কহে।

ভগবান মনু ও ৩।১৫৫ পুনর্ভূর পুত্র ও ১৬৬ শ্লোকে পরপূর্ব্বার পতিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তিন কন্যার বিবাহও একবারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সকৃদংশো নিপততি সকৃত কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদামীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥

পৈতৃক সম্পত্তি একবারই বিভক্ত হইয়া থাকে। কন্যা একবারই বরকে সম্প্রদান করা হয় এবং সকল পদার্থের দান একবারই করা যায়, এই জন্য সজ্জনগণ এই তিন কার্য্য একবারই করিবেন। উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।ঃ—

(১) নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন বাগ্‌দত্তা কন্যা বিষয়ক। বাগ্‌দত্তা কন্যার এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় অন্যপতি সহ বিবাহ হইতে পারে। পদ্ম পুরাণোক্ত আখ্যায়িকায় ব্রাহ্মণগণও অনুদ্বাহিতা অর্থাৎ বাগ্‌দত্তা কন্যার রজস্বলার পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসম্মত বলিয়াছেন।

(২) নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন যাঁহারা বিবাহিতা কন্যা সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে চাহেন তাঁহারাও ব্রাহ্ম-বিবাহের ন্যায় কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। কারণ বিবাহ দ্বারা দূষিত কন্যার স্বামীর সহিত সহবাস হউক বা না হউক একপ্রকার সংস্কার (যাহার নাম পুনর্ভূ সংস্কার) দ্বারা অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিত। এইরূপ স্ত্রী, পতী ও পুত্র সমাজে হেয় ছিল। উহাদের অন্য কেহ গ্রহণ করিত না, উহারা অপাংক্তেয় ও সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবহিষ্কৃত।

অসুপুত্রাস্তু যে জাতাস্তে বর্জ্যা হব্য কব্যয়োঃ।
তথৈব যতয়স্তাসাং বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ॥ বৃহপরা ৫ অধ্যায়—

ইহাদের গর্ভজাত পুত্র কুপুত্র ও হব্যকব্যে বর্জ্জনীয়। ঐ সকল সন্তান যদি ব্রহ্মচারীর ন্যায়ও হয় তথাপি যত্ন সহকারে বর্জ্জনীয়।

শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত
(রায়বাহাদুর—ভূতপূর্ব্ব সহকারী উকিল
গৌহাটীর ধর্ম্মসভার সম্পাদক।)

নির্জ্জনে—মধুপুর।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

কি চাও তুমি?

তা কি দিবে যে জিজ্ঞাসা কর?

বিশ্বাস কি রাখ যে দিতে পারি?

তা রাখি। সব তোমার আছে—সব দিতেও পার তুমি এ বিশ্বাস রাখি।

তবে?

আমার যে কর্ম্ম ভাল নয়—তাই—

এই যে এমন সুন্দর স্থানে আনিয়াছি, এই যে এমন সঙ্গ দিয়াছি—বল দেখি এখন কি তোমার মনে আছে তোমার কর্ম্ম ভাল কি মন্দ?

সত্যই ত আমার কর্ম্মের কথা ত মনেই ছিল না। কর্ম্মের কথা এখনও যেন মনে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যেন জোর করিয়া এই জীবনের কর্ম্ম সকল ভাবিতে হইতেছে।

বলিতে পার কেন কর্ম্মের কথা ভাবিতেও ইচ্ছা হয় না?

পারি। তুমি এমন কিছু আনন্দে ডুবাইয়া দিতেছ যেখানে দেহটাও থাকিতে চায় না—হারাইয়া যাইতেছে এক জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন মন আর কিছুই লইয়া থাকিতে চায় না—তা সে কি করিয়াছে না করিয়াছে ভাবিবে কখন?

এখানে কি পাইলে যে তোমার আর সব ভুল হইয়া গেল আমিই রহিলাম ?

পোড়া মাটীর ঘরে থাকি, চারিদিকে কেবল চিৎকার, কেবল প্রাকৃত কথা, কেবল বিরুদ্ধ কথা—ভিতরে সব থাকে, সব ফুটিতে চায় কিন্তু ফুটিতে পারে না, যা হোক তা হোক করিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া যাই। কিন্তু তুমি যে বলিলে এমন সুন্দর স্থানে আনিয়াছি এমন সুন্দর সঙ্গ দিয়াছি—আহা ! সুন্দর স্থানে আর সুন্দর সঙ্গেই সব ভাল যাহা তাহাই ফুটিয়া উঠে।

কিরূপে ?

সুন্দর সঙ্গ হয় বলিয়া নির্জ্জন স্থান বড় সুন্দর। চারিদিকে বৃক্ষগুলি ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" শ্রুতিত ঠিক বলিয়াছেন। এই সব সঙ্গী যাঁহার ধ্যান করিতেছে - যে ইহাদের সঙ্গ করে তাহাকেও ইহারা তাঁরই ধ্যানের দিকে টানিয়া লয়। ভালর সঙ্গ কর ভাল তোমায় টানিবে, মন্দের সঙ্গ কর মন্দ তোমায় টানিবে। মন্দ হইতে তোমার ইচ্ছা নাই, তবুও সঙ্গ দোষে তোমার ভালটি ফুটিতে পারিবে না—তুমি যেন যা চাও তা পাওনা বলিয়া ছাই রাই হইয়া থাক। কিন্তু কোলাহল শূন্য স্থানে বৃক্ষলতা পুষ্প ফলের সঙ্গে ধ্যানের বস্তু ফুটিয়া উঠিতে চায়—যাহারা "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" তাহারা নীরব ভাষায় জীবন্ত প্রার্থনা জাগাইয়া দেয়। প্রাণ ভরিয়া উঠে—উঠিয়া—লুটাইয়া লুটাইয়া সঙ্গীদিগকে বলে আহা ! আমাকে অমনি করিয়া তার চরণ তলে লইয়া চল। চারিদিকে বৃক্ষলতা—উপরে নীল অনন্ত আকাশ। সমন্তাৎ প্রসারিত—অপার পর্য্যন্ত নভ বিশাল হৃদয়ে এই ক্ষুদ্র হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া—ইহাকে বিশাল করিয়া লইয়া দেখাইয়া দেয় ঐ তোমার থাকিবার স্থান। পাখী সকল নানাপ্রকার কাকলী তুলিয়া তারই সংবাদ বহিয়া আনে। প্রজাপতি মত্ত হইয়া তাহাতেই যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বসে। তৃণগুচ্ছ যে ঊর্দ্ধমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তা তাহারা তার দিকেই যে তাকাইয়া আছে তাহা বলিয়া দেয়। বায়ু এই কোলাহলশূন্য স্থানে বৃক্ষলতা তৃণ গুল্ম সকলের সঙ্গে সেই সতের সঙ্গের কথা শুনাইয়া শুনাইয়া সকলকে কাঁপাইয়া তুলে—বায়ুহিল্লোলে পুলক ভরা হৃদয়ে ইহারা তার কথা লইয়াই শাখা দুলাইয়া নাচে হাসে—যে শুনে তার জন্য তার কথা কত শুনায়। আহা! সৎসঙ্গে যে সকল সৎ কথা—যাহা শাস্ত্র দেখাইয়াছেন, যাহা মানুষ দেবভাবে থাকিলে নির্ম্মল

হৃদয় হইতে যত স্থানে বাহির হইয়াছে শুনিয়াছি—সব সৎ কথা আকাশে নক্ষত্র উঠার মত এক ক্ষণেই যেন ফুটিয়া উঠে—কি করিয়া তোমায় বলিব তুমি যারে কৃপা কর তারে লইয়া কি কর?

আচ্ছা—এখন বল দেখি কি চাও তুমি ...

এখনও কি বলিতে বাকী রহিল?

হাঁ—অনেক। শুধু ত উচ্ছ্বাসের কথা কহিলে। উচ্ছ্বাসের কথায় আনন্দের আভাস জানাইলে—আমি কি তাহা বলিলে কৈ?

তুমি কি তা কি কেহ বলিতে পারে?

পারে বৈ কি? আমি যারে কৃপা করি সে আমার কৃপায় আমাকে জানিতে পারে আমার মত হইতেও পারে। আমি যদি অজানা হইয়াই থাকিতাম তবে আমি বেদস্বরূপ হইয়া কেন বলিতেছি "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"। আমি যদি চিরদিন অজানাই রহিব তবে আমি শ্রুতিমুখে তাঁহাকে জানা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য পথ নাই বলিব কেন? আমি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, আমিই খণ্ড উপাধির মধ্য দিয়া বাহিরেও মূর্ত্তি ধারণ করি ইহা জান তবেই সর্ব্বহৃদিস্থ আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিবে।

ভাগবতে—সাধনার কথা।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

সাধককে ব্যবহারিক জগতে যেমন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয় সেইরূপ একান্তেও সাধনার কার্য্য করিতে হয়।

প্রথমে ব্যবহারিক জগতে আচরণের কথা বলা যাউক। ব্যবহারিক জগতে সুখ দুঃখেই মানুষের মন বিচলিত হয়—এবং উত্তম মধ্যম সমান লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলে মন প্রসন্ন থাকে তাহাও জানা আবশ্যক।

চতুর্থস্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে ভাগবত বলিতেছেন—

মানুষ যে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে মোহই তাহার একমাত্র কারণ। লোকের কর্ম্মই তাহার সুখ দুঃখের বীজ। অতএব ঈশ্বরের আনুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হয় না—ইহা বিবেচনা করিয়া, দৈব হইতে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাতেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। অদৃষ্টবশতঃ সুখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত "আমার পুণ্যক্ষয় হইতেছে," এইরূপ দুঃখ আসিলে মনে করা উচিত "আমার পাপক্ষয় হইতেছে" এইরূপ বিবেচনা করিয়া আত্মাতে সন্তোষ জন্মাইবে; এইরূপ অভ্যাস যিনি ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বদা অভ্যাস করেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আরও গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে, গুণাধম পুরুষের প্রতি দয়া করিবে; এবং সমান লোকের সহিত মিত্রতা করিবে; এইরূপ অভ্যাস করিলে মানুষ সন্তাপে অভিভূত হইবে না।

ব্যবহারিক জগতে এই শান্তিপথ ধরিয়া যিনি সর্ব্বদা চলিতে পারেন, এই শান্তি উপদেশ যিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, এবং মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং পাপকে উপেক্ষা করিতে পারেন তাঁহার চিত্ত রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া কালে শুদ্ধ হয়। ইহার পরে উপাসনা করিতে হয়।

নির্জ্জন স্থানে যখন উপাসনা করিবে তখন প্রথমেই ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। শ্রীভগবানের স্বভাবটি জন্মিলেই উপাসনায় তাঁহার নিকট বসিবার ইচ্ছা লাগিবে।

ভগবান ক্ষমা সার—তোমার সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন যখন তুমি তোমার অপরাধ স্মরণ করিয়া, অপরাধের জন্য প্রাণকে কাতর করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাল্যকাল হইতে এই বয়স পর্য্যন্ত কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে, "তোমাকে ভুলিয়া কোন কর্ম্মই করিবে না" এই আদি প্রতিজ্ঞা কিসের জন্য কতবার, কতদিন লঙ্ঘন করিয়া, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কামের গোলাম হইয়া কতদিন, কতবার, অপকর্ম্ম করিয়াছ, পাপ করিয়া ফেলিয়াছ, তাহার স্মরণে প্রাণকে কাতর করিয়া আর যেন পাপের প্রলোভন আমার উপরে না পড়ে—আর যেন আমি পাপ না করি এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উপাসনার জন্য তাঁহার নিকটে উপবেশন কর।

ভগবান্ ভক্তবৎসল। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহারই পাদপদ্ম সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন। অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বভাবজ কর্ম্মদ্বারা—নিজ কর্ম্মদ্বারা

শোধিত চিত্তে তাঁহার উপাসনা কর। সেই পদ্মাপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন—এরূপ সম্ভাবনা নাই।

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীত পদ্ময়া
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমানয়া॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও—যাঁহার সম্বন্ধে ইতর—তাঁহারাও যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমলবাসিনী লক্ষ্মী আপনার হস্তে দীপবৎ কমল লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার অন্বেষণ করেন। তুমি ভক্তিভাবে শুদ্ধমনে তাঁহারই ভজনা কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার হরি পাদপদ্মের উপাসনাই একমাত্র উপায়।

কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে, কিরূপ সাধনা করিতে হইবে জান?

নির্জ্জন পবিত্র দেশে ভগবান হরি নিত্য অবস্থান করেন—তুমি এরূপ স্থানে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক।

গঙ্গা বা যমুনার পুণ্য সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে; সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া কুশাসনে স্বস্তিকাদি-আসন-নিয়ম ক্রমে উপবিষ্ট হইবে। নির্জ্জন স্থানের জন্য নিত্য প্রার্থনা করিবে। যতদিন তাহা না পাইতেছ ততদিন নিজের গৃহেই নির্জ্জন স্থান করিয়া লইবে।

পরে রেচক-পূরক-কুম্ভকরূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া স্থিরমনে ভগবান্ হরির ধ্যান করিতে থাকিবে।

জীবন্ত ভাবে ধ্যান না করিতে পারিলে ভগবদ্দর্শন মিলে না। ভাগবত এখানে ধ্যানের বস্তুটির রূপ ও গুণ জীবন্ত ভাবে দিয়াছেন।

ভগবান্ হরি দেবগণ মধ্যে পরম সুন্দর। তাঁহার নাসিকা ও ভ্রূযুগল রমণীয়। কপোল মনোহর। বদন ও নয়ন সর্ব্বদাই প্রসন্ন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি প্রসাদ দানে সর্ব্বদাই অভিমুখ। তাঁহার দেহ নব-যৌবন সম্পন্ন। তিনি প্রণতজনের আশ্রয় দাতা, সকলের সুখকর, শরণাগতের প্রতিপালক এবং দয়ার সাগর। তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন; নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ; পুরুষ লক্ষণযুক্ত; বনমালাধারী। তাঁহার বাহু চতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সর্ব্বদা শোভমান। তাঁহার মস্তকে কিরীট; কর্ণে কুণ্ডল; বাহুতে কেয়ূর

ও বলয়; গলদেশে কৌস্তুভ মণি; পরিধানে পীতবসন; নিতম্বদেশ কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত; চরণে স্বর্ণ নূপুর দেদীপ্যমান।

দর্শন যোগ্য যাহা কিছু সামগ্রী আছে, হরি সেই সকলের শ্রেষ্ঠ। বৎস! যে ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করে—নখের ন্যায় মণি-শ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি সেই ভক্তের হৃদ্‌পদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া তাহার মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ধারণা দ্বারা সুস্থির ও একাগ্রচিত্তে বরদশ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্‌কে মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত এবং অনুরাগ সহিত দর্শনকারীর ন্যায় ধ্যান করিবে।

ধ্যানের পর মন্ত্র জপ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ যে সপ্তরাত্র ইহা পাঠ করিলে, ইহার প্রভাবে মানব দেববৃন্দের দর্শন লাভ করিতে পারে। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইহা সিদ্ধ মন্ত্র।

এই মন্ত্র দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক শ্রীভগবানের পূজা করিবে। পবিত্র জল, মাল্য, বন্য ফল মূল, প্রশস্ত দুর্ব্বাঙ্কুর ও বন্যবসন এবং হরিপ্রিয়া তুলসী এই সকল দ্রব্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। শিলাদি-নির্ম্মিতা প্রতিমা যদি দেখিতে চাও তাহাতেই পূজা করিবে। তদভাবে মৃত্তিকা-জলাদিতেও অর্চ্চনা করিবে।

পবিত্র কীর্ত্তি ভগবান স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ মায়া যোগে যাহা যাহা করেন তাহা হৃদয়ের মধ্যে কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে। ভগবানের যতপ্রকার পরিচর্য্যা পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবে।
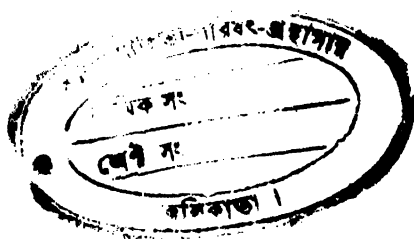
মহাত্মা ৺যোগত্রয়ানন্দের কথা।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,

গত ফাল্গুনের উৎসবে আপনার "অবতার-কথায় আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা ৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে এক স্থলে লিখিত হইয়াছে :—"এই প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে যোগত্রয়ানন্দ বেদ কাহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? তিনি বলিয়াছিলেন, প্রথম বয়সে তিনি পাণিনি অধ্যয়ন জন্য ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট গমন করেন। তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন জন্য বহু কাকুতি মিনতি করেন, বিদ্যাসাগর কিছুতেই সম্মত হননা। শেষে তিনি তাঁহার চরণে পড়েন, তাহাতে জীবানন্দ তাঁহাকে পদাঘাত করেন। ইত্যাদি।" আপনার ঠিক স্মরণ না থাকা বশতই বোধ হয় আমার মনে হয়, উক্ত বিবরণে একটু ভ্রমের সমাবেশ হইয়া গিয়াছে। আমি এই বিষয়টী তাঁহার মুখে একাধিকবার শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার জীবনীর যতটুকু অংশ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম (ইহা তাঁহার জীবদ্দশাতেই লিখিত হইয়াছিল) তাহাতে—চতুর্থ পরিচ্ছেদের (বাল্য ও কৌমার) "বিদ্যাগম" শীর্ষক প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশে—ঘটনাটী নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে ; আপনার পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উদ্ধৃত করিলাম :—

"স্বামীজীর ব্যাকরণ কৌমুদী ও সটীক মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিল বটে, সংস্কৃতের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবার উপযোগী ব্যাকরণের জ্ঞান তাঁহার অর্জ্জিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণ পাঠপিপাসা শান্ত হয় নাই, ব্যাকরণতত্ত্ব পূর্ণভাবে সমধিগত হইয়াছে, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার ইতঃপর পাণিনি ব্যাকরণ পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হইল। কিন্তু বঙ্গদেশে তখন পাণিনি ব্যাকরণের পঠন পাঠনের প্রচলন ছিলনা, মুগ্ধবোধেরই বিশেষ প্রচলন ছিল, পাণিনি ব্যাকরণ পড়াইতে পারেন এরূপ অধ্যাপক পাওয়াও দুষ্কর ছিল। এই নিমিত্ত, ইচ্ছা বলবতী হইলেও তিনি তখন তাহা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। কিছুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে কলিকাতায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি নামে একজন অধ্যাপক আছেন, তাঁহার পাণিনি পড়া আছে, তদ্ব্যতীত আর কাহারও পাণিনি পড়া নাই। অগত্যা পাণিনিপাঠের নিমিত্ত তাঁহারই শরণ গ্রহণ

করিবেন, স্থির করিলেন। সে সময়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় অভিধান প্রস্তুত করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিকটে গিয়া পাণিনি ব্যাকরণ পড়িবার প্রস্তাব করাতে, (উভয়ের কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর) তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বামীজীকে বলিলেন,—"দেখ হে, আমার এখন অবকাশ নাই, আমি এখন অভিধান প্রস্তুত করিতেছি। তা আমি তোমাকে পড়াইব। তুমি ত বেশ বুদ্ধিমান্ এবং সংস্কৃতাদিও বেশ জান, আমার এই অভিধান বিষয়ে আমাকে এখন সাহায্য কর, তাহার পর আমি তোমাকে পড়াইব।" স্বামীজী উত্তর করিলেন, আজ্ঞা, আচ্ছা, আমি তাহা অবশ্যই করিব, তবে আপনি আপনার অবকাশানুসারে আমাকে পাঁচ-দশ মিনিট করিয়া পড়াইবেন।" তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।" তদবধি স্বামীজী নিয়মতরূপে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে যাইতে লাগিলেন এবং অভিধান নির্ম্মাণ বিষয়ে বাচস্পতি মহাশয়কে যথাশক্তি সাহায্য করিতে লাগিলেন। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ের চতুষ্পাঠী কলিকাতায় স্থাপিত ছিল। স্বামীজী বালি হইতে পদব্রজে প্রথমে শালকিয়া পর্য্যন্ত আসিতেন, তথায় নৌকায় পার হইয়া, অথবা হাবড়া পর্য্যন্ত আসিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া, তথা হইতে পুনরায় পদব্রজে (পটলডাঙ্গার নিকট) বাচস্পতি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গমন করিতেন।

"এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু পাঠ আরম্ভ হইলনা। একদিন তর্কবাচস্পতি মহাশয় নিজ চতুষ্পাঠী হইতে বহির্গত হইয়া গোলদীঘির পার্শ্ব দিয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে একস্থানে গমন করিতেছিলেন। স্বামীজীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, স্বামীজীকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সঙ্গে আসিতেছ যে, কিছু বলিবার আছে কি?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"প্রায় ছয় মাস হইয়া গেল, আমার পড়াশুনা কিছু হইলনা; তা, এইবার একটু একটু পাঠ আরম্ভ করিলে হয় না?"

"তর্কবাচস্পতি মহাশয় কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন, আমি এখন পড়াইতে টড়াইতে পারিব না, বাপু, আমার এখন সময় নাই; আমার এই অভিধান সমাপ্ত না হইলে পড়-টড়া হইবে না।

"স্বামীজীর জ্ঞানপিপাসা বস্তুতই অলৌকিক ছিল। তিনি পাণিনি পড়িবার নিমিত্ত অধীর হইয়াছিলেন, আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি

তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পদতলে পড়িয়া গেলেন, এবং তাঁহার চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। "আঃ কর কি, কর কি" বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় পা উঠাইতে যাইতেই, স্বামীজীর বক্ষস্থলে আঘাত লাগিল। স্বামীজী, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অভিমানী বালক ছিলেন, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন, এবং সেই ক্ষণেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আর মানুষের নিকট কখনও পড়িব না'। তদবধি তিনি আর কখনও মানুষের নিকট পড়িতে যান নাই। পরদিন হইতে স্বামীজী পাণিনি ব্যাকরণ খুলিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং পাণিনি দেব এবং পতঞ্জলি দেবের ধ্যান করিতেন, তাঁহাদেরই নিকট হইতে পাঠ জানিয়া লইবেন বলিয়া। দুই তিন দিবস এইরূপ করিবার পর আর তাঁহার লৌকিক কোন গুরুর সাহায্যের প্রয়োজন হইল না, তিনি আপনিই সব বুঝিতে পারিতেন, পাণিনি ও পতঞ্জলি দেবই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। ইহার পর তিনি ৺কাশীধামে গমন করেন; তথায় রাত্রিতে স্বয়ং পড়িতেন, এবং দিবসে ছাত্রদিগকে পাণিনি ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়াইতেন।"

স্বামীজীর বিদ্যাগম সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পাঠকগণ তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারিবেন। বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বামীজীর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই অলৌকিক, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিনের ব্যাপারই অলৌকিকতাপূর্ণ।

গত পৌষের সংখ্যায় পূজ্যপাদ স্বামীজীর জীবনী প্রকাশ সম্বন্ধে আপনাদের উক্তি পাঠ করিয়াছিলাম। স্বামীজীর অন্যান্য ভক্তগণও শীঘ্র তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আপনাদের অনুরোধ আমার শিরোধার্য্য; তথাপি নানা কারণে এতাবৎ আমি তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। বুঝিতেছি, স্বামীজীর ভক্তবৃন্দ তাঁহার অপূর্ণ জীবনী পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবার নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া আছেন, কিন্তু আমার চিত্তের অবস্থা, এখনও এই দুরূহ কার্য্যের উপযোগী হয় নাই বলিয়াই আমি এখনও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই আশা করি, এজন্য সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে, ইতঃপর যথাশক্তি, যথাবুদ্ধি কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্রতী হইবার চেষ্টা করিব। ইতি—

বিনীত নিবেদক
শ্রীনন্দকিশোর বিদ্যানন্দ।

বুদ্ধি-দর্পণ—অন্তর্ম্মুখী হইবার কথা।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

পশ্চাতে ভগবান, সম্মুখে প্রকৃতি আর বুদ্ধি দর্পণ মধ্যে। দর্পণের মুখ প্রকৃতির দিকে। প্রকৃতি যখন যাহা করিতেছেন—দিন হইতেছে, সূর্য্য উঠিতেছেন. রাত্রি আসিতেছে ; চন্দ্র, তারকা মণ্ডিত হইয়া নীল আকাশে ভাসিতেছেন, ঋতু সকল আসিতেছে, যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে,—এই সমস্ত আরও কত কি—যাহা বাহিরে ঘটিতেছে সমস্তই বুদ্ধি দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, আর মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবকে নানা কর্ম্মে ছুটাইতেছে। যেমন বাহিরে প্রকৃতি সেইরূপ ভিতরে মানুষের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কাররূপ অন্তঃপ্রকৃতি। সকলের ছায়াই বুদ্ধি দর্পণে পড়িয়া জগচ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। প্রকৃতির নিয়মে ইহা ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের উপরেও আর একটি নিবৃত্তি-নিয়ম আছে। এইটি পুরুষের নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মে ছুটিতে হয় বহির্ম্মুখে আর পুরুষের নিয়মে আসিতে হয় অন্তর্ম্মুখে। জগতের সর্ব্বত্র এই প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গেই আছেন। সাধারণ জীব প্রকৃতির নিয়মেই চলে পুরুষের নিয়ম ধরিতে পারেনা। সাধককে পুরুষের নিয়ম ধরিয়া ধীরে ধীরে, ক্রম অনুসারে, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে হয়। প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া পুরুষের হওয়া এবং পুরুষরূপে স্থিতি লাভ করাই মোক্ষাবস্থা। প্রকৃতির হস্ত হইতে—অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াই নিত্য তৃপ্তির অবস্থা—আপনি আপনি থাকার অবস্থা—মোক্ষাবস্থা।

সাধক জিজ্ঞাসা করেন কিরূপে এই অবস্থা লাভ হয় ?

শ্রীভগবান্ গুরুরূপী হইয়া দেখাইয়া দেন বুদ্ধি দর্পণ উল্টাইয়া ধর দেখিবে জ্যোতি রাশির চক্রমধ্যে অতি স্নিগ্ধ অতি রমণীয় সুনীল অঙ্গ জ্যোতি। তাহার ভিতরে অতি উজ্জ্বল তারকা। সেই তারকার মধ্যে যাও যাহা চাও তাহাই দেখিবে। তাহাকেই পাইবে। বাহিরের দৃশ্যদর্শন মার্জ্জন হইলেই ভিতরের এক সীমাশূন্য পরম পদ খুলিয়া যাইবে। যে পদ, স্বরূপে আপনি আপনি—যে পদ আপন স্পন্দ শক্তি তুলিয়া সমষ্টি বিশ্ব এবং ব্যষ্টি সৃষ্ট পদার্থ—যে পদ, সমষ্টি বিশ্বে বিশ্বরূপ এবং ব্যষ্টি পদার্থে আত্মা—যে পদ আবার সৃষ্টির অধর্ম্ম উত্থানে

এবং ধর্ম্মগ্লানি কালে—ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিবার জন্য এবং অধর্ম্ম বিনাশ জন্য অবতার— এক কথায় যে পরম পদ সমকালে নির্গুণ সগুণ, আত্মা ও অবতার হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়রূপে খেলা করেন—বুদ্ধিদর্পণ উল্‌টাইয়া ধর —আর অবতারের সব খেলা, আত্মার সব খেলা, বিশ্বরূপের সব খেলা এবং নির্গুণের স্বরূপস্থিতি সেই জ্যোতি পরিমণ্ডিত সুনীল অঙ্গ জ্যোতির মধ্যবর্ত্তী অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সেই মধ্যতারকা মধ্যে দর্শন কর। ইহার জন্যই সাধনা!

মরণ রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর শ্রীভগবান যে সৃষ্টিকাল হইতে মানবের সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের দণ্ডবিধান করিয়া আসিতেছেন তাহা গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সফোক্লিসের (Sohpocles) পদানুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত টমাস কারলাইল (Thomas Carlyle)উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। (১) কারলাইল মহোদয়ের জার্ম্মান কবি গেয়েটেথর (Goethe) প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি এডিনবরা (Edinburgh) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক সভায় সভাপতির আসনে উপবেশন করিয়া ছাত্রগণের হিতার্থে যে বক্তৃতা দেন সেই বক্তৃতার শেষাংশে কবিবর গেয়েটেথ্‌কে স্মরণ করিয়া ছাত্রগণকে সংসারে অশেষ ভালমন্দ কর্ম্মের মধ্যে সৎকর্ম্মগুলি বাছিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যে ইহ জগতে সৎকর্ম্মের অনুসন্ধান স্বর্গলোকে পুরস্কার প্রাপ্তির মূলীভূত কারণ। (২) এইরূপ ইউরোপের সমস্ত

---

(১) "In the tragedies of Sophocles there is a distinct recogni- of the eternal Justice of Heaven and the unfailing punishment of crimes against the lows of God."—Thomas Carlyle.

(২) "Choose well your choice is
Brief, and endless
Here Eyes do regard you
In Eternity's stillness ;
Here is all fulness ;
Ye brave, to reward you
work, and despair not." Goethe.

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান যে মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া একান্ত উচিত তাহা সমস্বরে বলিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মের ধ্বংস নাই, যেমন সৃষ্টিতে বস্তুর ধ্বংস নাই, অর্থাৎ যেমন বস্তু এক আকারে অদৃশ্য হইয়া, তদ্দণ্ডেই বা কিঞ্চিৎকাল পরে স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ কর্ম্মও অনন্তকাল কোন না কোন ভাবে থাকিয়া যায়, যথাকালে বা কাল পূর্ণ হইলে কর্ম্মের ফল নূতনভাবে প্রকাশ পায়। (৩)

আমরা উপরে বলিয়াছি যে জন্মান্তর অর্থাৎ মরণ ও মরণান্তে নবদেহ ধারণ সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিব। পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার দেহ ধারণ করিয়া যাদৃশী কর্ম্ম করিয়াছিলাম, আর মরণ কালের অবস্থা যদি আমাদের স্মরণে থাকিত তাহা হইলে তাহার বৃত্তান্ত যথাযথ প্রকাশ করিতাম। (৪) তাহার অভাবে কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন জেলার অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের এ সম্বন্ধে প্রকাশিত মত বিবেচনা করিয়াও পারিপার্শ্বিক

---

(৩) "কালমূল ইদং সর্ব্বং ভবাভবৌ সুখাসুখে।
কাল সৃজতি ভূতানি কালোহি দুরতিক্রম"। মহাভারত।

(৪) এসম্বন্ধে শৈশবে রচিত একটি কবিতা মনের আবেগে উদ্ধৃত করিলাম।

"মলে পরে ফিরে আসি একথা নিশ্চয়।
মরণের যত কথা মনে নাহি রয়॥
যমরাজ কৃপা করি, সব কাড়ি লয়।
নতুবা সংসার ঘোর দুঃখময় হয়॥
যে ছিল আমার পিতা, স্নেহময়ী মাতা।
ছেলে মেয়ে যারা যারা, করিত মমতা॥
এজন্মের সকলেরে, তুচ্ছজ্ঞান করি।
কাঁদিতাম হাঁসিতাম, সবে বুকে ধরি॥
সংসারেতে বিশৃঙ্খল, হত অবিরত।
কাড়াকাড়ি মারামারি, সদাই বিব্রত॥
এ বলিত মোর তুই, ও বলিত মোর।
এ বলিত মোর গৃহ, তুই বড় চোর॥
যমরাজ দণ্ড ধরি, ভুলাইয়া দেন।
তাই তাঁরে নমস্কার করি অনুক্ষণ"॥

অবস্থার বশতাপন্ন হইয়া আমাদের একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মরণের পরে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, (৫) এবং আচরিত কর্ম্মফল ভোগ প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় সত্য।

জীব শরীর পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব সমন্বিত। যথা পুরুষ ১, প্রকৃতি ১, মহৎ ১, অহঙ্কার ১, তন্মাত্র ৫, জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, মন ১। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, আমরা বলিব যে জীব শরীর তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ স্থূল শরীর, দ্বিতীয়াংশ সূক্ষ্ম শরীর, ও তৃতীয়াংশ কারণ শরীর।

স্থূল শরীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি উপাদানে গঠিত। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। (১) ভাণ্ড শরীর (২) পিণ্ড শরীর। কঠিন, তরল, ও বাষ্পীয় পদার্থে ভাণ্ড শরীর গঠিত। উহা বহু জীবাণু কোষের সমষ্টি। এই কোষাণুগুলিই দেহ যন্ত্রকে চালিত করে। ঐ কোষাণুগুলির ক্ষয় হইলে আহারের দ্বারা ঐ অভাব মোচন হয়। পিণ্ড দেহ, মরুৎ, ব্যোম বা চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গণের অগোচর পদার্থে গঠিত। পিণ্ড ও ভাণ্ড দেহের মধ্যে এমন এক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, যে ভাণ্ড দেহের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে পিণ্ড দেহ তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতে পারে। উভয় দেহের আকার এক প্রকারের। মৃত্যুর পর ভাণ্ড দেহের সন্নিকটে পিণ্ড দেহ অবস্থান করে, এবং শবদাহ হইলে উভয় দেহেরই একত্রে ধ্বংস হয়।

সূক্ষ্ম শরীর ষোড়শ কলাত্মক, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন ইহাদের সমষ্টি। ইহাও স্থূল শরীরের ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ মনোদেহ ও কামদেহ। মনোদেহ, কাম দেহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল। এই সূক্ষ্ম দেহ হইতেই আমাদের বাসনার ও চিন্তার উদয় হয়। ইহা উত্তাপযুক্ত। (৬) সূক্ষ্ম শরীরের উত্তাপ হইতেই স্থূল শরীর উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে

---

(৫) "If a man dies shall he live again? Such is the Supreme question which man has been asking and answering in all ages and still asks; has been asking and answering again and again. The answer is Yes."

Scientific Idealism by William Kingsland

(৬) "স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন সতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ।" নিম্বার্কাচার্য্য (দেবর্ষি নারদের শিষ্য)

ত্যাগ করিলে স্থূল শরীরে আর উত্তাপ থাকে না। সকল মানবের বা দেহীর সূক্ষ্মশরীর একপ্রকারের নহে। সৎকর্ম্মিগণের সূক্ষ্মদেহ অতি মনোহর ও তাহার শক্তিও অধিক। অসৎকর্ম্মিগণের সূক্ষ্মদেহ কদর্য্য ও তাহার শক্তিও কম। কথিত আছে সৎকর্ম্মিগণের সূক্ষ্মদেহ, জীবদ্দশাতেই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া অনায়াসে বহুদূরে গমন করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সৎকর্ম্মিগণের স্বপ্নদর্শনও অতি বিস্ময়কর।

প্রকৃতিতে লীন পুরুষই কারণ শরীর। সাংখ্যদর্শনের মতে কারণ শরীরই ঈশ্বর।

স্থূল শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের বিচ্ছেদই মরণ। জীব মরণ কালে স্থূল শরীর পৃথিবীতে রাখিয়া সূক্ষ্ম শরীরের পদার্থগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঊর্দ্ধ বা তির্য্যগভাবে ক্ষণকালের মধ্যে পরলোকে গমন করে ও তথাকথিত "অতিবাহিক" দেহ ধারণ করে। (তৎক্ষণাদেব-গৃহ্লাতি) ধার্ম্মিকগণ ঊর্দ্ধ ও অধার্ম্মিকগণ তির্য্যক্ ভাবে গমন করে। ঐ দেহ স্থূল শরীরের অনুরূপ। কেহ কেহ উহার নীললোহিত বর্ণ অর্থাৎ যমরাজের কল্পিত বর্ণ (নীলায় পরমেষ্ঠিনে) বলেন এবং কেহ কেহ উহার ধূমবর্ণ (তন্মাত্রা নির্যযুদ্দেহাদ্ধূমবর্ণ কৃতত্বিষঃ) বলেন। উহা জ্যোতির্ম্ময় ও উহা কুজ্ঝটিকাবৎ আকারে স্থূল শরীরকে একটি সূক্ষ্মস্নায়বিক সূত্রের দ্বারা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে থাকে ও উহার কার্য্যকারিতা থাকে। উহাতে অণিমা, মহিমা এবং লঘিমা গরিমা শক্তি থাকে, অর্থাৎ উহা ক্ষণকাল মধ্যে অণু হইতে অণুতর হইতে পারে, আবার মহান্ হইতে মহত্তর হইতে পারে। উহা ভৌতিক স্তর ভেদ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করে এবং মনের ন্যায় গতিশীল হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। জীবাত্মার সাধারণতঃ তদবস্থায় থাকা অতি কষ্টকর। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তির চিতায় পিণ্ডদানের পর পর্য্যন্ত মানবাত্মা বা সূক্ষ্মশরীর দাহস্থান বা স্থূল দেহধারণ কালের অতি নিকট ও প্রিয় আত্মীয়কে অবলম্বন করিয়া ঐ ভাবে থাকে। চিতায় পিণ্ডদানের পরেই উহার কার্য্যকারিতা থাকে না, উহার কষ্ট নিবারণ হয় ও উহা অদৃশ্য হয়। তবে এই পিণ্ডদান যথাশাস্ত্র হওয়া প্রয়োজন। আতিবাহিক দেহের আকার তাহার ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানবের অদৃশ্য হইলেও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ দিব্যচক্ষুর সাহায্যে বা মন বিশেষরূপে স্থির করিতে সক্ষম হইলে উহা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারে। আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই সূক্ষ্মদেহের

অস্তিত্ব কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সূক্ষ্মদেহের কার্য্য সম্বন্ধেও অনেক চর্চ্চাও হইতেছে। ইহাকে ভৌতিক বিদ্যা বলে।

তথা কথিত আতিবাহিক দেহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইউরোপেও এসম্বন্ধে বহুগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থাদিতে বিবৃত বহু বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। তবে দুইএকখানি গ্রন্থাদি হইতে আমরা দুই একটি ঘটনার বৃত্তান্তমাত্র অতি সংক্ষেপে নিম্নে দিলাম।ঃ -

ফ্লরেন্স ম্যারিয়েট নাম্নী জনৈক শিক্ষিতা নারী "মৃত্যু নাই" (there is no death) নামক গ্রন্থে অনেকানেক আশ্চর্য্য ঘটনা লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রবার্ট ডেল আওয়েন (Robert Dale Owen) নামক বিচক্ষণ পণ্ডিত তাহার প্রণীত "স্বতন্ত্র জগতে পদবিক্ষেপ" (Footfall on the Boundary of another world) নামক গ্রন্থেও বহুতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার বর্ণন করিয়াছেন। "মৃত্যু নাই" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত একটি মাত্র ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেব শর্ম্মাঃ (রায়চৌধুরী)
৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পঞ্চেন্দ্রিয়-সাধনা।

আমার সকল মরমে
তোমার পরশ
উঠিবে পুলকে জাগিয়া ;
(কবে) উঠিবে পুলকে জাগিয়া।

আমার সকল নয়নে
তব রূপ ভাতি
সোহাগে উঠিবে ফুটিয়া ;
(কবে) প্রেমেতে উঠিবে ফুটিয়া।

আমার সকল শ্রবণ
হবে মুখরিত
(তব) নূপুর সিঞ্চন শুনিয়া ;
(কবে) নূপুর সিঞ্জন শুনিয়া।

আমার সকল রসনা
তব রসে সখা!
মধুরে উঠিবে ভরিয়া ;
(কবে) মধুরে উঠিবে ভরিয়া।

আমার সকল ঘ্রাণেতে
তোমারই গন্ধ
আসিবে সখাগো! ছুটিয়া ;
(কবে) আসিবে সখাগো ছুটিয়া।

আমার সকল ইন্দ্রিয়
হবেগো স্তবধ
তোমারে হৃদয়ে ধরিয়া ;
(কবে) তোমারে হৃদয়ে ধরিয়া।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।
কৈপুকুর, শিবপুর।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

সাধুবাবা তাঁহার বাসের ক্ষুদ্র পাহাড়টীর নাম "কৈলাস পাহাড়" রাখিয়াছেন। আর একদিন প্রাতে পুনরায় আমরা সাধুবাবার নিকট ঐ কৈলাস পাহাড়ে চলিলাম। সাধুবাবার নিকট গিয়া যখনই কেহ প্রণাম করে তিনি অতি মধুর স্বরে "হরিহর" কথাটি উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। তাঁহার ঘরের নিকট একটী দীর্ঘ বাঁশের উপর লাল একখানি নিশান উড়িতেছে; তাহাতেও উপরে বড় বড় অক্ষরে "ওঁ" ও তাহার নীচে "হরিহর" ও তাহার নীচে লেখা রহিয়াছে "কৈলাস পতি কি জয় জয় জয়"। আমরা একদিন পাহাড়ে গিয়া ঐ নিশানটী পড়িতেছি দেখিয়া সাধুবাবা বলিয়াছিলেন "ইহা একজন ভক্ত পাঠাইয়াছে।" সে যা'ক, সেদিন গিয়া আমরা সাধুবাবাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহার অভ্যস্ত মিষ্ট সুরে "হরিহর" উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেদিন সাধুবাবার সহিত যেরূপ কথা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ :—

সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার জলও যে জল, আবার তাহাকে যখন কমণ্ডলুর মধ্যে ভরিয়া তোলা হয় তখনও সেই জলই থাকে। তবে পার্থক্য এই যে গঙ্গার সুগভীর সুবিশাল জলরাশির মধ্যে কত বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তু, কত বড় বড় নৌকা, জাহাজ, ষ্টীমারাদি গমনাগমন করে ও ঐ জলরাশির মধ্যে কত মূল্যবান্ মণিমাণিক্যাদি থাকে, আর ক্ষুদ্র কমণ্ডলুটী অতি ক্ষুদ্র আধার, অতি সঙ্কীর্ণ স্থান বলিয়া তাহাতে কিছুই ধরে না। যদি পাত্রটী ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কমণ্ডলু স্থিত স্বল্পজল গঙ্গার অসীম জলরাশির সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়।" এই পাত্রটী ব্যবধান। সাধুবাবার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে 'আমি' রূপ ঘট বা কমণ্ডলুটী ভাঙ্গিতে পারিলেই আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে। ঘটস্থ আকাশও আকাশ বটে কিন্তু উহা ঘটের মধ্যে আবদ্ধ আছে, এই 'আমিত্ব' রূপ ঘট বা কমণ্ডলুটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলেই ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত হইবে।

তাহাই ভাবি হায়! কবে এই ব্যবধান দূর হইবে? কতদিনে আমিত্বরূপ ক্ষুদ্র ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে ও ঘট-বদ্ধ আত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে? কবে গঙ্গার সুবিশাল পবিত্র জলরাশির সহিত মিশিয়া একত্ব লাভ হইবে? জীব

ও শিবের মধ্যে এই আমিত্বের অভিমানই পর্দা। শ্রীগুরু মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী বলেন, এই "আমি" ও "আমার" ভাবের মধ্যে "আমার" ভাবটী বরং যাইতে পারে কিন্তু "আমি" ভাবটী কিছুতেই জীবের সহজে যাইতে চায় না। এ জগতে মনে করিতে হইবে যে কিছুই আমার নয় সবই ভগবানের। আমার বলিয়া যাহা কিছু মনে করি সে সমস্তই ভগবানের এবং আমিও তাঁহারি। সর্ব্ব সময়ের জন্য এইরূপ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বিষয় সম্পত্তি, সংসারাদি পুত্রকন্যা সমস্তই ভগবানের মনে করিতে হইবে এবং নিজেকে কেবল ঐ সকল সামগ্রীর জিম্মাদার মাত্র মনে করিয়া সদা সর্ব্বদা তাঁহার দাসভাবে সেবাইত বুদ্ধিতে থাকিতে হইবে। অনবরত এইরূপ করিতে করিতে তবে 'আমার' ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু 'আমি' ভাব জীবের সহজে নষ্ট হইবার নয়। তিনি বলেন, "এই আমিকে ভগবানের কাছে বলিদান দাও" অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ কর, তবে 'আমি' ভাব যাইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" শ্রীগুরু মহারাজের উপদেশ, "তন, মন, ধন সমস্তই তাঁহাকে উৎসর্গ কর ও উহার দ্বারা নিত্য নিরন্তর কেবল তাঁহারই কার্য্য করিয়া যাও।"

জোসিদি স্থানটী চতুর্দ্দিকে একেবারে মুক্ত ও খোলা ও উহা কিছু উচ্চ স্থান বলিয়া ওখানে বায়ুর খুব আধিক্য। সাধুবাবার কৈলাস পাহাড়টী তাহাতে আরও উচ্চ বলিয়া স্বভাবতঃই ঐ স্থানে বায়ু আরও কিছু অধিক প্রবল। তাহাতে আবার যেদিন রীতিমত প্রবলভাবে বাতাস বহিতে আরম্ভ করে সে দিনের ত কথাই নাই। এক এক দিন যখন ঐরূপ ঝড়ের মত বায়ু বহিতে থাকে সেদিন সাধুবাবার আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ ১৩৩২ সালে তখনও সাধুবাবার জন্য কোন পাকের ঘর প্রস্তুত না হওয়ায় ঐ পাহাড়ের মাথায় উন্মুক্ত স্থানে বাবার জন্য আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইত। পাকের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে তাহা ঐ প্রচণ্ড বায়ুর জন্য হয়ত নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়ায় বাবার জন্য সেদিন আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। এই যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় সাধুবাবার আহার্য্য প্রস্তুত না হওয়ায় বাবার আহার হইল না; তাহাতে তাঁহার কিছু মাত্র দুঃখ কষ্ট কিম্বা অসন্তোষ বোধ নাই। ইহাই আজিকার ব্যবস্থা মনে করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে হয়ত সেদিন যদি কোনও ভক্ত দ্বারা প্রেরিত সামান্য আহারীয় সামগ্রী কোন স্থান হইতে আসিল, তাহাই সন্তোষের সহিত আহার করিয়া সেদিন

দিনপাত করিলেন। কোন কারণেই সাধুবাবা বিচলিত হন না, সর্ব্বাবস্থাতেই ইঁহার সমান সন্তোষ ভাব, চিত্তের প্রসন্নতা কিছুতেই নষ্ট হয় না। সাধুবাবা একেবারে সুবিধা অসুবিধা বর্জ্জিত ভাব, কিছুতেই ইঁহার অসুবিধা হয় না বা মন বিচলিত হয় না। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার এই অদ্ভুত সমত্ব ও তিতিক্ষাভাব দেখিতে পাই। পরেও ইহার অনেক পরিচয় পাইয়াছি।

কিছুদিন হইল সাধুবাবার একটি অল্প বয়স্ক যুবক ব্রহ্মচারী শিষ্য জুটিয়াছে। বাবা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন হরিহরানন্দ। সেই প্রত্যহ সাধুবাবার জন্য দ্বিপ্রহরে আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দেয়। বাবা খুব সামান্যই আহার করেন। প্রায় প্রত্যহই দ্বিপ্রহরে সাধুবাবার জন্য কয়েকখান আটার রুটি ও সামান্য একটী ব্যঞ্জন সে প্রস্তুত করিয়া দেয় ও রাত্রের জন্য গ্রাম হইতে কিছু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সাধুবাবাকে খাওয়ায়; বাবার অন্যান্য সামান্য কার্য্যাদিও সেই করিয়া দেয় কিন্তু তখন পাহাড়ে সাধুবাবার নিজের ব্যবহারের গৃহখানি ব্যতীত অন্য কোন বাসস্থান না থাকায় রাত্রে হরিহরানন্দ পাহাড় হইতে গ্রামের মধ্যে নামিয়া গিয়া অন্য কোন ব্যক্তির গৃহে শয়ন করিয়া থাকিত। ঐরূপ লোক বিরল ব্যাঘ্রাদি সেবিতস্থানে সাধুবাবা সানন্দচিত্তে একাকী রাত্রি যাপন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার উদ্দেশে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন ও বনজঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতে বাসই মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ নির্জ্জন স্থান যে অতিশয় আনন্দদায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের মত ব্যক্তির নিকট উহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। আবার শুক্লপক্ষে কিম্বা পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিতে যখন পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন সাধুবাবা এই শীতকালের শীতল বায়ু অগ্রাহ্য করিয়া ও এরূপ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর বিচরণক্ষেত্রে নির্ভয় অন্তঃকরণে একাকী সানন্দচিত্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মুক্ত স্থানে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যানস্থ হন। ইহাঁর নিদ্রা অতিশয় কম, রাত্রিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা যান। রাত্রি ২টা-৩টার সময়েই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সাধনার জন্য বসিয়া যান।

ক্রমশঃ।

দেবতা ও প্রতিমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
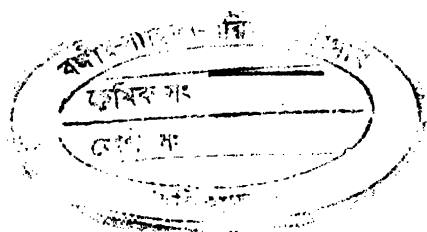
(৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব লিখিত)।

প্রতিমাকে দেবতার ধ্যানানুরূপিণী করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রের আদেশ; কিন্তু কি হইলে ধ্যানের অনুরূপ হয় তাহা বিশেষ ভাবিবার কথা। আমাদের দেশে পূজক এবং পুরোহিতগণ ধ্যান বলিলেই বুঝিয়া থাকেন, পূজা পদ্ধতিতে ধ্যানের বিষয় যাহাতে উল্লিখিত আছে, সেই বচনটী। ইহাঁরা জানেন যেখানে ধ্যান করিতে হইবে লেখা থাকে, সেইখানেই ঐ বচনটী পাঠ করিতে হয়; সুতরাং ধ্যানের অনুরূপ বলিলে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, প্রতিমার হাত কয়খানি, চক্ষুঃ কয়টী, রংটী কেমন ইহাই সাধারণতঃ; আর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ উর্দ্ধসংখ্যা এই যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ, বেশ ভূষণ ও বাহন অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি কাহার কিরূপ? কিন্তু ইহার পর যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, স্থূলাঙ্গী বা কৃশাঙ্গী? বসিয়া আছেন অথবা দাঁড়াইয়া আছেন? মুখখানি ভার ভার, কি হাসি হাসি? কোন্ মূর্ত্তি কি বয়ঃক্রমের হইবে? তবেই চক্ষুঃ স্থির; কেননা, বচনে ত সে সব কথার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম, ইহাঁদের ধ্যানও বচনে, সমাধানও বচনে। সেই বচনের অনুসরণে যে সকল যজমানের জীবন ও মরণ, তাহাদের গৃহে দেবমূর্ত্তির এ সকল দুর্দ্দশা ঘটিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। তবে শাস্ত্রের আজ্ঞা, দেবতার মূর্ত্তি ধ্যানানুরূপিণী করিতে হইবে, এ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত—ইহাঁদিগের পক্ষেও একরূপ স্থিরই আছে, কেননা ধ্যানেরও দশা যেরূপ, মূর্ত্তিরও সেইরূপই হইতেছে।

এই ধ্যান যদি বচনে না হইয়া কার্য্যে হইত, তাহা হইলে কিন্তু মূর্ত্তির এ দশা কখনই ঘটিত না। প্রতিনিধি পুরোহিতের হস্তে যদি পূজার ব্যবস্থা না থাকিত, পূজক কর্ত্তৃক মূর্ত্তি চিন্তার নাম যদি ধ্যান হইত, তবে সেই ঐকান্তিক চিন্তার ফলে ধ্যানমন্ত্রের ধ্যেয় পদার্থ দেবতার স্বরূপও সাধকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইত। দুঃখের কথা বলিব কত, এ দেশে নাটক নভেল যাঁহারা নিয়ত পড়েন, সেই সকল নাটক নভেলের নায়ক নায়িকার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে

পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত তিলে তিলে অণু পরমাণুর ধ্যান ধারণায় সে সকল মূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয় পটে এমনই চিত্রিত হইয়া আছে যে যাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবে তিনিই তোমাকে সন্তোষের পর অতি সন্তোষের উত্তর দিয়া সুখী করিবেন, কিন্তু তাঁহাকেই যদি জিজ্ঞাসা কর, আপনার ইষ্টদেবতার মুখখানি কেমন ?—হাসি হাসি, কি স্থির গম্ভীর ? তাহা হইলে সেই তিনিই হয়ত—হাসিয়া উত্তর দিবেন, ইষ্টদেবতার মুখ কি কেহ দেখিয়া আসিয়াছে না কি ? না দেখিলে ইষ্টদেবতার মুখখানি কেমন তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু নবীন তপস্বিনী দুর্গেশনন্দিনীর হাসির মধ্যে কখন্ কয়টী দাঁতের কতটুকু দেখা গিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত তিনি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, বল ভাই সাধক ! পরমার্থরাজ্যে ইহা অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আরও কি কখন হইতে পারে ? কল্পিত নায়ক নায়িকার বিলাসময়ী মূর্ত্তির লাবণ্য-সাগরে যাঁহারা এইরূপে অতলজলে ডুবিয়া যাইতে পারেন ; দেবমূর্ত্তির নাম শুনিলে যে, তাঁহাদিগের মন অপার সমুদ্র ভাবিয়া সুদূরে পলায়ন করে, ইহা কি ধ্যানের অভাবের ফল নহে ? তাই বলিতেছিলাম—কার ধ্যান কেবা করে, মূর্ত্তি গ'ড়ে কুমার মরে !

পূজা যদি দেবতার জন্য হইত, মূর্ত্তিও তাহা হইলে দেবতার অনুরূপ হইত। এখনকার পূজা প্রায়শঃই দেবতার নাম করিয়া সমাজের পূজা, আর সমাজের আবরণ দিয়া যজমানের সংসার পূজা। তাই, লোক সংসারে গৌরব মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পূজার যে যে অঙ্গের উন্নতির প্রয়োজন, সেই সেই উন্নতির দিনই আসিয়াছে, ঘটিতেছেও সেই সেই উন্নতি। নদীর একদিকে পাড় ভাঙ্গিলেই অন্য দিকে চড়া পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম ; তাই অন্তর্দৃশ্য যত অন্তর্হিত হইতেছে, বহির্দৃশ্যের বাহ্য সৌন্দর্য্যও ততই বাড়িতেছে। পূজা গিয়াছেন পুরোহিতের হাতে, আর মা গিয়াছেন কুমারের হাতে। বঙ্গদেশে দেব প্রতিমার নির্ম্মাণ কার্য্য প্রাচীনকালে আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সন্ধ্যা আহ্নিকপূত শাস্ত্রতত্ত্বের অভিজ্ঞ এবং ধ্যান ধারণা বিষয়েও বিশেষ অভ্যাসশীল ও ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি, প্রাতঃস্নান প্রাতঃসন্ধ্যা ইত্যাদি সমাপন করিয়া ভয় ভক্তি সম্পন্ন পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিতেন। যত দিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ না হইত, ততদিন নিয়ত আশঙ্কিত হৃদয়ে দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেন,—"কি জানি মা

কেমন মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইবেন! যেমন দয়া করিবে তেমনই হইবে, কিন্তু মা! অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিও না।” ইহাঁরা যাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহাকে শুভাশুভ ফল বিধাত্রী পরমেশ্বরী বলিয়া প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। কালে কালে ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাবে, আর নাস্তিকতার প্রভাবে, সে সকল বংশ প্রায়শঃই লোপাপন্ন, কোন কোন বংশে দুই একটী বংশধর যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও এক্ষণে স্বজাতিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত, বিজাতীয় ভাবে দীক্ষিত এবং বিজাতীয় দাসত্ব বৃত্তিতে নিয়ত নিযুক্ত। এই সকল অবস্থার সূত্রপাত যে সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই নির্ম্মায়কের অভাবে অগত্যা প্রতিমা নির্ম্মাণের ভার পড়িয়াছিল, কুম্ভকারের হস্তে। কুম্ভকার শাস্ত্রজ্ঞান-বিবর্জ্জিত—শূদ্রজাতীর বর্ণসঙ্কর; আচার্য্যগণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণকালে যেরূপ শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য ও আত্মজ্ঞান ধ্যানধারণার ঐক্য করিয়া গুরূপদেশে তাহাকে আরও সুসংস্কৃত করিয়া দেবমূর্ত্তি গঠন করিতেন, আজ কুম্ভকার জাতি তাহা কোথায় পাইবে? তাহাদিগের নির্ম্মাণ-বিদ্যার ফল উর্দ্ধসংখ্যা, ছবি গড়া, আর পুতুল গড়া, তাই তাহাদিগের হাতে পড়িয়া আজ প্রতিমার নাম হইয়াছে—ছবি ও পুতুল, যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহাদিগের উপাধি হইয়াছে—পৌত্তলিক, তাই আজ উপাসনার নামও পৌত্তলিকতা, বস্তুতঃ এই লৌকিকখ্যাতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, ইহার উৎপত্তির মূল নাস্তিকতার অমূলক সিদ্ধান্ত হইলেও এখন কিন্তু আস্তিকতার মধ্যে সে মূল প্রবেশ করিয়াছে। আজকাল কলিকাতা প্রভৃতি প্রদেশে দেবতার মূর্ত্তি যত পাতলা হয়, ততই তাহা প্রশংসার যোগ্য, তাহার একমাত্র কারণ কেবল দূর হইতে দূরান্তরে আনা নেওয়া। সেই অনুরোধে দেবতার মূর্ত্তি অনেকস্থলে ভিতরে ফাঁপা রাখিয়া গড়ান হয়। শাস্ত্রের আদেশ, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে তৃণগর্ব্ভা করিতে হইবে। বংশও তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, এই বলিয়া প্রতিমার কাঠাম বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেই সূত্রে মূর্ত্তির মধ্যে বাঁশের অংশ যতটুকু থাকে, তাহাও তৃণ মধ্যেই গণ্য হয়। মূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থিত এই তৃণযষ্টি অস্থিস্থানীয়, তাহার পর মৃত্তিকার অংশ যাহা থাকে, তাহা মাংসস্থানীয়, তাহার পর বস্ত্রের বেষ্টনভাগ যাহা, তাহাই চর্ম্মস্থানীয়। এরূপ ক্ষেত্রে দেবতার মূর্ত্তি ভিতরে ফাঁপা হইলে সেই অস্থিমাংস-বিবর্জ্জিত চর্ম্মমাত্র-সার দেবমূর্ত্তিতে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন বলিতে হয়, “মা! তুমি এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা হইয়া আমার পূজা গ্রহণ কর”। যজমান! একবার ভাবিয়া দেখ—দেবতার যে মূর্ত্তি

তুমি গঠিত করিয়াছ, তাহাতে তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করিয়া, কি সত্য কথাই না তাঁহার কাছে বলিতেছ! এ মূর্ত্তিতে যদি মাকে অধিষ্ঠিতা হইতে হয়, তবে তিনি অন্তর্হিতা হইবেন কোথায়? তাহার ত আর স্থান থাকে না। সাধকের হৃদয় যেমন, দেবতার মূর্ত্তিও তেমনই হইবে; ইহা সাধক সম্প্রদায়ের চিরপ্রসিদ্ধি। তাই ভাই দেবতার মূর্ত্তি ফাঁপা হইল বলিয়া দুঃখ করিব কেন? পূজক! আজ তোমারও হৃদয় যেমন ফাঁপা মায়েরও মূর্ত্তি তেমনই ফাঁপা। তাহার জন্য দুঃখ করি না, দুঃখ এই যে এই ফাঁপাকে তুমি আবার শাস্ত্রবাক্যের অনুরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা কর।

শাস্ত্রের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকসাধিকাগণ নিজেই দৈবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তির অবলম্বনে সাধনানুষ্ঠানে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এই মূর্ত্তিনির্ম্মাণবিদ্যা চতুঃষষ্টিকলার অন্তর্গত, প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই চতুঃষষ্টিকলা কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই সাদরে শিক্ষা করিতেন, ইহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই শিক্ষার প্রভাবে উপাস্যদেবতার মূর্ত্তিগঠন সাধকের আত্মকর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত ছিল, তবে স্বর্ণাদি ধাতুময় মণিময় পাষাণময় ইত্যাদি মূর্ত্তিনির্ম্মাণ যাহা সাধারণতঃ বিশেষ কঠিন ও বিশেষ আয়াসসাধ্য, সেই সেই স্থলেই শিল্পীর প্রতি উহার নির্ম্মাণভার অর্পণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃণ্ময়াদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ত শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এরূপ কোন আকার ইঙ্গিতও নাই, কিন্তু এ কথা শোভা পাইত সেইকালে—যে কালে আর্য্যসমাজের নরনারী নির্ব্বিশেষে চতুঃষষ্টিকলায় সুশিক্ষিত হইতেন। কলিরাজের কালদণ্ডের প্রভাবে সে কাল আজ অন্তর্হিত, তাই এই সকল কালাপাহাড়ের হাতে আজ কাল দেবমূর্ত্তির ভারার্পণ! প্রতিমার গঠন, চিত্রকার্য্য, সাজসজ্জা ইত্যাদি আজকাল নীচজাতির কার্য্য মধ্যে পরিগণিত, ভদ্রলোক উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্তই অপমান বোধ করেন। এ অপমান বোধ যে কেবল মানের ভয়ে তাহা নহে, নির্ম্মাণের ভয়েও। এদিকে যে, নি—র্মান না হইলে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের অধিকার জন্মে না, তাহা বুঝেই বা কে? আর ভাবেই বা কে? এই নির্ম্মাণ বিদ্যার মূল্য যে চতুঃষষ্টিকলা, সে চতুঃষষ্টিকলা কাহার নাম, তাহা আজ দশ হাজার পূজক পুরোহিতের মধ্যে একজনও যে অবগত আছেন, তাহা বলিতেও আর সাহস হয় না, ভাগ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ছাপা হইয়াছিল, তাই আজকাল এদেশের লোক শুনিতে পায়—"কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টিকলায়"। এই যে দেশের নির্ম্মাণ সাধনা, সে দেশের সেই সাধনার সিদ্ধি ফলে দেবমূর্ত্তি ব্যঙ্গাঙ্গী বা বিকৃতাঙ্গী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

(ক্রমশঃ)

———

ব্যবহারঃ স্থিরপ্রায়ঃ কস্মাদেতদপীদৃশম্।
চিত্রাং জগদ্ব্যবহৃতিং প্রপশ্যামাবিমর্শিনীম্॥ ৩৩
অহো যথান্ধানুগতো হ্যন্ধশ্চেষ্টতি তাদৃশঃ।
লোকস্য ব্যবহারো বৈ সর্ব্বস্যাপ্যভিলক্ষিতঃ॥ ৩৪॥
নিদর্শনং হ্যাত্মকৃতিরত্র মে সর্ব্বথা ভবেৎ।
নূনং মম শৈশবে কিং জাতং তন্মে ন ভাবিতম্॥ ৩৫
কৌমারে চান্যথা বৃত্তং তারুণ্যেঽপি ততোঽন্যথা।
ইদানীমন্যথৈবাস্তি ব্যাপারো মম সর্ব্বথা॥ ৩৬॥
কিমভূৎফলমে তেষাং তন্ন বেদ্মি কথঞ্চন।
যদ্ যদ্কালে যচ্চ যচ্চ ক্রিয়তে যেন যেন বৈ॥ ৩৭॥
সম্যগেবেতি তদ্বুদ্ধা ফলাবষ্টম্ভপূর্ব্বকম্।
ফলং কি তত্র সংপ্রাপ্তং কেন বা সুখমাত্মনঃ॥৩৮॥

এই মহৎ জগদাড়ম্বর সমুদিত হইয়াছে এবং কোথাই বা যাইতেছে আবার কোথাই বা বিলীন হইতেছে? সর্ব্বত্রই যে সমস্ত বস্তু দেখিতেছি তাহা সমস্তই অস্থির অর্থাৎ প্রতিক্ষণ পরিণামী॥ ৩২॥

বিষয়স্যাস্থিরত্বে কথং তদ্বিষয়কব্যবহারঃ অয়ং গ্রামো মৎপুত্রার্থং সম্পাদিত ইতি স্থিরপ্রায়ো ভবতীতি বিস্ময়ন্নাহ ব্যবহার ইতি। অবিমর্শিনীমবিচারবতীম্॥ ৩৩॥

আর সমস্ত বিষয় অস্থির হইয়াও স্থির প্রায় ব্যবহার হইতেছে, এই বিচিত্র ব্যবহার যাহা দর্শন করিতেছি তাহা নিশ্চয়ই অবিচার সিদ্ধ॥ ৩৩॥

অন্ধ পরম্পরয়ৈব ব্যবহার ইত্যাহ—অহো ইতি॥ ৩৪॥

এই ব্যবহার অন্ধ পরম্পরা মাত্র ইহাই দেখাইতেছেন—অহো! যেমন অন্ধজনের অনুগত হইয়া অন্ধজন ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ সমস্ত লোকের ব্যবহারও অন্ধ পরম্পরা মাত্র বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

অত্র দৃষ্টান্তঃ স্বস্যাচরণমেবেত্যাহ-নিদর্শনমিতি। আত্মনঃ কৃতির্ব্যবহারঃ। তদেবাহ-নূনমিতি। মে ময়া॥ ৩৫॥ ৩৬॥ ৩৭॥

নিজের আচরণই ইহার দৃষ্টান্ত ইহাই বলিতেছেন—এই ব্যবহার যে অন্ধপরম্পরা সিদ্ধ তাহাতে নিজের ব্যবহারই দৃষ্টান্ত। আমার শৈশবে কি

যচ্চাপি লোকে ফলবদবিমৃশ্য ফলং হি তৎ।
ন ফলং তদহং মন্যে পুনর্যস্মাৎ করোতি সঃ ॥৩৯॥
প্রাপ্তে ফলে ফলেচ্ছাবান্ পুনর্ভূয়াৎ কথং বদ।
যস্মান্নিত্যং করোত্যেব জনঃ সর্ব্বঃ ফলে হয়া ॥৪০
ফলং তদেব সম্প্রোক্তং দুঃখ হানিঃ সুখঞ্চবা।
কর্ত্তব্য শেষে নো দুঃখনাশো বা সুখমেব বা ॥৪১
কর্ত্তব্যতৈব দুঃখানাং পরমং দুঃখমুচ্যতে।
তৎসত্ত্বে তু কথন্তে স্তো দুঃখাভাবঃ সুখঞ্চ বা ॥৪২

হইয়াছিল তাহা আমি কখন ভাবি নাই। আবার কৌমার দশাতে আমার ব্যবহার অন্যরূপ হইয়াছিল, এবং যৌবনে আরও অন্যথাভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি আমার ব্যবহার অন্যরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৩৫॥৩৬॥

ফলাবষ্টম্ভঃ ফলপ্রাপ্তিনিশ্চয়ঃ ॥৩৮॥

এই শৈশবাদি অবস্থাতে যে আমার অন্যথা অন্যথাব্যবহার হইয়াছিল তাহাদের কি ফল হইয়াছে ইহা আমি কিছুই বিদিত নহি; যে যে লোক, যে যে সময়ে, যাহা যাহা করিয়া থাকে, তাহা সত্য বলিয়াই করিয়া থাকে তাহাতে ফল প্রাপ্তি নিশ্চয় করিয়াই করিয়া থাকে কিন্তু ফল আত্মার সুখ এই আত্ম-সুখরূপ ফল কে কবে লাভ করিয়াছে? ॥৩৭-৩৮॥

যচ্চ ফলং ধনাদি তস্যাবিচারেণৈব ফলত্বমিত্যাহ—যচ্চেতি ॥৩৯॥

যে যে আচরণ লোকে ফলবৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা সমস্তই নিষ্ফল; ফল কি তাহা না জানিয়াই লোকে ফলবৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ধনাদি যাহা ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা আমি ফল বলিয়াই মনে করিনা; কারণ ফল লাভ হইলে আবার লোক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? (যাহার প্রাপ্তিতে ইচ্ছার বিচ্ছেদ বা নাশ হয় না তাহা ফলই নহে)

ফলাভিমতপ্রাপ্ত্যনন্তরং প্রবৃত্তিকারণেচ্ছায়া এবোদয়ঃ কথমিত্যাহ—প্রাপ্তে ইতি ॥৪০॥

ফল প্রাপ্ত হইলে আবার ফলে ইচ্ছাবান কেমন করিয়া হইবে? অথচ দেখা যায় ফল লাভের জন্য সমস্ত লোক সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছে ॥৪০॥

যথা দগ্ধাখিলাঙ্গস্য পাদে পাটীরলেপনম্।
তথা কর্ত্তব্যশেষস্য সুখলাভ ইহোচ্যতে ॥৪৩॥
যথা শরাবিদ্ধহৃদঃ পরিষঙ্গোঽপ্সরোগণৈঃ।
তথা কর্ত্তব্যশেষস্য সুখলাভ ইহোচ্যতে ॥৪৪
যথা ক্ষয়াময়াবিষ্টনরস্য গীতসংস্তুতি।
তথা কর্ত্তব্যশেষস্য সুখলাভ ইহোচ্যতে ॥৪৫॥
সুখিনস্তে হি লোকেষু যেঽকর্ত্তব্যতয়া স্থিতাঃ।
পূর্ণাশয়া মহাত্মানঃ সর্ব্বদেহসুশীতলাঃ ॥৪৬॥

ননু কিঞ্চিৎ ফল প্রাপ্তাবপি ফলান্তর প্রাপ্ত্যর্থং করণং যুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্য নেতি বক্তুং ফলস্বরূপং নিরূপয়তি ফলমিতি। অভাবস্যাসতো ন ফলত্বং যুক্তমিত্যাহ—সুখঞ্চ বেতি ॥৪১॥

দুঃখানাং মধ্যে কর্ত্তব্যতৈব পরমং মহদ্ দুঃখম্। তে দুঃখাভাবঃ সুখঞ্চেতি দ্বে ॥৪২॥

(ফল স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন) যাহা দুঃখের নাশ অথবা সুখ তাহাই ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে; লোকের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি না হইয়া সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যের অবশেষ থাকিয়া যাইতেছে; আর কর্ত্তব্যশেষ থাকিতে কি দুঃখনাশ কি সুখ ইহার কোনটিই হইতে পারে না। যেহেতু দুঃখ সমূহের মধ্যে কর্ত্তব্যতাই পরম দুঃখ, আর এই পরম দুঃখরূপ কর্ত্তব্যতার অবশেষ থাকিতে সুখ অথবা দুঃখাভাব ইহা থাকিবে কিরূপে?

এতদেব দৃষ্টান্তৈরুপপাদয়তি—যথেত্যাদি ॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥

(দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করিতেছেন) যাহার সমস্ত শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে তাহার মাত্র পাদদেশে চন্দন লেপন করিলে যেরূপ সুখলাভ হয়, কর্ত্তব্য শেষ থাকিতেও সুখলাভ সেইরূপ হইয়া থাকে। অথবা যেমন শরের দ্বারা যাহার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইয়াছে তাহার অপ্সরাগণের আলিঙ্গনে যেরূপ সুখলাভ হয়, কর্ত্তব্য শেষ ব্যক্তির সুখলাভও তদ্রূপ। অথবা ক্ষয় রোগে মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন গীতশ্রবণে সুখলাভ হয়, কর্ত্তব্য শেষ ব্যক্তির সুখলাভও তদ্রূপ ॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥

যদি কর্ত্তব্যশেষেঽপি সুখং স্যাৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
শূলপ্রোতেঽপি চ নরে স্যাৎসুখং গন্ধমাল্যজম্ ॥৪৭॥
অহো মহচ্চিত্রমেতৎ কর্ত্তব্যশতসঙ্কুলে।
সুখমস্তীহ যস্যার্থে করোত্যেব সদা জনঃ ॥৪৮॥
অহো বিচারমাহাত্ম্যং কিং বদামি নৃণামহম্।
অনন্তকর্ত্তব্যশৈলাক্রান্তঃ সৌখ্যং লভন্তি চ ॥ ৪৯ ॥

তর্হি কঃ সুখীত্যাকাঙ্খায়ামাহ—সুখিন ইতি ॥ ন কর্ত্তব্যং যস্য তদ্ভাবোঽকর্ত্তব্যতা। ইদমেব সুখিনাম্লক্ষণমিতিভাবঃ। সুখিনমিতরস্মাদ্বিবেচয়িতুমাহ-পূর্ণেত্যাদি। অন্যেষাং প্রাপ্তব্যশেষাদপূর্ণঃ কামিতাপ্রাপ্ত্যারিক্ত আশয়শ্চিত্তম্। তথান্যে অমহাত্মনঃ স্বাত্মানং ন্যূনং মন্যমানাঃ। স্পষ্টং চৈতৎ। সার্ব্বভৌমোঽপীন্দ্রাৎ স্বাত্মানং ন্যূনং মন্যতে ইতি। মূর্দ্ধ্নি মুকুটসত্ত্বেঽপি কণ্ঠেহারাভাবেন দুঃখানুবৃত্তেঃ ন তে সর্ব্বাঙ্গশীতলাশ্চ ॥৪৬॥

(তবে সুখী কে তাহাই বলিতেছেন) তাঁহারাই সুখী যাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া আর কিছুই অবশেষ নাই। যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সর্ব্বদেহ সুশীতল সেই মহাত্মাগণই সুখী। যেমন মস্তকে মুকুট থাকিলেও কণ্ঠে হার নাই বলিয়া দুঃখ থাকে এজন্য সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল হয় না ইহাদের সেরূপ হয় না ॥৪৬॥

কেনচিৎবস্ত্রমাল্যাদিনা ॥৪৭—৫০॥

যদি কর্ত্তব্য শেষ থাকিতেও কোন উপায়ে কোন সময়ে সুখ হইতে পারিত তবে শূলে আরোপিত ব্যক্তিরও গন্ধ মাল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সুখ হইতে পারিত ॥৪৭॥

অহো! বড়ই বিচিত্র এই যে শত কর্ত্তব্য শেষ থাকিতেও সুখ অনুভব হইতেছে বলিয়া লোকে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে ॥৪৮॥

মানবগণের বিচিত্র বিচার মাহাত্ম্য আর কি বলিব? অনন্ত কর্ত্তব্য কোলে আক্রান্ত হইয়াও ইহারা সুখ লাভ করিতেছে ॥৪৯

সার্ব্বভৌম সম্রাট্ সুখলাভের জন্য যেরূপ যত্নবান্ ভিক্ষাটনে রত ভিক্ষুকও সেইরূপ সুখলাভে সর্ব্বদা যত্নবান্ রহিয়াছে ॥ ৫০॥

তথা সৌখ্যায় যততে সার্ব্বভৌমস্ত সর্ব্বদা।
তথৈব যততে নিত্যমপি ভিক্ষাটনে রতঃ॥ ৫০॥
পৃথক্ তৌ প্রাপ্নুতঃ সৌখ্যং মন্যেতে কৃতকৃত্যতাম্।
তদ্‌যেন যান্তি সর্ব্বেঽপি যাম্যহং তানমুক্রমাৎ॥৫১
অনালোচ্য ফলঞ্চাপি যথান্ধোঽন্ধানুগস্তথা।
তদলং মেধয়ানেন ভূয়ো গত্বা দয়ানিধিম্॥৫২
বিজিজ্ঞাসিতজিজ্ঞাস্যো বিচিকিৎসাম্বুধেঃ পরম্।
পারং প্রপৎস্যে সুশুভং গুরুবাক্‌প্লবমাশ্রিতঃ॥৫৩
ইতি ব্যবস্য সহসা জামদগ্ন্যঃ শুভাশয়ঃ।
প্রতস্থে তদ্‌গিরিবরাদ্ গুরুদর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ৫৪

যেনাবিচারিতেন মার্গেণ ক্রমাদ্ যান্তি তানহমনুযামি॥৫১॥

সার্ব্বভৌম সম্রাট ও ভিক্ষুক ইহারা উভয়েই পৃথক্‌ভাবে সুখ লাভ করিয়া থাকেন এবং উভয়েই কৃত কৃত্যতার অভিমানও করিয়া থাকেন। এইরূপ অবিচারিত পথে যেমন জনসাধারণ গমন করিয়া থাকে আমিও তাহারই অনুগমন করিতেছি॥৫১॥

অত্রহেতুঃ ফলমালোচ্যেতি। মেধয়া অবিচারজনিত নিশ্চয়েন। অনেন বিচারেণ সহ গত্বা। যাবদ্বিচারো ন নশ্যেৎ তাবৎ ইতি তাৎপর্য্যম্। বিচিকিৎসা সন্দেহঃ। গুরুবাগের প্লবো নৌঃ তামাশ্রিতঃ॥৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭॥

অন্ধ যেমন অন্ধের অনুগত হইয়া, ফল আলোচনা না করিয়া অবিচারিত-ভাবে অন্ধের অনুবর্ত্তন করে (আমিও তাহাই করিতেছি) এই অবিচারজনিত বুদ্ধি দূরেই থাকুক। যে বিচার আজ আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে তাহার বিনাশ হইবার পূর্ব্বেই সেই দয়ানিধি গুরুর নিকট পুনর্ব্বার গমন করিয়া জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহ সমুদ্রের পরপার গুরুবাক্যরূপী ভেলার সাহায্য প্রাপ্ত হইব॥ ৫২।৫৩

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শুভাশয় জামদগ্ন্য সেই পর্ব্বত হইতে গুরুদর্শনাভি-লাষে প্রস্থিত হইলেন॥ ৫৪

গন্ধমাদন শৈলেন্দ্রং প্রাপ্য শীঘ্রমপশ্যত।
গুরুং পদ্মাসনাসীনং ভূভাস্বন্তমিব স্থিতম্॥ ৫৫
প্রণনাম পাদপীঠং পুরতো ভুবি দণ্ডবৎ।
শিরসাঽপীড়য়ৎ পাদপদ্মং নিজ করাশ্রিতম্॥ ৫৬
অথৈবং প্রণতং রামং দত্তাত্রেয়ঃ প্রসন্নধীঃ।
আশীর্ভির্যোজয়মাস সমুত্থাপয়দাদরাৎ॥ ৫৭
বৎসোত্তিষ্ঠ চিরাদদ্য ত্বাং পশ্যামি সমাগতম্।
ব্রূহি স্বাত্মভবং বৃত্তং নিরাময়াস্থিতম্॥ ৫৮
অথোত্থায় গুরূক্ত্যা স গুর্ব্বাদিষ্টাগ্র্যবিষ্টরঃ।
উপবিশ্য প্রসন্নাত্মা বদ্ধাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ॥ ৫৯

শীঘ্র গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইয়া পদ্মাসনোপবিষ্ট ভূমিতলাবতীর্ণ সূর্য্যের মত গুরুদেবকে দর্শন করিলেন॥ ৫৫

(এবং গুরুকে দর্শন করিয়া) গুরুর সম্মুখভাগে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গুরুদেবের পাদপীঠ প্রণাম করিলেন এবং হস্তযুগল দ্বারা চরণযুগল স্পর্শ পূর্ব্বক মস্তক শ্রীগুরুর চরণপদ্মে স্থাপন করিলেন॥ ৫৬

প্রসন্নচিত্ত দত্তাত্রেয় এইভাবে প্রণত পরশুরামকে বহু আশীর্ব্বাদ করিয়া আদর পূর্ব্বক উত্থাপিত করিলেন॥ ৫৭

আত্মভবং শরীরাদৌ ভবং উৎপন্নম্॥ ৫৮॥৫৯॥

হে বৎস! গাত্রোত্থান কর, বহুকাল পরে অদ্য তোমাকে সমাগত দর্শন করিলাম, তোমার শারীরিক কুশল বল॥ ৫৮

গুরুর আদেশানুসারে পরশুরাম গাত্রোত্থান করিয়া গুরুর আদিষ্ট কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৫৯

অথেত্যপ্যর্থঃ॥ বিধিসৃষ্টৈরপীত্যর্থঃ॥ ৬০। ৬১॥

হে শ্রীগুরো! হে করুণাসিন্ধো! তোমার করুণারূপ অমৃতে যে নিমগ্ন হইয়াছে সে বিধিনির্ম্মিত রোগসমূহ দ্বারা কখন কি অভিভূত হইতে পারে?

শ্রীগুরো! করুণাসিন্ধো! ত্বৎ কৃপামৃত আপ্লুতঃ।
কথং স পরিভূয়েত বিধিস্টষ্টৈরথাময়ৈঃ ॥ ৬০
ত্বৎকৃপাত্মামৃতকরমণ্ডলান্তঃস্থিতন্তমাম্।
সন্তাপয়েৎ কথং ব্যাধিশ্চণ্ডাশুরতিভীষণঃ ॥ ৬১
অন্তরং বাহ্যমপি তে কৃপয়ানন্দিতং মম।
সদাস্থিতং কিন্তু ভবৎ পাদাব্জবিযুতিং বিনা ॥ ৬২
নাহ্যক্রজাবহং কিঞ্চিদাসীম্মে লেশতঃ ক্কচিৎ
তদ্ভবচ্চরণাম্ভোজদর্শনাদস্থ বৈ পুনঃ ॥ ৬৩
সম্পূর্ণতা সদাপন্না সর্ব্বথা শ্রীগুরো নন্থু।
তৎ কিঞ্চিচ্চিরসংবৃত্তং হৃদি মে পরিবর্ত্ততে ॥ ৬৪
তৎপ্রষ্টুং ত্বাভিবাঞ্ছামি চিরসংশয়িতান্তরঃ।
আজ্ঞপ্তো ভবতাহ্যহং পৃচ্ছামি বিচিকিৎসিতম্ ॥ ৬৫
সংশ্রুত্যৈবং ভার্গবোক্তিং দত্তাত্রেয়ো দয়ানিধিঃ।

তোমার করুণারূপী চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত আমাকে ব্যাধিরূপ ভীষণ-সূর্য্য কিরূপে সন্তাপিত করিবে? ॥ ৬১

আন্তরং মনঃ। বাহ্যং শরীরম্। ভবৎপাদাব্জয়ো র্বিযুতি র্বিয়োগঃ ॥ ৬২। ৬৩

তোমার চরণযুগল বিয়োগ ভিন্ন আমার আন্তর=মন, বাহ্য=শরীর তোমার কৃপা দ্বারা সর্ব্বদা আনন্দিত হইয়া অবস্থিত আছে ॥ ৬১

আনন্দস্থ সম্পূর্ণতা। চিরকালাৎ হৃদি সংবৃত্তং:উৎপন্নং প্রষ্টব্যমিতি ॥ ৬৪

আপনার চরণযুগলের অদর্শন ভিন্ন আর আমার কিছুই লেশতঃ দুঃখাবহ ছিল না। কিন্তু হে শ্রীগুরো! অদ্য আপনার চরণযুগল দর্শনে আমার আনন্দ সর্ব্বথা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তথাপি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬৩।৬৪ ॥

তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। বহুকাল হইতে আমি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া রহিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে অদ্য আমি আমার সংশয় নিবেদন করিতে পারি ॥ ৬৫

সম্প্রহৃষ্টমনা রামমূচে প্রীত্যাথ ভার্গবম্ ॥ ৬৬ ॥

পৃচ্ছ ভার্গব যত্তেঽস্ত প্রষ্টব্যং চিরসম্ভৃতম্।

তব ভক্ত্যা প্রসন্নোঽস্মি প্রব্রবীমি তবেপ্সিতম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদিতিহাসোত্তমে ত্রিপুরারহস্যে জ্ঞানখণ্ডে ভার্গবপ্রশ্নে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রষ্টব্যার্থে চিরাৎসংশয়িতং আন্তরং মনোযস্ত ॥ ৬৫।৬৬।৬৭ ॥

ইতি ত্রিপুরারহস্য জ্ঞানখণ্ডব্যাখ্যায়াং তাৎপর্য্য দীপিকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ানিধান দত্তাত্রেয় হৃষ্টমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক পরশুরামকে বলিয়াছিলেন—হে ভার্গব! বহুদিন হইতে যে জিজ্ঞাস্য তোমার সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা কর। তোমার ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। যাহা তোমার অভিলষিত তাহা বিশদরূপে কীর্ত্তন কর ॥৬৬-৬৭॥

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত প্রথম অধ্যায়।
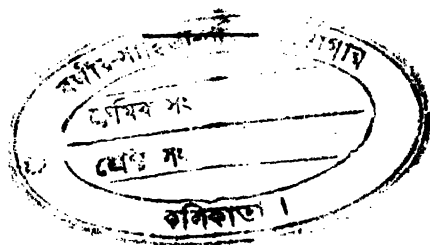
আচ্ছা! নির্ব্বিকার অদ্বয় ব্রহ্মে বীজ শূন্য এই জগৎ—বিম্ব শূন্য এই প্রতিবিম্ব কিরূপে উৎপন্ন হয় যদি জিজ্ঞাসা কর, উত্তরে বলি কাকতালীয় যোগে—কাকটা উড়িয়া গেল আর তাল পতিত হইল এই ব্যাপার দেখিয়া যেমন অজ্ঞ মানুষ একের কার্য্য অন্য ইহা ভাবে—সেইরূপে সঙ্কল্প অথবা সঙ্কল্প মূর্ত্তি এই জগৎ মৃগতৃষ্ণা সলিলের ন্যায়, দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতীত হয়। ইহাই ভ্রান্তি। যেমন মাতুলিঙ্গ ফল ভক্ষণ করিলে চক্ষের পিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া শুক্লবর্ণ কাচাদিতে পীতবর্ণ স্বর্ণ ভ্রম হয় সেইরূপ অতি নির্ম্মল চিৎ অল্প মাত্র অজ্ঞান দোষে দুষ্ট হইলে সঙ্কল্প হৃদয়ে উত্থিত হইয়া—অসত্যই সত্যরূপেই প্রকাশিত হয়; তাই বলিতেছি তোমার হৃদয়স্থ সঙ্কল্প অসত্য, সঙ্কল্পের জন্ম ও স্থিতিও অসত্য। অসত্যকে জানিয়া অগ্রাহ্য কর তখন অসত্য থাকিবে না, শুদ্ধ সত্য পরমাত্মাই প্রকাশিত হইবেন।

অসৌ সোঽহমিমে ভাবাঃ সুখদুঃখময়া মম।
ব্যর্থ মে বেতি নানাস্থা যেনাস্তঃ পরিতপ্যসে॥ ১০

এই আমি, এই সব আমার—এই সমস্ত ভাব—ইহারা সুখের বা দুঃখের হইলেও ইহারা মিথ্যা। এখনও এই সমস্ত পদার্থে তোমার অনাস্থা জন্মে নাই সেই জন্য তুমি ভিতরে পরিতপ্ত হইতেছ। তুমি সঙ্কল্পবশতঃই আমি জন্মিয়াছি এইরূপ ভ্রান্তি দ্বারা মূঢ় হইতেছ। তোমার আবার জন্ম কোথায়? মিথ্যা সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বদা সত্য ব্রহ্ম চিন্তা কর। জন্মিলে কি করিতে হইবে? পূর্ব্বানুভূত সুখ দুঃখাদিভাব স্মরণ করিও না—ইহাতে আর সঙ্কল্পোদয় হইবে না।

সঙ্কল্প নাশ যত্নেন ন ভয়ান্যনুগচ্ছতি।
ভাবনাভাব মাত্রেণ সঙ্কল্প ক্ষীয়তে ক্ষণাৎ॥ ১৩

সঙ্কল্প নাশে যত্ন করিলে আর কোন ভয়ই থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব ভাবের ভাবনা না রাখিলে—ভাবনার অভাব হইলে সঙ্কল্পও ক্ষীণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

সুমনঃ পল্লবামর্দ্দে কিঞ্চিদ্ব্যতিকরো ভবেৎ।
সুসাধ্যো ভাব মাত্রেণ নতু সঙ্কল্প নাশনে॥ ১৪

শিরীষাদি পুষ্প পল্লব দলনে কিঞ্চিৎ ব্যাপারের আবশ্যক হয়—কিঞ্চিৎ কষ্ট হয় কিন্তু সঙ্কল্প দলনে কোন ক্লেশ নাই। পূর্ব্ব ভাবনা না রাখিলেই সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া যায়। পুত্র! পুষ্প মর্দ্দন করিতে হইলে কর স্পন্দনও চাই কিন্তু সঙ্কল্প ক্ষয়ে কোন ক্লেশ নাই।

সঙ্কল্পো যেন হন্তব্য স্তেন ভাববিপর্য্যয়াৎ।
অপ্যর্দ্ধেন নিমেষেণ লীলয়ৈব নিহন্যতে॥ ১৬

(ভাবোভাবনাস্মৃতিস্তস্য বিপর্য্যয়াৎ অস্মরণাৎ)
যিনি সঙ্কল্পকে বিনাশ করিতে চান তিনি পূর্ব্বভাবনার অস্মরণ করিতে পারিলেই অর্দ্ধনিমেষমধ্যে অবহেলে সঙ্কল্প দূর করিতে পারিবেন।

ভাব মাত্রোপসম্পন্নে স্বাত্মনি স্থিতি মাগতে।
সাধ্যতে যদসাধ্যং তৎ কস্য স্যাৎ কিমিবাঙ্গতে॥

সঙ্কল্প দূর করিতে পারিলেই ভাব মাত্র প্রাপ্তি—ইহাতেই যে আত্মস্থিতি আইসে, যে স্বরূপে অবস্থান হয় তাহাতে যাহা অসাধ্য তাহাই সিদ্ধ হয়। ভাব হইল ভাবনা। নিরন্তর ভাবনা করিতে পারিলে, নিরন্তর আপনার পূর্ণানন্দত্মতা চিন্তা করিতে পারিলে—এই চিন্তাতে যখন স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুতিতে নিত্যস্থিতি লাভ হয় তখন যাহা অসাধ্য তাহাও সম্পন্ন হয়। স্বতঃসিদ্ধ আত্মভাবে স্থিতি হয়। আত্ম ভাবটা প্রাপ্তির বিষয় নহে। যাহা পূর্ব্বে ছিল না—তাহা পাওয়ার নামই প্রাপ্তি। কিন্তু আত্মজ্ঞান ত স্বভাব সিদ্ধ—এইজন্য বলা হইল ইহা উৎপন্ন হয় না কিন্তু এই অত্যন্ত দুরূহ অসাধ্য আত্মজ্ঞান সাধ্য হয়। হে অঙ্গ! তোমার আত্মা যখন অবিদ্যা ও তৎ কার্য্য দ্বারা অপহৃত হয় তখন ইহা কাহার হয়? বিনাশ হইলেই বা কি হয়? ঘট নষ্ট হইলে খর্প্পর হয় কিন্তু আত্মা কি হয়? যাহা হয় তাহা দেখিবে কে?

কারণ আত্মার দ্রষ্টা নাই। সেইজন্য আত্মনাশ যে হইবে তাহার সাক্ষী নাই—তবে ইহা কাহারই হইবে আর কিই বা হইবে। আত্মস্থিতিরূপ মোক্ষ স্বতঃসিদ্ধ।

সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্প ছেদন কর অর্থাৎ সঙ্কল্প করিবনা বলিয়া মনকে দেখ, হে মুনে মনের দ্বারা মনকে ছেদন কর—অর্থাৎ মন যখন সঙ্কল্প তুলে তখনও আমি জানি আবার ইহার অভাবকেও জানি—সবিকল্প মনকে বিকল্পশূন্য মন দ্বারা প্রশমিত কর—পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্পের অভাব ভাবনা করিয়া সঙ্কল্প দূর কর— ইহা আর দুষ্কর কি? সঙ্কল্প উপশান্ত হইলে সংসার দুঃখের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে। সঙ্কল্পই মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি ও বাসনা। নাম মাত্রে ইহারা ভিন্ন। ইহাদের পৃথক্ অর্থ নাই। সঙ্কল্প ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই তখন হৃদয়ের সঙ্কল্প ছেদন কর, বৃথা শোক কেন? আকাশের মত জগৎটাও শূন্য। আকাশই বল আর জগৎই বল—সবই সঙ্কল্প হইতে উঠিয়াছে সুতরাং সব মিথ্যা। সব মরীচিকা—আরোপে ইহাদের বিস্তৃতি। ভাবনা রূপ সঙ্কল্প হইতে জগৎ উঠিয়াছে। ভাবনাক্ষয়ে ইহার থাকে কি? জগৎটা যে অসৎ তাহা নিশ্চয় করাতে কষ্টও নাই। সব অগ্রাহ্য কর, সব অবহেলা দৃষ্টিতে দেখ, দেখিয়া আত্মাই আছেন আমি আত্মাই এই ভাবনা কর। বল তখন স্ত্রী পুত্র বিষয়াদিতে আস্থা কি থাকে? আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তে আস্থা রাখিও না, দেখিবে সুখ দুঃখ ও তখন মিথ্যা হইয়া যাইবে। মন বাসনা দ্বারা জগদ্রূপ মানস নগর বিস্তার করে। একবার গড়ে, আবার ভাঙ্গে—ভাঙ্গিয়া দুঃখও করে। হৃদয় কাননের মর্কট এই জীব—ক্রীড়ারত হইয়া কখন ইহা বাড়িয়া উঠে কখন ক্ষীণ হয়। সঙ্কল্পে জগৎ বিস্তৃত হয়, সঙ্কল্প ক্ষয়ে ধ্বংস হয়। এই ক্ষণবিধ্বংসী অসৎ সঙ্কল্পের চিকিৎসা কর। পারিবেই। যাহা অসৎ তাহাও সৎ হয় না। কাজেই যাহা অসৎ তাহার চিকিৎসা করা ত সহজ। সংসার বা জগৎ সত্য হইলে ইহাদিগকে দূর করা যাইত না। কল্পনায় ইহাদিগকে সত্য ভাবিয়াছিলে আবার বিপরীত কল্পনা করিলে ইহারা দূর হইয়া যাইবে। অসৎ যাহা তাহা কতদিন

থাকিবে? আত্ম বিচারে সংসারে লয় হইবেই। সংসার ভাবনা ত্যাগ করিলেই ত্যাগ করা যায়। এ সংসারে তোমার বলিতেও কিছু নাই আমার বলিতেও কিছু নাই। তুমি বা আমি আমরা সংসারের কেহ নই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার ভ্রম দূর হউক—তুমি পরমপদে স্থিতি লাভ কর।

স্থিতি ৫৫ সর্গঃ

বশিষ্ঠ দাশূর মেলন।

নির্ব্বৃষ্ট সলিল তোয়দ যেমন নিঃশব্দে পর্ব্বত শৃঙ্গে অবতরণ করে, বশিষ্ঠ দেব বলিতে লাগিলেন হে রঘুকুল আকাশের শশাঙ্ক! সেই রাত্রিতে পিতাপুত্রের আলাপ শ্রবণ করিয়া আমিও সেইরূপে আকাশ হইতে পত্রপুষ্পফল সঙ্কুল কদম্বাগ্রে অবতরণ করিলাম। ইন্দ্রিয় নিগ্রহে শূর সেই দাশূরকে দেখিলাম। সেই অগ্নিকল্প ঋষির শরীর হইতে নিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ ভূতলকে কাঞ্চনীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভাস্কর যেমন ভুবনমণ্ডল প্রতপ্ত করেন তিনিও সেইরূপ ঐ বৃক্ষ তাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া দাশূরমুনি পত্রাসন বিছাইয়া দিলেন এবং পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করিলেন। তখন আমরা উভয়ে দাশূর পুত্র সমক্ষে সংসার-তরণোপায় স্বরূপ আত্মবিচার করিলাম। কথান্তে মুনির কদম্বাশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম তাঁহার তপস্যা প্রভাবে মৃগকুল অব্যাকুলিত চিত্তে সেই বৃক্ষের কোটর প্রদেশে অবস্থান করিতেছে। লতামণ্ডলমণ্ডিত বিস্তৃত বনতুল্য ঐ কদম্ববৃক্ষে অসংখ্য কুসুম কলিকা বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে আর মনে হইতেছে যেন কোন বধূ বরের সহিত মিলিত হইয়া মৃদু

মৃদু হাস্য করিতেছে। ইন্দুসুন্দর চমরমৃগগণ শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতেছে আর মনে হইতেছে বৃক্ষ যেন শুভ্র মেঘমণ্ডলে পরিবৃত শরৎকালীন আকাশমণ্ডল। বৃক্ষের পত্রে পত্রে হিম বিন্দু এ যেন মুক্তামালা—শাখাগ্রে পুষ্প নিকর—এ যেন অলঙ্কার। কদম্ব পুষ্পের রেণু বৃক্ষকে চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। নবোদ্গত পল্লবরাজি রক্তাম্বর পরিচ্ছদের ন্যায়। লতা ও বৃক্ষ দেখিয়া মনে হয় যেন অলঙ্কার বিভূষিতা লতাঙ্গনাকে বিবাহ করিবার জন্য কদম্ব বৃক্ষ বরবেশে দাঁড়াইয়াছে। এই যে বৃক্ষের বর্ণনা ইহাতে কি বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হইলে সমস্তই যেন জীবন্ত হইয়া যায়। বৃক্ষ দেখা হইলে আমি মহাত্মা দাশূরের সহিত কতক্ষণ আলাপ করিলাম এবং তাঁহার শিষ্যকেও উপদেশ প্রদান করিলাম। আর বনদেবী পুত্র প্রবুদ্ধ হইলেন। জ্ঞানগর্ভ বিচিত্র কথোপকথনে শর্ব্বরী মুহূর্ত্ত কালের ন্যায় অতিবাহিত হইল।

"শর্ব্বরী সা ব্যতীয়ায়া মুহূর্ত্ত ইব কান্তয়োঃ।"

প্রাতঃকালে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। মহাত্মা দাশূর পুত্র সঙ্গে কদম্ববনের সীমা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিলেন। অতঃপর স্বর্গ গঙ্গায় স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া আমি নভোমার্গে সপ্তর্ষি মণ্ডল ভেদ করিয়া স্বস্থানে ফিরিলাম।

রাম! দাশূর উপাখ্যান এই তোমায় বলিলাম। সংসার সত্য মত হইলেও ইহা অসত্য। জগতের বিম্ব নাই অথচ ইহা প্রতিবিম্ব-তুল্য—ইহা অসৎ। দাশূর উপাখ্যানে জগৎ যে অসৎ তাহাই দেখাইলাম। লোকে যে ইহাকে বাস্তব বলিয়া ভাবনা করে তাহা ভ্রম মাত্র। দাশূর মুনির দৃষ্টান্তে তুমি অবাস্তব ত্যাগ কর, করিয়া বাস্তব আত্মতত্ত্ব গ্রহণ কর। আত্মা হইতে ব্যর্থ কল্পনা মুছিয়া ফেল, আর পরিপূর্ণ নিবিড় ঘন এক রস আত্মাই তোমার স্বরূপ জানিয়া ঐভাবে স্থিতি লাভ কর।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৫৬ সর্গঃ।

বিচার যোগ উপদেশ—'আমি' 'আমার' আস্থা ত্যাগ—

বশিষ্ঠ—নাস্তীদমিতি নির্ণীয় সর্ব্বতস্ত্যজ রঞ্জনাম্।
যন্নাস্তি তৎপ্রতি কিল কেবাস্থেহ বিচারিণাম ॥১

ইদং=জড়ং জগৎ। রঞ্জনাং=অহং মমেতি সংসর্গ তাদাত্ম্যা ধ্যাস লক্ষণামাস্থাম্। যাহা দেখ, শুন, স্মরণ কর তাহা নাইই এই নিশ্চয় করিয়া সকল বস্তুতে 'আমি' 'আমার' আস্থা ত্যাগ কর। যাহা নাই তৎপ্রতি, বিচারবান্ যাঁহারা, তাঁহাদের অবস্থা আবার থাকিবে কি? জগৎটা সৎ হউক বা অসৎ হউক বা সদসৎ হউক এই পক্ষত্রয়েই অহংতা-মমতা-রঞ্জন বা আস্থা উচিত নহে। জগৎ দেখিতেছি, দেহ দেখিতেছি—এই জন্য যদি বল ইহাদের সত্তা আছে তবে সে সত্তা তুমিই। কারণ তুমি আছ বলিয়াই তোমার নিকট দেহাদি আছে। তুমি না থাকিলে দেহাদি কাহার নিকট থাকিবে? জগৎটা যে থাকিবে তা জগতের একজন অনুভব কর্ত্তা থাকা চাই; জগৎটা অনুভব কর্ত্তার অনুভবে থাকে। অনুভবের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের একটা পৃথক্ সত্তা থাকে না।

কিন্তু যদি তোমার অস্তিত্বের অপেক্ষা না রাখিয়া দেহাদির পৃথক্ সত্তা আছে স্বীকার কর তবে তুমিও দেহাদি সত্তা বা অস্তিত্বের অপেক্ষা না রাখিয়া অসঙ্গ, উদাসীন, চিদ্রূপী স্বীয় আত্মায় অবস্থান কর—দেহাদিতে আত্মভাব স্থাপন করিয়া আপনাকে বদ্ধ ভাবনা কর কেন? যদি দেহাদি জড় জগতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই আছে স্বীকার কর, তথাপি যাহা চলাচল স্বভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব নাস্তিত্ব—এই পরস্পর বিরোধী-ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া অনিয়ত স্বভাব যাহা, তাহার ভাবনায় বদ্ধ হওয়া কি যুক্তি সঙ্গত? আর রাম! যদি জড়ের—এই জগতের বা দেহাদির স্বতন্ত্র অস্তিতা না থাকে তাহা হইলে বুঝিও যে নির্ম্মল আত্মতত্ত্বই এই জগৎরূপে বিস্তৃত হইয়াছেন।

আত্মাই চৈতন্য। ঘন নিবিড় সর্ব্বত্র একরস এই চৈতন্য কিন্তু

আকাশের মত নহেন। আকাশও চৈতন্যের মত সর্ব্বব্যাপী মত দেখায় কিন্তু আকাশ ঘন পদার্থ নহে, নিবিড় নহে কারণ আকাশের ভিতরে অন্য বস্তু প্রবেশ করিতে পারে, অবকাশ আছে বলিয়া ইহার নাম আকাশ। নিবিড় চৈতন্যের ভিতরে কোন কিছু থাকিবার কিন্তু অবকাশ নাই। তথাপি চৈতন্যের ভিতরেই এই জগৎ এই যে বলা যায় ইহা স্ফটিক শিলা যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব ধারণ কবিয়া ঐ আকারে আকারিত দেখায় সেইরূপ। যদি বল বৃক্ষাদি বিম্ব আছে বলিয়া তাহাদের প্রতিবিম্ব স্ফটিক শিলায় পড়িতে পারে কিন্তু জগৎটা যদি প্রতিবিম্বই হয় তবে বল দেখি এটা কাহার প্রতিবিম্ব? জগতটার বিম্ব কোথায়? বাহিরের কোন বস্তু জগৎ প্রতিবিম্বের বিম্ব নহে—কিন্তু জগৎটা চিত্তস্পন্দন কল্পনার প্রতিবিম্ব। কল্পনা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে ঘনীভূত হইয়া জগৎ রূপ ধারণ করে। কল্পনা যেখানে আছে সেখানে একটা চলন আছেই এবং সেখানে উহাদের সংস্কার বা দাগ থাকিবেই। বিচিত্র কল্পনায় বিচিত্র সংস্কার। ইহাই বিচিত্র জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়।

নেদমস্তি জগদ্রাম তব নাস্তি মহামতে।
কেবলং স্বচ্ছমে বেত্থ মাততং মিতমীদৃশম্॥ ৪॥

রাম! বিম্ব নাই প্রতিবিম্ব আছে ইহা যদি বুঝিয়া থাক তবে নিশ্চয় করিতে পারিবে জগৎটা আদৌ নাই। তবে আর তোমার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? কেবল স্বচ্ছ আত্মতত্ত্বই এই রীতিতে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছেন ইহাই নিশ্চিত। অন্য বস্তু দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার অবকাশ এখানে নাই, অর্থাৎ এখানে অহং বা মমতা করিবার কিছুই নাই। এখন কর্ত্তা, অকর্ত্তা—এই সব কি বিচার কর। বিচার করিয়া অহং অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলে তুমি স্বরূপে অবস্থান করিবে।

এই জগৎ কোন কর্ত্তার কৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে অর্থাৎ এই জগৎ কোন কর্ত্তার কার্য্য নহে। এই জগতে কর্ত্তৃ কর্ম্মাদির ও কোন প্রকার ক্রম নাই। অমুক কর্ত্তা, অমুক কর্ম্ম এইরূপ প্রতীতি ভ্রম মাত্র ইহা অবিদ্যা হইতে আইসে। এই জগজ্জাল অকর্ত্তৃক হউক বা সকর্ত্তৃক

হউক তুমি দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য অধ্যাস ভাবনা করিও না এবং আপনাকে বুদ্ধি উপাধি পরিচ্ছিন্ন, খণ্ড মত ভাবিও না।

রাম—আত্মা অকর্ত্তা—এইরূপ বলিলে শ্রুতি বিরোধ হয় না কি? শ্রুতি না বলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা"—শ্রুতি এইরূপে আত্মাকে কর্ত্তা বলেন কেন?

বশিষ্ঠ—যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং, তদপাণিপাদং, নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি" শ্রুতি ইহা বলিয়া আত্মার স্বরূপ যাহা তাহা তাহাতে অসঙ্গ বলিতেছেন, আত্মা উদাসীন শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন। তবে যে আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয় তাহা কেবল জগৎকে মিথ্যা বলিবারই জন্য। আত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয় বিহীন। যাহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, যিনি নিরাকার তিনি কর্ত্তা হইবেন কিরূপে? জড়ের কর্ত্তত্ব না থাকিলেও যেমন লোকে বলে গাছের পাতা মর্ম্মর শব্দ করিতেছে—আত্মার কর্ত্তৃত্ব এই জড়োপম। কাক উড়িয়া গেল আর তাল পড়িল ইহা দেখিয়া লোকে বলে কাকই তাল ফেলিয়া গেল সেইরূপ কাকতালীয় মতে লোকে বলে আত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আত্মা কিন্তু জগৎ সৃষ্টি করেন না। কর্ত্তা যে কর্ম্ম করেন তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা থাকে এবং যত্ন ও থাকে। কিন্তু এই ইচ্ছা ও এই যত্ন আত্মাতে আছে ইহা কে বলিবে? কাজেই জগৎ কার্য্যটা আকস্মিক—আত্মা ইহার কর্ত্তা নহেন। আত্মার কর্ত্তৃত্ব সুমেরু পর্ব্বতের সূর্য্যপরিবর্ত্তনের কর্ত্তৃত্বের ন্যায়।

কাকতালীয় যোগেন জাতং যৎ কিঞ্চিদেব তৎ।
তস্মিন্ ভাবানুসন্ধানং বালো বধ্নাতি নেতরঃ॥ ১৮

কাকতালীয় যোগে যাহা জন্মে তাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ। ইহা অনির্ব্বচনীয়। ইহাতে যে ভাব অর্থাৎ অহংতা মমতা করা—সেই জন্য পুনঃ পুনঃ জগতের যে স্মরণ ইহা বালক ব্যতীত জ্ঞানীর কখন হয় না।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অৰ্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

নূতন পুস্তক

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২৩শ বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

একান্ত ভাবনায়—কলিকাতায়।

এইত সেই চিরাভিলষিত একান্ত বনভূমি। আহা! এই নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়াই চিত্ত যেন কোন এক অপূর্ব্ব রসে ডুবিয়া থাকিতে চায়, আর ঋষিগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহাদের ভাবনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধন্য হইয়া যায়।

চারিদিকে গোলাকারে বৃক্ষ লতা গুল্মাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা। মধ্যে পরিষ্কার সমতল ভূমি। কত হরিণ হরিণী, কত ময়ূর ময়ূরী, কতপ্রকারের পক্ষী, কত প্রকারের প্রজাপতি এই পার্ব্বতীয় লতাপুষ্পপূর্ণ স্থানে আনন্দে বিচরণ করে। পর্ব্বতের গাত্র হইতে কতকাল ধরিয়া স্ফটিকস্বচ্ছজলধারা নিঃসৃত হইয়া সমতল ভূমি বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র নদীর আকারে প্রবাহিত হইতেছে।

ঈশ্বর চিন্তার স্থানই এইরূপ পুণ্যভূমি। ঋষিগণের প্রদর্শিত ঈশ্বর ভাবনা এই সব স্থানে আপনা হইতে চিত্তভূমিতে প্রবাহিত হয়।

লোকে বলে মানুষই ঈশ্বর সেবা করে কিন্তু ঋষিগণ সকল প্রকার উপাসনার ভিতরেও দেখিতেন পুরুষ হইয়া প্রকৃতির সেবা।

কোলাহলশূন্য এই নির্জ্জন প্রদেশে রাত্রিকালে সমন্তাৎ প্রসারিত সুনীল আকাশে ঐ যে তারার মালা ঝলমল করে আর নিম্নে ঐ যে

বিচিত্র কুসুমরাশি এই বনভূমিতে শোভা ছড়ায় একি শুধুই প্রকৃতির শোভা? এখানে—এই সকলের অন্তরালে আর কাহারও আদর আর কাহারও প্রতি আছে কিনা তাহা সাধারণ লোকে ধরিতে বুঝি পারে না কিন্তু ঋষিরা তাঁহারই অনুগ্রহে এই সকলের মধ্যে আরও কিছু যেন দেখিতেন—দেখিয়া তাঁহার ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন। আমরা আর কিছু না বলিয়া শ্রীগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকের প্রশ্নোত্তর হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

গীতা সেই পরম বস্তু সম্বন্ধে বলিতেছেন তিনি আদিমৎ নহেন; সৎও নহেন অসৎও নহেন; সর্ব্বত্র পাণি, পাদ, অক্ষি, শির, মুখ, শ্রুতি বিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপী তিনি। তিনি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত অথচ ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক; কাহারও সহিত কোন সংস্রব তাঁহার নাই অথচ তিনি সকলের আধার; গুণ নাই অথচ গুণের পালক; সর্ব্ব জীবের বাহিরে অন্তরে তিনি; তিনি স্থাবর আবার তিনিই জঙ্গম; সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়; তিনি দূরে তিনি নিকটে "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে; তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" আবার "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" এক স্থানে বসিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন, শুইয়া থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করেন"; তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত; সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা হইয়াও সংহারকর্ত্তা; সূর্য্যাদিরও প্রকাশক তিনি; প্রকৃতির অতীত তিনি; তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য; তিনি সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত।

আহা! কত সুন্দর এই পরদেবতা! স্বরূপে তাঁহার কিছুই বলা যায় না। তুমি আমি এক হইলে তাহা নিজবোধরূপে প্রকাশ পাইবে। রূপে আমিই সেই বিরাট পুরুষ। সকল অবতারই আমি। আদি খুঁজিতে যাও পাইবে না—ইন্দ্রিয় গোচর করিতে যাও সৎ অসৎ কিছুই বলিতে পারিবে না। বিপুল এই মানব জাতি যাহারা গিয়াছে—যাহারা উপস্থিত আছে—যাহারা আসিবে—আমারই দেহ—আমারই আকার—আপনার সহিত আপনিই খেলা করিতেছি—আমি ও আমার প্রকৃতি—অস্পন্দ ও স্পন্দ স্বভাব—আমরা অভিন্ন—আমি আমার প্রকৃতিতে আত্মাভিমান করিয়া থাকি।

আমি অনন্ত কোটি হস্তে আমার প্রকৃতিকে—আমার ভক্তকে সাজাইতেছি, আপনি আপনার ভক্তের রক্ষাবিধান করিতেছি, আপনি আপনার প্রকৃতির চরণ সেবা করিতেছি—তৃপ্তি নাই—অনন্ত কোটি চরণে আমি আমার ভক্তের

জন্য কর্ম্ম করিতে ছুটিতেছি—অনন্ত কাল ধরিয়া করিয়া আসিয়াছি, সাধ ফুরায় না—অনন্ত কোটি নয়নে আমি আমার ভক্তের পানে চাহিয়া আছি—কত দেখি—দেখিয়া আশা মিটে না, অনন্ত কোটি মস্তকে তারে প্রণাম করি—তবুও হয় না; অনন্ত কোটি আননে আমি আমার ভক্তকে ডাকিতেছি, সোহাগ করিতেছি—কত ভিন্ন ভিন্ন স্বরে, কত বিভিন্ন সুরে আনন্দিত হইয়া তাহারই গুণগান করিতেছি, তবুও ডাকা হয় না; অনন্ত কোটি শ্রবণে আমি আমার ভক্তের কথা শুনিতে উৎগ্রীব হইয়া আছি—চিরদিন তাহার কথা শুনিবার আশায় থাকিব—তথাপি এই কর, চরণ, মস্তক, আনন, শ্রবণ—আমার কিছুই নাই, সবই তার; আমি মাত্র তাহার বস্তুকে আপনার বলিয়া বলি, ইহাই আমার স্বভাব; কোন কিছুই আমার নাই—বুদ্ধি নাই, চিত্ত নাই, মন নাই, অহং নাই—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নাই, কিছুই নাই, কোন গুণও নাই, সব তার—সে কিন্তু আমার। আমিই তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া বেড়াই, পাছে সে পড়িয়া যায় আমার অবর্ত্তমানে সে মরিয়া যায়; সে সর্ব্বদা আমার আনন্দে বিভোর থাকে তার অন্তরে আমি, বাহিরে আমি—কোথাও তারে একা রাখিয়া থাকিতে পারি না, আমার প্রকৃতি কখন চলে না—তাই স্থাবর—তখন আমি তার সঙ্গে স্থাবর; কখন চলে—তখন আমি তার সঙ্গে জঙ্গম, কখন অতি সূক্ষ্ম রূপ ধরিয়া তার যেন অবিজ্ঞেয় হই; কখন ভুলাইয়া দেখাই আমি অতি দূরে, কখন জ্ঞান দিয়া দেখাই আমি কত নিকটে, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত; তাহার সহিত সৃষ্টি করি, স্থিতি করি আবার সংহার করি। আমার দীপ্তিতে আমার ত্রিনয়নীর বহ্নি, সূর্য্য, শশাঙ্কনয়ন সর্ব্বদা উজ্জ্বল—তাহার সহিত সব সাজি বটে তথাপি সে আমার সহিত কখন এক হয় না। আমা হইতে বিভিন্ন হইয়া আমাকে দেখিতে চায়—আমাকে তাহার অতীত বলে। এই জগৎ তাহার চিত্তস্পন্দন কল্পনা—আর সে আমার উপরে তাণ্ডবে নিমগ্না; আমি তাহার সৃষ্ট জীবের বুদ্ধিতে; কে বুঝিবে আমাদের একি খেলা?

এই সব চিন্তায় আত্মহারা হইয়া এই কাককোলাহল স্থানেই একান্ত করিয়া লইতে হয়। আমার ভাগ্যে কখনও সত্যের একান্ত যুটিল না—তার ইচ্ছা হইলেই যুটিবে। সন্ধ্যাবন্দনাতেও কতকাল ধরিয়া "আয়াহি বরদে" বলিয়া ডাকি—আর কল্পনায় ভাবনা করি—সে আসিয়াছে। আমার সৈরূপ ভাগ্য নাই। আর তাঁহারা কতই ভাগ্যবান্—যাঁহারা "আয়াহি বরদে

দেখি" বলিয়া ডাকিলেই সত্য সত্যই দেখেন সে আসিয়াছে? এই যে পাই না—তাতে বুঝি "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ"—ভাল কর্ম্ম করা নাই, তার জন্য কোন স্বার্থত্যাগ করি নাই, তার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করি নাই—শুধু আপনার সুখ খুঁজিয়াছি তাই সে আসে না। ইহাতে দুঃখ নাই—এখন আর যে কটা দিন অবশিষ্ট আছে সে কটা দিন তার নাম করিয়া করিয়া সকল কার্য্য যেন করিতে পারি এই প্রার্থনা।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।
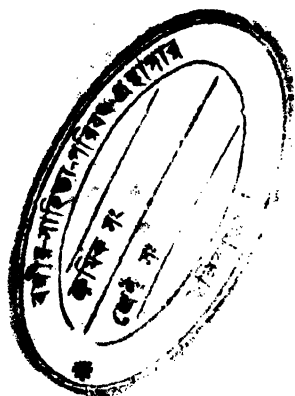
রাম গান।

রামচন্দ্র গুণধাম হামারি।

নবদুর্ব্বাদল কান্তিউজল, হৃদি-মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী॥
সর্ব্বারাধ্য হে দেবদেব শ্রীঅযোধ্যাপুরজন তাপনিবারী।
কৌশল্যাসুত দশরথনন্দন নটসুন্দর সরযূতটচারী॥
কমলনেত্র বিমল মুখমণ্ডল তরুণারুণ
বক্ষপীন কটি ক্ষীণ অসীমশক্তি সুবলিত ভুজদণ্ডে—
রম্ভাতরুউরু চরণে উদিত চারুচন্দ্র নখর দোসারী
শীর্ষে প্রখরকোটী ভানুকরোজ্জ্বল ঝলমল মুকুট করে ধনুধারী॥
তাড়কামারি ত্রাসিত সুরবাসিগণ তাপদুঃখ ভঞ্জনকামী
রঞ্জন হে রঘুনন্দন বিশ্বামিত্র বিমোহন স্বামী
রাজ রাজ যুবরাজ রক্ষকুল নির্ম্মূল হেতু অবতারি
সঙ্গে অনুজ মহাভুজ শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীচরণ পরশে অহল্যা উদ্ধারী॥
জনক সুতাবর মাল্যগ্রহণপর রঙ্গে হরধনু ভঙ্গে
ভৃগুরাম দর্পহর রাম সমরসামর্থ্য পরীক্ষা প্রসঙ্গে
পিতৃসত্য পালনে বনবাসী সহ লক্ষ্মণ জনককুমারী
বালী নিধন হনুমন্ত জীবন সংগ্রামে খরদূষণ বক্ষবিদারী॥

গুহক মিত্র হে সুখদ চরিত্র চিত্রকূটাদ্রি নিবাসী
লঙ্কাপতি কৃত মায়া অপহৃতা সীতাবিরহী উদাসী
শুদ্ধ স্নেহাস্পদ সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্বুবান শুভকারী
মহাসিন্ধু সেতুবন্ধক বিভীষণ বান্ধব কুম্ভকর্ণ রাবণারী ॥
সীতা উদ্ধারক সমরে নিপাতক বিকটাকৃতি দশস্কন্ধ
মিত্র বিভীষণে রাজ্য প্রদায়ক তোষণ সুর মুনিবৃন্দ
বর্ষ চতুর্দ্দশ অন্তে অযোধ্যাপুনরাবর্ত্তনকারী
পুষ্পরথস্থিত বল্কল পরিহিত পিঙ্গল জটিল জটাজূটধারী ॥
জয়তি অতঃপর সিংহাসন পর সীতাসহ দশরথলাল
লক্ষ্মণ ভরত শক্রঘ্ন পরিবৃত রাজ রাজেন্দ্র দয়াল।
প্রজানুরঞ্জন ত্রিভুবন বন্দন দাস ভক্ত মনোহারী
জয়তি রাম সীতা, রাম রাম দাস **বিশ্বরূপ** দুরাচার উদ্ধারী ॥

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

এই সীতারাম সকলের হৃদয়ে আছেন। সকল পদার্থের স্বরূপই এই সীতারাম। ইঁহার স্মরণ—উগ্রভাগে স্মরণ—এইত তপস্যা। হৃদয়ে ত আছেন—সর্ব্বদা স্মরণে মহাবীর যেমন বক্ষবিদারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন হৃদয়ে সীতারাম কেমন করিয়া আছেন—ইঁহার স্মরণে—সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্বভাবনায়—কাতরভাবে সর্ব্বদা স্মরণে যখন সীতারাম হৃদয়ে জাগ্রত হয়েন—হইয়া হৃদয়ের রাজা হইয়া উপবেশন করেন তখনইত মানুষের সব হয়। ভক্ত তুলসীদাস সব জানিয়া, যাহা বলিয়াছেন তাহাইত ভক্তের সকল সাধের সাধ।

জানি সকহু তে জানহু নিগুর্ণ সগুণ স্বরূপ।
মম হিয়পঙ্কজ ভৃঙ্গইব বসহু রাম নররূপ ॥

জানিতে যাঁর শক্তি আছে তিনি তোমার নির্গুণ সগুণ স্বরূপ জানুন। আমি প্রভু বড় দীন হীন, বড় কাঙ্গাল। আমার সাধ—আমার হৃদয়পদ্মে—আমার হৃদয়স্থিত অষ্টদলপদ্মে নিরাকার রাম নররূপে বসিয়া আমার হৃদয় কমলের মধু পান করুন। আমি ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসুখ মনে করি। ভ্রমর যে কমলের মধুপান করে তাহাতে ভৃঙ্গ অপেক্ষা কমলের সুখই—যিনি মধুপান করেন তাঁহা অপেক্ষা যিনি মধুদান করেন—সেই কমলের সুখই নিরতিশয় আনন্দ।

আর এই মাতা কৈকেয়ী? দেবী কৈকেয়ীকে এস আমরা শত শত প্রণাম করি। তাঁহার জন্যই আমরা সঙ্ক্ষেপে অযোধ্যাকাণ্ড—বহু বর্ষ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলাম। মায়ের প্রসাদেই আজ এই অযোধ্যাকাণ্ডের—আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সমাপ্ত হইল। ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসের মহাষ্ঠমী আজ। কাল রামনবমী। কাল রবিবার। কি জানি এই রামনবমীতে কি আছে?

এই রমণীয় চিত্রকূট হইতে বিদায় লইবার সময় আমরা রাণী কৈকেয়ী হইতে কিছু পূর্ব্বের কথা বলিয়া রাণীর কথা শেষ করিতেছি।

নয়নাভিরাম চিত্রকূটে রামমাতাগণ সকলেই আসিয়াছেন আর তৃষার্ত্তা গাভী যেমন জলদর্শনে দৌড়িয়া যায় সকলেই সেইরূপে রাম দর্শনে যাইতেছেন। কেবল কৈকেয়ী যাইতে পারিতেছেন না—দেখা করিতে আসিয়াও দেখা করিতে পারিতেছেন না। কোন মুখে দেখা করিবেন? এক বৃক্ষগাত্রে ভর করিয়া, কৈকেয়ী অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন; মনে মনে বলিতেছেন রাম! আমার অপরাধের কি ক্ষমা নাই? তুমি কি আমায় দেখা দিবে না? তোমায় দেখিতে আসিয়াও, আমি তোমার নিকটে যাইতে পারি না! আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি। একটিবার বল, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তোমার মুখেই ইহা একবার আমি শুনিতে চাই। আর তোমার মুখে শুনিয়া আজ তোমার নিকটে আমার এই অসার জীবন বিসর্জ্জন দিব। তোমার শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া মরিতে চাই। একটি বার শুনিতে চাই, তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ। নতুবা মরণেও আমার শান্তি নাই। রাম! আর কি এই পাপীয়সীকে তুমি দেখা দিবে না? জানি আমি বড় অপরাধ করিয়াছি। আনন্দকানন অযোধ্যা, এই অযোধ্যাকে শ্মশান করিয়াছি, পতিঘাতিনী হইয়াছি, তোমায় বনে দিয়াছি, আমার বড় আদরের মা জানকীকে স্বহস্তে চীরবসন দিয়াছি। আমি যে সীতাকে পাইয়া মাণ্ডবীকেও আদর করিতে

ভুলিয়া যাইতাম। আজ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছি আহা! আমি এসব কি করিয়াছি? আর বাকী কি আছে? সব দোষ আমার। আমার অপরাধ সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে। আমার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না—কাহাকেও বুঝাইতে চাইওনা। যাহাকে কিছু বলিতে চাই সেই উপহাস করে, আমি প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করি, করিয়া আপনার জ্বালায় আপনি ছট্‌ফট্‌ করি। রাম! আমি তোমায় বড় দুঃখ দিয়াছি—আমিও আজ বড় দুঃখ পাইতেছি। আমার মনে হয় আরও দুঃখ আমার পাওয়া উচিত। কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না—আমি তোমার নিকট বড় অপরাধিনী—তবু তোমাকেই আমার দুঃখ শুনাইতে চাই। তুমি কি শুনিবে না? তুমি যদি না শুন, বল আমি কোথায় যাইব? বল আমার স্থান কোথায়? আমার আপন সন্তানও যে আর আমার দিকে চায় না রাম! আজ সকলেই যে আমায় লক্ষ্য করিয়া বলে "এই রাক্ষসীই আজ সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রকে বনে দিয়াছে, এর জন্যই সত্যসন্ধ রাজা দশরথ প্রাণ হারাইয়াছেন।" আজ জগৎ সংসার আমায় ঘৃণা করে। আর তুমি? তুমিও কি আমায় ঘৃণা করিবে? না, না, তুমি বড় ক্ষমাশীল, তুমি বড় দয়াময়। তুমি ত কাহারও উপর রুষ্ট হইতে জানন; আমার অন্তর বেদনা রাম, তুমি ভিন্ন আর কে জানিবে? শুনি তুমি মায়ামানুষ, তুমি অন্তর্যামী।

কৈকেয়ী বড়ই কাঁদিতেছেন। বড় উগ্রভাবে রামকে স্মরণ করিতেছেন। আজ বিপদে পড়িয়া, অনুতাপানলে কৈকেয়ীর কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে। কৈকেয়ীর পশ্চাত্তাপদগ্ধ প্রাণের কাতর আহ্বানে, রাম ব্যাকুল হইয়াছেন, রাম আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রাম যেন কাহারও অনুসন্ধান করিতেছেন।

ভরতকে সহসা চক্রধারী, জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত কোন উত্তর দিলেন না। যেখানে দুঃখিনী, মলিন বসনা রাজরাণী, অশ্রুপূর্ণ লোচনে যোড়করে, শূন্য লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, রাম সেইস্থানে আসিলেন। আসিয়াই প্রফুল্ল বদনে চরণ বন্দনা করিলেন।

কৈকেয়ী শিরহিয়া উঠিল। দুঃখে, লজ্জায়, অনুতাপে হৃদয় আবার যেন পুড়িতে লাগিল। আহা! এই রামকে কোন্ প্রাণে—অভিষেকের দিনে, বাকল পরাইয়া বনে পাঠাইয়াছিল! রাম যেন বড়ই অভিমান করিয়াছেন—অভিমানে বলিতেছেন "মা"। আজ কৈকেয়ী কতদিন মা শব্দ শুনেন নাই, কৈকেয়ী আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন—রাম বলিলেন "মা, সকলে

আমার সহিত দেখা করিল, আর তুমি "মা" এখানে দাঁড়াইয়া আছ কিরূপে?

আবার সেই প্রাণভরা "মা"। যেন দিগ্‌দিগন্তে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভরত মা বলে না, কৈকেয়ী যেন যুগযুগান্তর মা শব্দ শুনেন নাই, দুঃখিনী আজ অশ্রুজলে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। আজ রাম বলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, জগৎ যেন মা বলিয়া তাঁহার কোলে আসিতে চায়। কৈকেয়ী কত বার চেষ্টা করিলেন একটি বার ভাল করিয়া দেখিবে হায়! আজ নয়নজলের বিরাম নাই। রামের সুমধুর মা নাম শিরায় শিরায় অমৃত সিঞ্চন করিল, আর একদিকে অনুতাপের শত বৃশ্চিক দংশন জাগিয়া উঠিল। কৈকেয়ী অজ্ঞাতসারে হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, ইচ্ছা একবার রামকে কোলে লয়েন, কোলে লইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান। অন্তর্যামী, কৈকেয়ীর প্রাণের কথা বুঝিলেন। দীনবৎসল, সহাস্য বদনে কৈকেয়ীর ক্রোড়ে আসিলেন। আর কৈকেয়ী ভিতরে কি হইয়া গিয়াছে; রামকে কোলে পাইয়া কৈকেয়ীর সর্ব্বদুঃখ দূর হইয়াছে—কৈকেয়ী কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। কৈকেয়ীর নয়ন জলে, রামের বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে। রাম বহু সান্ত্বনা করিলেন, এমন সময়ে সীতা আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন আসিলেন। কৈকেয়ী পাগলিনীর মত গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল। রামের আদরে, কৈকেয়ীর চক্ষের জল একবার থামিয়াছিল। আবার সীতা দর্শনে কৈকেয়ী বড় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বারিধারা বর্ষণের পূর্ব্বে, মেঘ যেমন একবার গম্ভীর হয়, কৈকেয়ী একবার সেইরূপে সীতাকে দেখিলেন। পরে বড় আগ্রহে মা জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। "হায়! আমার এই ননীর পুতলীকে আমি কোথায় বিসর্জ্জন দিয়াছি"। কৈকেয়ী বলিতে পারেন না—কৈকেয়ীর আর কোন কপটতা নাই। ভরত, কৈকেয়ীর ভাব দেখিয়া আর শঙ্কিত হইতেছেন না। কৈকেয়ী এখন সেই স্নেহময়ী জননী—আর সে লোক সংহারিণী মূর্ত্তি নাই। সকলেই মনে ভাবিতেছেন এই কি সেই? আজ সীতারামকে হৃদয়ে ধরিয়া, সর্ব্ব দুষ্কৃতির খণ্ডন হইল। কৈকেয়ী সীতাকে কোলে লইয়া কতই কাঁদিলেন, বলিলেন "মা, আমি কোন্ প্রাণে আমার এই সোহাগ পুতলীকে—এই সোণার প্রতিমাকে, বনে দিয়াছি! কি তখন আমার হইয়াছিল মা, তোমরা অযোধ্যায় চল, কেহই আর মা সেই শূন্য পুরীতে বাস করিতে পারিবে না।

মা, আমার রাম আমায় ক্ষমা করিয়াছে, চল, আমার রাজলক্ষ্মী গৃহে চল। সীতারাম শূন্য অযোধ্যা স্মরণ করিতেও, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সীতা, আমি তোমাদের হইয়া, বনবাস করিব, আজ তোমাদের হইয়া আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তোমরা অযোধ্যায় যাও। কৈকেয়ী কতই বলিতে চান, সীতা শাশুড়ীর চক্ষুজল মুছাইতেছেন।

পূর্ব্বে ভরত পরাজয়ের কথা বলা হইয়াছে সকলের বিদায় হইয়া গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাম কুটীরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকেয়ী একান্তে কি বলিবেন এই ইচ্ছা জানাইলেন। ভক্তাধীন প্রভু কৈকেয়ীর অন্তর বেদনা বুঝিলেন। রাম ও কৈকেয়ী একান্তে আগমন করিলেন।

কৈকেয়ী রামমেকান্তে প্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যবিঘাতনম্॥
কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিতচেতসা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ॥

কৈকেয়ী রামকে একান্তে পাইয়া অশ্রুধারা বিগলিত লোচনে কাতর প্রাণে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন হে রাম! আমি মায়ায় মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি বলে তোমার রাজ্যসুখ বিনষ্ট করিয়াছি। তুমি আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। তুমি সাধুর সাধু। ক্ষমা করাই তোমার স্বভাব।

ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
মায়ামানুষ রূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ॥
ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধ্বসাধু বা।
ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্॥

তুমিই বেশনশীল সর্ব্বব্যাপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তুমি অব্যক্ত। তুমি পরমাত্মা। তুমি সনাতন পুরুষ। তুমি নিরাকার হইয়াও মায়া সাহায্যে নরাকার রূপে নিখিল জগৎ ভুলাইতেছ। লোকে সাধু, অসাধু যাহা কিছু করে তাহাদের কর্ম্মের প্রেরণা তুমিই দিয়া থাক। তোমার অধীন এই জগৎ কাজেই ইহার স্বাতন্ত্র্য আদৌ নাই। তুমি ভিন্ন ইহা কিছুই করিতে পারে না।

যথা কৃত্রিম নর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া।
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী॥

যেমন কৃত্রিম নর্ত্তকী—কাষ্ঠপুত্তলী বাজীকরের ইচ্ছানুরূপে নৃত্য করে, সেইরূপ তোমর অধীন যে মায়া তিনি নর্ত্তকীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করেন।

ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা।
পাপিষ্ঠং পাপমনসা কর্ম্মাচরমরিন্দম॥
তস্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ॥

হে অরিন্দম! দেব কার্য্য সিদ্ধির জন্য তুমিই আমাকে প্রেরণা করিয়াছ তাই আমি কলুষিত মনে এই সকল পাপ কার্য্য করিয়াছি। দেবগণের অগোচর হইলেও আমি আজ তোমাকে জানিয়াছি।

পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নমোঽস্তু তে।
ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরম্।
ত্বজ্‌জ্ঞানামলখড়্গেন ত্বামহং শরণং গত'॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে অনন্ত! হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার নির্ম্মল জ্ঞানরূপী খড়্গ দ্বারা আমার এই উৎকট অপত্যস্নেহ ও আমার এই নিদারুণ বিষয়বাসনা—এই সমস্ত স্নেহরূপ পাশ—এই ফাঁসি—ছেদন কর। আমি তোমার শরণাগত।

কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ॥

কৈকেয়ী ত আর কখন এইরূপ ভাবের কথা কহেন নাই। যখন মানুষ নিজত্ব লইয়া ডুবিয়া থাকে তখন তাহার মাথার উপরে দশ হাত জল। ঘোর মায়ার স্বপন যে দেখিতেছে সে ভগবানকে পাইয়াও ত চিনে না। তাই কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাম ঈষৎ হাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—মহাভাগাবতি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্যই—একটুকুও অসত্য নহে। কারণ আমি দেবতাগণের কার্য্যোদ্ধার জন্য বাণীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। সেই বাণীই তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। ইহাতে তোমার দোষ কি?

ঠাকুর! তুমি যাহা বলিলে তাহাও ঠিক, আবার কৈকেয়ী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন

"দেবতার কার্য্যে রাম তুই বনে এলি
আমার মাথায় থুয়ে কলঙ্কের ডালি"

জননী কৈকেয়ীর এই বাক্যও ঠিক। ঠিক এই জন্য, যে এক তুমি ভিন্ন আর যাহা কিছু, সমস্তই যে অগ্রাহ্য না করে, তারই ক্লেশ অসহ্য আর তোমাকে মাত্র গ্রাহ্য করিয়া আর সব যে অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছে তাহা দ্বারা যদি কিছু অন্যায়ও হয় তাহাতে তাহার কোন কষ্ট হয় না।

গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্।
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষসেঽচিরাৎ॥
অহং সর্ব্বত্র সমদৃক্ দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা।
নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোঽনুভজাম্যহম্॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ো মামম্ব মনুজাকৃতিম্।
সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ॥
দিষ্ট্যা মদ্গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহম্।
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ॥

ভগবান্ কৈকেয়ীকে শেষ উপদেশ যাহা দিলেন জগৎ যদি আজ তাহা শিখিয়া কার্য্য করে তবে বুঝি কোন নর নারীর অশান্তি থাকে না। রাম বলিতে লাগিলেন যাও মা! তুমি হৃদয়ে একমাত্র নিত্য বস্তু যে আমি, আমাকে দিবানিশি ভাবনা কর (যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ভাবিও না—আর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবিও না সমস্ত মায়া, সমস্ত মিথ্যা আমি ভিন্ন কোন কিছুই গ্রহণ করিবার নাই—ইহা জানিয়া সব অগ্রাহ্য করিয়া—অন্ততঃ ভিতরে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে লইয়াই থাক) সর্ব্বত্র ভাল লাগালাগি ছাড়—ছাড়িয়া আমারই ভক্ত হও—আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তি আনিতে পারিলেই অতি শীঘ্র মুক্ত হইয়া যাইবে। আর হে কৈকেয়ি! আমিও সকলকে সমান দেখি (মায়ার আবরণ নাই বলিয়া সর্ব্বত্র আমি আমাকেই দেখি) কাজেই আমার দ্বেষ করিবারও কেহ নাই—প্রিয়ও কেহ নাই। বল দেখি ঐন্দ্রজালিক যাহা লোককে দেখাইয়া মুগ্ধ করে—সেই সকল বস্তুতে কি তাহার দ্বেষ থাকে না প্রীতি থাকে? কিছুই থাকে না, কেননা সে জানে সবই মিথ্যা। ফলে আমাকে যিনি ভজনা করেন আমিও তাঁকে অনুভজন করি—পশ্চাৎ ভজন করি। হে অম্ব! আমার মায়াতে মূঢ় বুদ্ধি হইয়া আমার এই নরাকার মূর্ত্তি দেখিয়া আমাকে লোকে সুখ দুঃখাদির অধীন মনে করে কিন্তু স্বরূপটি আমার জানে না-- নরাকার

স্মরণ করিয়াও যে আমি সর্ব্বদা আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই থাকি ইহা তাহারা জানে না। বড়ই আনন্দের কথা মা যে "আমার জ্ঞানে" সংসার নাশ হয় সেই জ্ঞান তোমার উৎপন্ন হইয়াছে। আমাকেই স্মরণ করিয়া গৃহে বাস কর—কোন কর্ম্ম আর সুখ বা দুঃখ দিয়া তোমাকে বাঁধিতে পারিবে না।

আনন্দে—বিস্ময়ে ভরিত হইয়া দেবী কৈকেয়ী রামকে পরিক্রমা করিলেন—ভূমিতে মস্তক রাখিয়া শত শত প্রণাম করিয়া—আনন্দে গৃহে ফিরিলেন।

নিজের অপরাধ বুঝিয়া, অনুতপ্ত হইয়া যদি দেবী কৈকেয়ীর পথে কেহ চলিতে অভ্যাস করেন তবে তিনি যে রামের কৃপা লাভ করিবেনই তাহার জামীন থাকিলেন মা কৈকেয়ী।

৩০ অধ্যায়ের শেষ অংশ।

পাপ-দোষ-অপরাধ প্রক্ষালন-তপস্যা।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার।)

ত্রিপুরা-রহস্য বলিতেছেন যে মুহূর্ত্তে তোমার অপরাধ বাসনার জ্বালা হৃদয়কে পুড়াইবে সেই মুহূর্ত্তে তুমি নির্ম্মল হইবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি হৃদয়মুকুরে তোমার ঈপ্সিততমের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সফল করিতে পারিবে। একবার-একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিলে বুঝিবে তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন, আর তিনি সর্ব্ব হৃদিস্থ। তখন তুমি বুঝিবে তাঁহাকে পিতা বলিয়া তাঁহার সহিত সংসারের পিতার মত কথা কওয়ায় কি সুখ, মাতার মত দেখিয়া তাঁহার সহিত কথা কওয়ায় কত আনন্দ, স্বামীরূপে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কওয়ায় কত বিশ্রাম, সখারূপে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করায় কত আরাম। শাস্ত্র, এইরূপে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মত লোকের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ
স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্রঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু
র্নান্যংজানে নৈব জানে না জানে।

আহা! আমার ত এখনও ইহা হইল না। হায়, মুখে অপরাধের কথা বলিলেও, মনে মনে দোষের কথা আলোচনা করিলেও, প্রাণে প্রাণে পাপের কথা তুলিয়া প্রাণকে কাতর করিতে চেষ্টা করিলেও সেরূপ বুঝি হইল না নতুবা একান্তে হৃদয় জ্বালাইয়া, হৃদয় নির্ম্মল করিয়া তোমাকে দেখিতে প্রাণপণ করি না কেন? আমার পাপরাশি বিঘ্ন স্বরূপে আসিয়া আমাকে ইতি উতি ছুটায়, একটা ছল করিয়া, একটা আত্মপ্রতারণা করিয়া, নানা প্রকারের লোক সঙ্গ করায়, আহা! তবু বলিতে ইচ্ছা হয় শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি নিরন্তর গোলমাল তুলিলেও প্রাণ যেমন উহার মধ্যে একান্ত করিয়া লইয়া আপনার কার্য্য করেন আমিও যতদিন প্রাণের অভিলাষ মত একান্ত না যুটিতেছে ততদিন যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই বহু প্রকারে একান্ত করিয়া লইতে পারি। হায়! প্রিয়তমকে দেখিতে হইবে, এইজন্মেই উহাঁর সহিত মিলিত হইতে হইবে—ইহা বুঝি আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে, বুঝি আমার ইন্দ্রিয় লাম্পট্য, ভোগ লাম্পট্য অতিশয় প্রবল—নতুবা আমি লাম্পট্য কোনটা বুঝিতে এত দেরী করি কিরূপে—নতুবা লাম্পট্য ধরিয়াও ভোগত্যাগে আমার এত বিলম্ব হয় কেন? হায়! বৈরাগ্যের কারণ ত অনেক পাইলাম! শুধু বচনেই বুঝি বৈরাগ্যের কথা কহিলাম! যে বৈরাগ্যে "সীদন্তি মম গাত্রাণি, মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি; বেপথুশ্চ শরীরে মে, রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে। ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ"—হায়! আমার ত্বকের উপরি ভাগের রোমস্পর্শী বচন—বৈরাগ্যে বুঝি আমার বাসনানিবিড় হৃদয় একদিনও গলিল না আমার হইবে কিরূপে? আমি তোমার দর্শন পাইব কিরূপে? আমি আমার দোষ দেখিতেই চাইনা—আমার উপর তোমার করুণা কিরূপে হইবে? আহা! এখানেও তোমার কৃপা চাই! হায় প্রভু—আমাকে তোমার দাসানুদাস বলিয়া—একবার—একটিবার মাত্র স্বীকার কর—তবেই আমি ভাল হইতে পারিব।

বলিতে পার উহারা কারা যারা বলিয়া বেড়ায় শাস্ত্রের গণ্ডী যত দিন এই জাতি না ছাড়িবে ততদিন এই জাতির লৌহ-শৃঙ্খল ঘুচিবে না। শাস্ত্রই এই জাতির নরনারীকে অসুখী করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের যখন যাহা ভাল লাগে—তাহা যদি মানুষ করিতে পায় তবেইত মানুষ সুখী হয়, তা করিবার উপায় নাই। খাইতে ইচ্ছা হইল খাইলাম—ইহাতে আর বিধি নিষেধ কি জন্য? ভগবানকে নিবেদন না করিয়া যে অন্ন ও জল গ্রহণ করা যায় তাহা বিষ্ঠা ও

মূত্র—এইরূপ উক্তি যে শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহা আবার কি মানিতে হয়? "আচারো প্রথমো ধর্ম্মঃ" "আচার হীনান্ ন পুনন্তি বেদাঃ" এই সমস্ত শাস্ত্রশাসন ইঁহারা মানিতে চান না। এই সমস্ত ব্যক্তিকে স্বভাববাদী বলে। ইঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখাই উচিত নহে। হইতে পারে আধুনিক সমাজে এই দলের লোকই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি বলিতে হয় ঈশ্বর মঙ্গলময়। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহাদের শেষ রক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না—ইহারা সিদ্ধিলাভও করিতে পারেন না—আর ইঁহাদের এখানেও সুখ নাই, পরকাল ত ইহাদের পক্ষে নিতান্ত দুর্গতির স্থান। আচার ও আহার সম্বন্ধে ইঁহাদের যে যুক্তি তাহা নিতান্ত অসার, পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু অর্জ্জুনেরও অনেক যুক্তি ছিল কিন্তু ভগবান্ সে সমস্ত যুক্তির কোন উত্তর দেন নাই—ইহা দেখিয়া বুঝিতে হয় স্বভাববাদীর যুক্তির মূল্য কত।

আমরা এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে যাঁহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়া থাকিতে চান তাঁহারা এই সকল ব্যক্তিকে ঘৃণা না করিয়া যতদূর নিঃসঙ্গ হইতে পারেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ পথ।

এক্ষণে আমরা বৈরাগ্য জাগাইবার জন্য প্রত্যহ যেরূপ ভাবনা অভ্যাস করা উচিত তাহাই আর একবার উল্লেখ করিয়া কিরূপ সাধনা দ্বারা আমরা শ্রীভগবানের হইতে পারি তাহারই আলোচনা করিব।

শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে নানা প্রকার সাধনার কথা বলা হইয়াছে। ত্রিপুরারহস্যে হারিতায়ন ঋষি বলিতেছেন প্রথমেই তীব্র মুমুক্ষা জাগাইতে হইবে। আমাকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে মুক্ত হইতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষা যদি তীব্র না হয় তবে শাস্ত্রের শ্রবণ মননাদি সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। প্রাণকে কাতর না করিতে পারিলে বিষয় ভোগ মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলে—সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া মানুষকে পাপপঙ্কে নিপাতিত করে। সাধনার পূর্ব্বে প্রাণকে কাতর করাই প্রধান কার্য্য। বৈরাগ্য ভিন্ন—বৈরাগ্যের ভাবনা তীব্র না করা পর্য্যন্ত মন কিছুতেই আপাতরমণীয় বিষয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। একদিকে ভগবানের ভাবনা দৃঢ় ভাবে করা চাই, তজ্জন্য শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্ম্মসম্পাদন জন্য প্রাণপণ করা চাই, অন্যদিকে অন্য সমস্ত বিষয় মনে মনে অগ্রাহ্য করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন সৎ শাস্ত্রে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য তীব্র করা উচিত। তীব্র বৈরাগ্য জন্মিলে আর কোন ভয় নাই—কিন্তু মন্দ

বৈরাগ্যেও সুবিধা হইবে না। আমরা এখন প্রত্যহ বৈরাগ্য আনিয়া প্রাণকে কাতর করিবার কথা বলিব।

আহা! অনেক দোষ আমি করিয়া ফেলিয়াছি, অনেক অপরাধ আমার হইয়া গিয়াছে, অনেক পাপ হইয়াছে। বহুদোষের, বহু অপরাধের, বহু পাপের স্মৃতি এখনও আমাকে পীড়া দেয়। সাধন ভজন যথাসাধ্য করি সত্য, কিন্তু যখন বাল্যকাল হইতে এই বয়স পর্য্যন্ত নিজের জীবন আলোচনা করি তখন দেখি আমি গুরুর নিকট অপরাধী, পিতামাতার নিকট অপরাধী, নিজের আত্মার নিকট পাপী। মনে হয় দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া বিষ খাইয়াছি, যাহা ভাল লাগিয়াছিল, তাহা ভাল কি মন্দ বিচার না করিয়া, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ না জানিয়া, গুরুর বিধি নিষেধ না জানিয়া অথবা না মানিয়া শুধু ভাল লাগিতেছে বলিয়া বিষ অঞ্জলি অঞ্জলি খাইয়াছি! আমি অপবিত্র হইয়াছি—তাই বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছি তোমারা বলিতে পার আমার কি কোন উপায় আছে?

আছে বৈকি। যে যত পাপ করুক না কেন শাস্ত্রও বলিতেছেন সকলেরই রক্ষার পথ এখনও আছে। যদি পাপী হইয়াও কেহ পাপ প্রক্ষালন করিতে চায়, যদি সে পবিত্র হইতে চায়, তবে তাহারও পথ আছে।

গীতা বলিতেছেন যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও তথাপি জ্ঞান নৌকায় আরোহণ কর অনায়াসে পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। ৪।৩৬। আবার অন্যত্র বলিতেছেন অতি দুরাচার হইয়াও যদি আমাকে সর্ব্বহৃদিস্থ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অনন্য চিত্তে আমাকে ভজনা কর তবে আমি তোমাকে সাধু করিয়া দিব কারণ তুমি ভাল হইবার জন্য তীব্র ইচ্ছা করিয়াছ। ৯।৩০ গীতা। গীতা আবার বলিতেছেন

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৯-৩২

অতি পাপাত্মাও যদি আমার শরণ লয়, তাহা হইলে নীচকুলজাত ব্যক্তি (পাপযোনয়ঃ) স্ত্রীলোক, বৈশ্য অথবা শূদ্র যেই হউক না কেন সে নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হইবেই। শাস্ত্রাদি জ্ঞান না থাকিলেও শুধু আমার নাম লইয়া আমাকে আশ্রয় করিলেই অতি পাপীও পবিত্র হইয়া আমাকে লাভ করিবে। শুধু শাস্ত্র বাক্য ইহা নহে—অতি পাপীরও বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত আছে।

জগন্নাথ ও মাধব—(জগাই মাধাই) নাম আশ্রয় করিয়াই নিত্য স্মরণের মানুষ হইয়া গিয়াছেন, রত্নাকর উল্টা নাম করিয়াও মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছেন। অহল্যা জ্ঞাতসারে পাপ করিয়াও নাম আশ্রয় করিয়া আজ প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তবে কেন ভাবিতেছ তোমার কি কোন উপায় নাই?

শাস্ত্রত উপায় বলিয়া দিতেছেন এখন তুমি পবিত্র হইব ইহার তীব্র ইচ্ছা জাগাও—আপনাকে অপরাধী জানিয়া তীব্র ভাবে ইচ্ছা জাগাও আমি নিঃসঙ্গ হইয়া তোমারই আশ্রয় লইব—তুমি নাম আশ্রয় করিয়াই থাক, বা যোগপথ ধরিয়াই থাক বা জ্ঞানপথ লইয়াই থাক—তুমি নিশ্চয়ই পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের হইতে পারিবে।

যে পথই ধরিয়া থাকনা কেন শাস্ত্র যাহা করিতে হইবে তাহাই বলিয়া দিতেছেন।

প্রথমেই আচার মানিতে হইবে। আচারহীনান্ ন পুনন্তি বেদাঃ। যাহারা আচার মানেনা—সে যেমনই লোক হউক না কেন—ক্রমে জানা যাইবে--তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য সমস্তই ধ্বংস হইবে কারণ আচার হীনকে বেদও পবিত্র করেন না। শাস্ত্র আবার বলিতেছেন, "আচার রহিতে রাজন্ নেহ নামুত্র নন্দতি।" আচার যদি না মানিয়া চল তবে দেখিবে এই জগতে বা পরজগতে তোমার সুখ হইবে না। আহারে বিচার না করা, বিছানায় বসিয়া যা তা খাওয়া, বিনামা পায়ে, ভগবানকে নিবেদন না করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে খাওয়া ইহা প্রথমেই ত্যাগ আবশ্যক। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন-শুদ্ধ হইয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া আহার করিতেই মহাপুরুষেরা উপদেশ করেন। ইহা না কর বিষ্ঠামূত্র আহার, পান হয়—ইহা করিয়া কয়দিন ভাল থাকিবে? অন্য বিষয়ে আচার নিজে নিজে শাস্ত্র দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া লইতে হয় এবং সেই মত চলিতে হয়। আহার সম্বন্ধেও তাই।

আমরা এখন অতি সংক্ষেপে প্রথমে নাম করিতে হয় কিরূপে তাহাই বলিব। পরে যোগের কথা ও জ্ঞানের কথা বলিতেছি।

নাম সাধনা ও মন্ত্রসাধনা এক প্রণালীতে করিতে হয় না। মন্ত্রজপ উচ্চৈঃস্বরে করা উচিত নহে কিন্তু নাম জপ উচ্চৈঃস্বরেও করা যায়। তবে মন্ত্রজপ এবং নাম জপ মনে মনে করিলে শুচি অশুচি না বিচার করিয়া সকল অবস্থাতেই করা চলে। তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায় গায়ত্রী জপও সকল অবস্থাতেই

করিতে পারা যায় কিন্তু ইহা মানস জপ। এখন আমরা নাম জপের কথা বলিব। তিন সন্ধ্যাতে তিন বার করিয়া বসার বিধি। যাঁহারা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় পাননা তাঁহাদিগকে অগত্য প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এক সময়েই সারিতে হয়। যাহাদের চাকুরীর পীড়া নাই তাঁহারা তিনবারই বসিবেন। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ১০টার পরেও করা চলে।

তিন সন্ধ্যা সাঙ্গ করিয়া সন্ধ্যার অঙ্গীভূত যে জপ তাহা সংখ্যা রাখিয়া করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বদার জন্য যে নাম জপ তাহা সংখ্যা না রাখিয়াই করা উচিত।

যিনি সর্ব্বদা নাম জপ করিতে পারেন—জপ করিতে করিতে স্নান, আহার এবং গৃহকর্ম্মাদি করিবার চেষ্টা করেন তিনি দীর্ঘ কাল পরে সর্ব্বদা নামজপ আয়ত্ব করিতে সমর্থ হন। এইরূপ জাপকের উচিত তিনি শাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে নামীর স্বরূপ, নামীর রূপ, নামীর গুণ ও কর্ম্ম—এই সকলেরও স্মরণ মননে যত্ন করেন। ভগবান আশ্বাস দিতেছেন "মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ"—ইহা এইরূপ জাপকেরই হইয়া থাকে। এইরূপ জাপককেই ভগবান্ বলিতেছেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" আমি হাতে ধরিয়াই এইরূপ সাধককে মৃত্যু সংসার সাগর পার করাইয়া দিয়া থাকি। তাই বলা হইতেছে নাম করিয়া করিয়া তৈল মর্দ্দন কর, নাম করিয়া করিয়া স্নান কর, নাম করিয়া করিয়া গ্রাস মুখে তুল, যাহা দেখ নাম করিয়া করিয়া দেখ, যাহা শুন নাম করিয়া করিয়া শ্রবণ কর, নাম করিয়া করিয়া গৃহকর্ম্ম কর; নাম করিয়া করিয়া রাস্তা চল—যতক্ষণ নিদ্রা না আসিতেছে ততক্ষণ নাম করিতে করিতে নিদ্রার জন্য অপেক্ষা কর, ঘুম ভাঙ্গিলেই নাম কর, আবার নিদ্রা যাইতে হইলে নাম করিতে করিতে নিদ্রা যাও—এইরূপ অভ্যাসও সহজ নহে। সংসারসাগর পার হওয়া কি সহজ যে তাহার উপায় সহজ হইবে? কর হইবে। ক্রমে ধ্যান ও আত্মবিচার সমকালে চলিতে থাকিবে। কিন্তু এমন কর্ম্মও আছে যাহা জপ করিতে করিতে করা যায় না। সেখানে নামের নিকট অনুমতি লইয়া কর্ম্ম কর কিন্তু কর্ম্ম শেষ হইলেই আবার নাম জপিতে থাক। ইহাতে নামীর কৃপা অনুভব করিবে ও তোমার সুবিধা হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে "নিবেদয়ামি চাত্মানং" অভ্যাস কর—সব তোমার আমার কিছুই নাই প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করিয়াও ভাবনা কর। যোগপথে প্রাণায়াম করিয়া করিয়া স্থিরত্ব লাভ হইলে ভাবনা কর কূলকুণ্ডলিনী শতবিদ্যুৎ

প্রভা ছড়াইয়া ধীরে ধীরে সুষুম্নার সূক্ষ্মপথে উঠিতেছেন, শেষে কূটস্থে উঠিয়া রূপ ধরিয়া পরমপুরুষের দিকে চাহিয়া আছেন ইহার ধ্যান কর। আবার জ্ঞান মার্গে "আমার" ছাড়িয়া "আমি" ধর। ইহাই বিদ্যাভ্যাস। ইহাতে দেহে অহং বোধের নাশ হইবে। এই সব কথা বহুদিন হইতেই বলা হইয়াছে।

দেবতা ও প্রতিমা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সিদ্ধ সাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব লিখিত)

বস্তুতঃ নির্ম্মাণকর্ত্তা যদি নিজে সাধক হয়েন, অথবা—সাধক যদি নিজে নির্ম্মাণকর্ত্তা হয়েন, তবেই একদিন এ অভাব—ঘুচিবার কথা, অন্যথা ধ্যানের অনুরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, শাস্ত্রের এ আজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতিমার অনুরূপ ধ্যান করিতে হইবে, এই সিদ্ধান্তই শেষ দাঁড়াইবে। সাধনার ফলে সাধকের হৃদয়ে তাঁহার আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব যেখানে যতটুকু পরিস্ফুট হয়, তাহা সাধক নিজে বই অন্যে জানিবে কি উপায়ে? আমার ধ্যেয়মূর্ত্তির অঙ্গাবয়ব,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সংস্থান, প্রসাদমাধুর্য্যাদি ভাবের আবেশ ও উন্মেষ, এ সকল অন্যে অবগত হইয়া আমার ধ্যেয় স্বরূপের প্রতিবিম্ব, মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত করিবে কিরূপে? তাই সাধক নিজে নির্ম্মায়ক হইলে তাঁহার দ্বারা নিজের উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি যেরূপ ধ্যানানুরূপ গঠিত হইবে, অন্যের দ্বারা তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। এই জন্যই বলিতেছি, নির্ম্মায়ক নিজে সাধক অথবা—সাধক নিজে নির্ম্মায়ক না হইলে এ অভাব কোন কালেও ঘুচিবার নহে। ইহাই ত সাধারণ কথা। তাহার পর বিশেষ কথা আরও আছে—যে সকল দেবমূর্ত্তিতে বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন রসের সংমিশ্রণ একাধারে পরস্পর বিজড়িত, সেই সকল মূর্ত্তির— নির্ম্মাণ আরও সুকঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ, বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে দেবীমূর্ত্তি যাহা গঠিত হয়, তাহা শাস্ত্র প্রথমানুসারে—যুদ্ধমূর্ত্তি। মায়ের সেই সমরোন্মাদিনী মূর্ত্তিতে প্রসাদকারুণ্যের—সমরসে অবস্থান এবং সেই অবস্থানের প্রতিবিম্ব, মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত করা সহজসাধ্য নহে। মা রণরঙ্গিনী

মহিষমর্দ্দিনী যাহাই বল, সে রূপ অসুর নির্য্যাতনের জন্য ; কিন্তু সেই মূর্ত্তিতেই আবার আর একটী অপরূপ স্বরূপের সন্নিবেশ আছে, যাহা মহিষাসুর—সমরবিজয়োল্লাসে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল দেব দেবর্ষি—মহর্ষি মণ্ডলের ভক্তি-প্রবাহ পূর্ণ নয়নে, আর ভক্তিপ্রবাহপূর্ণ হৃদয়ক্ষেত্রে। একাধারে যিনি মহিষাসুরের বক্ষঃস্থলে বিশাল-শূলঘাতিনী, তিনিই আবার প্রশান্তপ্রসন্ন সহাস্যমুখে স্নেহ প্রবাহপূর্ণ নয়নে দেবকুলে করুণা কটাক্ষপাতিনী। মায়ের একমাত্র মুখমণ্ডলে—মহিষাসুরের দৃশ্য ভীষণ ক্রোধের আবেগ, দেব দেবর্ষি-বৃন্দের দৃশ্য—প্রসাদমাধুর্য্যরসের পূর্ণ সমাবেশ। এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রতিবিম্বিত করা নিতান্তই সাধনসাপেক্ষ। সাধকের আত্মধারণা ব্যতীত তাহা অসম্ভব। তাই যজমান ! এ সকল কথা কখনও একবার ভাবিয়াছ কি ?

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(রাজসাহির জনৈক রাজমহিলা লিখিত)

একদিন আমরা পাহাড়ে গেলে সাধুবাবা রাজযোগ ও হঠযোগ সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়াছিলেন। সহজে অর্থাৎ প্রেমের সহিত কার্য্য করিলে তাহা কত অনায়াসে সিদ্ধ হয় তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন যে একটী গরু মাঠে চরিতেছে, তাহাকে যদি জোর জবরদস্তির সহিত ধরিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করা হয় তবে সে সেখান হইতে দৌড়াইয়া পলাইতে আরম্ভ করিবে। যদি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লাঠী হস্তে দৌড়াইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে সে আরও প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিবে। রৌদ্রের মধ্যে যষ্টিহস্তে গরুর পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করিলে বহু পরিশ্রম হইবে মাত্র, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধ তাহাতে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। যদি প্রথমেই বলপ্রকাশ না করিয়া গরুটীর নিকট ধীরে ধীরে গিয়া আদর করিয়া গায়ে ও গলায় হাত বুলান হয় ও কিছু খাদ্য দ্রব্য উহার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে গলার রজ্জুটি ধরা হয় তবে কত অনায়াসে ঐ কার্য্য সিদ্ধ হয়। তেমনি আমাদের মনকে প্রথমেই জোর জবরদস্তির সহিত বশে আনিতে চেষ্টা না করিয়া উহাকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া "প্রেম সে" বশে আনিতে

চেষ্টা করাই ঠিক। প্রথমেই মনের উপর জোর খাটাইতে গেলে তাহাতে হয়ত মন আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে।

আর একদিন সাধুবাবার নিকট গেলে তিনি আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়াছিলেন। পরমাত্মা দীপকের মত সর্ব্বদা উজ্জ্বল আলোক ছড়াইতেছেন। এ সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া একটি ক্ষুদ্র গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন। একরাজা রাত্রিকালে মজ্‌লিস্ করিয়া তাঁহার বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া আছেন; সেই কক্ষে বহু গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি নানারূপ সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া জমকাল ভাবে, যথাযোগ্য আসনে বসিয়া আছেন। গৃহের মধ্যস্থানে একটী প্রকাণ্ড উজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। গৃহমধ্যে নানাবিধ নৃত্যগীত হাসি তামাসা ইত্যাদি চলিতেছিল। যখন মধ্যরাত্রে নৃত্যগীতান্তে রাজা সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন যে যাহার বাসস্থানে গমন করিলেন। গৃহখানি একেবারে নীরব হইয়া গেল বটে কিন্তু গৃহস্থিত প্রজ্বলিত আলোকটী সমভাবেই প্রভা বিকীর্ণ করিয়া যাইতে লাগিল। এতক্ষণ যে গৃহ মধ্যে কত জনসমাগম, কত হাস্যামোদ হইতেছিল তাহাতেও যেমন গৃহস্থিত প্রদীপটী তাঁহাদের উপর আলোক প্রদান করিতেছিল আবার পরে যে গৃহখানি একেবারে জনশূন্য নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল তবুও আলোকের তাহাতে কোন বিকার নাই, সে সেইরূপ সমভাবেই আলো প্রদান করিয়া যাইতে লাগিল। আলোকের নিম্নে যেমন সুখ কি দুঃখের যে অভিনয়ই হউক না কেন তাহাতে সে যেমন নির্ব্বিকার, যেমন সুখ কি দুঃখ তাহাকে কিছুই স্পর্শ করে না তদ্রূপ দেহ মধ্যস্থ পরমাত্মাও সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত। দেহের কোন সুখ কিম্বা দুঃখ পাপ কিম্বা পুণ্য তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥১৩।৩১॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥১৩।৩২।

অর্থাৎ "অনাদি নির্গুণ হেতু পরমাত্মা অব্যয়
হইয়াও শরীরস্থ না করে, না লিপ্ত হয় ॥১৩।৩১।
নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতাহেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত আকাশ যেমন।
সর্ব্বদেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা নির্লিপ্ত তেমন ॥"১৩।৩২

সাধুবাবা একদিন পঞ্চেন্দ্রিয় সেবার কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহাই গল্প করিতেছিলেন। পতঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এক একটী ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হওয়ায় তাহাদের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হয় ও তাহারা স্বেচ্ছায় কিরূপ চির দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, সেই কথা আমাদের বুঝাইয়া বলিতেছিলেন। সাধুবাবা বলিলেন, যেমন পতঙ্গ অগ্নির প্রজ্জ্বলিত রূপে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া স্বেচ্ছায় অগ্নির মধ্যে উড়িয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে; কুরঙ্গ ব্যাধ কর্ত্তৃক বংশী নিনাদ শ্রবণে মোহিত হইয়া আসিয়া ব্যাধ কর্ত্তৃক পাশ বদ্ধ হয়। হস্তী স্পর্শসুখাকাঙ্ক্ষায় দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হওয়ায় হস্তীধৃতকারীদের প্রস্তুত ডালপালা দ্বারা আচ্ছাদিত গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হওয়ায় ধৃত হয় এবং চিরজন্মের মত স্বাধীনতা সুখ হইতে বঞ্চিত হয়; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখলাভাকাঙ্ক্ষায় মোহিত ভৃঙ্গ-কুল প্রদোষকালে কমলের উপর উড়িয়া গিয়া বসিয়া কমলের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মীন রসনার ক্ষণিক তৃপ্তির লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া খাদ্য দ্রব্যের প্রলোভনে ছুটিয়া আসিয়া বড়িশ বিদ্ধ হওয়ায় অকালে প্রাণত্যাগ করে। তাই সাধুবাবা বলিতেছিলেন যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক একটী যাহাদের প্রবল, একটী ইন্দ্রিয়ের বশে চলিয়াই তাহারা নিধনপ্রাপ্ত হয়; আর অবিবেকী মনুষ্য ত একাধারেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত, কাজেই তাহাদের পরিণাম ত বিষময় হইবেই। সদ্বিবেচক ব্যক্তির এই সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বিচার পূর্ব্বক সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

একদিন দ্বিপ্রহরে আকাশে নিবিড় মেঘ করিয়া আসিতেছিল কিন্তু পরদিন কোন কারণে বিঘ্ন থাকায় আমরা সেইদিনই বৈকালে সাধুবাবার নিকট কৈলাস পাহাড়ে রওনা হইলাম। গিয়া দেখি পূর্ব্ববৎ বারাণ্ডার সেই কোণটীতে বাবার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে তেমনি প্রসন্নবদনে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। আমারা গিয়া সাধুবাবকে প্রণাম করিয়া বারাণ্ডায় বসিতেই ফোটা ফোটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির জন্য সাধুবাবা ঘরের মধ্যে উঠিয়া গিয়া তাঁহার চৌকীর উপর বসিলেন ও আমরা সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া মেজেতে মাদুরের উপর বসিলাম। সাধুবাবর নিকট শুনিতে চাওয়ায়—সে দিনও তিনি আমাদিগকে একটী গল্প বলিয়া শুনাইতেছিলেন ও আমরা তাহা সানন্দে শুনিতেছিলাম। কিন্তু সেদিন আকাশে যেরূপ ঘন মেঘাড়ম্বর তাহাতে শীঘ্র বৃষ্টি ছাড়িবার লক্ষণ নয় বুঝিয়া বরং বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি

হইতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ী রওনা হওয়াই সঙ্গত বোধ করিলাম। এদিকে সূর্য্য অস্ত যাওয়ায় ও আকাশে মেঘ থাকায় দিবসের আলো ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে তাহাতে আবার জোমিদির সঙ্কীর্ণ পথগুলি যদিও কঠিন কঙ্করময় কিন্তু অল্পক্ষণ বৃষ্টি হইলেই উহা অতিশয় পিচ্ছিল হইয়া যায়। আমরা বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী রওনা হইতে চাওয়ায় সাধুবাবা আমাদের জন্য তাঁহার ছাতাটি ও তখন তাঁহার একটীমাত্র লণ্ঠনই ছিল সেটী আমাদের ব্যবহারের জন্য দিতে চাহিলেন এবং নিজে চৌকী হইতে উঠিয়া আসিয়া বৃষ্টির ধারাপাতে নিশ্চয়ই উচ্চ নীচ অসমান বক্র রাস্তাগুলি পিচ্ছিল হইয়া যাওয়ায় আমাদের বাড়ী যাইতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া কত আগ্রহের সহিত অপেক্ষাকৃত ভাল পথের সন্ধান বলিয়া দিতে লাগিলেন। একে তাঁহার ঐ পাহাড়ে একাকী বাস তাহাতে তখন ওঁর নিকট মাত্র ঐ একটীই লণ্ঠন, তাহা যদি আমরা লইয়া যাই তাহা হইলে ঐরূপ দুর্য্যোগে নিবিড় অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি কি প্রকারে কাটিবে বলায় তেমনি মৃদু হাস্যের সহিত শান্তভাবে বলিলেন, "এখানে বাতির কি প্রয়োজন? এরূপ অন্ধকারে থাকা আমাদের অভ্যাস আছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে বলিয়াছিলেন, —

> "হৃদাকাশে চিদানন্দো মুদাভাতি নিরন্তরং।
> উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথংসন্ধ্যা হ্যপাস্যতে॥"

তেমনি ইঁহাদের হৃদয়াকাশ সেই আনন্দময়ের নিরন্তর স্মরণে যেন সর্ব্বদাই আলোকিত রহিয়াছে বলিয়া তাহাতে উদয়াস্ত বোধ নাই; সকল সময়ই আলোকিত আছে বলিয়া বাহিরের আলোকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ঐ একমাত্র আলোটী আমাদের নিজের সুবিধার জন্য লইয়া আসা আমরা কিছুতেই সঙ্গত বোধ করিলাম না। সেদিন বাবা ৺বৈদ্য-নাথের কৃপায় ও সাধুবাবার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। পাহাড় হইতে নামিয়া অল্প দূর আসিতেই পথের মধ্যে বাড়ী হইতে পাঠন লোকের হস্তে আলো, ছাতা ইত্যাদি সব পাওয়ায় অমন দৈব দুর্যোগ হইলেও আমাদের বিশেষ কোন কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সন্ধ্যার মধ্যেই সেদিন নির্ব্বিঘ্নে আমরা বাড়ী পৌঁছিয়াছিলাম। এই যে আমরা কত সময় সাধুবাবার নিকট যাইয়া বসি ও তিনি আপন জনের মত কত স্নেহ করেন

ও কত সদুপদেশ দেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনদিন নিজমুখে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই। সর্ব্ব বিষয়েই ইঁহার কৌতূহল খুব কম দেখিতে পাই। তিনি নিজ হইতে সাধ্য পক্ষে আমাদের কোন প্রশ্ন করেন না কিন্তু আমরা যে সকল প্রশ্ন করি তাহা অতি সুন্দররূপে ধীরে ধীরে পরিষ্কাররূপে বহুক্ষণে বুঝাইয়া দেন।

পুনরায় আর একদিন সাধুবাবার নিকট তাঁহার পাহাড়ে গেলে তিনি এক অহং শূন্য ধার্ম্মিক রাজার কাহিনী আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। গল্পটী এইরূপ :—

কোন সময়ে খুব বড় এক রাজা ছিলেন। তিনি যেমন ধার্ম্মিক তেমনি নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন। রাজার খুব ইচ্ছা হইল তিনি একটী যজ্ঞ করিবেন। রাজার যজ্ঞ উপলক্ষে খুব ধূমধাম আয়োজন আরম্ভ হইল ও নানাদেশ হইতে রাজার বন্ধুবান্ধব লোকজন সব আসিতে আরম্ভ হইল। রাজা যখন অতিথিদের অভ্যর্থনা ও নানাস্থানে নিমন্ত্রণাদির বন্দোবস্তে ব্যস্ত আছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন তাঁহার রাজ্য মধ্যে অদূরে একজন সাধু বাস করিতেছেন। সেই সাধুটিকে যজ্ঞস্থানে আনিবার জন্য রাজার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় মন্ত্রীকে তিনি সাধুর নিকট পাঠাইলেন। রাজমন্ত্রী সাধুর নিকট গিয়া সাধুকে রাজার মনোবাসনা জানাইয়া যজ্ঞস্থানে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। মন্ত্রীর প্রস্তাবে কিন্তু সাধু রাজবাড়ীতে আসিতে সম্মত হইলেন না। পরে মন্ত্রীর বহু অনুরোধে ও একান্ত ইচ্ছায় সাধু বলিলেন, "রাজা যদি সমস্ত যজ্ঞফল আমাকে দান করেন, তবে আমি তাঁহার যজ্ঞে যাইব।" মন্ত্রী একথা শুনিয়া ভাবিলেন তাহা কেমন করিয়া হয়? কারণ এত আয়োজন, এত অর্থব্যয় ও কত পরিশ্রম করিয়া যজ্ঞ হইবে, তাহার সমস্ত ফল যদি অন্যেই লাভ করিল তবে আর যজ্ঞ করিয়া কি ফল হইল? সাধুর বাক্যে মন্ত্রী কোন উত্তর না দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া তখন সেই অহঙ্কার শূন্য পরম ধার্ম্মিক রাজা স্বয়ংই সাধুকে যজ্ঞস্থানে আনিবার জন্য চলিলেন। রাজা সেই সাধুর নিকট পৌঁছিয়া সাধুকে যজ্ঞস্থানে লইয়া আসিবার জন্য বহু অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও ঐ সাধু পূর্ব্বের মত সমস্ত যজ্ঞফল রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা শুনিয়া বলিলেন, "যখন অহং অভিমান ত্যাগ করিয়া সাধু দর্শন মানসে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপেই বহু বহু যজ্ঞফল লাভ করিয়াছি।"

পূর্ব্ব হইতেই ধার্ম্মিক রাজার সঙ্গগুণে ও তাঁহার সহিত বহুক্ষণ সদালাপ হওয়ার ফলে সাধুর মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছিল, অবশেষে রাজার মুখে এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুর জ্ঞান হইল যে 'অহং' ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ বটে। তখন রাজার বাক্যে সাধু অভিমান ত্যাগ করিয়া সানন্দচিত্তে রাজার যজ্ঞস্থানে যাইতে সম্মত হইলেন।

ক্রমশঃ

পরলোক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) পিতৃলোক।

ইহা ভুবর্লোকের সূক্ষ্মতম স্তর। মানুষ প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে যাইবার পথে পিতৃলোকে গমন করে। এখানে সূক্ষ্মদেহধারী কতগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র "পিতৃদেবতা" নাম দিয়াছেন। ইঁহারা সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ্ ও আজ্যপ। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর দেবতাগণকে অগ্নিষ্বাত্ত বলে। ইঁহারা অতি উচ্চ অঙ্গের দেবতা ও মানবজাতির জ্ঞানের অধীশ্বর। শেষোক্ত উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ্ ও আজ্যপ দেবগণের সাধারণ নাম বর্হিষদ্। স্থূল সূক্ষ্মভেদে ইঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর দেবতা ৭ ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পিতৃগণ সর্ব্বসমেত ২৮ উপবিভাগে বিভক্ত। উষ্মপদেবগণ অতি সূক্ষ্ম কারণ দেহধারী; সুকালী, বর্হিষদ ও আজ্যপ দেবগণ লিঙ্গদেহধারী। উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার সময় প্রথমতঃ এই সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণের তৃপ্ত্যর্থে জলদান করিতে হয়, ইহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন।

স্বর্গলোক।

স্বর্গও মানসরাজ্য, কিন্তু ভুবর্লোক হইতে অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম। ইহা দেবগণের আবাস স্থান এবং পুণ্যাত্মার পুণ্যনিকেতন। সাত্ত্বিক জীবগণ এই

স্বর্গলোকে অবস্থান করেন। এখানে কোন অভাব নাই, কাজেই কোন দুঃখও নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন—জীব পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে।

"পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং।" ৬।২

এই চন্দ্রলোক স্বর্গের দ্বার বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে;

যথা স্বর্গস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাঃ। কৌষিতকী উপনিষৎ ১।২

এই চন্দ্রলোক দৃশ্যমান চন্দ্রনামক জড়পিণ্ডে অবস্থিত নহে। ইহা ভুবর্লোকের অতি উচ্চভূমিতে স্বর্গলোকের দ্বারদেশে অবস্থিত। স্বর্গের নানা স্তর আছে; যথা—ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, বহ্নিলোক প্রভৃতি। জীব বিশেষ বিশেষ শুভ কার্য্যের ফলে এই সকল লোকে আসিয়া অপার আনন্দভোগ করেন। কর্ম্মের উপর স্বর্গভোগের কাল ও তারতম্য নির্ভর করে। সকলের ভোগ একপ্রকারের হয় না। যিনি যে প্রকার কর্ম্মের দ্বারা যে প্রকার মনোময় দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহার সেইরূপ ভোগ হয়। কর্ম্মানুসারে কেহ দীর্ঘকাল, কেহ স্বল্পকাল স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

এই তিন লোকেই সাধারণ মনুষ্য যাতায়াত করে; ইহার ঊর্দ্ধে মহর্লোকে, জনলোকে, তপলোকে ও সত্যলোকে তাহাদের গতি হয় না। কেবল যোগিগণই ঐ সকল সূক্ষ্মলোকে গমন করিতে সক্ষম হন।

শাস্ত্রকথিত শিবলোক কৈলাস। ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলোক প্রভৃতি অতি উন্নত ও দেবগণের স্বর্গ হইতে অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম। আমরা কৈলাস বলিলে যে কৈলাস পর্ব্বত বুঝিয়া থাকি, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কৈলাস অতি উন্নত সূক্ষ্মস্তর। ইহা সর্ব্বোচ্চ সত্যলোকের অন্তর্গত। কে—অর্থ জল; লস ধাতুর অর্থ উল্লাস বা আনন্দ। যে স্থান অতি শীতল অর্থাৎ যাহাতে অনিত্য সুখ দুঃখের লেশমাত্র নাই এবং যাহা আনন্দনিকেতন তাহাই মহাদেবের আবাস স্থান শিবলোক বা কৈলাস। এই মহাদেবতা শ্মশানে, মশানে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করেন। তাঁহার আহার বিহারে কিছুমাত্র বিকার নাই; তিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত; সমদর্শী ও সমজ্ঞানী। তিনি পূর্ণজ্ঞানী ও মহাযোগী—সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানে বিভোর। তিনি বিশ্বের আদি ও বিশ্বের বীজ। তিনি লীলাময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া কৈলাসে প্রকটিত। সাধনাবলে যিনি সেই সূক্ষ্ম স্তরে

উঠিতে পারেন তিনিই সেই চিন্ময় আনন্দঘন মূর্ত্তি—প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

জীব স্বর্গলোক ভোগের পর—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" গীতা ৯২

যে পুণ্যে স্বর্গলাভ হইয়াছিল, তাহার ভোগ হইয়া গেলে ঐ দেহের নাশ হয়; তখন আবার দেহ ধারণের জন্য পৃথিবীতে আসিতে হয়। মর্ম্ম এই যে, যে সুকৃতি বলে স্বর্গবাস হইয়াছিল, তাহার ক্ষয় হইলে অর্থাৎ শুভকার্য্যের সংস্কার রাশি ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, জীব স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয় এবং স্থূল পার্থিব বাসনার তাড়নায় স্থূল ভূলোকে আসিতে বাধ্য হয়। মানব বাসনার সমষ্টি; যখন যে প্রকার বাসনা জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে সেই প্রকার বাসনানুরূপ লোকে আসিতে হয়। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জন্ম-মৃত্যু-রোগ-শোক ভোগ হইয়া থাকে।

পুরা কৃতানি পাপানি ফলন্ত্যস্মিংস্তপোধনাঃ।
রোগ দৌর্গত্য রূপেণ তথৈবেষ্টবধেন চ॥

মৎস্য পুরাণ।

হে তপোধন, পুরাকৃত পাপ সমুদয় ইহজন্মে রোগ, দারিদ্র্য ও ইষ্ট বিয়োগ-রূপে পরিণত হয়।

যাঁহারা পুণ্যাত্মা, কিন্তু যাঁহাদের বাসনার বীজ নিঃশেষিত হয় নাই, তাঁহারা বহুকাল স্বর্গভোগের পর, পুণ্যাত্মা ও শ্রীমন্তদিগের গৃহে জন্ম লাভ করেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

গীতা ৬।৪১

সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি (সম্যক্ বাসনার হাত এড়াইতে পারেন নাই বলিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন) পুণ্যকারিগণের লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া, তথায় বহু বৎসর বাস সুখ অনুভব করিয়া, পরে শুদ্ধাচার সম্পন্ন ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের বিষয় বাসনা অতি প্রবল, তাঁহারা কোন সুকৃতি ফলে স্বর্গরাজ্যে উন্নীত হইলেও অতি অল্পকাল মধ্যে বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া

স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জীব সূক্ষ্ম লোক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে স্থূল ভূতের সাহায্যে স্থূললোকে উপস্থিত হয় এবং ব্রীহিশস্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব শরীরে প্রবিষ্ট হয়; পরে পিতৃদেহ হইতে মাতৃগর্ভে গিয়া কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণ করতঃ—যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয়।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ।
গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে॥ গীতা ৯।২১

এইরূপে সকাম কর্ম্মনিবন্ধন সংসারে বারবার গতায়াত করে।

যতদিন জীবের কামনার শেষ না হয়, ততদিন কামনা পূরণ করিবার জন্য তাহাকে স্বর্গলোক হইতে পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।

সকাম ও নিষ্কাম ভেদে জীবের দুই প্রকার মার্গ—পিতৃযান ও দেবযান। যাঁহারা সকাম জীব, তাঁহারা পিতৃযান পথে গমন করিয়া পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আসেন। এই পিতৃযান পথের নাম ধূমযান, দক্ষিণমার্গ, কৃষ্ণমার্গ ও রয়িমার্গ। এই পথ আবর্ত্তনরূপী চক্রাকার। ভূলোক হইতে ভুবর্লোকে—তাহার পর আপনাপন পুণ্যানুসারে কিয়ৎকাল স্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় সেই পথে মর্ত্ত্যে আগমন করেন।

ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥
গীতা ৮।২৫

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস—এই পথে গমন করিয়া যোগী চন্দ্রলোক (স্বর্গের অংশ বিশেষ) প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণমার্গী সকামজীব চন্দ্রলোকে কর্ম্মক্ষয় অবধি বাস করিয়া, যে পথে আগমন করিয়াছিলেন—সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাঁহারা নিষ্কাম সাধক, তাঁহারা দেবযান, উত্তরমার্গ বা শুক্ল পথে গমন করেন এবং ক্রমে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন; তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। মৃত্যু সময় এই সকল মহাত্মার জীবাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হয়।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥

অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—এই দেবযান পথে যে সকল ব্রহ্মবিৎ নিষ্কাম পুরুষ গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

এই পথ লৌকিক পথের ন্যায় নহে, ইহা সম্পূর্ণ—আধ্যাত্মিক। শাস্ত্র এই মার্গকে অচিরাদি নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

গীতা ৮।২৬

জগতের শুক্ল কৃষ্ণ এই দুইটী চিরন্তন গতি;—শুক্লপথে গেলে আর ফিরিয়া আইসে না, কৃষ্ণপথে গেলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।

শুক্ল দেবযান পথে যাইতে হইলে কামনা বর্জ্জন করিতে হইবে। সকাম ব্যক্তি ঐ পথে যাইতে পারেন না। সকাম কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ; সেখান হইতে ফিরিতে হয়। নিষ্কাম সাধকের ভুবর্লোক কি স্বর্গলোকের ভিতর দিয়া গতি হয় না, কাজেই পিতৃলোকেও তাঁহাকে যাইতে হয় না। সত্যলোক হইতেও জীবের পতনের সম্ভাবনা আছে। ব্রহ্মপদ না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের জন্মমৃত্যুরূপ ভ্রমণ শেষ হয় না।

প্রতিকল্পান্তে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের—ধ্বংস হয়, কিন্তু উচ্চতর লোকগুলি বর্ত্তমান থাকে। মহর্লোকও এ সময় বাসের অযোগ্য হয় ও অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক—পরিত্যক্ত হয়। কার্য্যতঃ পুনঃ সৃষ্টি পর্য্যন্ত নিম্নস্তরের—চারিটী লোকের (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ) অস্তিত্ব থাকে না। ইহাকে কাল্পিক বা ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয় বলে। মহাপ্রলয়ে সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোকের নাশ হয়। এক কল্পের পরিমাণ মানব পরিমিত ৪৩২ কোটি বৎসর; ৩৬০০০ ছত্রিশ হাজার কল্পের পর মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। বর্ত্তমানে ব্রহ্মাণ্ডের ১৮০০১ তম কল্প চলিতেছে। এই কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আমাদের পুরাণ শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মানব—দর্শন—বিজ্ঞান যাহা স্বপ্নেও অনুভব করে নাই, এমন অনেক কথা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের সীমাবদ্ধ স্থূলদৃষ্টিতে

তাঁহাদের অনেক কথা আমরা অসার ও অসম্ভব মনে করিয়া উড়াইয়া দেই, ইহা আমাদের ধৃষ্টতা ও দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র।

প্রত্যেক কল্পের, প্রত্যেক মন্বন্তরের এবং প্রত্যেক চতুর্যুগের প্রারম্ভে দেবতা, ঋষি ও মহাপুরুষগণ স্বর্গ ও উচ্চতর লোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই আমাদের ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, কপিল, ভৃগু, মরীচি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ।

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত।

(সমালোচনা)

(মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ)

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন; তিনি যোগবলে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। তিনি জীবিত থাকা সময়ে ৺কাশীধামে কেহ আসিলে যেমন ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন করিত তেমনি জঙ্গম মহাদেব স্বরূপ এই যোগিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকেও দেখিয়া কৃতার্থ হইত। ঈদৃশ মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য কাহার না অভিলাষ হয়?

সন ১২৯৪ সালে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীজি দেহ রক্ষা করেন; ইহার পাঁচ বৎসর পরে * ৺কাশীধামের প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষ বিক্রেতা (অধুনা পরলোকগত) নিবারণ চন্দ্র দাস মহাশয় স্বামীজির একখানি জীবনচরিত প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রকাশ করেন —সেইখানি এখন অতি কমই পাওয়া যায়। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে ১৩২৩ সালে স্বামীজির শিষ্য শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়—"মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ † স্বামীর জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ" নামে স্বকীয় গুরুদেবের জীবন-

---

* শাকে বেদবিধু দ্বিপেন্দু গণিতে বৈসাখিণে পূর্ষণি শ্রীযুক্তেন নিবারণেন কৃতিনা প্রাণায়ি প্রীত্যৈ সতাম্। (শক ১৮১৪ [=১২৯৯ সাল] চৈত্র মাসে)

† এই প্রবন্ধে 'ত্রৈলিঙ্গ'ই ব্যবহৃত হইবে, যদিও 'তৈলঙ্গ' শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতেও পাওয়া যায়।

কাহিনী ও উপদেশাবলী গ্রন্থকারে প্রকাশিত করিয়াছেন ; তাহার এই পর্য্যন্ত তিনটী সংস্করণ হইয়াছে।

সাধু মহাত্মাগণের জীবন-চরিত ও উপদেশাদি যাঁহারা প্রকাশ করেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

'Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime'

আমেরিকার কবিবরের এই উক্তি খুবই সমীচীন—আমরা মহাত্মাগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আমরাও যে কিঞ্চিৎ "মহত্ত্ব" লাভ করিতে পারি তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই—যদিও দুঃখের বিষয়, যে আমরা সচরাচর সেই পথে চলি না কেন না, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। তথাপি জীবনচরিতের যৎসামান্য আলোচনায়ও লাভ আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আজকালকার বাজারে যে সব সাধু মহাত্মাদের জীবনচরিত উপদেশ প্রভৃতি প্রচারিত হইতেছে সেই সকলের মধ্যে লেখক মহাশয়েরা নিজের রুচি অনুসারেও দুই এক কথা বসাইয়া দেন এবং কখনও কখনও ঘটনাদির সম্যক্ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান না করিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকেন। এছাড়া অত্যুক্তিবাদ অবতারবাদ ইত্যাদি ঐরূপ গ্রন্থের মূল্যবত্তা হ্রাসের কারণ ঘটাইয়া থাকে। * সুখের বিষয় ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর যে দুইখানি জীবনচরিতের আলোচনা করা যাইতেছে তাহাতে লেখক মহাশয়েরা মহাত্মা স্বামীজিকে 'অবতার'রূপে খ্যাপিত করিতে কোনও প্রয়াস পান নাই—যোগিশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রূপেই তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাই ছিলেন। অবতারবাদ অপেক্ষা এইরূপে প্রতিপাদনই আমাদের সমধিক সমাদরণীয়। অবতারের অনুসরণ করা যায় না কিন্তু যাঁহাদের সাধনার একটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায় তাদৃশ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা সুসাধ্য, কেননা একজন মানুষ যাহা করিতে পারিয়াছে অপর মানুষে চেষ্টা করিলে তাহা করিতে পারে—what a man has done—a man may do.

---

* যাঁহারা এইসবের উদাহরণ দেখিতে চান তাঁহারা ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে অনেকটা পাইবেন ; তদ্বিষয়ে মৎপ্রণীত "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" পুস্তকে অনেক কথা আছে।

কিন্তু স্বামীজির শিষ্য শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তল্লিখিত জীবনচরিতে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমার নিকট সম্যক্ সরল ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ই কিছু আলোচনা করিব। *

৺নিবারণ চন্দ্র দাসের সঙ্কলিত জীবনচরিতের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন "আমি নানাদেশ পর্যটন ও বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া খ্যাতনামা-মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া সাধারণ সমীপে প্রচারিত করিলাম।"

উমাচরণ বাবু (তৃতীয় সংস্করণে) ভূমিকায় § লিখিয়াছেন—"স্বামীজীর জীবনচরিত এই প্রথম প্রকাশিত না হইলেও তাঁহার ধারাবাহিক জীবনী এতাবৎ কেহই প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। কেহ কেহ যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও অধিকাংশস্থল ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ" * * * * স্বামীজির জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী আমি অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং বাকী সমস্তই আমি স্বয়ং বহু আয়াস ও অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করিয়া (‡) সুচারুরূপে যথাযথ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই যে "কেহ কেহ" তাহা আমার বিশ্বাস ৺নিবারণ চন্দ্র দাসকেই উদ্দেশ

---

* আলোচ্যমান বিষয়ে অনেক কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ভাবে গ্রন্থকার উমাচরণ বাবুর নিকট (গ্রন্থের প্রকাশকের ঠিকানায়) একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

§ আমি প্রথম সংস্করণ ও তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে এই "ভূমিকা" ছিল কিনা জানিনা কিন্তু প্রথম সংস্করণে ইহা ছিল না, ছিল "প্রকাশকের নিবেদন" তাহাতেও উদ্ধৃতাংশ অধিকাংশই আছে। কেবল "আমি" স্থলে "তিনি," "দেখিয়াছি" স্থলে "দেখিয়াছেন" এবং "চেষ্টা করিয়াছি" স্থলে "সমর্থ হইয়াছেন" এই পার্থক্য।

(‡) কিন্তু গ্রন্থের ৯০—৯১ পৃষ্ঠায় আছে যে তিনি স্বামীজির নিকট তদীয় গুরুদেব ইত্যাদি কথা জানিতে চাহিলে স্বামীজি তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য কালীচরণ স্বামীর নিকট জানিতে বলিলেন। তারপর লিখিয়াছেন "তাঁহার (অর্থাৎ কালীচরণ স্বামীর) সহিত বাবার (অর্থাৎ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর) আশ্রমেই আমার সাক্ষাৎ হয় ও বিশেষ রকম আলাপ পরিচয় হয়। আমি

করিয়া বলা হইয়াছে। নিবারণ বাবুর গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ৺স্বামীজির একটি 'ধারাবাহিক জীবনচরিত'ই বর্ণিত হইয়াছে। উমাচরণ বাবুর গ্রন্থের 'জীবনচরিত' অংশে কয়েকটি অতিরিক্ত ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় বটে, পরন্তু ঘটনাবলীর পর্য্যায়ক্রমও উভয় গ্রন্থেই প্রায় একই প্রকার, মধ্যে মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র। নিবারণ বাবু যেখানে নাম তারিখ দিতে পারেন নাই উমাচরণ বাবু প্রায়শঃ তাহা দিয়াছেন ইহাতে উমাচরণ বাবুর অনুসন্ধিৎসা সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। নিবারণ বাবুর গ্রন্থে উমাচরণ বাবুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে মহাত্মা স্বামীজির যে সব সম্পর্ক ও আলাপাদি হইয়াছে তাহাও নিবারণ বাবুর গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু উমাচরণ বাবু স্বীয় গ্রন্থে কুত্রাপি নিবারণ বাবুর নামও উল্লেখ করেন নাই, অথচ অনেক স্থলে উভয় গ্রন্থের মধ্যে ভাষাগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়—তাহাতে মনে হয় উমাচরণ বাবু পূর্ব্ববর্ত্তী নিবারণ বাবুর গ্রন্থখানি দেখিয়াই এই সকল স্থল লিখিয়াছেন তবে তাদৃশ স্থলে মাঝে মাঝে দুই একটি নিজস্ব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন।

এক্ষণে দুইখানি পুস্তকের মধ্যে যে যে স্থলে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কতকগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টাচার্য্য নামক কোনও ব্যক্তি ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর আশ্রমে একদিন বৈকালে আসিলে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়; তিনি সঙ্গে ছাতা না আনাতে রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন তথাপি বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন ত্রৈলিঙ্গস্বামী তাঁহাকে দুইটী এলাচি খাওয়াইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। তিনি প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ছত্রহীন-অবস্থায় অন্ধকারে পথে চলিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার উপর কোনও বারিবিন্দু পতিত হইল না; এবং তাঁহার আগে আগে একজন আলোক লইয়া পথ দেখাইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইরূপ বর্ণনা নিবারণ বাবুর গ্রন্থে (৪০ হইতে ৪৪ পৃষ্ঠায়) রহিয়াছে।

পরন্তু উমাচরণ বাবুর পুস্তকে (তৃতীয় সংস্করণ ৭৯ হইতে ৮১ পৃষ্ঠায়) এই ঘটনাটা তাঁহার নিজ সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল, এইরূপ লিখিয়াছেন। বর্ণনা

বাবার জীবনী অর্থাৎ বাল্যাবস্থা হইতে কাশীধামে অবস্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহারই নিকট সংগ্রহ করিয়াছি।"

ঠিক একইরূপ, কেবল এলাচি খাওয়া ও খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হওয়ার কথা নাই। তিনি সেইদিন মধ্যাহ্নে স্বামীজীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিন তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ লিখিয়াছেন।

এস্থলে উমাচরণ বাবুর লেখাটা নিজ সম্বন্ধে বলাতে (যদি প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া নিতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে নিবারণ বাবুর ভ্রম হইয়াছিল—একে আর লিখিয়াছেন; অথবা একইবিধ ঘটনা দুই ব্যক্তির (বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য ও উমাচরণ মুখোপাধ্যায়) সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু বর্ণনাতে উভয় পুস্তকের বহুস্থানে একইরূপ ভাষা প্রয়োগ কিরূপে হইতে পারিল ইহা বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? উদাহরণ দিতেছি। "চারিদিকে প্রবল বেগে বৃষ্টি পতন শব্দ ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুতের আলোক এক একবার চমকিত হইতেছে" নিবারণ বাবুর গ্রন্থ ৪৩ পৃ ১৪—১৬ পংক্তি)। ঠিক এই বাক্যটা উমাচরণ বাবুর গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় ১২—১৪ পংক্তিতে রহিয়াছে, কেবল বিদ্যুতের আলোক স্থলে "বিদ্যুৎ আলোক" এইটুকুই পার্থক্য। "মনে মনে ভাবিলেন যে এই আলোক দ্বারা যখন আমার গন্তব্য পথ সুচারু দর্শন হইতেছে তখন কষ্ট পাইয়া নিকটবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন কি?" (নিবারণ ৪২ পৃঃ শেষ পংক্তি ও ৪৩ পৃষ্ঠা প্রথম ৩ পংক্তি)। উমাচরণ বাবুর পুস্তকে (৮১ পৃষ্ঠা ৬—৮পংক্তি) অবিকল ইহাই আছে, কেবল ভাবিলেন স্থলে 'ভাবিলাম' এবং "সুচারু" স্থলে "সুচারুরূপে" এই পার্থক্য। "তিনি ছত্রাদি বিহীন হইয়া অনাবৃত মস্তকে গমন করিতেছেন, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ জল ব্যতীত বর্ষাবারি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতেছে না" (নিবারণ ৪৩পৃঃ ১১—১৪ পংক্তি), উমাচরণ বাবুর পুস্তকে ৮১ পৃষ্ঠা ১৩—১৫ পংক্তিতে হুবহু এইবাক্য রহিয়াছে, কেবল প্রথম পুরুষ (3rd person) স্থলে উত্তম পুরুষ (Ist person) এই যা প্রভেদ।

"এতাদৃশ মহাপুরুষের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছেন ভাবিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।" (নিবারণ ৪৪ পৃঃ ১৩—১৫ পংক্তি), উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে ৮১ পৃঃ ২০—২১ পংক্তিতে তাহাই আছে, কেবল "করিতে লাগিলেন" স্থলে "করিলাম" এইমাত্র প্রভেদ। এই কেবল অবিকল নকলের স্থানগুলি দেখাইলাম, বিবরণের অন্যান্য বাক্যেও শব্দগত যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা ইহতে অনুমান হওয়া কি অনুচিত যে উমাচরণ বাবু নিবারণ

বাবুর গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন? * অপিচ যাহা নিজ সম্বন্ধে ঘটিয়াছে তাহার ভাষা অন্যের লিখিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইবারই বা কারণ কি? বিশেষতঃ বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্যের নামোল্লেখ যদি অশুদ্ধই হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা কি উচিত ছিল না? পূর্ব্বেই বলিয়াছি উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে কুত্রাপি নিবারণ বাবুর নামটি ভ্রমেও উল্লেখ করা হয় নাই। উমাচরণ বাবু এই ঘটনার তারিখ দিয়াছেন ৪ঠা মাঘ, তাঁহার দীক্ষার পূর্ব্বদিন; নিবারণ বাবু কোনও সময় নির্দ্দেশ করেন নাই। মাঘ মাসের প্রথমে তাদৃশ দুর্য্যোগ ঘটাও একটু অস্বাভাবিক (অন্ততঃ অপ্রত্যাশিত) নয় কি?

২। স্বামীজির সঙ্গে উমাচরণ বাবুর সাক্ষাৎকার স্বামীজির অনুগ্রহ লাভ ইত্যাদি বর্ণনায় উভয় গ্রন্থে (ভাষাগত নানা সৌসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও) অনেক বিভিন্নতা রহিয়াছে সেগুলি সমগ্র উল্লেখ করিতে হইলে অনেক লিখিতে হয়। নিবারণ বাবু অবশ্যই উমাচরণ বাবু হইতেই সাক্ষাৎ ভাবেই, হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তাহাতে এত পার্থক্য ঘটা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। সে যাহা হউক তন্মধ্যে দুই একটি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য মনে করিতেছি। (ক) "স্বামীজি সেবক দ্বারা উমাচরণ বাবু দেবনাগরী পড়িতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। উমাচরণ বাবু উত্তরে বলিলেন, তিনি দেবনাগরী পড়িতে পারেন না।" (নিবারণ ৫৬ পৃষ্ঠা ৫-৮ পংক্তি)। উমাচরণ বাবুর পুস্তকে আছে:—"কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ সঙ্কেতে মঙ্গলদাস ঠাকুরের দ্বারা আমি দেবনাগরী পড়িতে পারি কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম, দেবনাগরী পড়িতে পারি।" (উমাচরণ বাবুর পুস্তক ৬২ পৃষ্ঠা ১১—১৫ পংক্তি) (মঙ্গলদাস ঠাকুর স্বামীজির সেবক)। উমাচরণ বাবু দেবনাগরী জানেন বলিলে স্বামীজি তাঁহার দ্বারা কতকগুলি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত শ্লোক বাঙ্গলা অক্ষরে লেখাইয়া লইলেন। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন

---

* অন্যান্য অনেক বিবরণ বর্ণনায়ও যে এতাদৃশ অনুসরণ আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"প্রত্যেক কাগজের উপরে আমার নাম স্বাক্ষর করা আছে।" * কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে কুত্রাপি এইসব শ্লোকের কথা আর উল্লেখ নাই। উমাচরণ বাবুর লেখার ভাবে বুঝা যায় যেন স্বামীজি ঐগুলি (নাগরাক্ষরে লিখিত শ্লোকগুলি সহ) নিজের নিকটেই রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত এইগুলি দ্বারা তাঁহার যে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে তাহারও এইগ্রন্থে উল্লেখ নাই।

(খ) উমাচরণ বাবু জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে তথ্য জানিবার জন্যই বিশেষতঃ স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। নিবারণ বাবুর পুস্তকে আছে স্বামীজি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন তৎসম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনার্থ তদীয় বর্ত্তমান জন্মের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া নাম ধামাদি বলিবার পরে কহিলেন "তুমি অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক স্থানে অমুক অমুক কুকর্ম্ম ও কদাচার করিয়াছ। * * তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে অবকাশ লইয়া বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই, কাশী আসিয়াছ। তুমি বাড়ী গেলে এমন একটি কদর্য্য কার্য্য করিবে মনে করিয়াছিলে যে সেই কার্য্যফলে তোমাকে আবার হাড়ির ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইত কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তোমার তাহা ঘটে নাই" (নিবারণ ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে নিজের এই দুশ্চরিত্রতার উল্লেখ মাত্রই নাই, বরং তাঁহার সচ্চরিত্রতার প্রশংসাবাদ আছে—মঙ্গল দাস ঠাকুর (স্বামীজির নিত্যসেবক) উমাচরণ বাবুকে বলিতেছেন :-"বাবা (অর্থাৎ স্বামীজি) আজ পর্য্যন্ত এত ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত করেন নাই, আর প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে এই বাঙ্গালী বাবুটি অতি শান্ত ও সৎ স্বভাবের লোক।" (৭৫ পৃষ্ঠা) নিবারণ বাবু অবশ্যই উমাচরণ বাবুর নিজের নিকট হইতেই স্বামীজির ঐ সব নিন্দাজনক উক্তির কথা জানিয়াছিলেন নচেৎ তিনি অযথা উমাচরণ বাবুর বিষয়ে কুৎসার অমূলক কথা কেন বলিতে যাইবেন? উমাচরণ বাবুর যে পাপ ছিল তদ্বিষয়ে তিনিই অন্যত্র লিখিয়াছেন * * "জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব, * * * * * আমি যে পাপ হইতে মুক্ত হইলাম তাহার কিছু প্রমাণ দেখাইয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া দিন,

---

* এই সাবধানতা কেন তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে না।

তিনি বলিলেন যে 'তোমার বিশ্বাসের জন্য বলিতেছি, তোমার কর-পল্লবের চর্ম্মন্তর উঠিয়া যাইবে।' "বস্তুতঃ হরিদ্বার হইতে মুঙ্গেরে ফিরিয়া আসিলে অনেকেই দেখিয়াছেন যে চষীপোকা অথবা "আগুনেবাত" হইলে যেমন চামড়া উঠিয়া যায় আমার হাতের চামড়া সেইরূপ উঠিয়া গিয়াছিল।" (৯৩ পৃষ্ঠা)।

(গ) উমাচরণ বাবু গ্রন্থের (৭২-৭৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় একখানি খাতা নিয়া আসিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি সেইরূপে আসিলে স্বামীজি তাঁহাকে নিয়া এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিলেন * * * * অদ্য হইতে আমি তোমাকে দ্বাদশটি বিষয় বুঝাইব তুমি তাহা লিখিয়া লইবে।" এই বলিয়া ১৩ রাত্রিতে ১২টি বিষয় লিখাইয়াছিলেন—এই গুলিই তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তত্ত্বোপদেশ" নামে (১২১—৩০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। এ ছাড়া দেবতত্ত্ব সম্বন্ধেও আর একখানি খাতায় ছয় রাত্রিতে ১২টি বিষয় লিখাইয়া দিয়াছিলেন—ঐগুলি এই গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত হয় নাই। *

পরন্তু নিবারণ বাবুর পুস্তকে ঐ সকল কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। তাঁহার গ্রন্থে (৬০-৬১ পৃষ্ঠায়) আছে, "স্বামীজি উমাচরণ বাবুকে দীক্ষার (জপমন্ত্র উপদেশেরও যথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থার) পরে (†) কতকগুলি মৌখিক উপদেশ দিলেন এবং তাহা ছাড়া কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকও হিন্দীভাষায় উপদেশ লিখিয়া দিলেন। উমাচরণ বাবু এই গুলির কিছু অর্থ

---

* ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়ই বলিতে হইবে; কেন না এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ ১৩২৩ সালে হইয়াছিল, তৃতীয় সংস্করণও (১৩৩২ সালে) হইয়া গেল; তথাপি যখন ঐ "দেবতত্ত্ব" প্রকাশিত হইল না—তখন আর কখন হইবে? বিশেষতঃ কোন সংস্করণের ঐ ভূমিকায় 'দেবতত্ত্ব' যে কখনও প্রকাশিত হইবে তাহা প্রকাশক বা 'গ্রন্থকার' কেহই বলেন নাই।

† উমাচরণ বাবু যে বলিয়াছেন দীক্ষা লাভের পূর্ব্বেই তিনি ঐ সব উপদেশ পাইয়াছিলেন—ইহাও যেন একটু অস্বাভাবিক বোধ হয়। দীক্ষা দিয়া করিবার পূর্ব্বে এতটা আয়াস করিয়া (১৮ রাত্রি ব্যাপিয়া) স্বামীজি যে ঐ সব লিখাইয়া দিয়াছিলেন ইহা কতটা সম্ভাবনার বিষয় তাহা সুধীভির্ভাব্যম্।

বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজি বলিলেন বুঝাইয়া দিবার লোক তুমি যেখানে থাক তাহার নিকটেই আছেন। (*) সেই সময় উমাচরণ বাবুর মনে হইল যে বুঝাইয়া দিবার লোকটিকে, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবাবুই বা হবেন। উমাচরণ বাবুর এই বাক্য স্মরণ হইবা মাত্র স্বামীজি কটাক্ষ সঙ্কেতে বুঝাইয়া দিলেন তিনিই।" ইহার পর নিবারণ বাবু লিখিয়াছেন (৬১ পৃষ্ঠা) "(পাঠক মহাশয়গণ! যিনি সনাতন ধর্ম্মার্থবক্তা গুরুদত্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে এক্ষণে বিখ্যাত।) উমাচরণবাবু যখন মুঙ্গেরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তখন উক্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর নিকট হইতে ঐ শ্লোকগুলির (পঞ্চদশীর ও যোগ-বাশিষ্ঠের) অর্থ বুঝাইয়া লয়েন এবং অন্যান্য নানা উপদেশ গ্রহণ করেন।"

পরন্তু উমাচরণ বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কথা কি লিখিয়াছেন, একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—"মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বাগ্‌চী মহাশয়কে ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে (মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা) আমি স্বামিজীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা সমস্ত বলিলাম ও আমার বিষয়ও কিছু কিছু বলিলাম এবং দুইখানি খাতায় কিছু উপদেশ লিখাইয়া দিয়াছেন তাহাও দেখাইলাম। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ও বাগ্‌চী মহাশয় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহারা উভয়ে আমার সহিত ৺কাশীধামে যাইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে বিশেষ জিদ করিয়া ধরেন। এই সকল কথা প্রকাশ করিতে স্বামীজী আমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও ইঁহাদিগকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না কারণ ইঁহারা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে কথাটা একটু প্রচার হইয়া পড়িল তাহাতে আমি ভীত হইলাম। এক বৎসর পরে আমি এবং শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় উভয়ে ৺কাশীধামে গমন করিলাম। ‡ আমার জানা ছিল সন্ধ্যার পর নির্জ্জন না হইলে স্বামীজীর সহিত কোন

(*) উমাচরণ বাবু তখন মুঙ্গেরে এক ডাক্তারখানায় কাজ করিতেন।

‡ উমাচরণ বাবুকে স্বামীজী কেবল যে তাঁহার কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এমন নহে, অপিচ বলিয়াছিলেন "যদি কখনও কোন

কথা হইবে না সেইজন্য আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দেখ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মনে মনে বড় অহঙ্কার হইয়াছে। তুমি মনে স্থির করিয়াছ পূর্ব্বকালে যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তুমিও সেই শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সকলে পূজা করে এই তোমার ইচ্ছা। তোমার পায়ের ধূলা লইতে ব্রাহ্মণতনয়কেও পা বাড়াইয়া দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ হয় না। তোমার ভবিষ্যৎ ফল বড় শোচনীয়। তুমি একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র তবে কিছু বক্তৃতা শক্তি আছে। দেখ যখন লোকে লুচি ভাজে প্রথমে লুচি বেলিয়া ঘৃতে ছাড়িয়া দেয়, যতক্ষণ কাঁচা থাকে কল কল করিয়া শব্দ হইতে থাকে, তাহার পর যখন পাকে তখন স্থির হইয়া ঘৃতের উপর ভাসিতে থাকে। এক্ষণে তোমার অতিশয় কল কলানি হইয়াছে, অগ্রে তোমার কল কলানি থামুক, তার পর যদি ধর্ম্মের নিকট যাইতে পার। উপস্থিত ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে আছ।" এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না অথবা কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করায় আমরা উভয়ে চলিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মিশির পোকরাতে একটি আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া তথায় থাকিলেন। * * * * * শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কিছুদিন ৺কাশীধামে মিশির পোকরাতে থাকিয়া হাউজ কাটরাতে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া তথায় অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং উক্ত বাটীর যোগাশ্রম নাম দিয়া তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত হইলেন।" (৯৮—১১০ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সম্বন্ধীয়

বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে একাকী আমার নিকট আসিবে" (৯৩ পৃষ্ঠা) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও পরে শ্রীযুক্ত যদুনাথ বাগচীকে তাঁহার নিকট নিয়া যাইবার পরে আবার স্বামীজী বলিয়াছিলেন "তুমি আর কখনও কাহাকেও সঙ্গে করিয়া আনিও না, আসিতে ইচ্ছা হইলে একাকী আসিবে, নতুবা আসিবে না" (১০২ পৃষ্ঠা)

এই বিবরণটা না লিখিলেই ভাল হইত। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ হইতেছে। প্রথমতঃ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী পারত পক্ষে কাহারও সহিত কথাই বলিতেন না; একজন নবাগত ব্যক্তিকে এভাবে অভিযোগ করা তো তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব কেননা কাহারও মনঃপীড়া দেওয়া সামান্য সাধুজনের পক্ষেই গর্হণীয়, স্বামীজী তো আদর্শ সাধু মহাত্মা ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী অব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণকে পদধূলি দিবার জন্য পা' বাড়াইয়া দেওয়াটা, নিতান্তই গর্হিত ব্যাপার মনে করিয়া এই হেতুতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে একজন "অহঙ্কারী" 'ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে' অবাস্থত একথা বলিয়াছিলেন। উমাচরণ বাবু কি জানেন না যে স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণ শিষ্য করিয়া উহার দ্বারা "পদসেবা" করাইয়াছিলেন? অথচ তিনি ঐ বিবেকানন্দকে "মহাপুরুষ" পর্য্যায় * ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সঙ্গে উল্লেখিত করিয়াছেন। (২ পৃঃ)

তৃতীয়তঃ তিনি ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মুঙ্গের হইতে প্রথম ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট আগমন করেন। আট মাস পরে মুঙ্গেরে (১২৮৮ সালের প্রথমে সম্ভবতঃ আষাঢ় মাসে) ফিরিয়া যান—পর বৎসর (১২৮৯ সালে) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সহ দ্বিতীয় বার আইসেন। তাঁহার লেখার ভাবে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তখন "কিছু দিনের" মধ্যেই হাউজ কাটরায় বাড়ী করিয়া অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপন করেন ও ঐ বাড়ী যোগাশ্রম নামে সংজ্ঞিত করেন এবং "এই সময় হইতেই শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত" হন। ইহাতে বোধ হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রকৃত বিবরণ অবগত নহেন। †

---

* ঐ মহাপুরুষগণের তালিকায় কেবল রামকৃষ্ণপরমহংসের নামের পূর্ব্বে "শ্রীমৎ" বিশেষণ দেওয়ায় এবং বিবেকানন্দ স্বামীর নাম ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করাতে বোধ হয় তিনি "বিবেকানন্দী" দলে ভিড়িয়াছেন—অন্ততঃ ঐ দলের প্রভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

† পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ঐ সকল বিষয়ক প্রকৃত বিবরণের যতটা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই। ১৮০৪ শকের (১২৮৯ সালের) অগ্রহায়ণ মাসে স্থির হয় তিনি মুঙ্গের হইতে কাশীতে আসিয়া বাস করিবেন। ১৮০৫ শকের (১২৯০ সালের) বৈশাখ মাস হইতে তাঁহার মুখপত্র 'ধর্ম্মপ্রচারক' কাশী মিসির পোখরা হইতে প্রচারিত হইতে থাকে।

তিনি আরও এক বিষয়ে তাঁহার গুরু মহাপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। প্রকৃত সাধু মহাত্মারা কদাপি শাস্ত্র ও সদাচারের বিরোধী কোনও কথা বলিতেই পারেন না কেন না তাঁহাদের সাধনা ব্যাপারে তাঁহারা শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ সুষ্ঠু অবলম্বন করিয়া সদাচার সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু উমাচরণ বাবু ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর দ্বারা এমন সব কথা বলাইয়াছেন—যাহা শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। * কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

(১) "আহারাদিতে ধর্ম্মের হানি হয় না, কেবল মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয়" (৮৩ পৃষ্ঠা ৬-৭ পংক্তি) যদি তাই হয়, তবে গীতায় শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের এই ত্রিবিধ বিভাগ কেন করিলেন? উপনিষৎ কেন উপদেশ দিলেন 'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ, সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ' ইত্যাদি? ‡

১৮১১ শকে (১২৯৬ সালে) যোগাশ্রম নির্ম্মিত হয়। ১৮১২ শকে (১২৯৭ সালে) যোগেশ্বরী প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮১৩ শকে (১২৯৮ সালে) তিনি কুম্ভমেলা স্থানে তদীয় গুরু ৺দয়ালদাস স্বামী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত হন। [মুঙ্গেরে অবস্থান সময়ে তিনি কাহাকেও 'শিষ্য' করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, 'ব্রাহ্মণ শিষ্য' সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই দু একজন হইয়াছিলেন এবং শিষ্য সম্পর্কিত ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণকে পা বাড়াইয়া দেওয়াও অসম্ভাব্য বিষয়।]

* নিবারণ দাস লিখিত জীবনচরিতে তাদৃশ কোনও কথা মোটেই পাওয়া যায় না।

(‡) কথাটা যে ছেঁদো' তাহা "কেবল মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয়" এই টুকু দ্বারাই প্রতীত হইতেছে—মুক্তির প্রাপ্তির বিলম্ব যাহাতে ঘটে তাহাতে 'ধর্ম্মের হানি' সূচিত হয় না কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীগীতার প্রশ্নোত্তরের বিষয় নির্ঘণ্ট।

অ (বর্ণমালাক্রমে)

রাম—জগৎটা অনির্ব্বচনীয় কিরূপে ?

বশিষ্ঠ—রাম এই জগৎ কখনও শান্ত নহে। শান্ত বলে তাহাকে যাহা অত্যন্তাভাব বশতঃ শূন্যস্বভাব আর ক্ষয় হইলেও প্রধ্বংসপ্রযুক্ত শূন্যস্বভাব হয়। এই জগৎ কিন্তু অজস্র দেখা যাইতেছে এবং ইহা পুনঃ পুনঃ হইতেছে এজন্য উহা শূন্যস্বভাব নহে। রাম আরও দেখ অজস্র ক্ষয় হইতেছে বলিয়া এই জগতের কখন অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ইহাকে ক্ষয়ীও বলা যায় না। ক্ষয়ী হইতে হইলে ইহার পূর্ব্বের অস্তিত্ব থাকিত, কিন্তু যাহা একবারেই নাই তাহার আবার ক্ষয় কি ? ইহা অনুমানে অবস্থান করে সুতরাং ইহার বিনাশও অসম্ভব। কিন্তু যাহা বাস্তব সত্য তাহার কি ক্ষয় আছে ? না বিনাশ আছে ? আরও জগৎটা ক্ষয়ী হউক বা বিনাশশীলই হউক যিনি সীমাশূন্য আদি অন্ত বর্জ্জিত, যিনি স্বরূপে বিজ্বর, যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত তিনি কেন ইহাতে আস্থা করিয়া খেদপ্রাপ্ত হইবেন ? তোমার ইহাতে আস্থা করা উচিত নহে। অস্তিত্ব নাস্তিত্ব যাহার স্বভাব তাহা জন্মিয়াছে মিথ্যা হইতে। জগতের সন্নিধানে আত্মা আছেন বলিয়া ইহার সত্তা আছে। এই ভাবে আত্মাকে কর্ত্তা বলিতে চাও বল—কিন্তু ইহার জন্য লালায়িত হইয়া দুঃখ অনুভব করিবে কেন ? মানুষের আয়ু শত বৎসর কিন্তু অনাদি অনন্ত কালের কাছে এই শত বৎসর কতটুকু, আদি নাই অন্ত নাই এমন আত্মা শত বৎসরের জন্য মিথ্যার অনুগামী হইবেন কেন ? আরও যদি জগতের সকল বস্তুকে স্থির স্বভাবও বল তাহা হইলেও চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আস্থা করা উচিত হয় না, কারণ যাহা জড় তাহার জন্য চৈতন্য ব্যাকুল হইবেনই বা কেন—আর জড়ের সহিত চৈতন্য মিশিবেনই বা কেন ? আবার যদি বল জগৎটা অস্থির ক্ষণধ্বংসী তাহা হইলে ইহাতে আস্থা ত হইতেই পারে না, কারণ "পয়ঃফেনাস্থিরস্যান্তে দুঃখমেষা দদাতিতে" ॥ ১৫ ॥ ফেনতুল্য নশ্বর যাহা তাহাতে আস্থা করিলে শেষে দুঃখই ত আসিবে।

রাম! জগৎ স্থায়ী হউক, বা অস্থায়ী হউক ইহাতে আস্থা

রাখিও না। ফেনশৈলের মত ইহা দেখা যায়—কিন্তু কোন্ বুদ্ধিমান্ এই ফেনশৈলে আরোহণ করে?

সর্ব্বকর্ত্তাপ্যকর্ত্তেব করোত্যাত্মা ন কিঞ্চন।
তিষ্ঠত্যেবমুদাসীন আলোকং প্রতিদীপবৎ ॥১৭
কুর্ব্বন্ন কিঞ্চিৎ কুরুতে দিবাকার্য্যমিবাংশুমান্।
গচ্ছন্নগচ্ছতি স্বস্থঃ স্বাপদস্থো রবির্যথা ॥১৮

আত্মা জগৎ কার্য্যের কারণ বলিয়া কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তার ন্যায়। তিনি কিছুই করেন না আলোকদানে দীপ যেমন উদাসীন—যেমন চেষ্টাশূন্য আত্মাও সেইরূপ উদাসীন। সূর্য্য সর্ব্বপ্রাণির দিনকৃত্য নির্ব্বাহ যেন করেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা করেন না তিনি নিষ্ক্রিয়, আত্মাও সেইরূপ কর্ত্তারূপে ভাসিলেও কিছুই করেন না। সূর্য্য গমনাগমন করেন বলিয়া লোকে দেখে কিন্তু তিনি আপনাতেই স্থিত—আপনারই আস্পদে—স্থানে অবস্থিত। অরুণা নদীতে অনেক শীলা আছে সেইজন্য আবর্ত্ত উঠিতেছে। অরুণা ঐ আবর্ত্তের কর্ত্তা নহে—আবর্ত্তের উদয় আকস্মিক। সেইরূপ চিৎ সান্নিধ্যে জড়ে এই আশ্চর্য্য জগদাবর্ত্ত উঠিতেছে কিন্তু চিৎ বা আত্মা ইহার কর্ত্তা নহেন। আত্মাকে কর্ত্তা বলা মূঢ়তা। রাম! এই ভাবে বিচার কর তাহা হইলে জগতে তোমার আস্থা থাকিবে না। অলাতচক্রে, স্বপ্নে, ভ্রম দৃষ্ট পদার্থে আবার আস্থা কি?

অকস্মাদাগতোজন্তুঃ সৌহার্দ্দস্য ন ভাজনম্।
ভ্রমোদ্ভূতং জগজ্জালমাস্থায়াস্তন্ন ভাজনম্ ॥২২

অকস্মাৎ আগত জন্তু কি সৌহার্দ্দের পাত্র হয়? সেইরূপ ভ্রমোদ্ভূত জগজ্জাল কি আস্থার পাত্র?

শীতার্ত্ত যেমন উষ্ণরূপে কল্পিত চন্দ্রে আস্থা রাখে না, তাপার্ত্ত যেমন শীতলরূপে কল্পিত সূর্য্যে আস্থা রাখে না, তৃষ্ণার্ত্ত যেমন মরীচিকা সলিলে আস্থা রাখে না, তুমিও সেইরূপ এই জগৎ স্থিতিতেও আস্থা

রাখিও না। সমস্ত ভাব জাতকে—সমস্ত জগৎকে স্বপ্নের মত, সঙ্কল্পপুরুষের মত—ভ্রম বলিয়াই জানিও।

অন্তরাস্থাং পরিত্যজ্য ভাবশ্রীভাবনাময়ীম্।
যো সি সো সি জগত্যস্মিংল্লীলয়া বিহরানঘ ॥২৫

বস্তুর রূপরসাদি সৌন্দর্য্যের যে ভাবনা—অন্তরে সেই ভাবনাতে আস্থা ত্যাগ কর। হে অনঘ! তখন যাহা পরিশিষ্ট থাকে তাই তুমি। এই ভাবে জগতে লীলাপূর্ব্বক বিহার কর।

আমি কর্ত্তা নই এই ভাব যাঁর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে—এবং কর্ত্তা হইবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত যিনি পান করিয়াছেন সেইরূপ ব্যক্তি যদি উদাসীন ভাবে ব্যবহার কর্ত্তাও হন তখন তিনি দেখেন কি—নিখিল পদার্থের অন্তবর্ত্তী অথচ নিখিল পদার্থ হইতে ভিন্ন যে আত্মা তাহাই তিনি। সেই ইচ্ছা রহিত আত্মার সত্তা সন্নিধান মাত্রেই এই নিয়তি—এই জগৎ নিয়ম আপনা হইতেই স্ফুরিত হইতেছে। যেমন দীপের সন্নিধি বশতঃ যে প্রভা স্ফুরিত হয়—তাহা ইচ্ছাহীন অর্থাৎ বস্তু প্রকাশে তাহার কোন ইচ্ছা থাকে না, যেমন মেঘের উদয়ে কূটজ কুসুম ইচ্ছা না করিয়াও আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে সেইরূপ আত্মার সন্নিধান মাত্রেই এই ত্রিজগৎ আত্মা হইতে প্রকাশিত হয়। যেমন সকল প্রকার ইচ্ছা রহিত সূর্য্যদেবের আকাশে অবস্থান মাত্রই ব্যবহারিক জগতের কার্য্য আরম্ভ হয় সেইরূপ পরমাত্মার সত্তাতে সমস্ত ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ইচ্ছা রহিত রত্নের সন্নিধানে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হইয়া আলোক প্রবর্ত্তিত হয় সেইরূপ পরমাত্মার সত্তা সন্নিধান মাত্রেই এই সমস্ত জগৎ ফুটিয়া উঠে।

অতঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বমকর্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতম্।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধি মাত্রতঃ ॥৩১
সর্ব্বেন্দ্রিয়াদ্যতীতত্বাৎ কর্ত্তা ভোক্তা ন সন্ময়ঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তর্গতত্বাত্তু কর্ত্তা ভোক্তা স এব হি ॥৩২

এই জন্য আত্মাতে কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব উভয়ই আছে। আত্মার ইচ্ছা নাই বলিয়া তিনি অকর্ত্তা আবার তিনি সন্নিধানে থাকায় জগৎ উৎপন্ন হয়,তাঁহার সন্নিধি না হইলে কোন কর্ম্মই হয় না বলিয়া তিনি কর্ত্তা। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া কর্ত্তাও নহেন ভোক্তাও নহেন আবার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কর্ত্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন।

রাম! যাহাতে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে তাহাত শুনিলে এক্ষণে "আমি অকর্ত্তা" এই ভাবেই আশ্রয় লইয়া স্থির হইয়া যাও।

সর্ব্বস্থোহমকর্ত্তেতি দৃঢ়ভাবনয়ানয়া।
প্রবাহ পতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৩৪
যাতি নীরসতাং জন্তুরপ্রবৃত্তেশ্চ চেতসঃ।
যস্যাহং কিঞ্চিদেবেহ ন করোমীতি নিশ্চয়॥ ৩৫

আত্মা বা চৈতন্যপূর্ণ। আকাশেরই যখন খণ্ড হয় না তখন চৈতন্যের খণ্ড হইতেই পারে না; আমি পূর্ণ—উপাধি দ্বারা আমি খণ্ড মত বোধ হইলেও আমি কখন খণ্ডিত নহি। চৈতন্যরূপী আমি নিরন্ধ্র নিবিড় ঘন, আমার ভিতরে কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। তবুও যে বলি আমার দেহ ইত্যাদি—এ সমস্ত চৈতন্যের উপরে ঘন কল্পনার প্রতিবিম্ব মাত্র। "ঘন নিবিড়" বলিয়া ইনি অখণ্ড এই জন্য আমি সর্ব্বত্র স্থিত।

আমি সর্ব্বত্র স্থিত—আমি অকর্ত্তা এই ভাবনাকে সুদৃঢ় করিতে পারিলে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইলেও তুমি আর কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। যে সাধকের এইটি নিশ্চয় হইয়াছে যে "আমি কিছুই করি না" চিত্তের অপ্রবৃত্তি হেতু কোনপ্রকার ভোগে আর তাহার রুচি থাকেই না। যাহার ভোগ সমূহে কামনা রহিয়াছে সে কি নিশ্চয় করিবে? আর ভোগ সমূহ ত্যাগই বা করিবে কিরূপে? ইচ্ছা ত্যাগই ত ত্যাগ। অতএব নিত্যই দৃঢ় ভাবনা করিবে আমি "অকর্ত্তা"। এই দৃঢ় ভাবনা দ্বারা চিত্ত আসক্তি শূন্য হইবে তখন সর্ব্বত্র এক সমতারূপ পরমামৃত অবশিষ্ট থাকিবেন। ইহাই স্বরূপ স্থিতির প্রথম উপায়।

স্বরূপে স্থিতির দ্বিতীয় উপায় হইতেছে এই। "আমিই সমস্ত করিতেছি" এইরূপ মহা কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিতে পারিলেও হয়। ইহাও উত্তম। সমস্ত জগৎ ভ্রমময়। আমার উপরেই এই জগৎভ্রম উঠে। এই জগৎভ্রমে আমি কিছুই করি না ইহা নিশ্চয় করিতে পারিলেও বিষয়ে রাগ দ্বেষ থাকিবেই না। আমি জগতের কেহই নহি, ঈশ্বরের নিয়ম বা নিয়তি দ্বারা আমি এইরূপ হইয়াছি। আমার শরীর অন্য কর্ত্তৃক জাত, লালিত ও পালিত এবং অন্য কর্ত্তৃক উহা দগ্ধ হইতেছে, অন্তরে এইরূপ অকর্ত্তা ভাব যদি দৃঢ় হয় তবে কোন কিছুতে শোকও থাকে না। হর্ষও থাকে না। আবার আমার সুখ দুঃখ বিস্তারের জন্যই আমিই এই জগতের ক্ষয়োদয় কার্য্য করিতেছি—অন্তরে এই ভাব দৃঢ় করিলেও সুখ ও দুঃখ আর থাকে না। জগতের সুখ দুঃখ আমারই কৃত এবং এই এক কর্ত্তৃতার দ্বারা খেদোল্লাস লয় হইলেই একমাত্র সমতাই অবশিষ্ট থাকে। সর্ব্বভূতে সমভাব ইহাই হইতেছে পরম সত্যে স্থিতির একমাত্র উপায়। এই সত্যপরা সমতায় যাঁহার চিত্ত অবস্থিত তাঁহাকে আর কখন জনন মরণে পড়িতে হয় না।

আত্মা বা আমি কিছুই করি না, আত্মা বা আমি সবই করি—এই দুইটিই শান্তি বা সমতা প্রাপ্তির উপায়।

> অথবা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ রাঘব।
> সর্ব্বং ত্যক্তা মনঃ পীত্বা যোসি সোসি স্থিরো ভব। ৪৩॥

অথবা হে রাঘব! সমস্ত কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া—মনকে পান করিয়া বা মনোনাশ করিয়া যাহা হও তাই হইয়া স্থির হইয়া যাও।

পূর্ব্বে এই অধ্যায়ে ৩১।৩২ শ্লোকে যে বলা হইয়াছে কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব আত্মাতে দুই আছে ; ইচ্ছা নাই তাই অকর্ত্তা আবার "কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ" সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই আবার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কর্ত্তাভোক্তা উভয়ই—ইহার সাধনা দ্বারা কোন অবস্থা লাভ হয় তাহাই এখানে দেখান হইল। "অসঙ্গ শাস্ত্রেণ

দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃপদং তৎপরিমার্গিতব্যং" গীতার এই উক্তি কার্য্যে পরিণত কিরূপে করিতে হয় এখানে সেই বিচার প্রদর্শন করা হইল।

অয়ং সোহময়ং নাহং করোমীদমিদং তু ন।
ইতিভাবানুসন্ধানময়ীদৃষ্টির্ন তুষ্টয়ে॥ ৪৪

অয়ং অহং সঃ অর্থাৎ এই [দেহে স্থিত] আমি সেই—অর্থাৎ সর্ব্বদেহে যে আত্মা সর্ব্বদা আছেন তিনিই পরিপূর্ণ সমষ্টি আত্মা। এখানেও পরিচ্ছিন্ন ভাব না যাওয়ায় অপূর্ণভাব থাকিয়া গেল। ইদং দেহেন্দ্রিয়াদ্যহং ন অত ইদং ন কিঞ্চিদপি ন করোমি—এই বর্ত্তমান দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে স্থিত আমি—আমি নহি অতএব আমি কিছুই করি না—কোন কিছুতেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই—এই উভয়ভাবে অনুসন্ধানময়ী দৃষ্টি ভাল নহে। তথাপি যে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয় ভাবই বলা হইল তাহা অহম্ভাব অহম্ভাব দূর করার জন্য। আমি দেহী ইহা নিশ্চয় করিয়া যাহারা দেহে স্থিতিপ্রাপ্ত হয় তাহাদের ঐস্থিতিকে তুমি কালসূত্র নামক নরকের রাস্তা, মহাবীচি নরকে আবদ্ধ হইবার বাগুরা এবং অসিপত্র নামক নরকের বনশ্রেণী বলিয়াই জানিবে। অর্থাৎ অহংভাব থাকিলে ঐ সমস্ত নরকেই পতিত হইবে।

সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেপ্যুপস্থিতে॥ ৪৬

সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলেও অতি যত্নসহকালে দেহে অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিবে। দেহে স্থিতিকে, কুক্কুর মাংসবাহিনী চাণ্ডালিনীর ন্যায় ভদ্রলোকের অস্পর্শ জানিবে। এই অনর্থদায়িনী স্থিতিকে দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পরিহার করিতে পারিলে বিশুদ্ধ আত্মদৃষ্টির আবরণ ও বিক্ষেপও আর থাকে না, তখন বিগতাম্বুদা জ্যোৎস্নার ন্যায় পরমা দৃষ্টি—নির্ম্মলা দৃষ্টির উদয় হয়। সেই নির্ম্মল দৃষ্টিদ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

কর্ত্তা নাস্মি ন চাহমস্মি স ইতি জ্ঞাত্বৈবমন্তঃ স্ফুটং
কর্ত্তা চাস্মি সমগ্রমস্মি তদিতি জ্ঞাত্বাথবা নিশ্চয়ম্।
কোপ্যেবাস্মি ন কিঞ্চিদেবমিতি বা নির্ণীয় সর্ব্বোত্তমে
তিষ্ঠত্বং স্বপদে স্থিতাঃ পদবিদো যত্রোত্তমাঃ সাধবঃ॥ ৪৯

কর্ত্তা আমি নই, কর্ত্তৃতা—প্রয়োজক দেহাদিও আমি নই, রাম! তুমি অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অবস্থান কর। অথবা আমিই একমাত্র সকলের কর্ত্তা, সমষ্টিভূত এই ব্রহ্মাণ্ডও আমি। অথবা লোক প্রসিদ্ধ দৃশ্য যাহা দেখিতেছি তাহা আমি নই আর এই লোক প্রসিদ্ধ জড় দুঃখ স্বভাব আত্মা হইতে বিলক্ষণ পূর্ণানন্দ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া উত্তম ব্রহ্মবিৎ সাধুগণ যে পরম পদে অবস্থিতি করেন তুমি সেই স্বপদে স্থিতিলাভ কর।

স্থিতি ৫৭ সর্গ।

অদ্বয় পূর্ণব্রহ্মে—সঙ্কল্পের স্থান কোথায়?

[বিশেষ ভাবে নিত্য মননের যোগ্য]

রাম—'আমি' 'আমার'—এই আস্থা ত্যাগ করিতে পারিলে অদ্বয় পূর্ণ স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায়। 'আমি' জাগিলেই অহম্ভাব, তা সমষ্টি আমিই হউক বা ব্যষ্টি আমিই হউক। অহম্ভাবটাই অজ্ঞান। আমিই সব যখন হইল তখনও ত সমষ্টিভূত অজ্ঞান রহিল। পূর্ণব্রহ্মে অজ্ঞানের স্থান হয় কিরূপে?

ইদং সৎ তদিদং বাসদয়ং সোহমিদং ন তু।
অয়মেকোদ্বিতীয়োয়মিত্যাদিকলনাময়ম॥ ৬॥
একস্মিন্ বিততে ধ্বান্তে নীহার ইব ভাস্করে।
ইদং প্রথমমেবাচ্ছে কথমাত্মনি সংস্থিতম্॥৭

এই জগৎ সৎ বা অসৎ যাহাই হউক; আমি সমষ্টি অহং বা ব্যষ্টি দেহমাত্র আমি নই—ইহার যাহাই হউক; এই প্রপঞ্চ সমষ্টি দৃষ্টিতে এক এবং আর ব্যষ্টি দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বা বহু—ইহার যাহাই হউক—এই যে সমস্ত নিয়ত বহুরূপ কল্পনা, ইহা নিয়ত এক স্বভাব

নির্ম্মল আত্মাতে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে অন্ধকারের অবস্থিতির মত অবস্থিত হয় কিরূপে? মিথ্যা হইলেও ধনবান্ যেমন আপনাকে দরিদ্র কল্পনা করিতে পারেন, পূর্ণও সেইরূপে আপনাকে অপূর্ণ কল্পনা করিতে পারেন অথবা জ্ঞানী আপনাকে অজ্ঞানী কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু কল্পনা মাত্রই অজ্ঞান—তবে জ্ঞানে এই বিরুদ্ধ ভাব উঠিবে কিরূপে? যদি বলা হয় কল্পনা যাহাই হউক না কেন মায়া শবলিত অর্থাৎ মায়া দ্বারা বিচিত্র ব্রহ্মের উদরেই কল্পনা থাকে ইহারই অভিব্যক্তি স্বভাবতঃ হয় তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই, প্রথমে এই কল্পনা কিরূপে উঠে?

ভগবন্ আপনি যাহা যুক্তি দিলেন যে আত্মা নিরিচ্ছ, আত্মা উদাসীন তাহা বুঝিলাম; আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা কিরূপে, অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা কিরূপে তাহাও বুঝিলাম; আত্মার ভুত সৃষ্টিকারিতাও বুঝিলাম। আত্মা সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগামী, তিনিই নির্ম্মল পদ, তাহাও বুঝিলাম। এই পৃথিবীতে চারিপ্রকার জীব-শরীরের অবস্থান যেমন, তাহার ন্যায় সেই চিৎ স্বরূপ আত্মায় এই সমস্ত ভুবনের অবস্থিতি; অথচ তিনি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন—এই সমস্ত আমার বোধগম্য হইতেছে। নবীন জলদের বারিধারায় পর্ব্বতের নিদাঘ তাপ যেমন বিদূরিত হয় সেইরূপে ভবদীয় বাক্যে আমার হৃদয়তাপ দূর হইল। পরমাত্মা উদাসীন ও নিরিচ্ছ বলিয়া কিছুই ভোগ করেন না। কিছুই করেনও না অথচ সকলই প্রকাশ হইতেছে তাঁহারই প্রকাশে, এজন্য তিনি ভোগও করেন; ক্রিয়াও করেন—এইরূপও বলা হয়। এ সমস্তই আমি বুঝিতেছি কিন্তু যে অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি পরম্পরা ভাসিতেছে যে অজ্ঞান অবলম্বনে চিৎ চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয় সেই অজ্ঞান তাঁহার নিকটে আসিল কিরূপে আমার এই সংশয় আপনি দূর করুন। নিতান্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ আত্মার প্রথম কল্পনা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল? এই কল্পনা কলঙ্ক সেই অতি স্বচ্ছ আত্মায় কিরূপে থাকে তাহাই আমাকে বুঝাইয়া দিন।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/• আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল। [৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২৩শ বর্ষ। ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল। ৫ম সংখ্যা

বঙ্কিম বাবুর সমাজ সংস্কার।

দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে বঙ্কিমবাবু কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্‌ভাবে সমাজ সংস্কার করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর "বন্দেমাতরং" ভারতের সকল জাতি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যে যে বিষয় উল্লেখ করিতেছি তাহা যদি যুবক সম্প্রদায় গ্রহণ করেন, এবং সমাজ যদি সেইমত কার্য্য করে তবে জাতির কল্যাণ হইবে ইহা আমরাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

উপস্থিত সময়ে পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা ইত্যাদি গুরুজনকে ভক্তি করিব কেন ইহা এক সমস্যা। পিতা যদি নীচপ্রকৃতির হয়েন, যদি স্বার্থপর হয়েন, যদি অর্থলোভী হইয়া প্রাণদাতাকেও বিপদে ফেলিতে চাহেন তবে সেরূপ পিতাকে ভক্তি করা যায় কিরূপে? অথবা স্বামী যদি নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী, আচার ভ্রষ্ট, এবং নীচাশয় হয়েন সেরূপ স্বামীকে কি নারায়ণ বোধ করা যায়?—এখনকার সমস্যা এই রূপ। বঙ্কিমবাবু এই সমস্যার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এখন দেখা যাউক। আমরা দেবীচৌধুরাণী হইতে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

প্রথম দৃশ্য পিতাপুত্রের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?

হরবল্লভ পিতা ব্রজেশ্বর পুত্র। প্রফুল্ল পুত্রবধূ। গ্রামের লোকে মিথ্যা রটাইল বধূ বাগ্‌দীর মেয়ে। পিতা সম্যক বিচার না করিয়া প্রফুল্লকে ঝাঁটামেরে তাড়াইতে আজ্ঞা করিলেন। গিন্নী রাজী হইলেন না।

কর্ত্তা। বাগ্‌দীর ঘরে অমন দুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমিই তাড়াচ্চি। ব্রজকে ডাকৃতরে।

ব্রজ কর্ত্তার ছেলের নাম। একজন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইস। অনিন্দ্য-সুন্দর পুরুষ—পিতার কাছে বিনীত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু, তোমার তিন সংসার—মনে আছে ?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্‌দীর মেয়ে ?"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে—বাইস বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "বাগ্‌দী বেটী আজ এখানে এসেচে—জোর ক'রে থাকবে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বল্‌লেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে ? এ তোমার কাজ, তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।"

গিন্নী বলিলেন, 'ছি বাবা! মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলনা। ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চলবেনা। তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল "যে আজ্ঞা" মায়ের কথায় উত্তর দিল "ভাল"।

এই যে বঙ্কিমবাবু লিখিলেন "বাপের সাক্ষাতে—বাইস বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে" আমরা এখন কার যুবক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে (বাপ মায়ের উপরে) এ কথা কি সত্য ? বিলাত ফেরত ছেলেও সভ্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া লম্বা লম্বা স্পীচ ঝাড়িয়া বাপমার চক্ষের জল ফেলে—একালকার এই সভ্যতা ভাল না তখনকার বঙ্কিমবাবুর প্রদর্শিত পথে চলা ভাল ? বিচারের ভার স্বভাববাদী নভেল লেখকদের উপরেই রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য আর এক স্থানে বঙ্কিমবাবু লিখিতেছেন "যে দেবী—হরবল্লভের পুত্রবধূ—হরবল্লভকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া রক্ষা করিলেন সেই দেবীরাণীকে ধরাইয়া দিবার গোয়েন্দা আজ নৃশংস শ্বশুর কৃতঘ্ন হরবল্লভ।

সাহেব আসিয়াছে দেবীকে ধরিতে। দেবী কৌশল করিয়া হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, সাহেব সকলকে নিজের বজরায় আনিয়াছেন। দিবা নিশা এবং চাকরাণী বেশধারিণী দেবী ইহার মধ্যে সকলেই বলিতেছে আমি দেবী সাহেব ঠিক করিতে না পারিয়া গোয়েন্দা ডাকাইয়াছেন। ব্রজেশ্বরকে গোয়েন্দা বলিয়া হুকুম করিতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিতেছেন আমি গোয়েন্দা নই।

"সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, কেও বড্ জাত? টোম্ গোইন্দা নেহি?"

"নেহি" বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী শিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

"করিলে কি, করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিলে?" বলিয়া হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

"হুজুর! তুফান উঠা!" বলিয়া বাহির হইতে জমাদ্দার হাঁকিল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার শাঁখ বাজিল। এবার দুই ফুঁ। * * যেমন শাঁক বাজিল, অমনি খোঁটার কাছে যাহারা বসিয়াছিল তাহারা কাছি খুলিয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপরে সাহেবের যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল, কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে সেই পাঁচশত কোম্পানীর সিপাহী পরাস্ত হইল।

সাহেব ব্রজেশ্বরেরর চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র—ইহারই মধ্যে বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তার পরে ঝড়ের বেগে বজরা কাত হইল—প্রায় ডুবে। সাহেবের হাতের ঘুসি হাতে রহিল যেমন বজরা কাত হইল তেমনি কে কার ঘাড়ে পড়ে।

নৌকা ডুবিলনা—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল।

লেফ্টেনাণ্ট সাহেব সেই মুলতুবী ঘুষিটা আবার পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেম, অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন, "ও কি কর! ইংরেজের গায়ে হাত তোল?"

ব্রজেশ্বর বলিল "আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে হাত তুলিতেছে ?"

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি। আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন।"

সাহেব বলিলেন, "ও বড় বদ্‌মাস্। তবে যদি আমার কাছে ও যোড়হাতে মাফ চায়, তবে আমি মাফ করিতে পারি।"

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর। যোড়হাত করিয়া সাহেবকে বল "আমায় মাফ করুন।"

ব্রজেশ্বর। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতৃআজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করিনা। আমি আপনার কাছে যোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া, প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন ইত্যাদি।

পিতার অসদ্ব্যবহারে পুত্র যখন অত্যন্ত যাতনা পাইত তখন বঙ্কিমবাবু দেখাইতেছেন—ব্রজেশ্বর এই বলিয়া উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত করিত যে পিতার অবাধ্য হওয়া অপেক্ষা ঘোরতর অধর্ম্ম আর হইতেই পারে না। জানিয়া শুনিয়াও হৃদয় যখন ঘোরতর বিদ্রোহী হইত তখন ব্রজেশ্বর জপ করিত "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ করিয়া দেখ হৃদয় শান্ত হইবে।

যুবক সম্প্রদায়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি এই পিতৃভক্তি তোমরা রাখিয়াছ না তিলাঞ্জলি দিয়াছ ? তবে একথাও ঠিক "জিনকে প্রিয় না রাম বৈদিহী। ত্যেজিয়ে কোটি বৈরীসম যদ্যপি অত্যন্ত সিনেহি" ইহাও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে—এইটি অনুরাগে হইলে ক্রমে সমস্তই ভাল হইবে আশা করা যায়।

তৃতীয় দৃশ্য কর্ত্তার প্রতি গিন্নীর ব্যবহারে নারীধর্ম্ম।

কর্ত্তা গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজন-হস্তে ভোজন পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছী নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছী তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে ? গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে, কিন্তু স্বামী সেবা আর কার সাধ্য করিতে আসে ? যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই।

বঙ্কিমবাবু নারীধর্ম্ম উচ্ছেদকারী কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমদের মাথায় বজ্র হানিবার জন্য অভিসম্পাত আনিতেছেন—আজকালকার যুবক সম্প্রদায় কি তাহাদের চিনিয়াছেন? যদি চিনিয়া থাকেন তবে তাহাদের হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে কি তাঁহারা প্রস্তুত আছেন?

চতুর্থ দৃশ্য ঘোমটা খোলা সম্বন্ধে।

আজ এই ঘোমটা খোলার দিনে বঙ্কিম বাবুর মত কেই বা শুনিবে? তথাপি বঙ্কিমবাবু সমাজের অতি গণ্যমান্য ব্যক্তি—তাঁহার মত জানিয়া কার্য্য করাও কাহারও কাহারও অভিপ্রেত হইতেও পারে।

বঙ্কিমবাবু লিখিতেছেন—

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটাছিল—সে কালের মেয়েরা এ কালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল।

পঞ্চম দৃশ্য মেয়েদের (যাহাদের সেরূপ সুবিধা আছে অন্ততঃ তাহাদের জন্য) চরিত্র গঠনের জন্য বঙ্কিমবাবু যে শিক্ষা দিতেছেন—

নিশি—তিনিও আমাকে একপ্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল। এক প্রকার কি?

বয়স্যা। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম?

বয়স্য। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

বয়স্যা। হাঁ—কেননা, যিনি সম্পুর্ণরূপে আমাতে অধিকারী তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিতনা।"

বয়স্যা—শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে। কেননা, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত। এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারিনা। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃদ্ পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম

পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা! শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। ইত্যাদি।

বঙ্কিম বাবু যে শিক্ষায় সমাজ গঠন করিতে চান তাহাই কিন্তু এই জাতির স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র গঠনের প্রধান শিক্ষা। সধবাই হউক বা বিধবাই হউক মৃত স্বামীকে বা জীবিত স্বামীকে ঈশ্বর ভাবে উপাসনা করিতে হইবে ইহাই এই জাতির নারীগণের পতিনারায়ণ ব্রত।

স্বামী জীবিত বা মৃত যাহাই হউক না কেন প্রতিদিন একান্তে ইষ্টদেবতার সাজপোষাকে স্বামীকে অন্তরে সাজাইয়া মানসে পূজা করা উচিত। এই করিতে করিতে স্বামীর স্বভাবও অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বামী ও স্ত্রীর যে মিলন হইবে তাহাতেই পতিনারায়ণ ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে। ইহার পরে বঙ্কিমবাবু প্রফুল্ল গঠনের জন্য পাঁচ বৎসর ধরিয়া সংযম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যুবক যুবতীর যদি সংযম শিক্ষার বন্দোবস্ত না থাকে তবে সমাজ মৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা আমরা অনাবশ্যক মনে করিনা।

পঞ্চম দৃশ্য স্ত্রীলোকের সংসার ধর্ম্ম।

রাণীগিরি ছাড়িয়া প্রফুল্ল সংসার করিতে আসিয়াছে। সাগর (ব্রজেশ্বরের অপর স্ত্রী) প্রফুল্লকে খুঁজিয়া পুকুর ঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছে। সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা তুমি আমাদের নূতন বৌ ?"

"কে সাগর এয়েছ ?" বলিয়া নূতন বউ সম্মুখ ফিরিল। সাগর দেখিল, কে! বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেবী রাণী ?"

প্রফুল্ল বলিল "চুপ! দেবী মরিয়া গিয়াছে।

সাগর। প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। প্রফুল্ল মরিয়াছে।

সাগর। কে তবে তুমি ?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সাগর। কেমন করে কি হলো—আমায় সব বল দেখি ?

প্রফুল্ল নির্জ্জন ঘরে গিয়া সব বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল "এখন

গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণী গিরির পর কি বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দু'হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুমবরদারী কি তার ভাল লাগিবে?

প্রফুল্ল। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়! ইহাদের কাহারও কোনও কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড়? আমি এই সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছি।

বঙ্কিম বাবু গ্রন্থ শেষে লিখিতেছেন এখন এস, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও! আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। তাই আবার আসিলাম।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বঙ্কিম বাবুর অভিমত কি সকলেই দেখিতেছেন। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান তিনি দেখিয়াছিলেন—ভক্তির গ্লানি নয় বা জ্ঞানের গ্লানি নয়—ধর্ম্মের গ্লানি! তিনি যে যে বিষয়ে প্রতীকার দেখাইয়াছেন—সমাজ কি তাহা আলোচনা করিতে প্রস্তুত? যদি না হয় তবে শ্রীভগবান্ কল্কীর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

৺সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উপদেশ।

১। সহস্রের মধ্যে একজন যথাশাস্ত্রগুরু নিশ্চয় পাওয়া যায়, কিন্তু দশ সহস্রের মধ্যেও যথাশাস্ত্র শিষ্য একজন পাওয়া কঠিন। "গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক" হিন্দুস্থানীরাও ইহা বলেনগুরু ও শিষ্য উভয়েই ইহা বুঝিয়া শিষ্য ও গুরু করিও।

২। গুরুতে কি আছে না আছে, তাহার সকল বুঝিয়া তবে তাঁহাকে গুরু

করিব, এ বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিবিশেষ। যে যাহা অপেক্ষা সকল বিষয়ে বড় নহে, সে কখনই তাহার সকল বুঝিতে পারে না, গুরুর সকল বুঝিতে হইলেই গুরু অপেক্ষা বড় হইলে আর ছোটকে গুরু করা কেন ? ছেলে যদি আগেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল, তবে আর সে পাঠশালায় গিয়া কি করিবে ?

৩। শাস্ত্রের আদেশ, ব্রাহ্মণকে এক বৎসর, ক্ষত্রিয়কে দুই বৎসর,—বৈশ্যকে তিন বৎসর ও শূদ্রকে চারি বৎসর নিকটে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে শিষ্য করিবে। আজ সে আদেশের অপেক্ষা না করিয়া গুরুকুল! তুমি নির্ম্মল হইলে। মাটীর পরীক্ষা না করিয়া মালদহের আমের কলম লাগাইলেও, অনেক স্থলে এমন আম ফলে যে, এক আমেই এক ভোজের অম্বল শেষ।

৪। ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, কথকতা, গান ও নূতন পুস্তকের কুহকে মজিয়া নিজের কুলধর্ম্মে কুলদেবতায়, কুলমন্ত্রে জলাঞ্জলি দিও না।

৫। বৈষ্ণবের পক্ষে বৈষ্ণবগুরু প্রশস্ত, শৈবের পক্ষে শৈব, সৌরের পক্ষে সৌর, গাণপত্যের পক্ষে গাণপত্য ও শাক্তের পক্ষে শাক্ত গুরুই প্রশস্ত। তবে পঞ্চোপাস্য দেবতায়, কথায় না হইয়া কাজে যাঁহার একত্বজ্ঞান হইয়াছে, এমন কোন মহাপুরুষকে গুরু পাইলে, তাঁহার নিকটে পঞ্চদেবতারই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। সে যে পথে কখন নিজে যায় নাই, সে পরকে সে পথ— দেখাইবে, ইহা অসম্ভব, তবে যে কোন এক পথ দিয়া গন্তব্য স্থানের শেষ সীমায় গিয়া যিনি বুঝিয়াছেন সকল পথেরই পরিণাম এই, তিনি সকলেরই সকল পথের শেষ সীমা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতে পারেন। এই জন্যই শাস্ত্রের আজ্ঞা—"কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরু" যথার্থ কৌল হইলে তিনি শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সকল দীক্ষা বিষয়েই সদ্‌গুরু ॥

৬। সর্ব্বসাধারণ অধিকারীকে যিনি আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন, জানিও তিনি ধর্ম্মজগতে দুর্দ্দান্ত দস্যু।

৭। নিজের গুরুবংশে যথাশাস্ত্র দীক্ষাদানের উপযুক্ত পাত্র থাকিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যের নিকটে দীক্ষিত হইও না।

৮। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কুলগুরু অপেক্ষা তোমার অধিক ভক্তি হইলে অগ্রে পরীক্ষা করিও যে, সে ভক্তির কারণ কি ? ব্যাখ্যা বক্তৃতা শুনিয়া ভক্তি হইলে জানিও তাহা গুরুভক্তি নহে, উহা ব্যাখ্যা বক্তৃতারই ভক্তি, ব্যাখ্যাতা ও বক্তা ভাল হইলেই তিনি গুরুও ভাল হইবেন, ইহা নহে। কেননা,

ব্যাখ্যা বক্তৃতা কেবল ধর্ম্মভাব উদ্দীপনার জন্য, কিন্তু গুরুকরণ, সাধনা ও সিদ্ধির জন্য।

৯। গুরুবংশে কেহ উপাধিধারী পণ্ডিত থাকিলে তাঁহাকেই প্রশস্ত গুরু বলিয়া মনে করিও না। সিদ্ধিসাধনায় তিনি কতদূর অগ্রসর, তাহাই পরীক্ষা করিও, উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য পাণ্ডিত্য নহে, বরং সর্ব্বোপাধিশূন্য হইবার জন্যই তাঁহার পাণ্ডিত্য।

১০। গুরুকুলে দীক্ষাদানের উপযুক্ত পাত্র আছেন, কিন্তু শিষ্য অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, এমন স্থলে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যত্র দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই। কেন না, ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব জ্ঞানে,—ক্ষত্রিয়ের জ্যেষ্ঠত্ব বীরত্বে, বৈশ্যের জ্যেষ্ঠত্ব ধনধান্যে ও শূদ্রের জ্যেষ্ঠত্বও বয়ঃক্রম অনুসারে, ব্রাহ্মণবালক যদি জ্ঞানী হয়েন, তবে তিনি অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধেরও গুরু এবং প্রণম্য।

১১। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ কখনও ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণেরই দীক্ষাদানের অধিকারী। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই ত্রিবর্ণের; বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই দ্বিবর্ণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন। শূদ্র কখন কাহারও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না। তবে জ্ঞানী হইলে তিনি সজাতীয় ব্যক্তির জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারেন এই মাত্র।

১২। যতির নিকটে, পিতার নিকটে, মাতামহ, ভ্রাতা, পতি, বনবাসী ও সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ। পিতা, মাতামহ, ভ্রাতা ও পতি মহাবিদ্যার উপাসক হইলে পুত্র, দৌহিত্র, ভ্রাতা ও পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

১৩। গুরুতে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে যাহার অক্ষরবুদ্ধি এবং দেবদেবীর মূর্ত্তিতে যাহার মৃত্তিকা, পাষাণ ইত্যাদি জ্ঞান, তাহার নরক অব্যাহত।

১৪। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে তাহা অগ্রে গুরুর নিকটে সবিশেষ জানিয়া, নিজে তাহাতে সমর্থ হইবে কি না তাহা বুঝিয়া, তবে দীক্ষা গ্রহণ করিও।

১৫। মন্ত্রের দুই শক্তি; এক সাধকের সর্ব্বার্থসাধিনী, অপরা সর্ব্বার্থঘাতিনী। মন্ত্র যথাশাস্ত্র সাধিত হইলে সাধকের অষ্টসিদ্ধি করতলে প্রদান করেন; আবার গৃহীত মন্ত্র অসাধিত থাকিলে তিনিই ধনক্ষয়, জ্ঞানক্ষয়, দেহক্ষয় ও বংশক্ষয় করেন, ইহাই বুঝিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিও। (এতাবতা ইহা বলিতেছি

না যে, সাধন করিতে পারিবে না বলিয়া তুমি চিরকালই অদীক্ষিত থাকিয়া যাও।)

১৬। গুরুকে কি ভাবে, কি জ্ঞানে, কিরূপে আরাধনা উপাসনা করিতে হইবে, তাহা অগ্রে জানিও পরে নিজে শিষ্য হইও।

১৭। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম, দীক্ষার শাস্ত্রবিহিত কাল। গুরুনির্ব্বাচন করিয়াই জীবনটা কাটাইও না।

১৮। বুঝিয়া সুঝিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিবে, কথাটা শুনিতেই ভাল; কাজে কিন্তু ভাল নয়, বুঝিতেই যদি পরমায়ুঃ ফুরাইল, তবে সে মন্ত্রের সাধনার ভার কি উত্তরাধিকারীকে দিয়া যাইবে?

১৯। গুরুর বংশে জন্মিয়াছ বলিয়াই গুরু হইবে, এ অভিমান করিও না। গুরুত্ব মৌরসী পাট্টার জমীদারী নহে। নিজে আপন গুরুকে ভক্তি করিতে শিখিয়া পরে আপন শিষ্যকে গুরুভক্তির শিক্ষা দাও, পিতামহকে পিতা কেমন ভক্তি করেন, তাহা দেখিয়াই পুত্র কিন্তু পিতৃভক্তি শিখিয়া রাখে।

২০। শাস্ত্রের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া শিষ্যের মন রাখা, গুরুর ধর্ম্ম নহে, উহা শিষ্যের কর্ম্ম। কে গুরু, কে শিষ্য তাহা ঠিক রাখিয়া তবে শিষ্যের মনঃ যোগাইও।

২১। গুরু হইয়া তুমি শিষ্যের মন যত যোগাইবে, নিশ্চয় জানিও শিষ্য তোমাকে তত ভোগাইবেন।

২২। বৃত্তি আদায় করিতে শিষ্যের বাটীতে গিয়ে নিজে লাঞ্ছিত হইও না, তুমি বৃত্তি আদায় করিতে না গেলে শিষ্য আপনি তোমার বাটীতে আসিয়া অবনত মস্তকে বৃত্তি দিয়া যাইবেন। তোমার বৃত্তি তুমি আদায় করিয়া রাখিতে পারিবে না, শিষ্য যদি দিয়া যান, তবেই জানিবে তাহা চিরকাল থাকিবে।

২৩। মন্ত্রের কোন খাজনা নাই, তাহার জন্য শিষ্যকে উৎপীড়িত করিও না।

২৪। গুরুকে যাহা দাও, তাহা গুরুকে দিলে বলিয়া মনে করিও না। জানিও উহা নিজের সম্পত্তিই বিশ্বস্ত স্থানে গচ্ছিত রাখিলে। যে দিন তোমার সব ফুরাইবে, সে দিন কিন্তু ঐ টাকাতেই কাজ দিবে।

২৫। গুরুদক্ষিণা সহজ নহে। যে দিন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, সে দিনই ধনজন দূরে থাক, মনঃ প্রাণ দেহ আত্মা পর্য্যন্তও দক্ষিণা হইয়া গিয়াছে। দেওয়া জিনিষ আর দিবে কি? তথাপি যাহা দেও জানিও উহা প্রসাদ পাইবার

উপায় করিয়া রাখা মাত্র। আর যদি লৌকিক দক্ষিণা বুঝ, তাহা হইলে জানিও দীক্ষাগ্রহণকালে সমর্থ হইলে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা, তাহাতে অসমর্থ হইলে সর্ব্বসম্পত্তির অর্দ্ধভাগ, তাহাতেও অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেকের অর্দ্ধভাগ, ইহার ন্যূন নহে। এখন বুঝিয়া দেখ, গুরুর জ্বালায় তোমার হাড় কালি, কি তোমার জ্বালায় গুরুর হাড়কালি?

২৬। কুলদেবতা ও কুলমন্ত্র পরিত্যাগ করিলে কেবল শাস্ত্রের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় তাহা নহে, পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধনায় সে দেবতার যে প্রসন্নতা ও মন্ত্রে যে চৈতন্য সঞ্চার হইয়া আছে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়, পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরার চিরকাল সাধনায় মন্ত্রে যে শক্তি সঞ্চার হইয়াছে, তুমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে এক জীবনে তাহার শতাংশের একাংশও করিয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দেবতা সকলই এক, ভিন্নমূর্ত্তির উপাসক হইলে তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া যাওয়া হয় না, কিন্তু নিজের পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভূমি ছাড়িয়া গিয়া নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতে পরমায়ুতে কুলাইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ।

২৭। দেবতার মূর্ত্তি বিশেষের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা ভক্তি যদি জন্মাবধি স্বাভাবিক হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহা নিতান্তই জন্মান্তর সাধনার ফল, সে স্থলে সে মূর্ত্তি উপেক্ষা করিয়া অন্যমূর্ত্তির উপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক, কি ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, যাত্রা পাঁচালী, নাটক ও নবন্যাস ইত্যাদির অনুরোধে উদ্ভূত, তাহাই প্রথম পরীক্ষা করিতে হইবে। কাহারও কথায় বা ব্যাখায় আজ যদি কুলদেবতা ছাড়িয়া তোমার অন্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রবল হয়, তবে দুদিন পরে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাতা বা বক্তা অপেক্ষা আর একজন বাক্‌পটুর কল্যাণে তখন আবার যে তোমার এ দেবতা ছাড়িয়া অন্যদেবতায় ভক্তি হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছ, গঙ্গাস্নান করিয়া যাও, নবদ্বীপের ঘাট ভাল, কি শান্তিপুরের ঘাট ভাল তাহারই বিবাদ লইয়া গঙ্গাকে হারাও কেন?

২৮। আমার মনে যাহা ভাল লাগিবে, তাহাই আমার পক্ষে ভাল, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নহে, মৃত্যুর নিমন্ত্রণ বিশেষ। জ্বরে ধরিলে যত অপথ্য তাহাই মনে ভাল লাগে, কিন্তু সেখানে তোমার ভাল লইয়া সিদ্ধান্ত হইলে আর চিকিৎসকের ব্যবস্থাও টিকে না, প্রয়োজন ও হয় না। তুমি গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিবে তোমার মনঃ প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া, শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়া জন্মান্তরে তুমি

কি ছিলে, এবার কি হইয়াছ, তাহা জানিয়া তোমার ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিবেন তিনি। তুমি জানিবে—"গুরোর্ব্বচঃ সত্য মসত্য মন্যৎ"।

২৯। গুরু কি করেন, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই, তোমাকে তিনি যাহা করিতে বলেন, তুমি কায়মনোবাক্যে তাহাই করিয়া যাও।

৩০। সাধনশাস্ত্র যদি বুঝিতে চাও, তবে একেবারে সকল শাস্ত্রই বুঝিতে যাইও না। নিজধর্ম্মের অনুকূল শাস্ত্র যাহা, আগে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা কর যদি কৃতকার্য্য হইতে পার তখন এক শাস্ত্রকে দ্বার করিয়া সকল শাস্ত্রই বুঝিতে পারিবে। নইলে শত দ্বার গৃহের কোন্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে; কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইবে তাহার পথ না পাইয়া চিরকালই ঘুরিয়া মরিবে।

৩১। সাধন যদি করিতে চাও, তবে অন্য শাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সাধন শাস্ত্রেই বুদ্ধি মনঃ স্থির কর। সাধনশাস্ত্রের মধ্যেও আবার নিজ সাধনের অনুকূল যে শাস্ত্র তাহারই চর্চ্চানুশীলনে অগ্রসর হও।

৩২। শাস্ত্রের মুখে নিজ সাধনের অনুকূলতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইলে কোন্ উদ্দেশে কোন্ শাস্ত্রের অবতারণা, কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থে কোন তত্ত্ব প্রতিপাদ্য, তাহা আগে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া তাহার পর তাহা হইতে নিজ সাধন-তত্ত্ব নিষ্কাশনে সচেষ্ট হও।

বলরে রাম রাম।

তোর সকল দুঃখ যাবেরে দূরে বলরে রাম রাম।
তোর সকল জ্বালা হবেরে শান্ত গাওরে রাম রাম।
তোর সকল ব্যথা আর রবে না জপরে রাম রাম।
তোর সকল ইচ্ছা হবেরে পূর্ণ স্মররে রাম রাম॥
তোর সকল কর্ম্ম সফল হবে বলরে রাম রাম।
তোর সকল শাস্ত্রে হবেরে জ্ঞান গাওরে রাম রাম।
তোর সকল যোগ হবেরে সিদ্ধ জপরে রাম রাম।
তোর সকল বন্ধ মোচন হবে স্মররে রাম রাম॥
তোর সকল জানা যাবেরে হ'য়ে বলরে রাম রাম।
তোর সকল কুল উজ্জ্বল হবে গাওরে রাম রাম॥

তোর সকল পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে জপরে রাম রাম।
তোর সকল দেহ যাবিরে ভুলে স্মররে রাম রাম॥
তোর সকল সিদ্ধি আস্‌বে ছুটে বলরে রাম রাম।
তোর সকল ঋদ্ধি বিকাশ হবে গাওরে রাম রাম॥
তোম সকল শুদ্ধি যাবেরে হ'য়ে জপরে রাম রাম।
তোর সকল সিদ্ধি লুটাবে পায়ে স্মররে রাম রাম।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ
(ডুমুরদহ)

ক্ষেপার ঝুলি।

ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপার আনন্দের সীমা নাই ক্ষেপার গুরু ক্ষেপাকে একটী কথা শিখাইয়াছেন সে কথাটী ক্ষেপা যখন মনে করে তৎক্ষণাৎ দুঃখ কষ্ট রোগ শোক মান অপমান সব ভুলিয়া যায় সে রাম রাম করিলে তবে সে কথাটী তাহার মনে থাকে রাম রাম ভুলিলেই গুরুদেবের সে কথাটি আর স্মরণ থাকে না।

বড় কষ্টে পড়িয়া একদিন সে তাহার গুরুদেবকে বলিল ঠাকুর আমায় এমন একটী কথা বলিয়া দিন যাহা মনে হইলে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন সর্ব্বদা রাম রাম জপ করিবে আর ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য এ কথাটীতে স্থির বিশ্বাস রাখিবে তোমায় রোগ শোক দুঃখাদি অভিভূত করিতে পারিবে না।

ক্ষেপা সেই অবধি ঐ কথাটী মনে করে আর রাম রাম করে, রাম রাম করা কম করিলে আর ঐ কথাটীতে বিশ্বাস রাখিতে পারে না সে সর্ব্বত্র গুরু বাক্যটী প্রয়োগ অভ্যাস আরম্ভ করিল।

সে চিন্তা করিতে লাগিল এই যে কঠিন কঠিন রোগ হয় ঔষধে সারে না চিকিৎসক হার মানিয়া যান ইহাতে ভগবান্ কি মঙ্গল করেন? তাহার এক জনের কথা মনে পড়িল সেই লোকটী দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়াই রাম রাম করা অভ্যাস করিয়াছে। তাহা হইলে রোগ দিয়া ভগবান মঙ্গল করেন বৈ কি।

রোগও ভাল, রোগে মানুষ রাম রাম করিতে শিখে, স্বপ্নময় সংসারের জন্য হাহাকার করিতে ভুলিয়া যায়, রাম রাম রোগও ভাল, রোগে লোক ভগবানের ভক্ত হয় এই মিলিয়া গিয়াছে "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" রাম রাম সীতারাম।

আচ্ছা এই যে মানুষ গরীব হয় খাইতে পায় না একবেলা জুটে একবেলা হয়ত জুটে না কাল খাইবার সংস্থান নাই ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করেন? ক্ষেপা ভাবিতে লাগিল মানুষ দরিদ্র হইলে অহঙ্কার শূন্য হয় দরিদ্রের ব্যথা বুঝিতে পারে, দরিদ্র ব্যক্তিকে লোকে ঘৃণা করে সে লোকের নিকট যাইতে পারে না যাহার কাছে যায় সেই ভাবে বুঝি কিছু চাহিবার জন্য আসিতেছে ঐ বুঝি বলে আমার কিছু দাও সকলেই দরিদ্রের নিকট হইতে পাশ কাটাইতে চায়। দরিদ্রের নির্জ্জন ভিন্ন উপায় থাকে না সে নির্জ্জনে থাকিতে থাকিতে প্রাণের মাঝে আপনার জনের সাড়া পায় তখন তাঁহারই সঙ্গে কথা কয় তাঁহারই সঙ্গে আলাপ করে তাঁহাকে লইয়া দিবারাত্র আনন্দে থাকে। সাধুগণ দরিদ্রকে বড় ভালবাসেন দরিদ্রের গৃহে সাধুগণ পদার্পণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন ভগবানের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেন। সে ভগবানের কৃপালাভ করে ঠাকুরটী অকিঞ্চনের ধন কিনা যতক্ষণ কিছু আপনার বলিয়া থাকিবে ততক্ষণ ঠাকুরটী দূরে দূরে থাকেন যেমন আপনার বলিবার সব ফুরাইয়া যায় অমনি ঠাকুরটী আসিয়া বুকে তুলিয়া লয়েন। ঠাকুরটীর চিরকাল ঐ একই ধারা।

ক্ষেপা একজনের কথা জানিত সে ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও কত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে এবং কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে দ্রব্যাদি আসিয়া তাহার বিগ্রহের সেবা হয়। দারিদ্র্যই মানুষকে ভগবানের পথে লইয়া যায়। এই মিলিয়া গিয়াছে "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য"।

ক্ষেপা ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনাতেই মিলাইতে লাগিল, প্রত্যেক ঘটনায় ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য একথার অসঙ্গতি সে দেখিতে পায় না। রোগে শোকে দুঃখে যন্ত্রণায় সে দেখে "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" সময় সময় কি মঙ্গল করিলেন বুঝিতে না পারিলেও সে স্থির জানে ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

সে একটী স্ত্রীলোককে জানিত যৌবনেই বিধবা হইয়া পিতার গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইল সংসারে দারুণ কষ্ট সর্ব্বদা হাহাকার ইহাতে সে বুঝিতে পারিল না ভগবান্ কি মঙ্গল করিলেন, কিছুদিন পরে ক্ষেপা শুনিল মেয়েটী সর্ব্বদা গুরু

গুরু জপ করিতেছে আরও কিছুদিন পরে দেখিল মেয়েটী সমাধি লাভ করিয়াছে। তাহার কথা মিলিয়া যাইল সে নাচে আর বলে "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" রাম রাম সীতারাম।

সে একজন দুশ্চরিত্র মত্তপকে দেখিয়া প্রথমে মিলাইতে পারে নাই ভগবান্ কি মঙ্গল করিয়াছেন। কিছুদিন পরে মত্তপের মদে অরুচি হইল নারী সঙ্গে ঘৃণা আসিল, সে মহা হরিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎ কথার প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে লাগিল সে শ্রীভগবানের দাস হইয়া ধন্য হইল ক্ষেপার আনন্দের সীমা নাই ক্ষেপা নাচে আর বলে ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা একদিন দেখিল একজন পাওনাদার দেনাদারকে অত্যন্ত কটূক্তি করিতেছে, দেনাদার নীরবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, উপস্থিত তাহার দেনা শোধ করিবার কোন উপায় নাই। এখানে ভগবান্ কি মঙ্গল করিলেন ক্ষেপা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য"—দেনাদার বলিল ঠিক বলিয়াছ, মনিব আমায় বড় বিশ্বাস করিতেন, আমি মনিবের অনেক টাকা চুরি করিয়াছিলাম সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" জয় ভগবান্।

ক্ষেপা একদিন ভাবিল আচ্ছা দরিদ্র হইলে মানুষ যদি সৌভাগ্য থাকে তাহা হইলে ভগবানকে ডাকে, নচেৎ চুরি জুয়াচুরিও ত করে, এখানে ভগবান্ কি মঙ্গল করিলেন ; ক্ষেপা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীভগবানের চরণ দুইখানি চিন্তা করিতে লাগিল, সে দেখিল তাহার মনের মধ্যে লেখা ফুটিয়া উঠিল "ইহারা চুরি জুয়াচুরি করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় করিতেছে। ক্ষেপা উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য"।

ক্ষেপা রাম রাম করিতে করিতে মনে করিতেছে আচ্ছা ঐ যে ডাকাত লোকের মাথায় লাঠি মারে, সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, সর্ব্বনাশ করে, লোককে পুড়িয়ে মারে, লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন।

ক্ষেপা তখন কুল কিনারা না পাইয়া মনের দিকে চাহিয়া দেখিল এক নির্জ্জন তুলসী কাননে বসিয়া ডাকাত হরি নাম জপ করিতেছে তাহার সর্ব্বাঙ্গে রাম নাম অঙ্কিত কণ্ঠে তুলসী মালা হস্তে তুলসী মালাতে জপ করিতেছে—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

নয়ন জলে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। ক্ষেপা বলিল বারে ডাকাত তুই বুঝি কর্ম্মক্ষয় কর্‌ছিস্ বেশ বেশ জয় ভগবান্, ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা একদিন দেখিল একজন বৃদ্ধকে তাহার পুত্র পুত্রবধূ মারিতে মারিতে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতেছে, সে বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। ক্ষেপা ভাবিল এইরে এইখানে বুঝি অমিল হয়! কিন্তু সে পিছাইবার ছেলে নয় "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" বলিয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ অশ্রু মুছিয়া আনন্দের সহিত বলিল সত্যই "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য"। আমি আমার পিতামাতার উপর এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে ভগবান তুমি সত্য তুমি যাহা কর মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা কোন দিন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আচ্ছা এই যে নূতন নূতন রোগ—কালাজ্বর, বেরিবেরি, ক্ষয়কাস, অজীর্ণ, অম্বল, ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ আরও কত রকম কুৎসিৎ কুৎসিৎ রকম বিরকমের রোগে কত লোক পীড়িত হইতেছে ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন ?

ক্ষেপা, ক্ষেপা কিনা সে যেমন চোখ বুজে রাম রাম করিতে বসিল দেখিল সম্মুখে হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য একাকারের মহাতীর্থ চায়ের দোকানে বড় ভিড় একজন বসন্ত রোগী মুচি এক পেয়ালা চাপান করিয়া যেমন চলিয়া যাইল তৎক্ষণাৎ এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই মুচির উচ্ছিষ্ট পেয়ালায় চাপান করিয়া বসন্ত রোগকে আবাহন করিল সে এইরূপে বসন্ত রোগীর বীজ লইয়া দেশে গিয়া বীজ ছড়াইয়া দিল নিজে মরিল গ্রামটাকে মারিল।

ক্ষেপা ভাবিল ওঃ হরি! ঐ মুচি মুদ্দাফরাসের প্রসাদ ভোজন করেই বুঝি এত রোগের বাড়াবাড়ী। যেমন রোগ তাহার তেমনি প্রায়শ্চিত্ত। ক্ষেপা দেখিল কলেরা, যক্ষ্মা, বেরিবেরি, কালাজ্বর, বসন্ত প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের বীজাণু সকল চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, ঐ চা বিস্কুট কেক দিয়া শরীরে প্রবেশ করত দেহকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। ক্ষেপার কথার মীমাংসা হইয়া যাইল, এই অনাচার ব্যভিচার জনিত পাপক্ষয় করিবার জন্য ভগবান্ রোগরূপ মঙ্গল করেন। জয় সীতারাম।

ক্ষেপার সম্মুখ হইতে সে দৃশ্য সরিয়া যাইল ক্ষেপা দেখিল সম্মুখে একটা দোকান তাহাতে কত রকম মাছ ডিম ও মাংসের তরকারি সজ্জিত রহিয়াছে, ক্ষেপা সে সব তরকারির নাম জানে না সেই সব ব্যঞ্জনের উপর কুকুর কাক

ভিক্ষুক লোভী এরূপ ভাবে দৃষ্টি দিয়াছে যে সে সমস্ত ব্যঞ্জন জ্বলিয়া গিয়াছে; যে যেমন ভোজন করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে অজীর্ণ, অম্ল অম্লশূল, ইত্যাদি রোগে গ্রাস করিতেছে। ক্ষেপা ভাবিল এই সব পেটুকদের রোগ মঙ্গলই বটে, ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইতেছে।

ক্ষেপা আবার এক নূতন দৃশ্য দেখিল একটী অস্থিচর্ম্মসার দন্তহীন ব্রাহ্মণ যুবক উদরে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে তাহার কিছু ভোজন করিবার উপায় নাই যাহা ভোজন করে জীর্ণ হয় না অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এখানে ভগবান্ কি মঙ্গল করিলেন ক্ষেপা স্থির করিতে না পারিয়াও বলিল "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য"।

ব্রাহ্মণ যুবক বলিল সত্য তাঁহার কোন অবিচার নাই, আমি ব্রাহ্মণ মুখ না ধুয়ে বিছানায় বসে চা খেয়ে তবে উঠেছি, কখন সন্ধ্যা আহ্নিক কিছু করেনি, চিরদিন কেবল উদর সেবা করেছি, তাই আজ ভোজনের শক্তি নাই অজীর্ণে ও অম্লে প্রাণ যায়। দিবারাত্রি ছাগলের মত দোক্তা দিয়ে পান খেয়েছি, যেখানে সেখানে যার তার হাতে সাজা পান খেয়ে নিজের উদারতা দেখাইয়াছি, তার ফলে দাঁতগুলা সব গেছে, সর্ব্বদা মাথা ঘুরছে একটা কথা মনে থাকে না কেহ মিষ্টবাক্য বল্‌লেও তাকে রূঢ় কথা বলে ফেলি। যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল ওগো তোমরা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করো সেও ভাল তথাপি আমার মত পান দোক্তা চা খেও না।

ক্ষেপার আর কোন সংশয় নাই সে সহর্ষে বলিল ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা মনে করিল আচ্ছা, নিষ্ঠাবান্, আচারপরায়ণ লোক যাঁহারা তাঁহাদেরও রোগ হয়, তৎক্ষণাৎ সেকথার মীমাংসা হইয়া যাইল—দুষ্কর্ম্মই রোগের কারণ, সে কর্ম্ম ইহ জন্ম কৃত না হইলেও ফল যাবে কোথায়? পূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম রোগরূপে আসিয়া নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকেও পাপমুক্ত করে॥ এই মিলিয়া গিয়াছে ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। ক্ষেপার মাথাটা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইয়া যাইল সে আর অমঙ্গল খুঁজিয়া পায় না; যাহাকে অমঙ্গল মনে করিয়া আকুল হয় কিছুক্ষণ রাম রাম করিলেই তাহাই মঙ্গল হইয়া যায়, ক্ষেপা আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে।

একদিন ক্ষেপা একটা রাস্তা দিয়া যাইতেছে এমন সময় দেখিল একটী বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে, ওরে বাবারে—কোথা গেলিরে—আমার যে আর কেউ নেই রে—আমায় কে দেখবে রে—আমায় কে খেতে দেবে রে—তোর জন্যে সর্ব্বস্ব খোয়ালাম, তোর জন্যে আমি পথে বস্‌লাম তোর জন্যে আমার ভিক্ষা সার হলোরে।—

ক্ষেপা বুঝিল বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। আহা বৃদ্ধার কি উপায় হইবে—আচ্ছা ভগবান্ এখানে কি মঙ্গল করিলেন, কিন্তু ক্ষেপা বলিতে ছাড়িল না, সে বৃদ্ধার কাছে যাইয়া বলিল "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।"

বৃদ্ধা এ নিদারুণ সময়ে অদ্ভুত কথা শুনিয়া ক্ষেপার মুখের দিকে চাহিল, ক্ষেপা সেই স্থানে বসিয়া শ্রীভগবানের চরণ চিন্তা করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ক্ষেপার অন্তরাকাশে একটী পুরুষ একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল পুরুষটী বলিল আমার সুদশুদ্ধ সমস্ত টাকা শোধ করে দাও নচেৎ ভাল হবে না, তোমার মহা অনিষ্ট হবে।

স্ত্রীলোকটী বলিল কোথা থেকে দিব বাবা আমার কিছু নাই, আমি খেতে পাইনে, ভিক্ষা করে খাই এ অবস্থায় তোমায় কি করে টাকা দিই।

পুরুষটী বলিল কি করে দেবে কেমন করে জান্‌ব; আমার টাকা না দিলে নিস্তার পাবে না, আমি যেমন করে পারি সুদ শুদ্ধ টাকা আদায় কর্‌ব; আমায় যেমন কাঁদাচ্ছ তোমায় তেমনি কাঁদাব।

স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল কি করে আদায় কর্‌বে বাবা, আমার যে কিছু নাই।

পুরুষটী বলিল আগামী জন্মে আমি তোমার পুত্র হব সমস্ত নষ্ট করে বুকের রক্ত দিয়ে আমায় মানুষ কর্‌বে। তারপর আমি সমস্ত টাকা আদায় করে দেহ ত্যাগ কর্‌ব। যেমন টাকার শোকে আমি কাঁদ্‌ছি তেমনি তোমায় আমার শোকে বৃদ্ধ বয়সে কাঁদ্‌তে হবে।

ক্ষেপার চটকা ভাঙ্গিয়া গেল রাম রাম রোক শোধ ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা এতক্ষণ ক্ষেপার মুখ পানে চাহিয়া ছিল, ক্ষেপার মুখ দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল তাহার দেহ এখানে থাকিলেও সে এখানে ছিল না; বৃদ্ধা ক্ষেপার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল রোক শোধ বল্‌লে কেন বাবা?

ক্ষেপা বলিল আরে পা ছাড় পা ছাড় আমি ক্ষেপা মানুষ আমি স্বপ্ন দেখিলাম—তুই যেন দেনাদার আর তোর ছেলে পাওনাদার সে তার টাকা আদায় করিতে আসিয়াছিল। এই কথা বলিয়া ক্ষেপা যাহা দেখিয়াছিল বলিল।

বৃদ্ধা বলিল ঠিক তাই ওত আমার ছেলে নয় ও পাওনাদারই বটে বাবা; আমি এখন কি করব, কোথায় দাঁড়াব, আমার যে কেউ নেই। ক্ষেপা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল!

সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ।
তারও আছ তুমি আছে তব স্নেহ॥
নিরাশ্রয় জন পথ যার গৃহ।
সেও আছে তব ভবনে॥

ওরে মা তুই রাম রাম কর, তোর যে সে আছেরে; জগৎ জুড়ে তার ঘর, তুই তাঁকে ডাক, ঐ দেখ চেয়ে দেখ কেমন চোখ দুইটা।

বৃদ্ধা রাম রাম করা ব্রত গ্রহণ করিল। ক্ষেপা রাম রাম করিতে করিতে ছুটিল। শুধু আনন্দ—কেবল মঙ্গল "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।"

ক্ষেপা একদিন শ্মশান ঘাটে যাইয়া দেখিল ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে, চট্ পট্ করিয়া মাঝে মাঝে শব্দ হইতেছে, দাহকারিগণ এক একবার বাঁশের দ্বারা চুলাতে আঘাত করিতেছে, আর একটী পরমাসুন্দরী যুবতী সেই স্থানে পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। ক্ষেপা বুঝিল এই রমণীরই স্বামী মরিয়াছে। ক্ষেপার অভ্যস্ত জিহ্বা উচ্চারণ করিল "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" কি মঙ্গল জানিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষেপা রাম রাম করিতে করিতে অন্তরাকাশে উপস্থিত হইয়া, দেখিল একটী যুবক ম্লান বদনে দাঁড়াইয়া আছে আর একটী যুবতী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।

তোমার মত হাড় হাবাতের হাতে পড়ে আমার খোয়াবের সীমা নেই, না একখানা ভাল কাপড় না একখানা সেমিজ না এক শিশি এসেন্স না একখানা সাবান না একখানা গহনা কিছুই ত নেই, ছি ছি কোন সক আমার মিটল না। পেটে খাওয়া—এ বেনা খায়, শেয়াল কুকুরেও খায়। যুবক ব্যথিত কণ্ঠে বলিল দেখ আমি যা উপার্জ্জন করি সব তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করি তোমার জন্য আমার মা বাবা, ভাই, বোন কখন সুখী হয় নি, তোমার জন্য আমার সোনার সংসারে আগুন জ্বলে উঠেছে, সব চলে গেছে আর কেহ নাই শান্ত হও এস পবিত্র ভাবে ভগবানকে নিয়ে সংসার করি।

যুবতী আরও ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল মুখে আগুন মুখে আগুন অমন সোয়ামীর মুখে আগুন, বিয়ে করেছিলে কেন, বাপ মা নিয়ে থাক্‌লেই হ'ত। ভগবান ভগবান, বড় ভগবানওয়ালা হয়েছিস্; কৈ-তোর ভগবান আমায় গয়না কাপড় সাবান দিক্ দেখি, কেমন ভগবান। মর মর এমন সোয়ামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, সাত জন্ম রাঁড় হয়ে থাকা ভাল।

যুবক বলিল তথাস্তু তাই হবে সাত জন্ম তুমি বিধবা হয়ে থাক্‌বে যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে অমনি বিধবা হবে।

ক্ষেপার চমক ভাঙ্গিল! কোথায় যুবক কোথায় যুবতী চুলী খুব বেশী জ্বলিয়া উঠিল ক্ষেপা "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য বলিয়া নাচিতে লাগিল, ক্ষেপার অমঙ্গল হারাইয়া গিয়াছে. সে শুধু মঙ্গল দেখিতেছে, সব মঙ্গল সব মঙ্গল; রোগ মঙ্গল, শোক মঙ্গল, অর্থাভাব মঙ্গল, অর্থ স্বাচ্ছল্য মঙ্গল, মান মঙ্গল অপমান মঙ্গল, সুখ মঙ্গল, দুঃখ মঙ্গল, বিধবা মঙ্গল, সধবা মঙ্গল পুত্র মঙ্গল, কন্যা মঙ্গল কেবল মঙ্গল মঙ্গলময় ঠাকুরটি—কেবল মঙ্গল দিয়াই এ বিশ্ব গড়িয়াছেন। জয় মঙ্গলময় শ্রীভগবান! জয় ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ
(ডুমুর দহ)

আহ্বান।

(১)

ধীরে ধীরে শ্যাম সন্ধ্যা ছাইছে গগন।
জীবন প্রদীপ তোর নিভে পলে পলে।
কি আশে আছরে বসি ওরে মোর মন॥
নীরবে হতাশ হয়ে মরণের কোলে॥

(২)

পথভ্রান্ত পান্থ ওরে আর কত কাল।
পাগলের মত তুই ধাইবি বিপথে।
সবলে করিয়া ছিন্ন মহামোহ জাল॥
আয় আয় পথহারা আয় মোর সাথে॥

(৩)

অজানা অচেনা পথে যেতে হবে তোরে।
কি পাথেয় হেথাতুই করিলি অর্জ্জন।
দেবের দুর্লভ দেহ পেয়েছিলে যে রে॥
বৃথায় এ হেন জন্ম করিলি যাপন॥

(৪)

এখন (ও) উপায় আছে আয় ফিরে আয়।
এখন (ও) সাধিস্ যদি লভিবি কল্যাণ।
উঠরে জাগিয়া ত্বরা আরকি ঘুমায়॥
ওই শুন কি মধুর হরি নাম গান॥

(৫)

গাও গাও অবিরাম জয় সীতারাম।
রোগ-শোক দুঃখ-জ্বালা চলে যাবে দূরে।
অনায়াসে লভিবিরে সে পরম ধাম॥
জপ তুমি অনিবার হরে রাম হরে॥

(৬)

উঠিতে বসিতে বল রাম রাম রাম।
ভোজনে গমনে জপ শয়নে স্বপনে।
রবে না অপূর্ণ তব কোন মনস্কাম॥
বৈকুণ্ঠ আসিবে নামি তোমার ভবনে॥

(৭)

হেলা আর ক'রোনারে বেলা যায় বয়ে।
নামের আগুন তুমি জ্বাল চারিধারে।
একে একে তিন দেহ যা'ক্ ভস্ম হয়ে॥
গাওয়ে নিয়ত নাম সুমধুর স্বরে॥

(৮)

হইবে সার্থক জন্ম ধরায় তোমার।
কর যদি নিরবধি হরি নাম গান।
আসিবেন রঘুমণি ক'রতে উদ্ধার॥
আর (ও) কত পাপী-তাপী পাবে পরিত্রাণ॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ
(ডুমুরদহ)

নিশ্চিন্ত হইবে ?

ক্ষণকালের জন্যও ভার দিয়া দেখ নিশ্চিন্ত হওয়ার সুখ আপনিই অনুভব করিতে পারিবে। সে যে তোমার সব ভার লইতে প্রস্তুত তুমি দিয়াই দেখ। দিলে ত ? তবে আবার ভাবিবে কি বল ? কোন ভাবনা ত আর নাই। তোমার ইহকালের পরকালের সকল ভার সে লইয়াছে, তুমি তাহার হইয়াছ—এত বড় আশ্রয়ের শরণাপন্ন হইয়াছ দেখ দেখি তোমার মন কতই হালকা হইয়া যাইতেছে। তোমার বক্ষের একটা গুরুভার যেন এক মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। তোমার আর কর্ত্তব্য-শেষ নাই। তোমার সকল কর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন তুমি পূর্ণ মাত্রায় আপনি আপনি। আহা ! কত নিশ্চিন্ত তুমি ! কোন ভাবনা আর নাই। আপনাতে আপনি তুষ্ট।

বল দেখি এখন কি ভাবে জীবন কাটাইবে! শুধু স্মরণ—শুধু প্রার্থনা। নিত্যকর্ম্ম ত তাঁহার আজ্ঞা। নিত্য কর্ম্মে প্রার্থনা কর—সকল ব্যবহারিক কর্ম্ম—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নাম করিয়া করিয়া করিতে অভ্যাস কর, তাঁহার নাম করিয়া করিয়া—তাঁহাকে শুনাইয়া স্বাধ্যায় কর, যা দেখিবে, যাহা শুনিবে— তাঁহার নাম করিয়া দেখ শুন। প্রথম প্রথম কতই ত ভুল হইবে—হইল না বলিয়া ছাড়িয়া দিওনা, আবার কর, আবার কর, তাঁর কৃপায় তাঁর স্মরণ হইবেই, ইহাকেই জীবনের ব্রত করিয়া ফেল—তুমি রক্ষা পাইয়া গেলে। বলিও না—যে এতদিন করিতেছি আমার হইল না কেন ? আমি অমুকের মত ভাবে ডুবিয়া যাইতে ত পারিলাম না। পারিবে, ধৈর্য্য ধর। যে ডুবিয়াছে, সেই বহুদিন একান্তে থাকিয়াছে। একান্তে থাকার অভ্যাস কর, স্মরণ করিয়া করিয়া একান্তে থাক—কোন দলে মিশিওনা ইহাতে ক্ষণিক কিছু হইলেও—ইহা কিছুই নয়। ক্ষণিক কত কি ত হইল—কোন কিছু থাকিল কি ? থাকিবে না। একান্তে যে তার আস্বাদন তাহাই তাহাকে মিলাইতে পারে, তাহাই তোমাকে তাঁহাতে ডুবাইয়া রাখিতে পারে। একটি, একটিমাত্র সঙ্কল্প, লোক সঙ্কল্প উঠিলে সে সরিয়া যায়—এত লোক সঙ্গে—এত দল সঙ্গে সে থাকিতেই পারে না—একান্তেই সঙ্গ হয়—বহু সঙ্গে সে থাকে না। একান্তে থাকা অভ্যাস কর—যাহা সময় পাও—তার মধ্যেই একান্ত করিয়া

নেও—আর যদি তোমার কর্ম্মফলে বহুপ্রকারে লোক সঙ্গে জড়াইয়া থাক তবে তোমার—আর বলায় লাভ নাই—আপনিই বুঝিয়া লইও।

কিন্তু একটি কথা। তুমি রাজা—বসুধাধিপ রাজ চক্রবর্ত্তী। তুমি রাজরাজেশ্বর—তুমি রাজরাজেশ্বরী। আর আমি—আমি দরিদ্র—আমি ভিখারী - আমি দীন হীন কাঙ্গাল। আমি তোমার মন্দিরের দ্বারে পথে দাঁড়াইয়া থাকি। কতলোক ভিতরে যায়—আমি যাইতে পারি না—আমি পথে দাঁড়াইয়া—তোমার মন্দিরের দিকে চাহিয়া থাকি।

হায় আমি—রাজরাজেশ্বকে—রাজরাজেশ্বরীকে এত আপনার ভাবি কিরূপে ? দরিদ্র ভিখারী—এই পরমারাধ্য পরমদেবতাকে—এই মহতোমহিয়ানকে—অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এত বড় তুমিকে—তুমি বলে কিরূপে ? সম্রাটকে অতি দীন প্রজা কি তুমি বলিতে পারে ?

"হরি ! হরি ! ইহাইত তোমার অপূর্ব্ব স্বভাব। অতি ক্ষুদ্রেরও যেমন তুমি আপনার হইতেও আপনার অতি মহতের তুমি সেইরূপ। তুমি যে আত্মা হইয়া সকলের মধ্যে সমান ভাবে আছ। আহা ! কি স্বভাব তোমার ?

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" তোমার যে আত্মপর নাই—যে তোমার শরণাগত হয়—পাপী হউক, কাঙ্গাল হউক, দীন হউক, দরিদ্র হউক—শরণাগত হইলেই যে তুমি তাহাকে আত্মভাব দান কর—এমন দাতা আর কে আছে ? যে, যে ভাবে তোমাকে ভজনা করে তারে যে তুমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ কর।

তুমি যে"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" সকল লোকের উপকারক, কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া—কোন কিছুর প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সকল লোকের উপকার কর। তুমিই যে বলিতেছ "নহি কল্যাণ কৃত কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি" শরণাপন্ন হইয়া তোমার আজ্ঞা পালনরূপ শুভ কর্ম্ম যে করে সে লোক কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। আহা ! তুমিই না বলিতেছ "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি" আমি ভিন্ন জগতের সৃষ্টি সংহার পালনের কর্ত্তা কেহই নাই। আর পাপ যে ছাড়িবার জন্য প্রাণপণ করে, তোমার আজ্ঞা পালনরূপ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যে পাপক্ষয় করে সেই তোমার শরণে আইসে—সেই দৃঢ় নিয়ম করিয়া তোমাকেই ভজন করে।

আহা ! কাতর হইলেইত আর চিত্ত অন্য কিছু লইয়া থাকিতে চায় না—অন্য কোথাও যাইতে পারে না—সর্ব্বদা তোমাকেই স্মরণ করিতে পারে।

প্রাণকে কাতর করিতে পারিলেই ত শরণ লওয়া হয়—স্মরণ হয়—ইহাই ত ভক্তি। সে ত "ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া" সবই তুমি—আমিও তুমি ইহা জানাই ভক্তি—ইহাই জ্ঞান—অন্য কিছুতেই ত তোমাকে পাওয়া যায় না। আহা! তুমিই বলিতেছ—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজামব্যয়ম্॥ তুমিই এই জগতের পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই ধাতা—পালনকর্ত্তা, তুমিই পিতামহ, তুমিই জগতের গতি, তুমিই পোষণকর্ত্তা, তুমিই নিয়ন্তা, তুমিই শুভাশুভদ্রষ্টা, তুমিই আশ্রয়, তুমিই রক্ষক—প্রপন্নার্ত্তিহর, সুহৃদ, স্রষ্টা, সংহারকর্ত্তা, আধার লয় স্থান এবং বীজ অথচ স্বয়ং অবিনাশী অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া যে শুধু তোমারই চিন্তা করে সেই নিত্যযুক্ত জনের যোগ ও ক্ষেম তুমিই বহন কর। এমন আর কোথায়—যে যা পারে পত্রপুষ্প ফল জল ভক্তিপূর্ব্বক যে তোমাকে দেয় তাই তুমি গ্রহণ কর। তোমার ভক্ত যাঁরা তাঁদের ত বিনাশ নাই। সকলেই তোমার চক্ষে সমান—তোমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই—অতি অসাধুও যদি শরণ লয়, আচার ভ্রষ্ট, ব্যবহার ভ্রষ্ট অতি নিকৃষ্ট জন্মাও যদি কাতর হইয়া আশ্রয় লয় তুমি কাহাকেও উপেক্ষা কর না—যে দুঃখীকে মানুষ ঘৃণা করে তুমি কিন্তু কাঙ্গাল দেখিলে পায়ে ঠেল না। হরি! হরি! এমন তুমি আমার আত্মা—সবার আত্মা—সর্ব্বহৃদিস্থ—তাই তোমাকে তুমি বলিতেও ভয় হয় না আপনিও বলা চলে। প্রভু শুধু প্রণাম—আর কি বলিব?

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)।

জন্মাষ্টমী

(১)

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, আজ আসে মনে
দূর অতীতের স্মৃতি, মথুরার বনে
নন্দনসুষমা একি, পারিজাত বাস,
ক্ষণতরে ফুটে ওঠে শতচন্দ্রহাস !

(২)

সেদিনো এমনি মেঘে মেদুর অম্বর,
এই অবিরাম বৃষ্টি ধারা ঝর ঝর,
দিক বধূদের স্বচ্ছ আনন কমল
এমনি ঢাকিয়াছিল আঁধার অঞ্চল।

(৩)

কদম্বতমালনীল যমুনার জল,
একে কৃষ্ণ, তায় ঘন আঁধার তরল
মিশিয়া করেছে যেন আরো কৃষ্ণতর,
খরবেগ, ঊর্ম্মিভ্রমিগ্রাহ ভয়ঙ্কর।

(৪)

কে গো যায় এ নিশীথে একা ধীরে ধীরে,
ক্রোড়েতে অপূর্ব্ব শিশু, চাহে ফিরে ফিরে,
বদনে বিষাদ-ভীতি-উদ্বেগ-লক্ষণ,
দ্রুতগতি রুদ্ধ করে বাধা অনুক্ষণ।

(৫)

দুপা যায়, থামে পুন, পথ সে হারায়,
ক্ষণিক স্ফুরণে পথ তড়িত দেখায়,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কড় কড় রবে
গর্জ্জে বজ্র ঘন, ভাবে উপায় কি হবে।

(৬)

কি চিত্র, যমুনামধ্যে শিবা! হৃষ্টমনে
হয় নদীপার, হায় সূর্য্যজাজীবনে
ক্রোড়ভ্রষ্ট শিশু হেরি কাঁদে ক্ষিপ্তপ্রায়,
বুকে লয়ে সাবধানে চলে পুনরায়।

(৭)

সঁপিয়া বুকের ধন গন্ধে, শূন্যচিতে
ফিরে সে, নিবিড় শোক বেদনা সহিতে,
যাপিতে যন্ত্রণাদীর্ঘ নিশা নিরাশায়,
জ্বলিতে দুশ্চিন্তা-শত-বৃশ্চিক জ্বালায়।

(৮)

স্বপনে দরিদ্র দীন লভে রত্নহার,
উদ্বেল উদ্দামবেশ হর্ষ পারাবার,
কি উল্লাস কলরোল আনন্দ অতুল,
কি উৎসব আয়োজন, গোকুল আকুল।

(৯)

ভুবনমোহন শিশু! তোমার লাগিয়া
পাগল বিশ্বের চিত্ত, শুধু পিতৃ-হিয়া
একা নহে উচাটন, করেছ আপন,
বেঁধেছ সকলে দৃঢ়, কি প্রেম-বন্ধন।

(১০)

অন্তর-অন্তরতম তুমি অন্তর্যামী,
কি না জান? সর্ব্বশক্তি ধর বিশ্বস্বামী,
খুলিলে কারার দ্বার, করিলে নিদ্রায়
অজ্ঞান প্রহরিগণে, আপন মায়ায়।

(১১)

হে বৃষ্ণিকুলাবতংস কংসধ্বংসকারী,
অধর্ম্মনাগেরে বাঁধ, ধর্ম্ম-চক্রধারী,
জগৎ ভাসিল পাপ-প্রবল বন্যায়,
করিলে জীবন্ত দীপ্ত লুপ্ত ধর্ম্মন্যায়।

(১২)

সংসার কারার দ্বার মম খুলে যাবে
হে চিরদয়িত কবে? কবে দেখা পাবে
রূপসিন্ধু! ক্ষুদ্র এক জ্যোতিকণিকার?
কবে হবে সর্ব্বভুক্ নিবৃত্তি ক্ষুধার?

(১৩)

সপ্তস্বর নিনাদিত প্রণব ঝঙ্কারে
মুখরিত বংশীধ্বনি সুধাবৃষ্টিধারে
ভুবন ভরিয়া উঠে, হৃদয়বীণার
কবেগো বাজিবে মোর সুরহারা তার?

অধ্যাপক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, এম-এ।
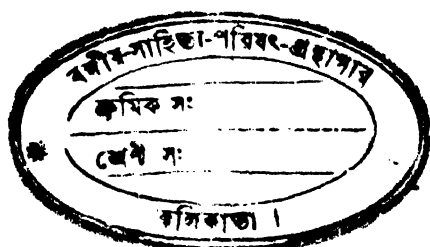
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল আরতি।

জয়তি, জয়তি, জয়ব্রজ বৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি;
শ্রীনন্দনন্দন, প্রেমবিনোদন, নীলেন্দীবরঘন, শ্যামল জ্যোতি। ১।
জয়তি জয়তি, জয় ব্রজবৃন্দাবনপতি মঙ্গল আরতি;
ফুল্ল কমলপর, হাস মনোহর, পীতাম্বরধর, সুন্দর মুরতি। ২।
জয়তি জয়তি, জয় ব্রজবৃন্দাবনপতি মঙ্গল আরতি;
ব্রহ্মসনাতন, বৃন্দাবনধন, ব্রজজনপালন, খিলশান্তমতি। ৩।
জয়তি জয়তি, জয়ব্রজ বৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি;
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশোৎপল, অঙ্কিত চরণতল, সহস্রদলকমল, পরে রাজতি। ৪।
জয়তি জয়তি, জয় ব্রজবৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি;
বেণুবাদন পর, রাসরসিকবর, নাটনটনকর, কাম মোহতি। ৫।
জয়তি জয়তি, জয়ব্রজবৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি;
শ্রীরাধারমণ মন, মোহন মোহন, কন্দর্প দর্প দমন, রাস রসতি। ৬।
জয়তি জয়তি, জয়ব্রজবৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি;
জয় মাধব-কেশব, গোকুলবান্ধব, গোপীজনবল্লভ, জয় জয়তি। ৭।
জয়তি জয়তি, জয়ব্রজবৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি;
দাস নৃসিংহগান, দেহিচরণে স্থান, অন্তকালেতে মাম্, শরণাংগতি। ৮।
জয়তি জয়তি, জয় ব্রজবৃন্দাবনপতি, মঙ্গল আরতি॥

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

মরণ-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাপ্তেন ফেড্রিক ম্যারিয়েট এবং স্যামুয়েল ইহারা দুই সহোদর। এই দুই সহোদরে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। ম্যারিয়েট যৎকালে ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া পুলুপিনাং (Pulu Pinang) দ্বীপের নিকটে সমুদ্রে একখানি জাহাজের একটি কক্ষে থাকিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার কক্ষের দ্বার খুলিয়া যায় এবং তিনি তাঁহার ভ্রাতা স্যামুয়েল, যিনি তৎকালে ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাকে ঐ কক্ষদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে দেখিতে পান। আরও দেখেন যে স্যামুয়েল শনৈঃ শনৈঃ তাহার নিকটস্থ হইল এবং বলিল "ম্যারিয়েট! আমি তোমায় বলিতে আসিয়াছি যে আমি মরিয়া গিয়াছি।" ঐ আকার যখন ম্যারিয়েটের নিকটস্থ হয় তখন ম্যারিয়েট মনে করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি তাঁহার দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় যথাযথ আকার দর্শন করিয়াও তদ্রূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যখন তিনি শয্যাত্যাগ করেন ও তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হন, তখন সেই আকারের আর কুত্রাপি দেখা পান নাই। কিয়দ্দিবস পরে তিনি ইংলণ্ড প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন যে যৎকালে জাহাজের কক্ষে তিনি স্যামুয়েলের আকার দেখেন, ইংলণ্ডে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্যামুয়েল দেহত্যাগ করিয়াছিলেন (১)

---

(১) "—he saw the door of his cabin open and his brother Samuel enterd and walked quietly up to his side. He looked just the same as when they had parted and uttered in a perfectly distinct voice, "Fred! I have come to tell you that I am dead." When the figure entered the Cabin my father jumped up in his berth thinking it was some one coming to rob him, and when he saw who it was and heard it speak, he leaped out of his bed with the intention of detaining it, but it was gone. So vivid was the impression made upon him by the

"স্বতন্ত্র জগতে পদবিক্ষেপ" নামক গ্রন্থ হইতে একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তঃ—কর্ণেল হ্যাথান উইলসন, জগদ্বিখ্যাত ডিউক অফ ওয়েলিংটনের অধীনে ভারতের সৈন্য বিভাগে বহু দিবস কর্ম্ম করিয়াছিলেন। মুনসিওর ডুবো নামক জনৈক যাজকের সহিত কর্ণেল উইলসনের পরম সখ্যতা ছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে টিলিচারি নামক স্থানে যাজক ডুবো পীড়িত হন। সেই সময়ে ভেলোরে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য কর্ণেল উইলসনকে ঐ স্থানে দ্রুতবেগে যাইতে হয়। তিনি তথায় গমন করিয়া সহরের সম্মুখে এক বিস্তৃত ময়দানে শিবির সংস্থাপন করেন। উহা উষ্ণপ্রধান স্থান, সুতরাং কর্ণেল উইলসন রাত্রিতে কেবলমাত্র একটি জামা গায়ে দিয়া তাম্বুর ভিতরে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। তদবস্থায় তাম্বুর প্রবেশদ্বারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দেখিলেন দ্বারদেশের পরদা তুলিয়া তাঁহার বন্ধু যাজক ডুবো প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ মলিন ও ঔৎসুক্যযুক্ত, মুখে কথা নাই। তিনি তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না, পরদা পড়িয়া গেল এবং ঐ আকারের অন্তর্দ্ধান হইল। কর্ণেল উইলসন দ্রুতবেগে শয্যাত্যাগ করিয়া তাম্বু হইতে বাহির হইয়া দৌড়াইলেন। তখন পর্য্যন্ত ঐ আকার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; ক্রমে উহা তাম্বু অতিক্রম করিয়া ময়দানের দিকে যাইতেছিল। উইলসন এতবেগে দৌড়াইয়াছিলেন যে তাঁহার সহকর্ম্মী-গণ অধীনস্থ প্রহরীগণের দ্বারা সংবাদ পাইয়া যখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিল তাঁহাদের বহুকষ্টে তাহাকে ধরিতে হইয়াছিল। ঐ প্রেতছায়া কেবল মাত্র ক্যাপ্তেন উইলসনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, অপর কোন সৈনিকপুরুষের

...tion that he drew out his log at once and wrote down all the particulars concerning it with the hour and day of its appearance. On reaching England after the war was over the first despatches put into his hand were to announce the death of his brother, who had passed away at the very hour when he had seen him in the Cabin."

"There is no Death"

By Florence Marryat.

দৃষ্টিতে পড়ে নাই। সে জন্য সকলে মনে করিয়াছিলেন যে দারুণ শ্রমের জন্য উইলসন সাহেবের মস্তিষ্কের বিকার জন্মিয়াছে। ইহা মনে করিয়া সৈনিক বিভাগের ডাক্তারের দ্বারা তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করা হয়। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কিছুমাত্র দোষ পান নাই।

এই সময় হইতে কর্ণেল উইলসনের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, তাঁহার বন্ধু পাদরী ডুবো মরিয়া গিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথা স্থির ছিল যে যিনি অগ্রে মরিবেন তিনি অপরকে প্রেতদেহ ধারণ করিয়া দেখা দিবেন। এই জন্য যে সময় পাদরী ডুবোকে তিনি দেখিতে পান ঠিক সেই সময়টী লিখিয়া রাখিবার আদেশ দেন। পরে টিলিচারিতে যে সকল পত্র আসে তাহাতে প্রকাশ পায়, যে যে সময়ে ডুবো উইলসন সাহেবকে দেখা দেন, ঠিক সেই সময় ডুবোর মৃত্যু হইয়াছিল। (২)

---

(২) Col Nathan Wilson served many years in India under Sir Arthur Wellesly. Monsieur Dubois a priest and Wilson were friends.

"In July 1811 the priest fell ill at Tellichery. At the same time a mutiny having broken out at Vellore, Col Wilson was summoned thither, and proceeding by forced marches encamped on an extensive plain before the town. The night was sultry; and Col Wilson, arrayed as is common in that climate, in Shirt, sought repose on a couch within his tent; but in vain. Unable to sleep, his attention was suddenly attracted in the entrance of his tent; he saw the purdah raised and the priest Dubois present himself. The pale face and earnest demeanour of his friend, who stood silent and motionless, riveted his attention. He called him by name but without reply; the purdah fell and the figure disappeared.

The Col sprang up and hastily rushed from the tent. The appearence was still in sight gliding through the camp and

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া সার চার্লস প্যারি হবহাউসের সহিত একত্রে "হিন্দুস্থান" নামক জাহাজে ভারত যাত্রাকালীন তাঁহার আত্মীয় কাপ্তেন বেঞ্জামিন হবহাউস সম্বন্ধে যে একটি প্রকৃত ঘটনার কথা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

কাপ্তেন বেনজামিন হবহাউসের ওয়াটারলু মহাসমরে মৃত্যু হয়। ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ হবহাউসের সহিত একত্রে পেনিনসিউলায় সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। সেই স্থানেই নিম্নোলিখিত ঘটনা ঘটে। এক দিন লর্ড হার্ডিঞ্জ হবহাউস এবং অপর এক বন্ধু তাম্বুর কিঞ্চিৎ দূরে সকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বন্ধুটি আহারের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কার্য্যানুরোধে দুই মাইল দূরে গিয়াছিলেন। সেই জন্য আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার অপেক্ষায় উভয়ের মধ্যস্থানে একখানি চেয়ার খালি রাখা হইয়াছিল। বন্ধুটি আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া হার্ডিঞ্জ ও হবহাউস আহার করিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুটি

---

making for the plain beyond. Col Wilson hastened after it and at so rapid a pace that when his brother officers, roused by the sentries, went in persuit of him, it was with difficulty that he was overtaken. The apparition having been seen by Captain Wilson only, his comrades, concluded that it was the effect of slight delerium produced by fatigue. But when the surgeon of the Regiment felt the col's pulse, he declared that it beat steadily without acceleration.

Col Wilson felt assured that he had received an intimation of the death of his friend missionary, who had repeatedly promised in case he died first to appear to him as a spirit. He requested his brother officers to note the time. They did so; and when subsequent letters from Tellichery announced the decease of Dubois, it was found that he died at the very hour when his likeness appeared to his friend."

Foot falls on the boundery of another World by Robert Dale Owen.

আসিয়া, ঐ খালি চেয়ারে অল্পক্ষণের জন্য বসিয়াই চলিয়া যান। কিয়ৎক্ষণ পরে সংবাদ আসিল যে, যে সময়ে উভয়ে বন্ধুটিকে চেয়ারে বসিতে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দুই মাইল দূরে বন্ধুটি গুলির আঘাতে মারা গিয়াছেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ এই ঘটনার কথা বলিবার কালে বলেন যে তিনি চান যে তাঁহার এই গল্পটি যেন সকলেই বিশ্বাস করেন। কারণ জ্ঞাতসারে তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। (৩)

আমরা উপরে বলিয়াছি যে আতিবাহিক দেহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা জ্ঞাত আছি, অধিকাংশ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই। তন্মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহাশয় একজন। তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জনার্দ্দনপুর। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অধিকাংশ সময়েই জনার্দ্দনপুরে বাস করিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রামদয়ালবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদস্কলার স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার ও অপরাপর আত্মীয়গণ সহ কলিকাতায় পটলডাঙ্গার অন্তর্গত পঞ্চানন তলার গলিতে একটি বাটীতে বাস করিতেন। রামদয়াল বাবু ১৮৮০ সালে সহসা এক দিবস অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া যান। তাঁহাকে তদ্‌ভাবাপন্ন দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলকণ্ঠ বাবু তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করেন। পরে

---

(৩) "One day Lord Hardinge, Hobhouse and a friend of theirs were all three on outpost duty. Their friend was about two miles from where they were having luncheon but they kept a chair for him. As he did not come the two men began their luncheon without him. In the middle of it he came in, sat down and immediatly got up and went out again. It afterwards turned out that the man they thought they saw sit down at table with them was at that moment shot dead at his post two miles off. Lord Hardinge in telling the story said "I demand that people shall believe me, for I have never to my knowledge uttered an untruth."

জিজ্ঞাসা করেন "তোমার কি হইয়াছিল ?" তদুত্তরে রামদয়াল বাবু বলেন যে পিতামহাশয় আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "রামদয়াল আমি দেহত্যাগ করিলাম।" এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে তারে সংবাদ আসে যে ঈশান বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে ঈশান বাবুর মৃত্যু হয় ঠিক সেই সময়েই রামদয়াল বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় তাঁহার আকারে দেখিতে পান ও তাঁহার দেহত্যাগ হইল বুঝিতে পারেন ও হতচেতন হন। (ক্রমশঃ)

শ্রী[illegible]ানন্দ দেবশর্ম্মা (রায় চৌধুরী) ৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

———

শ্রীগোপালস্তোত্র।

নবঘন-অভিরাম, কোমল সুন্দর শ্যাম
নিন্দি নীল ইন্দীবর নয়নের আভা।
গোপিকানন্দন কৃষ্ণ, অবনীতে অবতীর্ণ,
শ্রীগোপালরূপে, বন্দি ভক্তমনোলোভা ॥ ১

স্ফুরয়ে বিমলদ্যুতি, শিরে শিখিপুচ্ছভাতি,
সুনীলকুঞ্চিতকেশ সনে তার খেলা।
কদম্বকুসুমে গাঁথা, চিত্রপুষ্পপত্রযুতা,
আনন্দহিল্লোলে গলে দোলে বনমালা ॥ ২

হরষে চঞ্চলগতি কাঞ্চনকুণ্ডলজ্যোতি,
নীলাভগণ্ডের পাশে সাজিয়াছে ভালো।
সুবৃহৎমুক্তাফলভার, উজ্জ্বল বিমল হার,
শ্যামল বিশাল বক্ষ করিয়াছে আলো ॥ ৩

স্বর্ণাঙ্গদ বাহু'পরে কাঞ্চন কিরীট শিরে,
সোনার নূপুর পদে, ঝলমল শোভা।

মন্দানিল হিল্লোলে, পৃষ্ঠবাস মৃদু দোলে,
ঝম্পে অঙ্গে পীতাম্বর, তরলিত প্রভা ॥ ৪
বিম্বরুচি ওষ্ঠমাঝে, মোহনমুরলী রাজে,
তা'র সুধাসুমধুর কলধ্বনি দিয়া।
গোপীর বিহ্বল চিত, মুগ্ধ করে অবিরত,
প্রেমভরে মুহুর্মুহুঃ আকর্ষয়ে হিয়া ॥ ৫
আভীরীমুখারবিন্দ, সুমধুর মকরন্দ,
পানে মত্ত মধুকর হেন শ্যামচাঁদ।
তাহাদের মনঃক্ষোভ, ঘটায়ে, বাড়ায়ে লোভ,
পাতিয়াছে মৃদুহাস্য কটাক্ষের ফাঁদ ॥ ৬
যৌবনতরঙ্গভঙ্গ, প্লাবিত ললিত অঙ্গ,
গোপাঙ্গনা লীলারঙ্গে ধরি' হাতে হাতে।
বসনে বর্ণের মেলা, ভূষণে ছটার খেলা,
তারা যেন চন্দ্রে ঘেরি' আছে চারিভিতে ॥ ৭
দলিত অঞ্জনবর্ণ কালিন্দীর জলে কৃষ্ণ,
কেলিকলাকৌতুকের তরে সমুৎসুক।
কভু গোপশিশুসাথী, ক্রীড়াযুদ্ধে মাতামাতি,
কখন গোধনে বনে ডাকার ভাবুক ॥ ৮
যমুনাতরঙ্গ-কণ, মাখা মৃদুসমীরণ,
শিহরিতস্নিগ্ধঘন শীতলপল্লব।
কল্প তরুর ছায়ে, চরণে চরণ থু'য়ে,
বৃন্দাবনে কখন বা শ্রীগোপীবল্লভ ॥ ৯
রত্নগিরি সুমেরুর, শিখরেতে সুমধুর,
রত্নসিংহাসনে কভু রত্নবেদী' পরে।
সহস্রার পদ্মতলে ঊর্দ্ধে কল্পতরুমূলে,
সুবর্ণমণ্ডপ মাঝে কভু সুধা ঝরে ॥ ১০
বিচিত্র সৌরভময়, বসন্ত কুসুমচয়,
সুরভিত দশদিক্ যথা নিরন্তর।
সেই রম্য গোবর্দ্ধনে, প্রেমমুগ্ধ গোপীসনে,
কভু রাসরসলীলারসিক নাগর ॥ ১১

বাম করতলে কভু, গিরিবর ধরি প্রভু,
মস্তকে ছত্রের শোভা করেন বিস্তার।
গর্জ্জি' যবে অপমানে, ইন্দ্র রোষে বজ্রহানে,
ঘোর-ঘনঘটাসহ ঢালে জলধার ॥ ১২

বেণুর মধুর রবে, মহোল্লাসে মাতি' সবে,
হাম্বা হাম্বা শব্দ করি ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়।
বৎস সহ ধেনু যত, করি' শির সমুন্নত,
শ্যাম মুখ ইন্দুপানে ঘন ঘন চায় ॥ ১৩

কৃষ্ণগুণ অনুগান, ভিন্ন নাহি জানে আন,
কৃষ্ণের কর্ম্মের ধারা সদা অনুগত।
গোরজ্জু পাঁচনি হাতে, মহানন্দে ফিরে সাথে,
গোপাল-বালকবৃন্দ প্রাণসখা যত ॥ ১৪

অঙ্গসহ বেদরাশি, পারদ্রষ্টা মুনি ঋষি,
নারদাদি ভক্তশ্রেষ্ঠ, যোগিজন আর।
সপ্রেম গদ্গদবাণী, স্তব করে যাঁরে জানি,
সেই পরাৎপর কৃষ্ণে নমি বারবার ॥ ১৫

এইরূপে যেইজন, ধ্যায় কৃষ্ণে একমন,
তিনসন্ধ্যা স্তোত্রপাঠ করে ভক্তিভরে।
ভক্তের পরম ধন, সচ্চিৎ আনন্দঘন,
তুষ্ট হ'য়ে অভিপ্সিত বর দেন তারে ॥ ১৬

নৃপতির কৃপাপাত্র, হয় নিত্যপাঠ মাত্র,
ধরাতলে সর্ব্বজনে তারে ভালবাসে।
কমলা তাহার ঘরে, অচলা বিরাজ করে,
বৃহস্পতি সম তার বাগ্মিতা প্রকাশে ॥ ১৭

গৌতমীয় তন্ত্রমাঝে, এই স্তোত্র মন্ত্র রাজে,
অনুষ্টুভে "নবীন-নীরদ" আদি করি'।
সহজ বোধের তরে, বঙ্গ-অনুবাদ করে,
একজন কৃষ্ণ কৃপা কটাক্ষ ভিখারী ॥ ১৮। ইতি

শ্রীঅভয় পদ চট্টোপাধ্যায়, এম এ
বর্দ্ধমান কলেজের প্রফেসার।

পরলোক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রাদ্ধ।)

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ লিখিত।

শ্রাদ্ধ হিন্দুদিগের অতি আবশ্যকীয় ক্রিয়া। পিত্রাদির উদ্দেশে পুত্রাদির শ্রাদ্ধক্রিয়া অবশ্যপালনীয় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কার্য্য। এই কার্য্য অতিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া করিতে হয়।

শাস্ত্র বলেন,—

শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।

(পুলস্ত)।

পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে দেওয়া যায়, এ জন্য সেই ক্রিয়ার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্ব্বক না করিলে এ কার্য্যের দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। শ্রাদ্ধ দ্বারা পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের কোন উপকার হয় কি না, এ প্রশ্ন আজ নূতন নহে।

গরুড় পুরাণে উত্তর খণ্ডে একাদশ অধ্যায়ে গরুড় শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কথং কব্যানি দত্তানি হব্যানি চ জনৈরিহ।
গচ্ছন্তি পিতৃলোকং বা প্রাপকঃ কোঽত্র গদ্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধমাপ্যায়নং যতঃ।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য তেন সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাম্॥
মৃতাশ্চ পুরুষাঃ স্বামিন্ স্বকর্ম্মজনিতাং গতিম্।
গাহন্তিকে কথং সম্য স্তুতস্য শ্রেয় আপ্নয়ু॥ ৮।৯।১০

গরুড় কহিলেন যে, প্রভো! ইহলোকে জনগণ প্রদত্ত হব্যকব্যাদি পিতৃলোকে যায় কিরূপে? উহা কে লইয়া যায়? নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈলদানে

তাহার শিখাবৃদ্ধির ন্যায় শ্রাদ্ধদ্বারা মৃত মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন নিতান্ত অসম্ভব। মৃত মনুষ্যগণ নিজ নিজ কার্য্যানুসারে গতিলাভ করে, সুতরাং পুত্রের কৃতকর্ম্মের ফলে পিতার সুখ হইবে কিরূপে?

"মরা গরুতে ঘাস খায় না" ইহাও এই কথার প্রতিধ্বনি মাত্র।

শ্রাদ্ধের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে দুইটী বিষয় বুঝিতে হইবে।

(১) শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য (২) শ্রাদ্ধের উপকারিতা।

(১) শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রাদ্ধ ও তর্পণের অপর নাম পিতৃযজ্ঞ; ইহা পঞ্চ মহাযজ্ঞের একটী আবশ্যকীয় অঙ্গ। পরলোকগত পিত্রাদির মঙ্গলের জন্য যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। শ্রাদ্ধ অন্নদান এবং তর্পণ জলদান।

যে পিতামাতার প্রসাদে আমরা বিশ্বসংসারে আসিয়াছি এবং যাঁহাদের স্নেহ ও কৃপায় আমরা বর্দ্ধিত হইয়াছি, তাহাদের অপরিসীম ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য সন্তানের নাই; তথাপি তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার সাহায্যার্থ শাস্ত্র শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃলোকের প্রেতত্ব মোচন ও তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে; জীব প্রেতদেহে অবস্থানকালে যাতনা উপভোগ করে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াদ্বারা ঐ যাতনাময় দেহ নষ্ট হইয়া যায় এবং জীবকে ভোগ-দেহ ধারণ করার যোগ্যতা প্রদান করে। জীবের প্রেতত্ব সাধারণতঃ মৃত্যুর পর হইতে বৎসরকালব্যাপী, যতদিন ষোড়শ শ্রাদ্ধ হইয়া সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন প্রেতদেহে থাকিতে হয়, এজন্য আদ্যশ্রাদ্ধাদিতে প্রেতশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎপরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগ দেহং প্রপদ্যতে॥

তিথিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচন।

সপিণ্ডী করণের দ্বারা এই বৎসরকালস্থায়ী প্রেতদেহের নাশ হইলে জীবের ভোগদেহ [illegible] আর্য্যদিগের ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার মন্ত্রাবলীর প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, অগ্নিকার্য্য ও শ্রাদ্ধাদির সমস্ত ক্রিয়া মৃতব্যক্তির দিব্যলোক প্রাপ্তির কামনায় সাধিত হয়।

"দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু" মন্ত্রে অগ্নি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

কৃত্বাতু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ সগচ্ছতু॥

আর দুই একটী মন্ত্রের উল্লেখ করিলেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তি উৎপাদন ও যন্ত্রণার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা বিশদভাবে প্রতীয়মান হইবে।

অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরনার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥

যাঁহারা দুঃখময় প্রেতলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার যাতনা পাইতেছেন, তাঁহাদের উদ্ধার সাধনমানসে এই পিণ্ড প্রদান করিলাব।

যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥

পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যেন এই পিণ্ডদানের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন।

আর্য্যগণ, প্রেতলোক ভিন্ন অন্যান্যলোকে যাঁহারা গমন করিয়াছেন, কি যাঁহারা জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্যও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। পিতৃষোড়শী, মাতৃষোড়শী ও স্ত্রীষোড়শীর মন্ত্রগুলিই ইহার প্রমাণ। মন্ত্রগুলি অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। নিম্নে একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল।

"আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা
মাতুস্তব বংশভব মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত সেবকাশ্চ॥

মিত্রাণি সর্ব্বে পশবশ্চ বৃক্ষা
দৃষ্টাহ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ
তাভ্য স্বধা পিণ্ডমহং দদামি॥”

এই সৃষ্টিরাজ্যে আমার পিতৃমাতৃকুলে যাঁহারা গত হইয়াছেন; এই দুই কুলে যাহারা দাস, আশ্রিত, সেবক কিম্বা ভৃত্য ছিল; যে সকল পশু ও বৃক্ষ আমার মিত্র ছিল; যাহারা প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে উপকারী ছিল কিম্বা যাহাদের সহিত জন্মজন্মান্তরে আমার সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি পিণ্ডদান করিতেছি।

আর্য্যদিগের অপার করুণা সকলের জন্যই প্রসারিত। দাসদাসী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, যাহারা জন্মজন্মান্তরে কোনরূপ উপকার করিয়াছিল, তাহাদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস; কি সুন্দর ও মহান্ আদর্শ!

এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধাদিদ্বারা যেমন পিতৃলোকের উপকার হয়, তদ্রূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তারও পিতৃমাতৃভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তির উত্তেজনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পিতৃপুরুষের তুষ্টিদ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। পিতৃপুরুষদের স্মরণ ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা যে চিত্তে মহান্ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অতীতের স্মৃতি মানুষের ধর্ম্মপথের সহায়।

(২) শ্রাদ্ধের উপকারিতা।

গরুড়ের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—“হে গরুড়! শ্রুতিই এ সম্বন্ধে বলবত্তর প্রমাণ। শ্রুতির নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিলে লোক পরলোকে সুখী হয়। শ্রাদ্ধে উচ্চারিত পিতৃলোকের নাম গোত্র ও ভক্তি সহকারে পঠিত মন্ত্রই শ্রাদ্ধীয় হব্য কব্য পরলোকগত জীবকে প্রাপ্ত করায়। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ এই কার্য্যের জন্য ব্যবস্থিত আছেন। যাহার উদ্দেশে যোগ্যকালে নামগোত্র ও মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা কিছু প্রদান করা হয়, তাঁহারা সেই উদ্দিষ্ট প্রাণী যেখানে আছে, সেইখানে প্রেরণ করেন। জীব যেখানেই থাকুক তাহারা সে জন্মে সে দ্রব্যভোজী হয়। শ্রাদ্ধীয়ান্নও তদাকারে তাহার নিকট উপস্থিত হয়।”

কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা, আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য এ বিষয়ে আমাদের সহায়। যথাসম্ভব যুক্তি

প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইবে, তবে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যুক্তি তর্কের প্রসার অতি কম। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে অন্য লোকের সংবাদ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, একথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

শ্রাদ্ধব্যাপার স্থূল ও সূক্ষ্মরাজ্যের সম্মিলন ক্ষেত্র; বিশেষ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। যে যত নিকট সম্পর্কিত, শক্তি সঞ্চালন সম্বন্ধে তাহার তত যোগ্যতা। শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে শাস্ত্রে অধিকারী নির্ব্বাচন আছে। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" নিজ আত্মশক্তিই পুত্ররূপে জাত; সুতরাং পুত্র প্রথম ও প্রকৃষ্ট অধিকারী। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন :—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্।"

পুত্রের জন্যই ভার্য্যাগ্রহণ, এবং পারলৌকিক মঙ্গলবিধান জন্যই পুত্রের আবশ্যক।

শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ততা লাভ করার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়। মন, মন্ত্র ও দ্রব্য, এই তিনটী বিষয়ের প্রতি শ্রাদ্ধকর্ত্তার বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনকে সংযত ও বিশুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য কতকগুলি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রকৃতিভেদে অনুষ্ঠানের তারতম্য আছে। যাহাতে মন ভূর্লোক হইতে ভুবর্লোকে শক্তিসঞ্চালন করিতে পারে, তাহাকে সেই ভাবে গঠিত ও শক্তিসম্পন্ন করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আর একদিন সাধুবাবার নিকট কৈলাস পাহাড়ে গেলে তিনি আমাদের নিকট একটী গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

গল্পটী এইরূপ :—

এক দরিদ্র ব্যক্তির দৈনিক আয় দুই আনা পয়সা ছিল সেই ব্যক্তিটী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে দুই আনা পয়সা উপার্জ্জন করিত তাহা হইতে প্রত্যহ তাহার সংসার খরচ নির্ব্বাহ হইত। ঐ ব্যক্তি হঠাৎ বহু ঐশ্বর্য্যশালী এক দয়ালু ব্যক্তির কৃপাদৃষ্টি লাভ করায় উত্তরোত্তর তাহার আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার ভাগ্যক্রমে ও কার্য্যকুশলতার জন্য ঐ ধনী ব্যক্তি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায় তাহাকে মাসে মাসে আট দশ হাজার করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন। ঐ দরিদ্র ব্যক্তির যেমন দিন দিন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি ব্যয়ও তদনুসারে বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। পূর্ব্বে যখন সে তাহার প্রতি কৃপা-পরায়ণ ঐ ধনবান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিম্বা কোন প্রয়োজনে যাইত তখন পদব্রজেই যাইত কিন্তু যখন তাহার প্রভুর কৃপাদৃষ্টির গুণে তাহার আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন সে ক্রমে ক্রমে পাল্কী, ঘোড়া ও গাড়ীতে চড়িয়া প্রভুর নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল। এইরূপ প্রত্যেক খরচই তাহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে অতি সামান্য আহারীয় দ্রব্যেই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত ও তাহাতেই সে তৃপ্ত থাকিত কিন্তু ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নানাবিধ রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সামান্য বস্ত্রের দ্বারাই তাহার শীত নিবারণ হইত কিন্তু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহুমূল্যবান্ বস্ত্রাদির আবশ্যক হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সে নিজের গৃহকার্য্য নিজেই সন্তোষের সহিত নির্ব্বাহ করিত কিন্তু পরে নিজ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বেতনভোগী বহু ভৃত্যের প্রয়োজন হইতে লাগিল। ফল কথা এইরূপে তাহার সমস্ত বিষয়ই আবশ্যক বেশী হওয়ায় যত অর্থই হস্তে আসিতে লাগিল সমস্তই এই প্রকারে ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল। এত যে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, এত যে সে অর্থশালী হইল, কিন্তু তাহাতে তাহার মনের সুখের কিছু মাত্র বৃদ্ধি হইল না। পূর্ব্বে সামান্য আয়ের সময়ও সে যেমন অভাবগ্রস্থ ছিল, পরে যে তাহার অত

আয়ের বৃদ্ধি হইল তবুও তাহার সেই অভাবই রহিয়া গেল। কারণ ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিন দিন যেমন আবশ্যক বেশী বোধ হইতে লাগিল তেমনি বহু নূতন নূতন অভাবেরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। কাজে কাজেই এ ধন দ্বারা তাহার মনের সুখশান্তির কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইল না।

এই গল্প করিয়া সাধুবাবা আমাদের উপদেশ দিলেন যে লোকে হাজার ধন সম্পত্তির মালিকই হউক কিম্বা বহু সামগ্রী ঘর-বাড়ীর অধিকারীই হউক তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব কিছুতেই দূর হয় না। যতই যাহা যেখান হইতে পাওয়া যাউক না কেন জীবের অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষা ও লোভ ততই দিন দিন বাড়িয়া যায়। এই জন্য মনের আকাঙ্ক্ষা কমাইয়া স্বল্পে সন্তোষ অভ্যাস করিতে পারিলে মনে শান্তি ও সুখ লাভ হয়। মনের অভাব বোধেরই ক্রমে ক্রমে অভাব করিতে হইবে। যে ব্যক্তির অল্পে সন্তোষ অভ্যাস হইয়া যায় তাহার আর অভাব বোধ থাকে না। কাজেই তাহার মনে সতত সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করে। সাধুবাবা বলেন, "শান্তি তুল্য সুখং নাস্তি।" আর একটী কথা সাধুবাবা বলেন, "ইচ্ছা গেয়ি, চিন্তা গেয়ি, গেয়ি মন কি প্রবাহ; যিস্কা মন্‌মে সন্তোস রহে ও হয় শাহন শাহ।" অর্থাৎ যে মন হইতে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে সে মনে চিন্তার প্রবাহও চলিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা ও চিন্তা লোপ পাওয়ায় সেই মনে সদা সন্তোষ বিরাজ করে, কাজেই সে ব্যক্তি শাহন শা অর্থাৎ জগতের সম্রাটতুল্য।

এই মন হইতে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষাদির উচ্ছেদ সাধন করাই প্রয়োজন। এই দুর্দ্দমনীয় কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষাই যত বন্ধনের হেতু ও জীবের যত দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা ও আত্মার উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। সেই জন্য সর্ব্ববিধ লোভ, তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষাদি সম্পূর্ণ মন হইতে তাড়াইতে পারিলেই সেই চিত্তে সদা সন্তোষ ও শান্তি বিরাজিত রহিবে।

শ্রীভগবান কহিয়াছেন—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥" ২।৭১॥

একদিন সাধুবাবার সহিত দুঃখ ও ক্রোধ সম্বন্ধে কিছু কথা হইয়াছিল। দুঃখ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "দুঃখ মনুষ্যের তিন প্রকার। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক।" আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মানসিক নানা প্রকার যে দুঃখ

তাহাই। দুঃখের দ্বারা আমরা সেই আনন্দময় দয়ার আধার প্রেমময় হইতে "বজুদা" (ভিন্ন) হইয়া যাই। এই কারণে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ক্ষোভ মন হইতে সমূলে উচ্ছেদ করা আবশ্যক। আধিদৈবিক দুঃখ অর্থাৎ যাহা হঠাৎ দৈব হইতে ঘটে, যেমন নৌকাডুবি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, গৃহদাহ ইত্যাদি হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাই। আর আধিভৌতিক দুঃখ, যেমন সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী হইতে আক্রান্ত হওয়ার জন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়।

আর ক্রোধ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ক্রোধ চারি প্রকার। সাধু সজ্জন ব্যক্তির ক্রোধ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী; মুখেই কেবল উহার প্রকাশ, সে ক্রোধ মন পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায় না। কার্য্যতঃ তাহা দ্বারা কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হয় না; বরং উহা উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করিলে জীবের হিতই সাধিত হয়। উহা কিরূপ ক্ষণস্থায়ী তাহার উদাহরণ দিবার জন্য বলিলেন, যেমন জলের মধ্যে একখানি যষ্ঠি দ্বারা দাগ দিলে সে দাগ তখনই মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ সাধুব্যক্তির ক্রোধ অল্প সময়েই মিলাইয়া যায়। উহাতে সাধুব্যক্তির মনে কিছুই দাগ লাগে না। আর তিন প্রকার ক্রোধের উদাহরণ দিলেন; উদাহরণ গুলি এইরূপ :—যেমন বালির উপর সাময়িক দাগ, পাথরের উপর গভীর দাগ এবং লোহার ফাটার গভীর চিরস্থায়ী দাগ। কোন কোন সজ্জন অক্রোধী ব্যক্তির ক্রোধ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, উহা বালির উপর দাগ সদৃশ। বালির উপর যষ্ঠি দ্বারা দাগ দিলে যেমন তাহা অল্পক্ষণ পরে সামান্য কারণেই পুনরায় মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ উক্ত প্রকার ক্রোধ মনুষ্যের মন হইতে ক্ষণকাল পরেই লোপ হইয়া যায়। উহাদ্বারা তাহাদের মনে কোনরূপ স্থায়ী দাগ পড়ে না। আবার এমন ক্রোধ আছে যে আমরণ থাকিয়া যায়। যেমন প্রস্তরের উপর লোহার ফলক দিয়া দাগ কাটিলে গভীর ও স্থায়ীভাবে দাগ কাটিয়া যায় উহা সহজে লোপ পায় না, সেইরূপ অনেক ক্রোধী ব্যক্তির ক্রোধ তাহাদের মনে একটা বহুকালস্থায়ী দাগ কাটিয়া যায়। তাহারা কিছুতেই মনের সে দাগ অপসারিত করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ ক্রোধ ভয়ানক খারাপ। আর কোন কোন ক্রোধ এমনই ভয়ঙ্কর যে পরজন্ম পর্য্যন্ত উহা সঙ্গে সঙ্গে যায়। উহাকে লোহার ফাটার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, কারণ উহা কখনই জোড়া লাগে না, এমন ভীষণ মারাত্মক সামগ্রী। তাহারা এইরূপ ক্রোধের ফলে এতই বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাভাব পোষণ করে যে কি প্রকারে অপর পক্ষকে ভীষণরূপে জব্দ করিবে, নিরন্তর কেবল তাহাই চিন্তা

করিয়া মনকে কেবল যৎপরোনাস্তি কলুষিত করিয়া তুলে। এইরূপ ক্রোধ ও প্রতিহিংসা ভাব মরিলে পরলোকেও তাহাদের মন হইতে লোপ পায় না; এবং পরজন্ম পর্য্যন্ত এই অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। কোন ব্যক্তিকে শাসন করিবার জন্য মুখে সাময়িক সামান্য ক্রোধ প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখা আবশ্যক উহা স্থায়ী না হয়, কারণ স্থায়ী ও গভীর হইলে চিত্তে তাহার সংস্কার পড়িয়া যায়। ক্রোধের, লোভের কিম্বা অন্য কোন রিপুর ছাপ অর্থাৎ সংস্কার যেন চিত্তে না পড়ে, কারণ চিত্তে উহার সংস্কার পড়িলেই কত জন্ম জন্মান্তর উহার জন্য ভুগিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" ১৬॥২১

অর্থাৎ—

"নরকের এই তিন আত্মবিনাশক দ্বার,—
কাম, ক্রোধ আর লোভ, করিবে তা পরিহার।"

একদিন সাধুবাবা নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের নিকট কিছুকথা বলিয়াছিলেন। তিনি যেন বলিয়াছে মনে হয়, সাধারণতঃ মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাস দিনে রাত্রে ২৪ ঘণ্টায় একুশ হাজার ছয় শত বার ত্যাগ ও গ্রহণ হইয়া থাকে। এই নিশ্বাস ও প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণের মধ্যে যে বিরামক্ষণ, সেই সময়টি কোন এক প্রণালী মত অভ্যাস দ্বারা যত দীর্ঘ করিতে পারা যাইবে মনও তত স্থির হইয়া আসিবে ও তাহাতে প্রাণে প্রচুর আনন্দ লাভ হইবে। জীব অজ্ঞতাবশতঃ কত যে মূল্যবান্ সামগ্রী অবহেলায় বৃথা নষ্ট করিতেছে, যখন তাহা বুঝিবার তাহার ক্ষমতা হইবে তখন আর তাহার দুঃখ পরিতাপের সীমা থাকিবে না। এই বিষয়ের উদাহরণ দিবার জন্য তিনি আমাদের নিকট একটী গল্প বলিয়াছিলেন। সাধু বাবার গল্পটী এইরূপ:—

এক কৃষক তাহার জমিতে প্রত্যহ কার্য্য করিত। একবার তাহার জমিতে এক মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে অত্যন্ত মূল্যবান্ অসংখ্য রত্ন ফলিয়াছিল। কিন্তু কৃষক উহার কিরূপ ব্যবহার ও কিরূপ মূল্য হইতে পারে তাহা জানায় ঐ

মূল্যবান্ রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সে যে মঞ্চের উপর বসিয়া রাত্রিতে পাহারা দিত ও দিনে পাখীদের তাড়াইত, তাহার একদিকে সেগুলি একত্র করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। দিবসে যখন চড়ুই পক্ষী কিম্বা অন্যান্য পক্ষীকুল আহারের লোভে তাহার শস্য ক্ষেত্রের উপর আসিয়া বসিত, তখন কৃষক ঐ মঞ্চে থাকিয়া উহাদিগকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ঐ রত্নগুলি তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিত। যে মঞ্চের উপর বসিয়া সে জমি পাহারা দিত ঠিক তাহার সম্মুখেই এক বৃহৎ নদী ছিল, কাজেই কৃষক পক্ষীদের তাড়াইবার জন্য যে রত্নগুলি তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিত সেগুলি গিয়া ঐ নদীগর্ভে পতিত হইত। এইরূপ ভাবে রত্নগুলির অপব্যবহার হওয়ায় উহা শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। এক দিবস ঐ কৃষকের পত্নী কৃষকের জন্য মাঠে খাদ্য-সামগ্রী লইয়া আসিয়া মঞ্চের নিকট একটী ঐ রত্ন পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। উহার অতিশয় চাক্চিক্যতা বশতঃ কৃষক পত্নীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল ও উহার সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল "এমন সুন্দর জিনিষটী, ইহা আমি বাড়ী লইয়া যাই, আমার সন্তানগণ ইহা লইয়া খেলা করিবে।" কৃষকপত্নীও রত্নটীর উপযুক্ত ব্যবহার জ্ঞাত নয়, কাজেই সুন্দর সামগ্রীটি লাভ করিয়া সন্তানদের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদের খেলিতে দেওয়াই উহার চরম সার্থকতা মনে করিল। সে ঐ রত্নটী কুড়াইয়া লইয়া যখন উহা হস্তে করিয়া বাড়ী আসিতেছিল সেই সময় পথে এক মহাধনী বণিকের (অর্থাৎ ঐ রত্নের প্রকৃত বোদ্ধা মহাজনের) দৃষ্টি হস্তস্থিত ঐ রত্নটীর প্রতি পতিত হওয়ায় তিনি উহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি কৃষক পত্নীকে উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় সে তাহা অনবগত থাকায় বলিল, "আমি আর ইহার মূল্য কি বলিব, আপনি ধর্ম্মতঃ যাহা প্রকৃত মূল্য মনে করেন তাহা দিয়া ইহা গ্রহণ করুন।" ইহা শুনিয়া মহাধনী বণিক সেই রত্নটী গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, "উহার মূল্যস্বরূপ সাত দিন ধরিয়া যত অর্থ বহিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হও তত ধনরত্ন বহিয়া লইয়া যাইতে পার।" মহাজনের এই বাক্য শুনিয়া কৃষকপত্নী একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল ও তৎক্ষণাৎ কৃষকের নিকট গিয়া এই সকল কথা জানাইল। কৃষক তাহার পত্নীর মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; কারণ এরূপ বহুসংখ্যক রত্ন সে নিত্য নিত্য কত অবহেলায় অযত্নে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিয়াছে। ইহার যে এত অসাধারণ মূল্য হইতে পারে

তাহা উভয়েই সম্পূর্ণ অনবগত ছিল। নদীগর্ভে পতিত হওয়ায় আর উহা উদ্ধার করিবার কোন উপায় ছিল না, তখন কেবল বৃথাই তজ্জন্য হাহাকার করা।

এই গল্প করিয়া সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, "এই নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপযুক্ত ব্যবহার প্রকৃত সাধুব্যক্তি কিম্বা সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া লইয়া ইহার প্রণালী মত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নির্ব্বোধ অনভিজ্ঞ কৃষকের মত পরিশেষে—পরিতাপের বিষয় হইবে; কারণ যে কাল চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে আর সহস্র চেষ্টা করিলেও কেহ ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইবে না।"

সাধুবাবা একদিন সুখ এবং দুঃখ কত ক্ষণস্থায়ী, এ সম্বন্ধে একটী গল্প বলিয়া শুনাইয়াছিলেন। সুখ এবং দুঃখ কিছুই মনুষ্যের চিরস্থায়ী হয়না। "সুখং দুঃখং মনুষ্যণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে," এই কথাটী উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই গল্পটী আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। গল্পটী এইরূপ :—

এক সময়ে এক স্থানে খুব বিখ্যাত একজন জহুরী বাস করিত। ঐ ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা ছিল যে কোন রত্নাদি দেখিবামাত্র সে উহার প্রকৃত মূল্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারিত। তাহার চতুর্দ্দিকে যেমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, ব্যবসাদিতেও তদ্রূপ উত্তরোত্তর অতিশয় উন্নতি হইতেছিল। ঐ ব্যক্তির সুবৃহৎ বাসস্থলী, প্রকাণ্ড বাগবাগীচা, প্রচুর ধনরত্ন ইত্যাদি থাকায় সে অতি স্বচ্ছল অবস্থায় ও সুখে স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। ইহার উপর তাহার পত্নীটীও পতির একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকায় ঐ ব্যক্তির সুখের সীমা ছিল না। একদিন জহুরী তাহার সাধ্বী পত্নীকে আসিয়া বলিল যে তাহার মত ভাগ্যবান্ পুরুষ আর জগতে কেহ নাই, কারণ সে যে স্থান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে, সেই স্থানে পায়ের নীচে এক একটী পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিতেছে (অর্থাৎ যে কার্য্যেই সে হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহাতেই সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হইতেছে ও উহার দ্বারা বহু অর্থাগম হইতেছে)। জহুরীর পত্নী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "তাহা হইলে আমাদের উন্নতিরও চরম হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমাদের সুখের শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই এই সময় হইতে আমাদের ভাগ্য মন্দ হইতে আরম্ভ হইবে, কারণ জগতের চিরদিনের এইরূপ নিয়ম যে উন্নতির চরম হইলেই তাহার পর অবনতি অবশ্যই আসিবে।" বাস্তবিকও তাহাই হইল। ইহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে জহুরীর অবস্থা দিন দিনই মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। অত যে সুখ স্বচ্ছন্দ,

অমন যে স্বচ্ছল অবস্থা, তাহা দেখিতে দেখিতে কোথায় যেন চলিয়া গেল। অবশেষে উহাদের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল যে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করা একান্ত লজ্জাজনক ব্যাপার হইয়া উঠিল। এদিকে বাড়ী ঘরও সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় স্বামী স্ত্রী উভয়ে স্থান ত্যাগ করিয়া সহরের বাহিরে গিয়া একটী বৃক্ষতল আশ্রয় করিল। ইহাতেও তাহাদের দুঃখের শেষ হইল না। কিছুদিন পর জহুরী রুগ্ন হইয়া পড়িল। তখন উহার স্ত্রী ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্য যাহা ভিক্ষা পাইত তাহা দ্বারা উভয়ের আহার চালাইতে লাগিল। এইরূপ দুরবস্থায় উভয়ের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন ঐ জহুরীর হালুয়া খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় সে কথা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিল। উহা শুনিয়া তাহার স্ত্রী ভিক্ষায় বাহির হইল এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সে দিন তিনটী পয়সা মাত্র ভিক্ষা পাইল। উহা দিয়া সে এক পয়সার ময়দা, এক পয়সার গুড় ও এক পয়সার তৈল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কোনরূপে স্বামীর জন্য হালুয়া প্রস্তুত করিয়া জহুরীর নিকট আসিয়া দেখিল যে তাহার রুগ্ন স্বামী অনাহারে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন তাহাকে ডাকা অসঙ্গত বোধে ঐ কত দুঃখে সংগৃহীত সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত হালুয়া টুকু একটী মৃণ্ময় পাত্রে যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অধিক রাত্রিতে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্ত্রীকে খাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রী বলিল, "ঐ স্থানে তোমার জন্য হালুয়া তৈয়ার করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি।" জহুরী খাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ঐ স্থানে গিয়া দেখে যে হালুয়াটুকু কুকুরে খাইয়া ফেলিয়া পাত্র মধ্যে মলত্যাগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অতিশয় ক্ষুধার সময় ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়া জহুরী যৎপরোনাস্তি মনকষ্টে কাঁদিয়া ফেলিল ও এই দুঃখের কথা পত্নীকে গিয়া জানাইল। জহুরীর পত্নী শুনিয়া বলিল, "অদ্য হইতে আমাদের দুঃখ কষ্টের শেষ হইবে। কারণ আমাদের কষ্ট একেবারে চরম সীমায় উঠিয়াছে।" বাস্তবিক পতিব্রতার বাক্যই ঠিক হইল। কারণ তাহার পর হইতেই উহাদের পুনরায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। ঐ ঘটনার পরদিন প্রাতে জহুরীর শরীর কিছু সুস্থ বোধ হওয়ায় সে ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সহরের মধ্যে গেল, গিয়া দেখে কয়েকটী ব্যক্তি একস্থানে একত্র হইয়া একখানি রত্নের মূল্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিবাদ করিতেছে। কিন্তু তাহারা কেহই রত্নখানির প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। জহুরী ভাগ্যক্রমে ঠিক ঐ সময় ঐস্থানে উপস্থিত হওয়ায় অতি

অল্পক্ষণ মধ্যে সহজেই রত্নটীর উপযুক্ত মূল্য বলিয়া দিতে সক্ষম হইল। যদিও জহুরীর মলিন বেশ, শীর্ণকলেবর, কিন্তু সে রত্নটীর যাহা মূল্য নিরূপণ করিয়া দিল সকলের নিকটেই তাহা সঙ্গত বোধ হওয়ায়, 'এই ব্যক্তি' এসম্বন্ধে বেশ উপযুক্ত ব্যক্তি, বুঝিয়া ঐ বণিকগণ মধ্যে এক ব্যক্তি উহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। সেই বণিকের নিকট ঐ কার্য্যে যোগদানের পর হইতে পুনরায় ক্রমে ক্রমে তাহার উন্নতি আরম্ভ হইল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জহুরীর মনে আশা ভরসার উদয় হওয়ায় ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর ব্যাধি মুক্ত হইয়া পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল ও ক্রমে কার্য্যকুশলতার দরুণ আয় বৃদ্ধি হওয়ায় কিছু দিন পর তাহারা পূর্ব্ব সুখসমৃদ্ধি লাভে সক্ষম হইল।

এই গল্প শেষ করিয়া সাধুবাবা বলিলেন যে সুখ কিম্বা দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অনেক সময়ই সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর পুনরায় সুখ মনুষ্যের জীবনে অনবরতই আসিতেছে দেখা যায়; এই কারণে সুখের সময় গর্ব্বিত হওয়া কিম্বা দুঃখে একেবারে হতাশ হইয়া পড়া ঠিক নয়। এই সুখ দুঃখ অবিচলিত ধীর ভাবে সহ্য করাই কর্ত্তব্য। দুঃখের সময় দুঃখ ধীরভাবে সহ্য করিয়া যাইতে পারিলে শীঘ্রই উহা দূর হইয়া যায়, কারণ সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ইহাই জগতের চিরদিনের নিয়ম। সুখ দুঃখের এই পরিবর্ত্তনে যে ব্যক্তি গর্ব্বিত কিম্বা কাতর না হইয়া সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া চিত্তটী সর্ব্বদা তাঁহার চরণে সন্নিবিষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় সেই এ জগতের মধ্যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি।

সাধু মহাত্মাদের দেখিতেছি বয়স বেশী হইলেও শরীরে সহজে জরা-ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না, কারণ সাধুবাবার যে এত বয়স হইয়াছে, তবুও শরীর এত হাল্কা, এমন লঘু যে তাঁহার পদবিক্ষেপ সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এত বয়সে ইহা একেবারে অসম্ভব। এত বয়সে এখন পর্য্যন্তও মুখের দন্ত দুপাটী মুক্তার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে, দন্ত এ পর্য্যন্ত একটীও পড়ে নাই। এরূপ ভাবে যে তিনি সম্পূর্ণ একাকী বাস করেন, জ্বর কি অন্য কোনরূপ ব্যাধি হইলে কে দেখে, তখন কি করেন ইত্যাদি প্রশ্ন করায় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন; "ব্যাধি হইলে তখন শুইয়া থাকি, আমাদের ডাক্তার ডাকিয়া দেখান কিম্বা ঔষধ খাওয়া কিছুই প্রয়োজন হয় না; ব্যাধির নির্দ্দিষ্ট ভোগ কাল কাটিয়া গেলে ব্যাধি তখন নিজে নিজেই আরোগ্য হইয়া যায়।" ইঁহাদের এইরূপ সব কথা শুনিলে আমাদের মত বিশ্বাস ভক্তিহীন সংসারী প্রাণীর আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। ইঁহাদের মত একান্ত নির্ভরশীল ব্যক্তিদের অসুখও নিশ্চয় সহজে আক্রমণ

করিতে পারে না, কারণ এই যে এতদিন হইল সাধুবাবার নিকট যাইতেছি, কোন দিন কোনরূপ ব্যাধি কিম্বা কোন কারণে কিছুতে কাতর কিম্বা বিরক্ত ভাব এ পর্য্যন্ত ত কখনও দেখিলাম না। আর আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখি কিছুতেই তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা লোপ পায় না। একবার সাধুবাবার তখনকার একমাত্র সেবক হরিহরানন্দ, সাধুবাবাকে না বলিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য বাবাকে কিছুমাত্র বিচলিত বা দুঃখিত হইতে দেখি নাই, এমন কি এই কারণে সাধুবাবা তাহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্তি পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। আমরা যখন বাবাকে বলিয়াছিলাম, "উহার ত অন্ততঃ আপনাকে বলিয়া বিদায় লইয়া যাওয়া উচিত ছিল।" শুনিয়া তদুত্তরে সাধুবাবা করুণাদ্রস্বরে বলিয়াছিলেন, "বাচ্চা লোক।" অর্থাৎ ও বালক, তাই ওরূপ না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এতখানি সাধুবাবার ক্ষমা ও সহগুণ। সেবকটী যে চলিয়া গেল, 'এখন তাহা হইলে কে সাধুবাবার জন্য খাবার প্রস্তুত করিবে, কে বাবার অন্যান্য কার্য্যাদি করিয়া দিবে' বলিয়া আমার উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করায় তিনি তেমনই শান্ত স্বরে বলিয়াছিলেন, "আবার কত হরিহরানন্দ আসিয়া জুটিয়া যাইবে, আর সাধুব্যক্তিদের কাজকর্ম্ম নিজে নিজেই করা নিয়ম।" ইঁহার সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বাবস্থাতেই এই প্রকার অবিচলিত ভাব ; কোন দিন কোন কারণে যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইলেও ইঁহার সদা প্রসন্ন আনন অপ্রসন্ন হইতে দেখিলাম না। কোন কারণেই তাঁহার মনের এই সমত্ব ও সর্ব্বংসহ ভাব ও মুখের প্রসন্ন ভাব নষ্ট হয় না দেখিয়াছি।

(ক্রমশঃ)
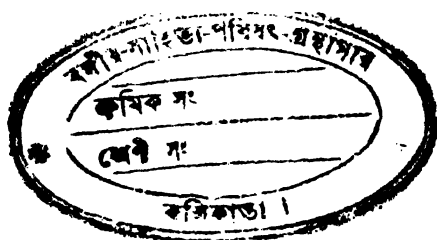
ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২) স্বামীজি যদুনাথ বাগচী মহাশয়কে বলিতেছেন—"তুমি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া খারাপ হইয়া গিয়াছ, এখনও মন স্থির করিতে পার নাই—অগ্রে মনস্থির কর তবে মুক্তির পথ পাইবে।" (১০০ পৃষ্ঠার শেষ দুই পংক্তি ও ১০১ পৃষ্ঠায় প্রথম দুই পংক্তি) "অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ কি খারাপ ? ধর্ম্ম-সাধক মাত্রেরই তো নিত্যশাস্ত্র পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। "সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।" শাস্ত্র পাঠ দ্বারাই "জিজ্ঞাসা" জন্মে, তাহাতেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হয়। এই যদুনাথ বাবু তাই ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মন যদি 'স্থির'ই, হইল তবে মুক্তি আর কত দূর ? শ্রীভগবান যাঁহার সখা ও সারথি তেমন অর্জ্জুনই মনটাকে এমন চঞ্চল বলিয়াছিলেন যে "তস্যাহং নিগ্রহংমন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্"। শ্রীভগবান অভ্যাস যোগের দ্বারা মনশ্চাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার উপদেশ দিতেছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ ভূয়িষ্টরূপে অধ্যয়ন করাও অভ্যাস যোগেরই সহায়ক।

আজ কালকার শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'অবতার'দের মুখ হইতেই ঈদৃশ উক্তি শোভা পায়। তাঁহাদেরই চেলারা বলিয়া বেড়ায় "ঠাকুর যা বলিয়াছেন তাই বেদ, তাই বেদান্ত।" * বলিবার কারণ এই যে শাস্ত্রের নিকষে পরীক্ষা করিলে ইহাদের কথাবার্ত্তা বা উপদেশের অসারতা ধরা পড়িয়া যায়। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী তো তাদৃশ ছিলেনন না তিনি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞই ছিলেন।

(৩) ঐ যদুনাথ বাবুকেই স্বামীজি বলিতেছেন "তুমি আফিসের একজন

---

* প্রায় এই ধরণেরই কথা (অর্থাৎ শাস্ত্র কিছু নয় কিন্তু এই সব উপদেশই সারাৎসার) উমাচরণ বাবুও স্বামীজির মুখে বলাইয়াছেন—"কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কিন্তু ভক্তিভাবে মনোযোগপূর্ব্বক এই বিষয়গুলি পাঠ করিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গব ও হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন।" তত্ত্বোপদেশ "সৃষ্টি" ১৪৮ পৃষ্ঠা। (উমাচরণ বাবু যে তাদৃশ দলের আওতায় পড়িয়া গিয়াছেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে এক পাদ টীকায় বলা হইয়াছে।

বড় বাবু অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয় কিন্তু ২০। ২২ বৎসর হইতে নিরামিষ ভোজন করিতেছ, কিছুদিন পরে তোমার ভয়ানক গাত্রদাহ পীড়া হইবে। যদি শরীর সুস্থ রাখিতে চাও তবে এইবার বাড়ী যাইয়া মৎস্য আহার করিবে; আর যদি চাকরী ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে মৎস্য ব্যবহার আবশ্যক নাই" (১০১. পৃষ্ঠা) ২০।২২ বৎসর হইতে নিরামিষ খাইয়া যাঁহার শরীর নিরাময় আছে (কেন না তাহার কোন পীড়ার কথা ইহাতে নাই) এবং বহুদিন যাবৎ চাকরীও যিনি করিতেছেন (কেন না আফিসের 'বড় বাবু' একজন হঠাৎ হইতে পারেন না) তাঁহাকে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ নিরামিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া মাছ খাইতে উপদেশ দিতেছেন, নচেৎ চাকরী ছাড়িতে বলিতেছেন এ কেমন কথা? আমরা তো জানিতাম যে সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারে দেহ নীরোগ সুতরাং কর্ম্মপটু থাকে; অবশ্য উদরাময় থাকিলে স্বতন্ত্র কথা, বিষে বিষ ক্ষয়ের ন্যায় মাছে উপকার দিতে পারে।

(৯) তারপর পুনরায় বলিতে লাগিলেন "দেখ যদুনাথ গোঁড়া হিন্দু হওয়া ভাল নহে। এক দিবস জামালপুরে তোমার নিম্নস্থ কোন এক কর্ম্মচারী প্রস্রাব করিবার সময় ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া কাণে পৈতা দেয় নাই তাহা তুমি হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এত চটিয়াছ যে তাহার উন্নতির পথ বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। ইহাতে বোধ হয় কাণে পৈতা দেওয়ার প্রকৃত কারণ তুমি জান না। পৈতা শুচি ও প্রস্রাব অশুচি, পাছে পৈতায় প্রস্রাবের ছিটা লাগে, সেই জন্য দুই তিন ফের কাণে জড়াইয়া লইতে হয়।" (১০১—১০২ পৃষ্ঠা)

অবশ্য কোন কদাচারের হেতুতে এমন কি ব্যভিচারাদি পাপানুষ্ঠানের হেতুতেও আফিসের কোনও কর্ম্মে শৈথিল্য না জন্মিলে বড় বাবুর উহার উন্নতির পথ রোধ করা উচিত নহে। পরন্তু কাণে পৈতা জড়াইবার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা শাস্ত্রাচারাভিজ্ঞ একজন মহাপুরুষের উক্তি ও যুক্তি বলিতে পারি না। প্রস্রাবের ছিটা এড়াইতে 'কাণে' পৈতা রাখিবে কেন? কর্ণে জড়াইবার কারণ এই যে:—

"অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যানিলাস্তথা।
সর্ব্বএবেহ বিপ্রাণাং কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে॥"

(পরাশর)

ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে তাই উপবীত রাখিলে শুচি থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রাদেশ হইয়াছে—

"দিবাসন্ধ্যাসু কর্ণস্থ ব্রহ্মসূত্র উদঙ্‌মুখঃ।
কুর্য্যান্মূত্র পুরীষেতু রাত্রৌ বৈ দক্ষিণামুখঃ॥"

(গোরুড় বচন শব্দকল্পদ্রুমধৃত)

"গোঁড়া হিন্দু হওয়া ভাল নহে"—এইরূপ বাক্য (যে কোনও ব্যপদেশেই হউক) মহাপুরুষ স্বামীজির মুখ হইতে নির্গত হওয়া অপ্রত্যাশিত মনে করি। (৫) স্বামীজি যে সকল প্রবন্ধ উমাচরণ বাবুকে লেখাইয়া দিয়াছেন তাহার একস্থানে আছে "আমার বিবেচনা হয় শিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে হিন্দু শাস্ত্রের কিছু সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।" ("ধর্ম্ম"—১৮৭ পৃষ্ঠা।)

"হিন্দু শাস্ত্র" সমস্তই ঋষি প্রণীত, ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন—তাই যুগে যুগে (যেমন এই কলিযুগে) যে সব 'আচারের' পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 'শাস্ত্র' অপরিবর্ত্তনীয় ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস—তবে আমরা দৌর্ব্বল্যাদি বশতঃ সম্যক্ সমস্ত যথাযথ পরিপালন করিতে পারি না, সে স্বতন্ত্র কথা। উমাচরণ বাবুর গ্রন্থেই আছে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী তাঁহাকে বলিয়াছেন—"ত্রিকালদর্শী আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি দেবর্ষি সিদ্ধশুদ্ধ মহাত্মাগণ তপোবলে জ্ঞানবলে যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কি সংশয় করিতে আছে? তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" (৬৫ পৃষ্ঠা) *

অতএব মহাত্মা স্বামীজি কখনও "হিন্দুশাস্ত্রের" সংস্কার (সংশোধন পরিবর্ত্তন ইত্যাদি) হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামীজির 'তত্ত্বোপদেশ" বলিয়া উমাচরণ বাবু যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা যে তিনি স্বামীজির বলা অনুসারে খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। স্বামীজি বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন কিনা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি যাহা হিন্দীতে বলিয়াছেন উমাচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ তাহা আপন মাতৃভাষায় (বাঙ্গালায়) লিখিয়া লইয়াছিলেন। সে

---

* ইহা যে স্বামীজির উক্তি তাহার প্রমাণ এই যে নিবারণ বাবুর পুস্তকেও হুবহুব এই সবই আছে, কেবল "সম্পূর্ণ সত্য" স্থলে "সত্য" রহিয়াছে। (৫৭ পৃষ্ঠা)

যাহা হউক না কেন 'ভাষা'টি (বাঙ্গালা অনুবাদ) উমাচরণ বাবুর নিজস্ব হইলেও ঐ সকল প্রবন্ধের মূল বা ভাব স্বামীজির নিজস্ব হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত। 'ধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, (অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রের সংস্কার আবশ্যক) তাহাতে স্বামীজির ভাবগুলি যথাযথ ঐ সব প্রবন্ধে প্রচারিত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। এই ("ধর্ম্ম") প্রবন্ধেরই প্রথম অংশটী পড়িলে ঐ সন্দেহ আবার দৃঢ়ীভূত হয়। লেখা হইয়াছে "আজ কাল সর্ব্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক কেবল ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এমন পুস্তক এমন পত্রিকা এমন প্রবন্ধ নাই যাহাতে ধর্ম্মের হুঙ্কারে লোকের কর্ণে তালা না লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজিকার মনুষ্যসমাজ এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম বড়ই বিরল। সকল লোকের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ, কেবল ভাব চুরি অর্থাৎ ভিতরে একপ্রকার, বাহিরে অন্য প্রকার। যিনি নিজে বলিতেছেন আজ কাল কন্যাদায় বড়ই শক্ত ব্যাপার হইয়াছে ইহা উঠিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তিনিই নিজের পুত্রের বিবাহের সময় অতি অল্প করিয়া দশ হাজার টাকার কমে ঘাড় পাতেন না।" (১৮১ পৃষ্ঠা) এই রচনাটুকুর ভাব ও ভাষা উভয়ই উমাচরণ বাবুর নিজস্ব বলিয়া অনুমিত হয়। স্বামীজির ন্যায় একজন সাধু মহাত্মা কর্ত্তৃক ঈদৃশ সাধারণের উপর অধিক্ষেপ সম্ভাবিত নহে। বাক্যগত দোষও আছে— "বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়" কি "মনুষ্য সমাজের" অন্তর্নিবিষ্ট নহে যে "মনুষ্য সমাজ এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে" বলা হইল? (অনুবাদে মূলের ঈদৃশ বাক্যগত দোষ থাকিয়াই যায়)। তারপর ১২৮৭ সালে উমাচরণ বাবু স্বামীজির নিকট হইতে এই সকল লিখিয়া লন। তখন (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে) কন্যাদায় ও বরপণ প্রথা কি এইরূপ ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে স্বামীজির ন্যায় একজন সংসার নির্লিপ্ত মহাপুরুষেরও ভাবনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল? আমি তো ইহাতে কাল-বিরোধিতা (anachronism) দেখিতেছি, উমাচরণ বাবু এই আধুনিক সময়ের কথাই বলিতেছেন।

এ ছাড়া আর একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে। যে পরিমাণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতি নিরর্থক গ্লানিকর কথা স্বামীজির মুখে বলাইয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাঁহার (অর্থাৎ পরিব্রাজকের) রচিত "শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থের কয়েকটী প্রবন্ধের বহু বাক্যের প্রতিলিপি এই "ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর তত্ত্বোপদেশ" পুস্তকের (?) (অন্ততঃ) দুইটি

("সংসার" ও "গুরু ও শিষ্য") প্রবন্ধে পাওয়া যাইতেছে ; ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) "সংসার" প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলির তুমি কে? "আমার" "মানব গ্রন্থ" * ও "জীবের নিদ্রাভঙ্গ" এই চারিটী প্রবন্ধের ছায়া পাত হইয়াছে, এক এক প্রবন্ধ হইতে এক একটি মাত্র বাক্য উদাহরণ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল :—

(ক) "যাহার সমক্ষে পৃথিবী একটি ধূলিকণা সূর্য্যমণ্ডল একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুল অগাধ সলিলরাশি গোষ্পদ জল সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি ৩য় সংস্করণ "তুমি কে?" ২৮২ পৃষ্ঠা।

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে ১৫০ পৃষ্ঠা ৪—৬ পংক্তিতে অবিকল ইহাই রহিয়াছে, কেবল "অগাধ সলিলরাশি"কে "মহাসমুদ্র" করা হইয়াছে।

এ স্থলে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রবন্ধের নাম "তুমি কে" এবং ইহার সর্ব্বপ্রথমেই আছে 'মানব' এই সম্বোধন পদ, এবং ইহা খুবই সমীচীন। উমাচরণ বাবুর প্রবন্ধের নাম 'সংসার'; যে প্যারায় উদ্ধৃত বাক্যের অবিকল প্রতিলিপি আছে, তাহারও আরম্ভে "মানব" এই সম্বোধন পদ রহিয়াছে। এই প্রবন্ধ (অর্থাৎ 'সংসার') মহাত্মা স্বামীজির উপদেশের অনুবাদ মাত্র ; স্বামীজি উমাচরণ বাবুকে উপদেশ দিতে দিতে হঠাৎ "মানব"কে সম্বোধন করিবেনই বা কেন? ইহা খাপছাড়া নহে কি?

(খ) কোন দ্রব্য 'তোমার' অধিকার থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয়, তবে কিছু মাত্র দুঃখ নাই কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার বলিবার অধিকার পাই তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না। (পুষ্পাঞ্জলি "আমার" ২৮৮ পৃঃ)

উমাচরণ বাবুর পুস্তকে আছে কোনও দ্রব্য তোমার অধিকারে না

---

* যখন আমি "তত্ত্বোপদেশ" পড়ি তখন কেবল এই "মানবগ্রন্থ" প্রবন্ধের সৌসাদৃশ্য ইহাতে দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। (পরিব্রাজকের অপরাপর প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা আমার স্মরণে আসে নাই) সম্প্রতি পরিব্রাজকের ভক্ত শিষ্য তদীয় যোগাশ্রমাশ্রিত কবিরাজ শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় অপর প্রবন্ধগুলির সাদৃশ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন অনুসন্ধান করিলে হয়তো আরও ঈদৃশ সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

* এই 'না' টি ছাপার ভুল (১ম সংস্করণ ১৪৪ পৃঃ ১৯ পং দ্রষ্টব্য।

থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয় তবে আমার জন্য কিছু মাত্র দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার বলিবার অধিকার পাই তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না। (১৫০—১৫১ পৃষ্ঠা)

(গ) এক একটি মনুষ্য এক একখানি পুস্তক বিশেষ, গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট; জন্ম জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল, ইহার সূচীপত্র, শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন বার্দ্ধক্যাদি ইহার এক একটি পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র, সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে, তাহারা যেন সাদা মলাটে মোড়া সামান্য পুস্তক, যাহারা ধনাঢ্য রাজা বা মহারাজা, তাহারা ভাল বাঁধাই করা সোণার জলে কাজ করা মলাটে মোড়া এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। (পুষ্পাঞ্জলি "মানবগ্রন্থ" ৫ পৃষ্ঠা)

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে ঠিক এই সকলই আছে তবে কর্ম্মফলের পূর্ব্বে "জন্মজন্মার্জ্জিত" শব্দ "শৈশবও" কৈশোরের মধ্যে "পৌগণ্ড" এবং 'তাহারা' শব্দের পরে 'যেন' নাই, উৎসর্গ পত্র' স্থলে 'বিজ্ঞান' (অর্থাৎবিজ্ঞাপন *) ধনাঢ্যস্থলে 'বড়লোক' আছে। এবং পরবর্ত্তী 'যাহারা' 'তাহারা' তে মস্তমার্থক "৺" যোজিত হইয়াছে। (১৫২ পৃষ্ঠা)

একজনকে উপদেশ দিতে গিয়া এইরূপ অলঙ্কারের অবতারণা গুরুগম্ভীর মহাত্মা স্বামীজির পক্ষে শোভন কি না বিবেচ্য। এই প্রকরণ আরম্ভ করিবার সময়ে উমাচরণ বাবু "মানব" তুমি বিদ্বান্ হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিতেছ" এইরূপ লিখিয়াছেন অর্থাৎ 'মানব' এই সম্বোধন পদ এখানেও ব্যবহার করিয়াছেন—যদিও শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলিতে এই বাক্যটি থাকিলেও ঐ সম্বোধন পদটি নাই। (১৫১ পৃষ্ঠা—১৭ পংক্তি)

---

* প্রথম সংস্করণ ১৪৬ পৃষ্ঠা—১৩ পংক্তি দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

[illegible]

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিত্য আহরণ করিতেছি, অথচ যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাসি বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অত্যদ্ভুত গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি—শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মূল্য মাত্র ২৷৵০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্রে সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা; মূল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

Registered No. C. 583
২৩শ বর্ষ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।
সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২৩শ বর্ষ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

আত্ম-প্রসাদ।

অন্তর যবে বিশ্ব ব্যাপিয়া
করিতে পারিবে আপনা দান।
বিশাল হৃদয় মাঝারে তখন
আত্ম-প্রসাদ লভিবে প্রাণ॥
"আমি" ও "আমার" রেখাটি টানিয়া
করেছি সংসার রচনা।
হইবে না কভু ভূমার সন্ধান
থাকিতে বিন্দু বাসনা॥
তাই প্রাণপণে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া
আপনারে এস মুক্ত করি।
চিত্ত মুকুরে হবেন প্রকাশ
চির প্রকাশিত দয়াল হরি॥

শ্রীমতী ভবরাণী
৺কাশীধাম।

মানুষ হওয়া।

মানুষ ত কতই আছে কিন্তু তুমি বল একনিষ্ঠ না হইলে মানুষের মত মানুষ হওয়া হইল না। মানুষের মত মানুষ যিনি তিনি সদা আপনাতে আপনি তুষ্ট; দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই; রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই; শুভ আসিলেও হর্ষ নাই, অশুভেও দ্বেষ নাই—এই ভাবে মানুষ যিনি, তিনি তোমাতে মিশিয়া তোমার মত থাকেন—তোমার মত কর্ম্ম করেন, তোমার মত সব করিয়াও সদা আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আপনাতে সন্তুষ্ট, আপনার মধ্যে সব দেখেন, সবার মধ্যে আপনাকে দেখেন; তুমি বলিতেছ তোমাতে কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া এইরূপ মানুষ জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়; এইরূপ মানুষ তোমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ দেখিয়া শান্তি লাভ করেন। তুমি বলিতেছ তৈল না থাকিলে যেমন প্রদীপ জ্বলে না, সেইরূপ তুমি না হইলে—তোমাকে না পাইলে মানুষ, মানুষ হইয়া বাঁচে না। তুমি বল মানুষ যে হইয়াছে সে তোমার স্মরণ ভিন্ন একক্ষণও থাকিতে পারে না; সে যাহা করে তাহাতেই তোমার পূজা করে, তোমাকেই নমস্কার করে, যা করে, যা খায়, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবই তার তোমাতে অর্পিত হয়—তুমিই তার মধ্যে থাকিয়া সব কর। মানুষ যে হইতে চায় তার জন্য তুমি বল—

> "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪

সর্ব্বভূতের আত্মাই আমি—আত্মাই সার পদার্থ অনাত্মা যাহা তাহা অসার—তাহা অগ্রাহ্যের বস্তু কাজেই সমস্ত প্রাণীই আমি এইটি যিনি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারেন তিনি মন্মনা হন। তুমি মন্মনা হও, আমার ভক্ত—আমার সেবক হও, আমার পূজা পরায়ণ হও—কর্ম্ম দ্বারা আমার পূজা কর; সবই আমি এই দেখিয়া দেখিয়া আমাকে সর্ব্বদা নমস্কার কর—এই প্রকারে মৎ পরায়ণ হও—সকল অবস্থাতে আমিই তোমার গতি এই ভাবিয়া শরণাপন্ন হও, এই ভাবে আমাতে মন সমর্পিত কর আমাকেই পাইবে। তোমার সবই আশ্চর্য্য—যাহাকে তুমি মানুষ কর তারে দেখাইয়া দাও—অনুভব করাইয়া

দাও—তুমিই তার মধ্যে থাকিয়া কার্য্য কর—এতদিন সে যাহা ছিল তাহাতে তোমার সে ছিল না তার মধ্যে যেন একটা ভূত ছিল—সে ভূতাবিষ্ট হইয়া কখন কি করিয়া ফেলিয়াছে—এখন তোমার মন্দিরে আর ভূত নাই—তোমার মন্দিরে তুমি আসিয়াছ; তুমিই তোমার পূজা করিতেছ, তুমিই তোমার ধ্যান করিতেছ, তুমিই তোমার আপনার নাম আপনি জপ করিতেছ—এই কি রঙ্গ তোমার? হায়! তাহা তুমি না দেখাইলে কেহ দেখে না।

আহা! যাহাকে তুমি মানুষ করিয়াছ তাহাকে বলিতেছ

"মৎচিত্ত মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯

যাঁহাদের চিত্ত আমাতেই আসক্ত—চিত্ত আমা ছাড়া আর কিছু লইয়া সুখ পায় না, যাঁহাদের প্রাণ আমাতেই অর্পিত—আমাকে ছাড়িয়া যাঁহারা ক্ষণ-কালও প্রাণধারণ করিতে পারেন না; এইরূপ ভক্ত শাস্ত্রমত প্রমাণে পরস্পর পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সর্ব্বদা আমার কথা কহিয়া—আমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ পান এবং আত্মারাম হইয়া অবস্থান করেন।

যাহাকে তুমি মানুষ কর তাহাকে তুমি শিক্ষা দাও

মৎ কর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৫

যে আমার আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করে—আমার প্রীতিজন্য কর্ম্ম করে—কোন ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করে না; আমি যার পরম পুরুষার্থ—যে বুঝিয়াছে সে কিছুই পারে না আমি তার মধ্যে থাকিয়া তার সকল কর্ম্ম করিয়া দিতেছি, সে আমার আশ্রিত—আমার ভক্ত; পুত্র বলিয়া, কন্যা বলিয়া, পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, সে আর কাহারও সঙ্গ করিতে পারে না—আমি ভিন্ন কোন কিছুরই পশ্চাতে আর সে ছোটে না—কোথাও তার আর আসক্তি নাই—সে একা আমারই সঙ্গ করে, নির্জ্জনে আমাকে লইয়াই বসিয়া থাকে; কাহারও উপরে তার শত্রুভাব নাই—সে যে আমাকেই পাইয়া এমন হয় তার কি কোন সংশয় থাকে? কত বারই না ভগবান্ বলিতেছেন মন্মনা হও—আহা! ইহা না হইলে যে মানুষ হওয়া হয় না। শেষে ভগবান্ আবার বলিতেছেন

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৩০

মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, আমার পূজক হও, মন, বাক্য, কর্ম্ম দ্বারা আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকে পাইবে—তোমাকে ভালবাসি—সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াই ইহা বলিতেছি।

বলিতেছিলাম একনিষ্ঠ না হইলে মানুষের মত মানুষ হওয়া হয় না। আবার ভগবানের না হইতে পারিলে একনিষ্ঠও হওয়া যায় না। কখন কি চিন্তা করিয়াছ ভগবানে একনিষ্ঠ হইতে হইলে কি করিতে হয়? যদি না করিয়া থাক তবে অন্যের নিকটে ইহার উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে—অথবা এই বিষয়ে অন্যের লেখা পড়িবার পূর্ব্বে একবার হৃদিস্থিত শ্রীভগবানকে এই প্রশ্ন কর। প্রবন্ধের এই অংশ পর্য্যন্ত পড়িয়া যতদিন না নিজের ভিতর হইতে ইহার উত্তর পাও ততদিন অন্তরের দেবতাকে ইহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাক উত্তর নিশ্চয়ই পাইবে। আমরা এই জন্যই ইহার উত্তর লিখিলাম না। এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ভগবানের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ কথা কওয়া হইবে ইহাই পরম লাভ।

আর এক কথা যতদিন না সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নিকটে যাচ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাও—যতদিন না সর্ব্বদা বলিতে পার—প্রভু আমি এখন—এই শেষ সময়ে বেশ করিয়া অনুভব করিতেছি **আমার আর কেহ নাই**—কেহই আমার আপনার নয় কেহই আমার সঙ্গে যাইবে না—আমার শেষ সঙ্কটে কেহই আমায় পরিত্রাণ করিতে পারিবে না—মন্ত্র, দেবতা এবং গুরু—এই তিনের একীকরণে যে দীক্ষা স্বরূপে তুমি আমার কাছে প্রকট হইয়াছিলে, হে প্রভু! আমি প্রপন্ন হইয়া কাতর প্রাণে পুনঃ পুনঃ তোমার কাছে যাচ্ঞা করিতেছি তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও—তোমার শিক্ষা মত তোমার কাছেই যাচ্ঞা "তবাস্মি", বলিতেছিলাম যতদিন না মানুষ প্রাণে প্রাণে বলিতে অভ্যস্ত হয় "আমি তোমার" ততদিন মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের ইচ্ছা থাকিবে—মানুষের ইচ্ছা এবং শাস্ত্রপ্রকাশিত ভগবানের ইচ্ছা—আর এই দুই ইচ্ছার একটা বিরোধও থাকিবেই। সাধনা দ্বারা এই বিরোধ মিটাইয়া যিনি দেখিবেন "আমি তোমার" কাজেই আমার ইচ্ছা আর বল করিতে পারিবে না—শাস্ত্রপ্রকাশিত তোমার ইচ্ছাই আমার প্রাণ স্বরূপ হইয়া যাইবে

—গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ইচ্ছাই আমাকে চালাইবে ফিরাইবে—যতদিন ইহা না হইতেছে ততদিন আমার অহং কিছুতেই যাইবে না। আমি তোমার না হইয়া—তোমা হইতে ভিন্ন একটা কিছু হইয়া থাকি বলিয়া আমার ইচ্ছা থাকে—কিন্তু আমি তোমার হইলে আর আমার পৃথক্ ইচ্ছা থাকিবে কিরূপে? এই তত্ত্বটি বেশ করিয়া বুঝিয়া যিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারেন —আহা! যাহা করিতেছি তাহা কি তোমার ইচ্ছা—না না ইহা তোমার ইচ্ছা নহে কেননা কোন শাস্ত্রে এই অশাস্ত্রীয় ইচ্ছা তুমি প্রকাশ কর নাই —ইহা আমার করণীয় নহে—এই ভাবিয়া যিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সংযমী হয়েন—যিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন মনোধাবতি সর্ব্বত্র মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবৎ—মন ত সর্ব্বদাই মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবৎ অশাস্ত্রীয় পথে চলিবেই কিন্তু শাস্ত্র আমাকে যে জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়াছেন সেই জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারেণ পুনঃ পন্থানমানয়েৎ—মনকে পথে আনিতে এই পুনঃ পুনঃ স্মরণই সাধনা।

বুঝিলে না সাধনা কোন্ বস্তু? ঈশ্বর পরায়ণতাই সাধনা—একনিষ্ঠাই সাধনা। একা যখন মনে মনে কথা কও, তখন ইষ্টের সঙ্গে কথা কওয়ার অভ্যাসটি অল্পে অল্পে করিয়া ফেল, লোক সঙ্গে যখন কথা কও তখন সর্ব্ব-হৃদিস্থ আমার ইষ্টের সঙ্গেই কথা কহিতেছি মনে ভাব, যা দেখ তাতেই ইষ্টকে স্মরণে দেখ ইত্যাদি। ধীরে অতি ধীরে বহু দিন ধরিয়া ইহা অভ্যাস কর, সাধক হইতে পারিবে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

কিবা আসে যায়।

(১)

কিবা আসে যায়?

উদ্যানের এক প্রান্তে যদি কোন ক্ষুদ্র ফুল
বৃন্তচ্যুত হয়,
বুকের মাঝেতে তার আছে যে সৌরভভার
কে জানিতে পায়?

(২)

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ধারা, শুকাইলে কোনখানে,
কিবা আসে যায়।

বিশাল তরঙ্গ ভঙ্গে, বিশ্বের অনেক নদী,
পরিপূর্ণ কায়॥

(৩)

এবিশ্বের মাঝখানে যদি কোন ক্ষুদ্রহ্রদি
আতপে শুকায়।
কিবা ক্ষতি পৃথিবীর অনন্ত নরের তাহে
কিবা আসে যায়?

শ্রীহেমলতা রায়।
রাজসাহী।

শ্রীমদ্ভাগবতে সাধনার কথা।

অন্তিম সময় ত আসিয়া পড়িল—আর কতটুকু সময় বা অবশিষ্ট আছে? আপনারা বলুন—এই অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি? অন্তিম যাতনা কত ভয়ানক হইবে তাহার আভাস ত পাইতেছি, মনে ত ভগবানের কোন কিছুই স্ফুরণ হইতেছে না। সর্ব্বদা কিসে যেন আচ্ছন্ন করিতেছে, কখন কত কি—কত অসম্বন্ধ কথা মনের মধ্যে আসিতেছে যাইতেছে, নাম করিবার জন্য ক্ষীণ পুরুষার্থ করিতে চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু নানাপ্রকারের যাতনা, নানাবিধ বিঘ্ন আমাকে কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। যখন তাহাও না হইতেছে তখন শুক পাখীর হরিনাম করার মত নাম উচ্চারিত হইতেছে, কোন ভাব নাই, কোন রস নাই—নামের পশ্চাতে নামীর কোন কিছুই দাঁড়াইতেছে না। আমি নিজের চেষ্টায় আর কিছুই যে পারিতেছি না; শুধু ভয়, শুধু কি হইবে, কোথায় যাইব এই ভাবনা আসিতেছে—অন্তিম বিভীষিকা সময় সময় ব্যাকুল করিতেছে। বলুন এখন আমার কর্ত্তব্য কি? যে শরীরটা আমি নই, যে শরীরটা আমার নয়, শতবার শুনিলাম, শতবার বিচার করিলাম, এখন এই শরীরটা একটু গোলমাল করিলেই মৃত্যুভয় আনিয়া দিল, মরণমূর্চ্ছার বিষম যাতনা স্মরণ করাইয়া দিয়া ব্যাকুল করিল; অথচ বেশ করিয়া জানিলাম দেহটা আমি নই, দেহের মৃত্যুতে আমার মৃত্যু হয় না। এই যে, আমার, তোমার অবস্থা—এই অবস্থায় তোমার আমার করণীয় কি?

আর এক কথা—স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প হয়। গত বারের মরণ মূর্চ্ছায় যখন আমার সমস্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল তখন কে যেন আমার শতজন্মের

অপরাধ সমস্ত জাগাইয়া আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিয়াছিল, আমি আমার কৃত পাপরাশি দেখিয়া বড় কাতর হইয়া সেই কর্ম্মপ্রবোধ কর্ত্তার চরণে পড়িয়া আমি আপনি প্রার্থনা করিয়াছিলাম ঠাকুর আমার পাপের সমুচিত দণ্ড দিয়া আমার এই অসহ্য যাতনা হইতে আমাকে মুক্ত কর—এইভাবে আমার নিজের প্রার্থনাতেই আমার এই উপস্থিত জন্ম হইয়াছে—আমি আপনি নিজে এইরূপ জন্ম প্রার্থনা করিয়া লইয়াছি, এখানে ত নানাপ্রকারের রূঢ় কথা নানাবিধ বিঘ্ন আসিবেই, এ সমস্ত ত আমার স্বকর্ম্মের ফল—তবে সংসার পীড়ন সহ্যইত করিতে হইবে—অত বিরক্ত হইলে চলিবে কেন, নিঃশব্দে সর্ব্বপ্রকার যাতনা সহ্য করিয়া করিয়া ভিতরে সহাস্য বদনে সমস্ত সহ্য করিয়া করিয়া আমার হৃদিস্থিত সাক্ষী ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরিতে হইবে -ইহাই ত এই জীবনের কার্য্য।

রাজা পরীক্ষিতের আর সাতদিন বাকী—তারপরেই কালসর্প দংশন করিবে? কত জ্বলিবে তখন? তারপরে ব্রহ্মশাপে কোথায় বা যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। রাজা ব্যাকুল হইয়া তীরস্থ হইয়াছেন—গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়াছেন।

রাজা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত। ইহাতেও তিনি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিতেছেন। রাজা বলিতেছেন "আমি পাপাত্মা, আমি সাংসারিক কার্য্যে একান্ত আসক্ত ছিলাম; মনে হয় সেইজন্য সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনিই বিপ্রশাপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন; কারণ বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাকিলেও শাপ ভয়ে অবশ্যই আমার বৈরাগ্য হইবে।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার একটি কথার আপনারা উত্তর প্রদান করুন।

সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মৃত্যুদশায় পতিত হইয়া মনুষ্য কোন্ কার্য্যকে বিশুদ্ধ ভাবিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে?

উত্তরে কেহ বলিলেন "যাগ", কেহ বলিলেন "যজ্ঞ", কেহ বলিলেন "তপস্যা," কেহ "যোগ," আবার কেহ বা "দান"কেই বিশুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন।

এমন সময়ে সেই স্থানে শুকদেব অবধূতের বেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। সুকোমল দেহ, দীর্ঘ লোচন, নাসিকা উন্নত, কর্ণযুগল নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ, বদন রমণীয়। তাঁহার কণ্ঠনিম্নস্থ অস্থিদ্বয় মাংসে আবৃত, বক্ষঃ বিশাল ও উন্নত, নাভি আবর্ত্তের ন্যায় গভীর; বেশ দিগম্বর;

কেশকলাপকুঞ্চিত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত; কলেবর শ্যামবর্ণ, পূর্ণ যৌবনের শোভা ও মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা তিনি যেন কামিনীগণেরও মন হরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে চিনিলেন, সকলে শুকদেবের পূজা করিলেন—আর যে সকল বালক ও বালিকা ক্ষিপ্তভ্রমে তাঁহার অনুগমন করিতেছিল তাহার সকলেই ফিরিয়া গেল আর শুকদেব পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তর শেষে শুকদেবই দিতে লাগিলেন।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মানুষ মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিবে; করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ সকল প্রাণীকে বিনাশ করিবেন জানিয়া কাহারও জন্য চিন্তা করিবেনা; সকলের উপর স্নেহ-মমতা ছেদন করিবে। মানুষ নিজে কিছুই করিতে পারে না জানিয়া অন্য সমস্ত ভাবনা উঠিলে এই বলিয়া মনকে শান্ত করিবে যে কোন সময়েই ত আমি কাহাকেও নিরাপদ করিতে পারি নাই, তবে বৃথা ভাবনা করিয়া মনকে উদ্বিগ্ন করি কেন? ঠাকুর আমি আর ভাবিব না, সব ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করিলাম, আমি তোমার নাম লইয়া থাকিলাম, যাহা ভাল তুমি তাহাই কর—আমি তোমার ভাবনাই করি।

এইভাবে পরিজন ভাবনা ত্যাগ করিয়া ধীর ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যতীর্থ জলে স্নান করিবেন এবং নির্জ্জনে আসন রচনা করিয়া—দ্বিজ হইলে পবিত্র ওঁকার মনে মনে অভ্যাস করিবেন কখনও দীর্ঘপ্রণব জপ করিয়া মনকে অন্তর্ম্মুখী করিবেন—দ্বিজেতর হইলে নাম অভ্যাস করিবেন। দীর্ঘপ্রণব জপের পর প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস জয় করিয়া মনকে দমন করিবেন। পরে বুদ্ধির সাহায্যে মন দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিবেন; করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক মনকে ঈশ্বরে ধারণা করিবেন।

ভগবানের সমগ্র রূপই ধ্যান করিবেন এবং তাঁহার এক এক অবয়ব ও চিন্তা করিবেন, করিয়া শান্ত হইয়া যাইবেন—আর কিছুই চিন্তা করিবেন না।

যাহাতে মন শান্ত হয় তাহাই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ। মন যদি পুনরায় রজঃ দ্বারা বিচলিত হয়, অথবা তমঃ দ্বারা জড়প্রায় হয় তাহা হইলে ধীর ব্যক্তি ধারণা দ্বারাই মনকে দমন করিবেন। ধারণাই কেবল রজস্তমঃ সম্ভূত মল নাশ করিতে সক্ষম। ধারণা সিদ্ধ হইলে ভক্তি যোগ শীঘ্র সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ বিষয়েই মনের প্রীতি জন্মে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ধারণা কিরূপে করিতে হইবে কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে ধারণা শীঘ্র মনোমল নাশ করিতে পারে ?

শুকদেব উত্তর করিলেন—আসন, প্রাণায়াম, বিষয়াসঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বুদ্ধি সহকারে ভগবানের বিরাটরূপে মনকে ধারণা করিতে হয়। "বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ"।

বিরাট পুরুষ বিরাট দেহ ধারণ করিয়া ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ; অহং ও মহত্তত্ত্ব এই সপ্তাবরণে আবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। এই বিরাট পুরুষই ধারণার বিষয়।

ভাবনা কর বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, সহস্র-শীর্ষা পুরুষের পাদমূলে পাতাল ; চরণের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগে রসাতল ; গুল্‌ফ (পাদগ্রন্থিতে) মহাতল ; জঙ্ঘা (গুল্‌ফ ও জানুর অন্তরালের অবয়ব) তলাতল, (অথবা পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিগুল্‌ফ—জঙ্ঘার সন্ধি জানু) দুই জানু সুতল ; উরুদ্বয়ের অধঃ ও উর্দ্ধভাগ বিতল ও অতল, জঘন দেশ মহীতল ; নাভিসরোবর নভস্তল। ভাল করিয়া ভাবনা কর, তোমার শরীরের অভ্যন্তরে যেমন অনন্ত অনন্ত কোটি জীব বাস করিতেছে সেইরূপ তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি এই বিরাট পুরুষের দেহে বাস করিতেছি—তোমার আমার দেহে যে সকল জীব চলে ফিরে তাহারা দেহের নানাস্থানে থাকিয়া সংসার করে, পুত্রাদি উৎপাদন করে, বিবাদ বিসম্বাদ করে আবার মরেও।

পাতাল তলে চরণ রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন—নীচের সপ্তলোক পর্য্যন্ত তাঁহার উরুদেশের ঊর্দ্ধভাগ। তাঁহার জঘন দেশ এই পৃথিবী। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি চলে সেইটি তাঁহার নাভি। ধারণা কর এই নাভিদেশ তুমি আমি সদাই দেখি ; আর জঘন দেশ এই পৃথিবীও সদাই দেখি।

মনে মনে কোন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া নাভি ও জঘন দেশ দেখিয়া দেখিয়া এই পুরুষকে চিন্তা কর—আহা ! এই বিরাট পুরুষ কত বড় তাহার ভাবনা কর—বিস্ময়ে হৃদয় ভরিয়া যাইবে।

এই বিরাট পুরুষের বক্ষদেশ স্বর্লোক ; গ্রীবাদেশ মহর্লোক ; বদন জনলোক ; ললাট তপোলোক এবং মস্তক সকল সত্যলোক।

ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাঁহার বাহু, দিক সকল কর্ণ-কুহর, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসাযুগল, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, প্রদীপ্ত অগ্নি মুখ, সূর্য্য চক্ষু, রাত্রিদিন

নিমেষ, উন্মেষ, মন চন্দ্র, ভ্রূভঙ্গ কাল, (নিমেষাধি দ্বিপরার্দ্ধান্তঃ) বুদ্ধি বৃহস্পতি, অহঙ্কার রুদ্র, জল তালু, রস রসনেন্দ্রিয়, বেদ বাক্, দ্রংষ্ট্রাদেশ যম, নক্ষত্র সকল দন্তপংক্তি, হাস্য মোহকরী মায়া; সৃষ্টি কটাক্ষ, ধর্ম্মস্তন, অধর্ম্ম পৃষ্ঠদেশ, সপ্ত-সমুদ্র কুক্ষি, নদী সকল নাড়ী, বৃক্ষওষধী রোম, রেত বৃষ্টি, জ্ঞানশক্তি মহিমা, বায়ু গতি' প্রাণীদিগের সংহার, ক্রীড়া; জলদজাল কেশ, সন্ধ্যা বসন প্রকৃতি হৃদয়, বিহঙ্গ সকল শিল্পনৈপুণ্য ইত্যাদি।

এই বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি স্থূল স্থূলভাবে ধারণ করিয়া বল—

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌঃ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥
নাভ্যা আসীদ্ অন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষু সূর্য্যস্তব প্রভো ॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়িদেব সর্ব্বং।
স্তোতা স্তুতিঃ স্তুব্য ইহ ত্বমেব ॥
ঈশত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং।
নমোঽস্তু ভূয়োপি নমো নমস্তে ॥

বিরাট পুরুষের অবয়ব সংস্থান এইরূপ। মুমুক্ষু যিনি তিনি এই স্থূল রূপে মন ধারণা করিবেন। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ইহার ধারণা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া সৃষ্টি করেন। অতএব মহারাজ ভোগে যত্ন করা উচিত নহে; যতটুকু ভোগ করিলে দেহ রক্ষা হয় তাবন্মাত্র ভোগই কর্ত্তব্য—তাহাতেও আসক্ত হওয়া উচিত নহে—কারণ তাহাতে সুখ নাই। ভূমি থাকিতে শয্যার প্রয়াস কেন? বাহু থাকিতে উপাধানের প্রয়োজন কি? অঙ্গুলি থাকিতে পাত্রের জন্য ব্যস্ত হইবে কেন? বল্কলাদি থাকিতে পট্টবস্ত্র কেন? পথে কি চীরখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে কি ভিক্ষা পাওয়া যায় না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? গিরি-গুহা কি কেহ রোধ করিয়াছে? হরি কি ভক্তদিগকে রক্ষা করেন না? তবে ধনিকদিগের উপাসনা করা কেন?

এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতঃ সন্ নিয়তার্থো ভজেত
সংসার হেতু পরমশ্চ যত্র ॥ ২।২।৬

হরি সকলের অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছেন। তিনিই আত্মা, তিনিই অত্যন্ত

প্রিয়। নিশ্চিতস্বরূপ শ্রীহরির প্রতি চিত্তধারণা দ্বারা নির্বৃত হইয়া তাঁহাকেই ভজনা কর; তাঁহাকে ভজিলে সংসারের হেতুভূতা অবিদ্যারও উপশম হইবে।

মনকে এই বিরাট পুরুষে ধারণা কর। আহা! সংসারটা বৈতরণী নদী। জীবগণ এখানে পড়িয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে। এখানে পশুতুল্য ব্যক্তি ভিন্ন হরির চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিন্দনীয় বিষয় চিন্তায় কাল হরণ আর কে করে?

এই হরিকে কেহ কেহ হৃদয়দেশে ধারণা দ্বারা চিন্তা করেন। "আমি তোমার" বলিয়াই চিন্তা করিতে হয়। তাঁহার চারিভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, বদন সুপ্রসন্ন, লোচন পদ্মপলাশবৎ আয়ত, বসন কদম্ব-কিঞ্জল্কের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ, মস্তকে, কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে কৌস্তুভ, গলে বনমালা, অঙ্গ সকল মেখলা, অঙ্গুরীয়,নূপুর ও কঙ্কণে অলঙ্কৃত,কেশপাশ আকুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল মনোহর হাস্যে সাতিশয় মনোরম। যতক্ষণ মন ধারণা দ্বারা স্থির থাকে ততক্ষণ সেই চিন্তামণি ঈশ্বরকেই চিন্তা করিবে। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার যুগল পদপল্লব হৃদয়পদ্মের কর্ণিকা রূপ আলয়ে রাখিয়া সতত চিন্তা করিবে, যোগিগণ এইরূপে চিন্তা করেন।

শ্রীহরির চরণ অবধি আস্য পর্য্যন্ত যাবতীয় অঙ্গ এক এক করিয়া ধারণা পূর্ব্বক ধ্যান করিতে.হয় এবং নিম্ন অঙ্গ এক এক করিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক উত্ত-রোত্তর শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সমূহ চিন্তা করিবে। যতদিন না বিশ্বের সাক্ষী পুরুষে ভক্তি জন্মে ততদিন নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ এক মনে তাঁহার স্থূলতর রূপ চিন্তা করিতে হইবে।

আর এক কথা আত্মা ভিন্ন সকল বস্তুকেই "ইহা আত্মা নহে ইহা আত্মা নহে" এইরূপ ভাবিয়া অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি ছাড়িয়া হৃদয় দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রতিক্ষণে চিন্তা করিবে। স্মরণ রাখিও প্রাণিগণ ভগবানের ধ্যান না জানাতে জননমরণরূপ দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছে। শুক-দেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন "হরি কথা শ্রবণ করিলে যে জ্ঞান জন্মে তদ্দ্বারা গুণের তরঙ্গ-স্বরূপ রাগাদি দূর হয়, আত্মা প্রসন্ন হন, এবং সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। এই জন্য উহা মুক্তিপথ বা ভক্তিপথ। বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলে বিজ্ঞানবলে বিষয় বাসনা নষ্ট হইবেই।"

তখন সেই সভায় হরিকথা কীর্ত্তনের ফলাফল ব্যাখ্যাত হইল।

যে ব্যক্তি হরির গুণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারই পরমায়ু কেবল সফল। সকলেই ত সব করে কিন্তু হরি কথা যে ভাল করিয়া শুনে না সে পশুতুল্য। যে কর্ণ কখন হরি কথা শুনিল না সে বিবর মাত্র; যে জিহ্বা হরিগুণ-গানে বিরত তাহা ভেক জিহ্বার ন্যায় নিন্দনীয়; যে মস্তক মুকুন্দের পদারবিন্দে প্রণত না হইল সে মস্তক দেহের বৃথা ভার মাত্র। যে হস্ত শ্রীহরির চরণে কুসুমার্পণ না করিল সে হস্ত কাঞ্চন বলয়ে বিভূষিত হইলেও মৃত ব্যক্তির বাহুর ন্যায় নিষ্ফল। যে চক্ষু শ্রীহরির রূপ দর্শন না করিল সে চক্ষু ময়ূর পুচ্ছ-নেত্রের ন্যায় অনর্থক সুদৃশ্যমাত্র। যে চরণ হরিক্ষেত্রে গমন না করিল সে চরণ বৃক্ষ মূলের তুল্য। যে মানুষ ভগবদ্ভক্তগণের চরণরেণু ধারণ না করিল সে জীবিত থাকিয়াও শব। যে জন হরিপাদপদ্ম—তুলসী ঘ্রাণ না লইল শ্বাস প্রশ্বাস টানাফেলা করিবার শক্তি সত্ত্বেও সে ব্যক্তি মৃত।

কিসে হরিভক্তি জন্মে শুকদেব নানাভাবে এখানে তাহাই বলিলেন, আবার বলিলেন ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ সমালোচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক "কিসে হরিভক্তি জন্মে" ইহা স্থির করিয়াছিলেন।

যিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন দ্রষ্টা স্বরূপ ভগবান্ অন্তর্যামী রূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই একমনে সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বসময়ে শ্রীহরির সহিত কথা কহিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবেন, গুণ কীর্ত্তন করিবেন, করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার

নাও।

চাহিতে পারি না আর দাও দাও বলে।
শতেক অভাব শুধু পুরাইতে ছলে।
নাও শুধু তাই আজি বলি বার বার।
নিয়ে নাও আমা হতে, আমি টি আমার।

শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবী।

৺কাশীধাম।

বিশ্বাসের ধর্ম্ম।

মানুষ ত সুখী হইবার জন্য কত কি করিতেছে কিন্তু সুখী হইতেছে কি? নাচ, গান, থিয়েটার, বায়স্কোপ গ্রামোফন, হারমোনিয়ম, রেডিও—আর কত কি—সব কি আর জানি? কত কি ত করিতেছে মানুষকে সুখী করিবার জন্য—কিন্তু মানুষ কতক্ষণ সুখ পাইতেছে?

বাহিরের বস্তু দিয়া মানুষকে একটু ভুলাইয়া রাখা যায় সত্য—কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য। বাহিরের কোন কিছু দিয়া মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়কে যুগপৎ জুড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাই যদি হয় তবে মানুষ জুড়াইবে কিসে? আমরা বলি ঈশ্বর ভিন্ন মানুষের জুড়াইবার বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ যিনি তাঁহাকে জানিবার জন্য বিচার কর তোমার বুদ্ধি গন্তব্য পথে চলিল—ইহাতে যে বিচার আসিতেছে অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব জন্য যে বিচার করিতে হয় তাহাতে তোমার বুদ্ধি তৃপ্ত হইল; আর তোমার হৃদয় জুড়াইল এই পূর্ণ চৈতন্য যখন তোমার শান্তচিত্তসরোবরে প্রতিবিম্বরূপে—ঈশ্বররূপে ভাসিলেন তখন। ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বর তোমারচিত্তে ভাসেন কখন? না যখন তোমার চিত্ত নির্ম্মল হয়, রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া শুদ্ধ হয়। সূর্য্য আকাশে কিরণমণ্ডিত হইয়া আছেন আর সরোবরের নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সুন্দর হইয়া ঝক্‌মক্ করিয়া ভাসে। এই প্রতিবিম্ব জলের মধ্যে সর্ব্বদাই আছে। সেইরূপ তোমার চিত্তে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব ঈশ্বর সর্ব্বদাই আছেন। ঈশ্বর যদি সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে থাকেন তবে দেখা যায় না কেন? জলে সূর্য্য প্রতিবিম্ব সর্ব্বদা থাকিলেও জল যদি চঞ্চল হয় তবে সেই প্রতিবিম্ব নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যায়—ঈশ্বর থাকিলেও—সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকিলেও চিত্ত রজোগুণে নিতান্ত চঞ্চল বলিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে দেখা গেল না। আবার যখন চিত্ত তমোগুণে অভিভূত হয় তখন সবই অন্ধকার—কোন কিছুই স্ফুরণ হয় না। সবই অপ্রকাশ। তাই বলা হইতেছে চিত্ত যখন শান্ত থাকে তখন প্রকৃতি, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকেন—এই শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতিতে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু রজস্তম গুণে আচ্ছন্ন হইলে চিত্ত চঞ্চল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় বলিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে দেখা যায় না।

তোমার আমার সকলের ভিতরে ঈশ্বর ত আছেনই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? পাই না—আমরা রজোগুণে ও তমোগুণে আচ্ছন্ন বলিয়া দেখিতে পাই না—জল চঞ্চল ও ঘোলা বলিয়া ঈশ্বর বা ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায় না। শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন ঈশ্বর যে সর্ব্বহৃদিস্থ ইহা তুমি শাস্ত্রমুখে ও শাস্ত্রমত চলিতেছেন এরূপ গুরু মুখে শুনিয়া এবং সৎ শাস্ত্রে দেখিয়া বিশ্বাস কর ঈশ্বর তোমার, আমার, সকলের হৃদয়ে আছেন।

বলিতেছিলাম বিশ্বাস কর ঈশ্বর আছেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—ঈশ্বর সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রাণীর এমন কি সকল বস্তুর মধ্যে আছেন। এই ঈশ্বর কি করেন? যাঁহারা চিত্তকে নির্ম্মল করেন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান তাঁহারা দেখেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামাত্মমুক্তি প্রদায়কম্" শিবসংহিতা ১। ২ ইহা বলিতেছেন। দেখিতে না পাইলেও বিশ্বাস করি এস তিনি আমার হৃদয়ের রাজা হইয়া আছেন—হৃদয় অর্থ ই হইতেছে "হৃদি অয়ং" অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছেন এই হৃদয়ে তিনি আছেন।

বলিতেছি বিশ্বাস কর তিনি আছেন আর তিনি সর্ব্বদা তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। যেমন তোমার গৃহস্থিত তোমার ইষ্টদেবতার প্রতিমূর্ত্তির নিকটে যখন তুমি উপবেশন কর, করিয়া যখন তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাও তখনই তুমি দেখিতে পাও তিনি তোমারই দিকে চাহিয়া আছেন সেইরূপ যখন বিশ্বাসেও ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে আছেন জানিয়া তুমি তাঁহার উপাসনা কর, যখন তাঁহার সমীপে উপবেশন কর, করিয়া তাঁহার নাম জপিয়া হৃদয়কে শান্ত কর, করিয়া হৃদয়কে রজস্তম হইতে মুক্ত করিয়া চিত্তকে সুস্থির কর, যখন একদিকে এই সপ্তাবরণ মিথ্যা, অন্যদিকে তুমি মাত্র সত্য এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যে চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিয়া চিত্তকে শান্ত করিতে পারিলেই বুঝিতে পার তিনি বড়ই দয়াময়, তিনি বড়ই কল্যাণময়; তিনি তোমার সব অপরাধ, সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া, তোমাকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া তোমার সবই করিয়া দিয়া থাকেন শেষে তিনি হাতে ধরিয়া মৃত্যু সংসারসাগরের পরপারে তাঁহার স্বধামে তোমাকে লইয়া যান—বল দেখি তখন তোমার কোন্ ভয় থাকে? তুমি তাঁহার নিকটে যাহা চাও তাহাই তিনি দিয়া থাকেন।

বলিতেছি বিশ্বাস কর এই দয়াময়, ক্ষমাসার ঈশ্বর তোমার আছেন তিনি ভিন্ন আর কেহই তোমাকে সুখ-স্থায়ীসুখ দিতেই পারে না—তিনি ভিন্ন

তোমাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না—তিনি ভিন্ন কেহই তাঁহার আজ্ঞা পালনের কর্ম্ম সুচারুরূপে করাইতেও পারে না—আর সব মিথ্যা আর সব অগ্রাহ্যের বস্তু তিনিই তোমার আপনার—তোমার ইষ্টদেবতাই,তোমার ইষ্টমন্ত্রই তোমার রক্ষাকর্ত্তা—ইষ্টমন্ত্রই তাঁহার সূক্ষ্মদেহ, ইষ্টমূর্ত্তি তাঁর স্থূলরূপ এই তিনিই বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন তুমি এই সপ্তাবরণকেও তাঁহারই আবরক মূর্ত্তি জানিয়া বিশ্বাসেও এই সপ্তাবরণের অন্তরালে তাঁহার স্মরণ কর, প্রতিকার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম কর, প্রতিবাক্য উচ্চারণ কালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কথা কও, প্রতি ভাবনায় তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া বল তিনিই তোমাকে সংসার হইতে মুক্তি দিয়া দিবেন। তুমি তাঁহাকে লইয়া, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া যাও, সর্ব্বদা তাঁহার নাম জপিয়া জপিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কও—মানুষের সঙ্গে কথা কহি-বার কালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যেন তাঁহারই সঙ্গে কথা কহিতেছি মনে রাখ—এই বিশ্বাসের ধর্ম্ম পালন করিবার জন্যই সাধনা—প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ইহারই অভ্যাস কর এবং সৎ সঙ্গে ও সৎ শাস্ত্রে এই কথাবার্ত্তা দৃঢ় কর নিদানের এই সখাই তোমাদের উদ্ধার করিবেন নিশ্চয়ই।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

সন্ধান পাইলে কি ?

"আমি কে" চিত্তে মিশাও, সন্ধান মিলিবে না, চিত্তকে আমিতে মিশাও সন্ধান পাইবে। তাই বলি সন্ধান কি পাইলে, যে নাম কর, সেই নামের নামী কে ? নাম করিতেছ, আর দেখিতেছ আমি নাম করিতেছি। এই দ্রষ্টা যখন নামের সঙ্গে মিশিয়া গেল অথবা নাম, নামের দ্রষ্টা যে আমি, আমাকে ছাইয়া ফেলিল—তখন আমি ও নাম এক হইয়া গেল। কাজেই যাহার নাম করিতেছিলাম, তাহার রূপ, গুণ, লীলা স্বরূপ আমাকে ডুবাইয়া—নামী হইয়া কি জানি কি এক আনন্দে ভরিত করিল। বুঝিলে কত সাবধানে, কতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিলে নাম ও নামী এক হইয়া যাইবে ?

আবার দেখ। যখন নাম করিতেছ, মন আর অন্য কোথাও যাইতে পাইতেছে না, তখন চিত্তের আর বৃত্তি উঠিতেছে না—চিত্ত আর অন্য আকারে

আকারিত হইতেছে না, চিত্তই নামের শব্দে নাম হইয়া যাইতেছে। আমি, আমার নাম শব্দরূপী বৃত্তিকেই দেখিতেছি। অথবা আমি আমার উচ্চারিত নামের রূপমাখা চিত্তকেই দেখিতেছি, অথবা আমার উচ্চারিত নামের গুণমাখা, বা লীলামাখা, বা স্বরূপমাখা চিত্তকেই দেখিতেছি। আরও সূক্ষ্ম কথা দেখ, নামের রূপ ধরিয়া চিত্ত যখন রূপ ধরিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই রূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লীলা জড়িত রহিল—আকারটি আর কি?—হস্ত, পদ, চক্ষু—ইহাদের সঙ্গে ইহাদের কর্ম্মগুলি জড়িত ত থাকিবেই। কাজেই চিত্ত যখন নামের রূপ ধরিল—চিত্ত যখন নামের আকারে আকারিত হইল তখন ত লীলাগ্রন্থ প্রকাশিত সমস্ত লীলাই পাইলে। চরণ যখন দেখিতেছ তখন পাষাণী বক্ষে থুইয়া যে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার লীলা কি আসিল না—একজন যোড় হস্তে স্তব করিতেছেন, আর একজন স্মেরাননে বিস্মিত হইয়া চরণ তুলিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর একজন নিস্পন্দ হইয়া পাষাণ ভেদ করিয়া যিনি উঠিলেন কখন তাঁহাকে দেখিতেছেন কখন বা যাঁহার চরণরেণু পাষাণকে মানবী করিল কি জানি কেমন হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন—আর একজন জপিতে জপিতে দেখিতেছেন আহা! এই সেই।

বল না—সন্ধান কি মিলিল? প্রথমেই আপনার চিত্তকেই যে দেখিতেছ সেইটি বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ। যাহার চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল—যাহার চিত্ত নানা প্রকারের বস্তু দেখিয়া—বাহিরের বস্তুর আকারে দণ্ডে দণ্ডে আকারিত হইতেছে সে সেই পরম বস্তু ধরিবে কিরূপে? তাই চিত্তকে বহু আকারে আকারিত হইতে না দিয়া এক আকারে আকারিত কর। সেই জন্য চিত্তটাকে নামের শব্দরূপে পরিণত কর। পরে নামীর আকার, গুণ, লীলা স্বরূপে আকারিত করিতে সহজেই পারিবে। এই জন্য সৎসঙ্গে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও স্বরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ চাই আবার সৎশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উহাদের মননও চাই। তবেই যে চিত্তকে দেখিতেছ চিত্ত তার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গেলে আনন্দে ভরিত হইবে তখন তুমি সব ভুলিয়া—বাহির অন্তরে আনন্দ হইয়াই থাকিলে। ইহাতেই নামে ডুবিয়া যাওয়া হইল; ইহাতেই স্বরূপের সন্ধান মিলিল—আর স্বরূপ হইয়া আনন্দে স্থিতি লাভ করা হইল। কি জানি কে যেন বলিয়া গেল ইহাই সন্ধান পাওয়া।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।
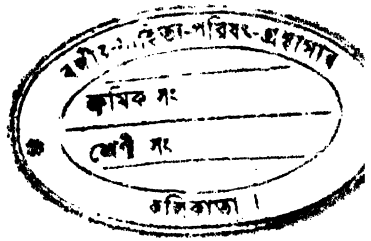
রামলালা।

সকল সময়ে সব কাজ সে করিতে দেয় না--কাজ ফেরি করিয়া লইলে আবার দেয়। রঙ্গটা দেখিতে জানিলে তবে হয়।

চারিধারে দুঃখের ছবি দেখিয়া আমার হৃদয় ত দুঃখেই ভরিয়া যায় রঙ্গ আসিবে কিরূপে?

কপাল তোমার! কিন্তু যে এই সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহস্য করিতেছে একবার তার দিকে চাহিয়া দেখিতে পার?

শাস্ত্রে ত শুনি নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া সেই মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বত্র বিহার করিতেছে। কিন্তু দেখি কৈ? বাপু! দেখ বৈ কি? সে কথা পরে হইবে। কিন্তু বিশ্বাস ত কর যেখানে যা কিছু হইতেছে সেখানে নন্দলালা আছে বা রামলালা আছে? তার প্রকৃতি লইয়া সে রঙ্গ করে, কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন কত কি করে এতে তোমার দুঃখটা কেন?

তাইত রামলালা ত বড় দুষ্টু। ঐ দেখ ঐ লোকটাকে চীৎকার করাইতেছে আর বলাইতেছে নন্দরাণী মাগো—দেমা চারিটি খেতে—আর পরক্ষণেই দেখ আর একজনকে বলাইতেছে একটা ভাঙ্গা বাটী দে মা রাখবার কিছু নাই আবার তৎক্ষণাৎ বলাইতেছে জগবন্ধু দরশনে মন চল না—আচ্ছা বল দেখি একজনের এই রঙ্গ দেখিলে হাসি পায় কি না?

তা পায়! কিন্তু জাতিটা খেতে না পেয়ে মরিয়া যাইতেছে ইহাও কি রঙ্গ?

আরে! তার জাতি সে রাখ্‌তে হয় রাখ্‌বে মারতে হয় মারবে—জাতি মরিল জাতি মরিল বলিয়া তুমি ছিচ্‌কাঁদুনে হও কেন? দেখনা সে কি করে তুমি তোমার কাজ কর—তার আজ্ঞা পালন কর আর দেখ সে তোমার মধ্যে, —সবার মধ্যে থাকিয়া কি করে। জগৎটা ত তারই, প্রকৃতি তারই, সে যা করে করুক তুমি তাই দেখিয়া দেখিয়া তার রঙ্গ দেখ আর তাকে দিয়া তোমার কর্ম্ম তার আজ্ঞা পালন করাও।

তাই ত এত চমৎকার রহস্য। ঐ দেখ একটা বিড়াল ছাদের উপরে ধীরে ধীরে গদাই লস্কর চালে চলিয়াছে আর দেখ ঐ মানুষটা ধীরে ধীরে তার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ শব্দ করিয়া অঙ্গ ভঙ্গ করিতেছে আর বিড়ালটা ভয় পাইয়া দৌড়িতেছে আবার কতদূর দৌড়িয়া গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া লোকটাকে একবার দেখিয়া লইয়া—আবার ভয়ানক ভাবে পলাইতেছে—এই রকম রঙ্গই সব দেখিতেছি। আর দেখিতেছি—রাম লালা বড় দুষ্ট, বড় রহস্য ময়—কত লোককে কত কি করায়—লোকে দুঃখ করে মিথ্যা দুঃখ মিথ্যা কান্না—মিথ্যা হাসি—যে আছে সেই আছে—একটা মিথ্যা লইয়া রঙ্গ ত? এই দেখিয়া যাও আর কর্ত্তব্য করিয়া যাও বা তার আজ্ঞা তাকে দিয়াই পালন করাইয়া লও। কেমন? মনে রাখিবে ত রামলালার রঙ্গই সব।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডের উপক্রমণিকার কিছু।

(এই উপক্রমণিকায় রামায়ণের সৌন্দর্য্য, মঙ্গলাচরণ, বহুপ্রকারের স্তবস্তুতি. চরিত্রগঠনের জন্য শাস্ত্রীয় উপদেশ ইত্যাদির কতক কতক পূর্ব্বে উৎসবে প্রকাশিত হইয়াছিল—এই সমস্তই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় স্তবক।

শ্রীগুরুঃ—স্বরূপ ভাবনা।

[১]

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরু তং নমামি॥

তুমি সদ্‌গুরু। তোমাকে নমঃ করি—সদ্‌গুরুকে নমস্কার করি। কি করিয়া নমঃ করিতে হয়? "ন মম" "আমার" কিছুই নয়, এই যখন প্রাণে প্রাণে বলা হয়, তখনই নমস্কার করা হয়। এই যে 'আমার' 'আমার' মানুষ

করে, মানুষ একান্তে গিয়া যখন স্বরূপ ধরিয়া বিচার করে "আমার" কি আছে তখন বুঝিতে পারে "আমার" যাহা তাহা স্বরূপ নহেন, তাহা সদ্‌গুরু নহেন। একান্তে গিয়া সমস্ত "আমার" ত্যাগ করিতে পারিলে যিনি থাকেন তিনিই স্বরূপ, তিনিই সদ্‌গুরু। 'আমার' যত দিন আছে ততদিন মানুষ 'অনাত্মা' লইয়া থাকে। অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে মানুষ বলে তুমি আমার আত্মা। কিন্তু 'আমার' থাকিতে আত্মা পাওয়া যায় না। প্রিয় ব্যক্তি আত্মা নহেন— আত্মীয়। সমস্ত আমার ত্যাগ হইলে আত্মাকে পাওয়া যায়। ইনিই সদ্‌-গুরু। ইঁহাকেই বলিতে হয় সব তোমার—আমার বলিয়া আমার কিছুই নাই।

এই সদ্‌গুরু কিরূপ? ইনি ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ বলিলে কি বুঝি? আনন্দ বস্তুটির ত কোন আকার নাই। কোন আকার নাই সত্য কিন্তু যখন ইনি বিষয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়েন তখন ব্রহ্মানন্দকেই বিষয়ানন্দ বলে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দ রূপে প্রকাশিত হয়েন। রূপে, শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে ও রসে যখন আনন্দ পাওয়া যায় তখন যে পুরুষ সেই ক্ষণিক, খণ্ড আনন্দকে সমস্ত আনন্দের আধার যিনি, সমস্ত আনন্দের পূর্ণতা যেখানে—সেই পূর্ণানন্দে, সেই ব্রহ্মানন্দে ফিরাইতে পারেন, বহির্মুখতা দূর করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া বলিতে পারেন আহা! সদ্‌-গুরুই ত আনন্দ সমুদ্র—এই আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গ ক্ষুদ্ররূপে ভাসিয়া ছিল— ক্ষুদ্র ত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়—ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই, আমার প্রয়োজন বিষয়ানন্দে নহে, আনন্দ জলধিতে—ইহা ভাবনা করিয়া ক্ষুদ্র আনন্দে, বিষয়ানন্দে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহাকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপ সদ্‌গুরুর দিকে যিনি ফিরিতে পারেন বিষয়ানন্দের ভোগ ছাড়িয়া যিনি ব্রহ্মানন্দের সন্ধান করেন তিনিই সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন।

ব্রহ্মানন্দ যেমন বিষয়ের ভিতর দিয়া খণ্ড মত হইয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ যখন ইনি বাসনার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হন তখন ইহাঁকে বাসনানন্দ বলে। সুষুপ্তিতে যে আনন্দ ভোগ হয়—যখন জাগ্রতের বিষয়ও থাকে না, নিদ্রার সংস্কারও থাকে না তখন কোন প্রকার কাম কামনা নাই, কোন প্রকার স্বপ্ন সংস্কারও নাই বলিয়া অজ্ঞানে এক অখণ্ড আনন্দের সঙ্গ হয়। নিদ্রাভঙ্গে যিনি স্থির হইয়া ভাবিতে পারেন—এইত এতক্ষণ কোন বিষয়ও ছিল না, কোন

স্বপ্ন সংস্কারও ছিল না—আহা বেশ ত ছিলাম—কোন ভাবনা ছিল না, কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না—বেশ ছিলাম—বাসনাতে সেই ব্রহ্মানন্দের যে ভাবনা তাহাকেই বলে বাসনানন্দ। বিষয়ানন্দ অপেক্ষা বাসনানন্দে—ব্রহ্মানন্দের অতি নিকটে যাওয়া যায়। কেবল সুষুপ্তির অজ্ঞানে ব্রহ্মানন্দকে ধরা যায় না। সাধনা দ্বারা সুষুপ্তি লাভ করিয়া এই ব্রহ্মানন্দের অপরোক্ষানুভূতিতে ডুবিতে পারা যায়। বিষয়ানন্দ এবং বাসনানন্দ সমস্তই ক্ষণিক—ক্ষণিক ত্যাগ করিয়া নিত্যব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারিলেই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? ইনি পরম সুখদ—ইনিই শ্রেষ্ঠ সুখে—ইনিই নিরতিশয় সুখে ডুবাইয়া রাখেন। সদ্‌গুরু ভিন্ন আর কেহই এই অখণ্ড সুখের অধিকারী করিতে পারে না। সমস্ত সুখ অগ্রাহ্য করিয়া এই পরম সুখদকে বুঝিয়া তাঁহাতেই ডুব দিতে হয়। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" ব্রহ্মানন্দই সুখের খনি। সর্ব্বপ্রকার আনন্দ ত এইখান হইতেই আইসে। সূর্য্য পাইলে আর রশ্মি পাইবার আকাঙ্ক্ষা ত থাকে না। ব্রহ্মানন্দ, পরম সুখদ সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইয়া আর ক্ষুদ্র খণ্ড আনন্দের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বৃহৎটি পাইলে তাহার অন্তর্ভূক্ত সমস্ত ক্ষুদ্রই পাওয়া হইয়া যায়।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? তিনি কেবল—তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্বই নাই। এই ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ সদ্‌গুরুর সত্তা অবলম্বন করিয়া তাঁহাতেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভাসিয়াছে, সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কোন কিছুর সত্তাই নাই। সদ্‌গুরুর শক্তিই তাঁহার উপরে এই বিচিত্র জগৎকোটি ভাসাইয়া তাঁহাকেই জগদ্রূপে দেখাইতেছে। ঠাকুর! তুমি আছ আর কিছুই নাই—কাজেই অন্য অভিলাষ আর থাকিবে কিরূপে? তোমার অভিলাষে যখন হৃদয় ভরিয়া যায় তখন আর অন্য অভিলাষ থাকে না। তুমি মায়া অবলম্বনে বহু হইয়া ভাস—একে দৃষ্টি পড়িলে আর সমস্তই তোমাতে মিশিয়া তুমি হইয়া অবস্থান করে। যখন শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বলিল—

বলাবলেপদুষ্টেত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥

বলের দ্বারা যে অবলেপ অর্থাৎ গর্ব্ব—সেই গর্ব্ব দ্বারা দুর্ব্বিনীতে দুর্গে তুমি গর্ব্ব করিও না। যে অতিমানিনী—অতিগর্ব্বিতা তুমি, তুমি অন্যদীয় বল সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছ।

সদ্‌গুরু স্বরূপিণী দেবী তখন উত্তর করিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

আমি এই জগতে একাই আছি। আমার সজাতীয় ও কিছু নাই, বিজাতীয়ও কিছু নাই আর আমার স্বগত ভেদ ও কিছু নাই। আমিই পরাচিতি আমার উপরে আমার শক্তি অনেক কিছু দেখাইতেছে। দেখার দোষে তুমি কত কিছু দেখিতেছ, আমি কিন্তু একাই আছি। আমা ছাড়া আর দ্বিতীয় কি আছে? এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহা আমিই দাঁড়াইয়া আছি। আমার মায়া আমাকে স্থূল করিয়া দেখাইতেছে, স্থূলের ভিতরে আমাকেই সূক্ষ্ম করিয়া দেখায়। আবার সূক্ষ্মকে বীজে বা শক্তিতে রাখে আর শক্তি থাকে আমি শক্তিমান আমাতে—আমিই সাক্ষীরূপে একই। রে দুষ্ট! দেখ্—এই সমস্তই আমার বিভূতি—বিভূতিরূপা এই সমস্তই আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। তাই সদ্‌গুরুই কেবল। এই বিভূতি দেখিয়া সদ্‌গুরুর নিকটে পৌঁছিতে হয়। যখন শ্রীভগবানের সখা শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া" কোন্ কোন্ পদার্থ ধরিয়া আমি তোমাকে চিন্তা করিব? শ্রীভগবান্ উত্তরে বলিলেন চিত্তবৃত্তি বহির্ম্মুখী হইলেও আমার বিচিত্র বিভূতি দ্বারা আমাকেই চিন্তা করিবে—সকল নরনারীর আত্মারূপে আমিই আছি—মানুষের স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম আকার, বীজ বা শক্তিতে সূক্ষ্ম আকারের স্থিতি—এই সমস্ত মায়িক—ইহা ত্যাগ করিয়া সাক্ষীভাবে যে আমি আছি সেই সাক্ষীকে নিজের মধ্যে সাধনা করিয়া, অন্য প্রাণীতেও আমিই আছি চিন্তা করিয়া, নিজের অন্তরে প্রবেশ করিবে। সকল প্রাণী দেখিয়া আমার চিন্তা যেমন করিতে হয় সেইরূপ আমি সূর্য্য, আমি বায়ু, আমি চন্দ্র, আমি গঙ্গা, আমি হিমালয় আমিই এক তেত্রিশকোটি দেবতা এই ভাবে চিন্তা করিয়া অন্তর্ম্মুখী হইতে হয়।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? সদ্‌গুরু জ্ঞানমূর্ত্তি—জ্ঞানের মূর্ত্তি। আহা! তুমি আনন্দমূর্ত্তি আবার তুমি জ্ঞানমূর্ত্তি। আনন্দের যেমন মূর্ত্তি নাই কিন্তু বিষয়ানন্দে ও বাসনানন্দে প্রাণের সাড়া পাইয়া যেমন ব্রহ্মানন্দে পৌঁছিতে হয় সেইরূপ জ্ঞানের কোন মূর্ত্তি নাই, জ্ঞান প্রকাশিত হয়েন সমষ্টি বিশ্বরূপে এবং প্রতি ব্যষ্টিরূপে। যিনি বস্তু সকলকে অনুভব করেন তিনিই চৈতন্য বা জ্ঞান।

"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" যিনি সকলকে জানেন তাঁহাকে জানিবে কিরূপে? চৈতন্য বা জ্ঞান বা আত্মাই সমস্ত জানেন। যাহা দেখ বা শুন বা স্মরণ কর তাহার মূলে এই চৈতন্য থাকেন বলিয়া দেখা—শুনা—স্মরণ করা হয়। যেখানে চৈতন্য সুপ্ত সেখানে কোন জ্ঞান থাকে না। চৈতন্য বা জ্ঞানের প্রকাশ হয় বস্তু ধরিয়া। বিশ্বের যিনি জ্ঞাতা তিনি স্বরূপে অবিজ্ঞেয়। সৃষ্টি থাকাতেই ইঁহার প্রকাশ হয় অর্থাৎ সৃষ্টি থাকিলেই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ হয়। সেইজন্য সৃষ্টিই তাঁহার প্রথমরূপ। নিগুর্ণ নিরবয়ব ব্রহ্মের আদিরূপ হইতেছে এই বিশ্ব। নিগুর্ণ যিনি তিনি বিশ্বরূপ হইয়াই প্রথমে রূপ ধারণ করেন। সমষ্টি বিশ্ব যেমন সেই অরূপের রূপ সেইরূপ ব্যষ্টি সমস্ত পদার্থও সেই অখণ্ডের খণ্ডরূপ। তিনি সর্ব্বত্র অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ড উপাধিতে খণ্ডমত দেখান। এখন স্থূল সূক্ষ্ম বীজ স্বরূপ উপাধি সমস্ত মায়িক, সেই সাক্ষী যিনি তিনি—উপাধিযোগেই জ্ঞানমূর্ত্তি। এই জ্ঞানমূর্ত্তিকে বা সাক্ষী চৈতন্যকে অনুভব করা যায় নিজেরই মধ্যে। যিনি সাক্ষী তিনি খণ্ডমত বোধ হইলেও যথার্থতঃ অখণ্ড জ্ঞান। সাধনা দ্বারা ইঁহার অনুভবেই জীব মুক্ত হইয়া যায়। যেমন মানুষ যাহা অনুভব করে না, যতক্ষণ অনুভব করে না—তাহার অস্তিত্ব ততক্ষণ মানুষের মধ্যে থাকে না, সেইরূপে বিশ্বের মূলে অনুভবকর্ত্তা বা জ্ঞান যদি না থাকে তবে বিশ্বের অস্তিত্বই থাকে না। পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা নানা বস্তুর নানা ভাবে জ্ঞান হইলেও যিনি জ্ঞান স্বরূপ—যিনি এক আত্মাই—যিনি বিজ্ঞাতা তিনি আনন্দ স্বরূপ এক অখণ্ড জ্ঞান মাত্র। এই বস্তুটিই সত্য। ইঁহার সত্তাতেই মায়িক বস্তু সমূহের সত্তা। মায়িক যাহা তাহা মিথ্যা, জ্ঞানই সত্য। অসত্য মায়িক মূর্ত্তি ধরিয়া সেই অখণ্ড জ্ঞানই জ্ঞান মূর্ত্তি ধারণ করেন।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? তিনি দ্বন্দ্বাতীত। জ্ঞান স্বরূপ আনন্দস্বরূপ সদ্‌গুরুর নিকটে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ কিছুই পৌঁছিতে পারে না। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয় পরাজয় সমস্তই মায়িক মিথ্যা। মিথ্যা কোন কিছুই জ্ঞানে নাই। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহী" এই শ্লোকাংশে ভাগবত বলিতেছেন, এই পরম সত্য জ্ঞান আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা বিরাজিত। অধ্যাত্ম রামায়ণ বলেন ত্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া—জ্ঞান স্বরূপ আনন্দস্বরূপ তুমি, তোমা হইতে অখিল মোহকরী মায়া ভীত হয়েন। এই গুরু "মায়াশ্রয়ং বিগত মায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্" অচিন্ত্যমূর্ত্তি এই সদ্‌গুরু, মায়াকে আশ্রয় দিলেও—

—মায়াকে আপনার উপরে ভাসিতে দিলেও তিনি কিন্তু বিগতমায়। এই জন্য ইনি দ্বন্দ্বাতীত।

ইনি আর কিরূপ? ইনি গগন সদৃশ। আকাশের মত সীমাশূন্য। চৈতন্যের খণ্ড হয় না। অজ্ঞানে মানুষ বলে খণ্ডচৈতন্য। বুঝিলেই বুঝা যায় এই ভূমাই গগন সদৃশ।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? ইনি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তু। সদ্‌গুরুকে ধরিতে হইলে ত্বম্ পদের শোধন ও তৎপদের শোধন করিতে হয়। ত্বম্ ও তৎপদের উপাধি ত্যাগ করিলেই ইঁহার অখণ্ডরূপে পৌঁছান যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সাক্ষী যিনি তাঁহাকে নিজের মধ্যেই যেমন অনুভব করা যায় সেইরূপ ত্বংপদ ও তৎপদের মায়া উপাধি তাড়াইতে পারিলেই "তুমিই" যে "সেই" তাহার অনুভব হয়।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? তিনি এক, তিনি নিত্য, তিনি মলাশূন্য, তিনি সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত।

সদ্‌গুরুই আছেন—অন্য যাহা কিছু তাহাই অনাত্মা, তাহাই মায়িক, তাহাই মিথ্যা। আবার এই আনন্দস্বরূপ জ্ঞানমূর্ত্তি নিত্য বস্তু—সর্ব্বদা সর্ব্বকালে সমভাবে আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। কোন প্রকার মায়ার মলিনতা ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইনি আপন স্বরূপে আনন্দ স্বভাব, অনেজৎ, সর্ব্বপ্রকার কম্পনশূন্য নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহাঁর দ্বিতীয় একটি যে স্বভাব, যাঁহাকে স্পন্দস্বভাব বলা যায় তিনিই এই আনন্দ স্বভাবের বক্ষে—শিবের বক্ষে কালীর নৃত্য করার মত নৃত্য করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ করেন।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? ইনি সর্ব্বধী সাক্ষিভূত। বুদ্ধি হইতেছেন প্রকৃতি। এই বুদ্ধিতেই ইহাঁকে ধরা যায়। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ধরিয়া এই সাক্ষীভূত চৈতন্যের স্বরূপে যাওয়া যায়।

সদ্‌গুরু আর কিরূপ? ইনি ভাবাতীত এবং ত্রিগুণরহিত। ভাব বলে বস্তুকে। সকল বস্তু ইহাঁর সত্তাতে সত্তাবান হইলেও ইনি মায়িক সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন। সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ লইয়াই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি কার্য্য করেন আর সদ্‌গুরু প্রকৃতির কর্ম্মে সাক্ষীরূপ থাকেন। গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীগুরুর স্তবে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতারের তত্ত্বটির চিন্তা করা হইল। শিবদুর্গা, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ ইহাঁদের তত্ত্বই হইতেছে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ধারণা করিয়া যিনি অবতার অবলম্বনে সাধনা করেন তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এই স্বরূপ চিন্তা যিনি না পারেন তিনি কোন কিছুর সামঞ্জস্য করিতে পারেন না পরন্তু সর্ব্বত্র বিরোধের সৃষ্টি করেন।

সীতারাম তত্ত্ব।

তত্ত্ব একটিই। এই এক আদি তত্ত্বই বহুভাবে উদ্ভাসিত হয়েন। বেদ ও বেদ প্রমুখ শাস্ত্রসমূহ এই তত্ত্বের নাম দিয়াছেন "অদ্বয় জ্ঞান"। এই অদ্বয় জ্ঞানই অপরিচ্ছিন্ন ঘন নিবিড় আনন্দ। ইনি আবার নিত্য। এক কথায়, ইনিই সৎ স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। শ্রুতি এই অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়াছেন। শক্তি যখন অস্পন্দ স্বভাবে মিশিয়া থাকেন তখন শক্তিমান্ ও শক্তি এক হইয়াই ব্রহ্ম ভাবে থাকেন। কিন্তু শক্তির যে দ্বিতীয় স্বভাব আছে—যেটি ইঁহার স্পন্দ স্বভাব--সেই স্বভাব যখন আপনা হইতে জাগ্রত হয়েন—যখন ইনি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন—যখন ইনি অনাদি জীবপুঞ্জের অনাদি কর্ম্মবশে—জীবের অদৃষ্ট বশে বহির্ম্মুখে নাচিতে নাচিতে আগমন করেন তখনই এই জগৎ ভাসিয়া উঠে। এই জগৎ সৃষ্টি জীবেরই উপকার জন্য—জীবকে জীবের কর্ম্মক্ষয় দ্বারা ভগবানের সমীপে আনয়ন জন্য।

তাই বলা হইয়াছে "সীতা· সাক্ষাজ্জগদ্ধেতুশ্চিচ্ছক্তির্জগদাত্মিকা"। মহামায়া সীতাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগতের হেতু, ইনি চিৎশক্তি, ইনি জগদাত্মিকা।

বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য অতি প্রাচীন হারিতায়ণ ঋষি প্রণীত "ত্রিপুরারহস্য" নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এই তত্ত্ব বিষদভাবে বলা হইয়াছে।

ওঁ নমঃ কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী।
বিরাজতে জগচ্চিত্র চিত্র দর্পণরূপিণী॥

ওঁকার নির্দ্দেশ্যা যিনি, সর্ব্বদৃশ্যবস্তুর কারণ স্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ সেই ব্রহ্মানন্দ যাঁহার স্বরূপ এবং যিনি নিরবচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপা অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দরূপা তাঁহাকে প্রণাম করি। এই জগদাত্মক অদ্ভুত চিত্র যাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্র প্রতিবিম্বিত দর্পণ সদৃশ যাঁহার রূপ প্রকাশ করিতেছে তাঁহাকে নমস্কার করি। এক্ষণে আমরা সীতারাম তত্ত্বে এই শক্তি ও চিৎ তত্ত্ব বুঝিতে প্রয়াস করিতেছি।

যে নামে বা যে রূপে শক্তির উপাসনা করা হউক না কেন এই শ্লোকে শক্তির স্বরূপ ও শক্তির জগৎরূপের কথা সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে। সীতা দেবীকে যেমন বলা হইয়াছে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগতের হেতু এবং তিনিই জগদাত্মিকা চিৎশক্তি সেইরূপে এই ত্রিপুরা দেবীকেও বলা হইতেছে এই পরাচিতিই স্বরূপে এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুর কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন আনন্দই সকল বস্তুর কারণ এইজন্য এই পরাচিতিই সচ্চিদানন্দরূপা। **স্বরূপে শক্তিই ব্রহ্ম কিন্তু অন্যদিকে ইনিই জগৎ**। নির্গুণ ব্রহ্মই চিৎ—শুধু চিৎ নহে ইনি সৎ, ইনিই আনন্দস্বরূপ। **চিতের শক্তি যিনি তিনিই চৈতন্য**। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের বিমল চিৎ-শক্তির নামই চৈতন্য। নির্গুণ ব্রহ্মে এই চৈতন্যই ব্রহ্মস্বরূপিণী। কবলীকৃত নিঃশেষ তত্ত্বগ্রাম স্বরূপিণী এই আদ্যাশক্তি সীতা। ইনি সকল ভুবনোদয় স্থিতি-লয় মায়া লীলা বিনোদন যুক্তা। পার্ব্বতী রাধা ইঁহারা সকলেই ইহা।

প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্মের মত এই শক্তিও নিরবয়বা-নিরাকারা। তবে আকার উঠিল কিরূপে।

শক্তি তত্ত্ব বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে শক্তি প্রকাশ মাত্র তনু। এই প্রকাশে জগদাত্মক অদ্ভুত চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। আবার বলি অতি বৃহৎ স্ফটিকশিলা যেমন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বন, নদী, পর্ব্বতাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া ঐ আকারে আকারবান্ হয় সেইরূপ শক্তিও চিৎ প্রতিবিম্বিত দর্পণ সদৃশ হইয়া প্রকাশমান হইতেছেন। শক্তির কোন রূপ নাই—বাহিরের বস্তু ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইঁহাকে রূপ দিতেছে মাত্র।

বলিতে পার যখন জগৎ থাকে না তখন শক্তির উপরে প্রতিবিম্ব পড়িবে কাহার? স্পন্দ শক্তির ভিতরে যে অনন্ত অনন্ত কল্পনারাশি—সমুদ্রে তরঙ্গরাশির মত নিরন্তর উঠিতেছে এই প্রতিবিম্ব সেই কল্পনারই প্রতিবিম্ব। জগৎটা এই

ভিতরের কল্পনার বাহিরের প্রতিবিম্ব। সেই জন্য জগৎকে বলা হয় জগৎটা চিত্ত স্পন্দন কল্পনা। সীতাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে কবলীকৃত নিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী, সকল ভুবনোদয়-স্থিতি-লয় মায়া লীলা বিনোদনযুক্তা প্রকাশমাত্রতনু এই মহাদেবীই চিত্রপ্রতিবিম্বিত দর্পণসদৃশরূপধারিণী। সীতা দেবীর স্বরূপ ও রূপ—বা স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ সংক্ষেপে বলিয়া এখন ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বরূপ ও রূপের কথা বলা হইবে। ইহার পূর্ব্বে এখানে এইমাত্র বলিতে হয় অধ্যাত্ম রামায়ণে এই জন্যই সীতা নিজের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—"মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্। তস্য সন্নিধি-মাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ আমিই মূল প্রকৃতি—আমি সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকি কিন্তু এই যে আমার সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গাদি ক্রিয়া—ইহা রামের সন্নিধি মাত্রেই হয়। করি আমিই সমস্ত কিন্তু অজ্ঞ জনে আমার কর্ম্ম রামে আরোপ করে মাত্র। "তৎ সান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেহবুধৈঃ॥

উত্তর তাপনি উপনিষদেও এই তত্ত্ব বলা হইয়াছে—

শ্রীরামসান্নিধ্য বশাজ্জগদাধারকারিণী।
উৎপত্তি স্থিতি সংহার কারিণী সর্ব্ব দেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল প্রকৃতি সংজ্ঞিতা॥

শক্তিতত্ত্ব ধারণা করা কঠিন এই জন্য আমরা এখানে যোগবাশিষ্ট মহাগ্রন্থ হইতে ত্রিপুরা ভৈরবী ও কল্পান্ত রুদ্রের প্রলয় নৃত্যের কথা ও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। মঙ্গলাচরণ স্তোত্রেও ইহা বলা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ আলোচনা ভিন্ন এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় না। প্রলয় কালে অবিদ্যাবৃতা চিৎ স্বরূপা—নিখিল সংসার চিত্রে দেদীপ্যমানা, বিদ্যাবলে অবিদ্যামালিন্য দূরীভূত হইলে নির্ম্মল প্রশান্ত আকাশরূপিণী, বিশাল-শরীরা ভৈরবী দেবী কল্পান্ত রুদ্রের পুরোভাগে নৃত্য করিতেছেন। আর কল্পান্ত রুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে নিখিল সংসার বনভূমি দগ্ধ হইয়া স্থাণু মাত্রাবশেষ হইয়া যাইতেছে; অতিদ্রুত নৃত্যাবেশে দেবী প্রবল বাত্যাবিধূনিত অরণ্য শ্রেণীর ন্যায় দুলিতেছেন, আর নৃত্য করিতে করিতে আকাশের ন্যায় ভীষণদেহ কল্পান্তরুদ্রকে অর্চ্চনা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কল্পান্ত রুদ্রদেবও দেবীর ন্যায় বিশাল শরীর ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে

ছেন। সীতারাম তত্ত্বেও এই তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। তাই বলা হয় শিব শিবা সীতা রাম রাধা কৃষ্ণ—মূলে এই এক শক্তিযুক্ত শক্তিমান্। এই সর্ব্ব-শক্তিমান্ নিগুর্ণ সগুণ আত্মা অবতার রূপী পরব্রহ্মই বৈদিক আর্য্য জাতির উপাস্থ।

বলিতেছিলাম সীতাতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস করিয়া এক্ষণে আমরা রাম তত্ত্বের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই রাম তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে নিগুর্ণ সগুণ আত্মা ও অবতার শ্রীরামচন্দ্রের এই চারি ভাবের কথাই বলিতে হইবে।

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ" শ্রুতি নিগুর্ণ ব্রহ্মকে অনেজৎ এবং সর্ব্ব-প্রকার চলন রহিত, স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন ইনি মনের অপেক্ষা দ্রুতগমনশীল। এখানে শ্রুতি নিগুর্ণ ও সগুণ ব্রহ্মকে সমকালেই বলিতেছেন। রাম সর্ব্বদাই মেঘের সঙ্গে তড়িল্লতার মত—সীতার সহিত জড়িত। শক্তিমান্ শক্তি ছাড়িয়া থাকিলে শব মাত্র, শিব নহেন আবার শক্তি, শক্তিমান্ ছাড়িয়া থাকিলে অর্থাৎ শক্তিমানের সহিত এক হইয়া থাকিলে অনির্ব্বাচ্যা মায়া—আছেনও বলা যায় না—নাইও বলা যায় না। রাম যখন নিগুর্ণ ব্রহ্মরূপে থাকেন তখন সৃষ্টি নাই তখন ইনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। তখন ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় "যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি" নিগুর্ণ ব্রহ্মকে বেদও জানেন না, মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে—সেখানে বাক্যেরও কোন প্রকাশ নাই। নিগুর্ণ ব্রহ্ম সগুণ হইয়া আসিয়া—মায়া মানুষ হইয়া জগতের উপকার সাধন করিয়া—জগতকে ঈশ্বরমুখী করিয়া দিয়া, ধর্ম্মের বিঘ্ন সরাইয়া দিয়া "পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাত্মং" পুনরায় আপনার আদি ব্রহ্মত্বে স্থিতি লাভ করেন।

রাম যে নিগুর্ণ ব্রহ্ম তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন

"রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

রামকে জানিও ইনি পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অদ্বয়—দ্বৈতবর্জ্জিত—দুই নাই শুধু একই নিত্য আছেন, কোন উপাধি তাঁহাতে নাই—কোন কিছু যে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে তাহাও নাই – মায়া উপাধি পর্য্যন্ত নাই, কেবল মাত্র সত্তা—শুধুই "আছেন" এই মাত্র বলা যায়, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, মনেরও গোচর নহেন ; তিনি আনন্দস্বরূপ—নিরতিশয় আনন্দ, সত্ত্ব-রজস্তমোমল শূন্য, পরম শান্ত—অনেজৎ-সর্ব্বপ্রকার কম্পন শূন্য, সর্ব্বপ্রকার বিকার বর্জ্জিত, অঞ্জন বা কালিমা কিছুমাত্র নাই ; তিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মা, স্বপ্রকাশ, সমস্ত কল্মষশূন্য কোন প্রকার পাপ তাঁহাতে নাই। রাম এই নির্গুণ ব্রহ্ম।

আর "মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং" আর সীতা এই নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব বলিয়াই বলিতেছেন আমাকে মূল প্রকৃতি বলিয়া জানিও – আমি কখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকি না—তাঁহার দ্বারা চৈতন্যদীপ্তা হইয়া আমি তন্দ্রাশূন্য হইয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া "সকল ভুবনোদয়স্থিতি—লয় মায়া লীলা বিনোদন যুক্তা"। শক্তিকে বক্ষে ধরিয়াই এই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েন।

প্রকাশ মাত্র তনু পরাচিতি যেমন জগদাত্মক অদ্ভুত চিত্র দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্র প্রতিবিম্বিত দর্পণ স্বরূপে প্রকাশমান হয়েন সেই রূপ যিনি স্বরূপে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং" সেই সুন্দর রাজা আপনার মূর্ত্তি ঐ শক্তি দর্পণে অবলোকন করিয়া "স্বয়মন্যমিবোল্লসন্"—আমি অন্যমত এই উল্লাস যুক্ত হয়েন। বিচিত্রবিশ্ব প্রতিবিম্বে চিত্রিত এই নির্ম্মল চিৎ-শক্তি দর্পণ রূপিণী যিনি তিনিই এই ত্রিলোক সুন্দরী সীতা আবার রামশরীরদর্পণে প্রতিফলিত সীতার সুন্দর রূপে রূপবান্ এই রাম—অর্থাৎ জগদাত্মিকা সীতা এবং সীতারূপে রূপবান্ এই রাম কেমন চিত্ত চমৎকৃতি এখানে—ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ মত হওয়া। সগুণ হইয়া এই রামই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো মায়া শক্তিসমন্বিতঃ মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া তুমিই বিশ্বরূপ পুরুষ। যিনি সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বগত স্বরূপ, নিত্য ধ্রুব নির্ব্বিষয় স্বরূপ,যিনি সত্য শিব শান্তিময় শরণ্য সনাতন, যিনি বেদান্ত বেদ্য, অপারসম্বিৎসুখমেকরূপ, যিনি তত্ত্বস্বরূপ, যিনি অচিন্ত্য. অব্যক্ত—অনন্তরূপ, যিনি জগদেকনাথ, যিনি আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অশেষ সংসার বিহার হীন আদিভাগ পূর্ণসুখাভিরাম সদা নির্গুণ থাকিয়াও সগুণে আসিয়া যিনি

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী এই মায়াধীশই সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান, এই সগুণ নির্গুণ পরম পুরুষ রামকেই তখন বলা হয়—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তথা।
আদিত্যাদি গ্রহশ্চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন॥

ইনিই তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, সমস্ত দেবতা, আদিত্যাদি গ্রহ রূপে বিশ্বরূপ ধারণ করেন। ইনিই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া—বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আত্মারূপে সকল সৃষ্ট বস্তুর অন্তরে বিরাজ করেন; বলা হইল নির্গুণ সগুণ আত্মা এই রামই সমকালে। যাহা কিছু তুমি দেখ, দেখিবে স্থূলরূপের ভিতরে সূক্ষ্মরূপ, সূক্ষ্মরূপের ভিতরে বীজ আর বীজের ভিতরে এই সাক্ষী পুরুষ। সাক্ষ্যংশে ইনি তুরীয়, বীজাংশে প্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মাংশে তৈজস এবং স্থূলাংশে জাগ্রদ্বিশ্ব।

নির্গুণ, সগুণ, আত্মা যিনি তিনিই অবতার—তিনিই নিরাকার হইয়া ও নরাকার রূপ ধরিয়া—

মনোভিরামং নয়নাভিরামং বচোভিরামং শ্রবণাভিরামং।
সদাভিরামং সততাভিরামং বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্।

এই পরম সুন্দর পুরুষকে কত ভাবে কত ভক্ত বন্দনা করেন। শ্রীরাম গীত গোবিন্দে জয়দেব বলিতেছেন—

বন্দে শারদপূর্ণচন্দ্রবদনং বন্দে কৃপাম্ভোনিধিং
বন্দে শম্ভু-পিনাক-খণ্ডন-করং বন্দে স্বভক্তপ্রিয়ম্।
বন্দে লক্ষ্মণসংযুতং রঘুবরং ভূপাল চূড়ামণিং
বন্দে ব্রহ্ম পরাৎপরং গুণময়ং শ্রেয়স্করং শাশ্বতম্॥

জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলে আগমন মাত্র। প্রতি বস্তুরই স্থূল আকার ও সূক্ষ্ম আকার আছে। এই সূক্ষ্ম আকার আবার বীজে বা শক্তিতে থাকে। আবার এই বীজ বা শক্তি থাকে সাক্ষী চৈতন্যে;

সাক্ষী, বীজ, সূক্ষ্ম ও স্থূল—সকল বস্তুরই এই চারি অবস্থা দৃষ্ট হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শ্রুতির এই সত্য কথার অর্থ ইহা নহে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্রই ব্রহ্ম—কেননা ব্রহ্ম বস্তু ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল আকারকে সূক্ষ্ম আকারে পরিণত করিতে পার, যদি সূক্ষ্ম আকারকে বীজে বা শক্তিতে স্থাপিত করিতে পার—এই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ অবস্থা অতিক্রম করিয়া যদি সাক্ষী চৈতন্যে আসিতে পার তবেই 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"এই স্বরূপে পৌছিতে পারিবে। সকল বস্তুর স্বরূপই ব্রহ্ম আর বীজ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা মায়িক মাত্র। রামের স্থূল সূক্ষ্ম বীজ অবস্থা মায়াকৃত কিন্তু স্বরূপ সাক্ষী অবস্থাটি ব্রহ্ম।

বিচিত্র মায়িক আকার সমূহে সাক্ষী চৈতন্য একভাবে প্রকাশ হন না। রাম এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সুর মানুষ তির্য্যগ্ রূপ ধারণ করেন সত্য কিন্তু তিনি দেহগুণে বিলিপ্ত নহেন কারণ মায়া অজ্ঞানীর চক্ষে রামকে ঢাকিয়া রাখিলেও, ইহা রামকে ঢাকিতে পারেন না—মায়া রাম হইতে ভীত হয়েন।

সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ রামের প্রকাশ সর্ব্বত্র সমান নহে। জীব ক্রমোন্নতির দ্বারা ধীরে ধীরে এই পূর্ণ বস্তুতে পূর্ণ বিকাশ দেখিতে সমর্থ হয়। উদ্ভিজ্জে চৈতন্যের বিকাশ যতটুকু স্বেদজে তাঁহার প্রকাশ তদপেক্ষা অধিক, আবার অণ্ডজে তদপেক্ষা অধিক আবার জরায়ুজে তদপেক্ষা অধিক। মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আবার সাধারণ মনুষ্যে শক্তির প্রকাশ যত বিভূতি মান্ মনুষ্যে শক্তির প্রকাশ আরও অধিক। অবতারে এই শক্তির প্রকাশ পূর্ণ।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহা সত্য আর রামই এই কৃষ্ণ। ভগবান্ সনৎকুমার দেখাইয়াছেন "রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ম্" রামতাপনি উপনিষদ্, কৃষ্ণ উপনিষদ ইত্যাদিতে রাম ও কৃষ্ণ একই, উভয়েই পূর্ণ। ৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর ধৃত বৃহৎ পারাশর হোরার উক্তিতে পাওয়া যায় শ্রীশক্ত্যা সহিতো বিষ্ণুঃ সদা পাতি জগত্রয়ং। * * সর্ব্বেষু চৈব জীবেষু পরমাত্মা বিরাজতে॥ সর্ব্বেষু চৈব জীবেষু স্থিতং হ্যংশ দ্বয়ং ক্বচিৎ। জীবাংশমধিকং তদ্বৎ পরমাত্মাংশকঃ কিল॥ রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভো বিপ্রনৃসিংহ শূকর স্তথা। এতে পূর্ণাবতারাশ্চ হ্যন্যে জীবাংশকান্বিতাঃ। রামোঽবতারঃ সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য যদুনায়কঃ। নৃসিংহো ভূমি পুত্রস্য বুধঃ সোম সুতস্য চ॥ ইত্যাদি।

আবার বলি অবতার না হইলে আমরা চরিত্র গঠনের আদর্শ পাই না—

যিনি আপনি আচরণ করিয়া জীবকে উন্নত করিবেন তাঁহাকে আদর্শরূপে না পাইলে জীব কখন পূর্ণতা পথে চলিতেই পারে না। সেইজন্য নির্গুণ, সগুণ, আত্মা পাইয়াও আমাদের হয় না—অবতারের আবশ্যক হয়।

যত প্রকার শিক্ষা মানব জীবনে আবশ্যক হয় তৎসমস্তই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আপনি আচরণ করিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন। পূর্ণ মনুষ্য জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন রাম, পূর্ণ নারী জীবনের আদর্শ সেইরূপ সীতা। "অযোধ্যাকাণ্ড রামায়ণ" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে এই সমস্ত গুণের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে আর সীতা রামের দৃষ্টান্ত ধরিয়া জীবন গঠন করিবার উপায় সমস্তও যথাসাধ্য বিবৃত করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ বলিতে ইচ্ছা হয়—মনুষ্য জীবনকে মধুময় করিবার জন্য এমন পূর্ণ চরিত্র আর কোথায়? এমন আদর্শ নরপতি কে কোথায় দেখিয়াছে। প্রজারঞ্জনের পূর্ণতা, দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণতা, একপত্নীব্রতের পূর্ণতা, লোক-মর্য্যাদার পূর্ণতা, রাজধর্ম্মের পূর্ণতা, বর্ণাশ্রম মর্য্যদার পূর্ণতা, পিতৃমাতৃভক্তির পূর্ণতা, জিতেন্দ্রিয়তার পূর্ণতা, সত্যব্রতের পূর্ণতা, কর্ত্তব্য পরায়ণতার পূর্ণতা, আস্তিকতার পূর্ণতা, সহিষ্ণুতার পূর্ণতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পূর্ণতা, ভ্রাতৃস্নেহের পূর্ণতা, ভক্তবৎসলতার পূর্ণতা—শরণাগতবৎসলতার পূর্ণতা—আহা! এমন পূর্ণ আদর্শ আর কোথায়? এমন মনের মানুষ আর কোথায়?

বিরহে রাম চরিত্র এবং রণক্ষেত্রে রাম চরিত্র—ইহা ভিন্ন অযোধ্যাকাণ্ডে রামচরিত্রের প্রায় সমস্ত অংশই আসিয়াছে। আমরা এই পুস্তকে যথাসাধ্য শ্রীভগবানের ব্যবহার সমস্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।
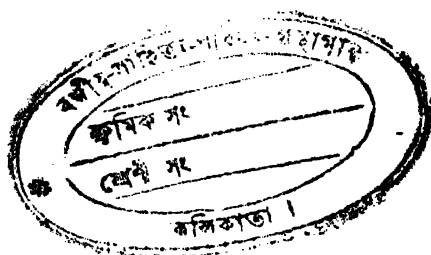
অযোধ্যাকাণ্ড-অন্ত্যলীলা।

৩৫ অধ্যায়।

সতীধর্ম্মে বনবাসিনী রাজরাণী ও তপস্বিনী।

"পতি শুশ্রূষণান্নার্য্যাস্তপো নান্যদ্বিধীয়তে"—বাল্মীকি।

বৃদ্ধা তপস্বিনী ভর্তৃ সমান ধর্ম্মচারিণা জনকনন্দিনীকে অবলোকন করিলেন, করিয়া বলিতে লাগিলেন জানকি! তোমার যে ধর্ম্মদৃষ্টি আছে ইহাই তোমার সৌভাগ্য। মানিনি! তুমি যে আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া এবং অভিমান ও ঋদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ ইহাই তোমার পরম সৌভাগ্য।

নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদিবাঽশুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্য স্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥

স্বামী নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন, স্বামী অনুকূলই হউন বা প্রতিকূলই হউন, যে নারী পতিকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়া জানেন তাঁহার জন্যই উত্তম লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল হউন বা স্বেচ্ছাচারীই হউন, অথবা ধনহীন দরিদ্রই হউন, আর্য্যস্বভাবা স্ত্রীগণের পতিই পরম দেবতা। বৈদেহি! পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফলেই অনুরূপ স্বামী লাভ হয় এবং পতিই ইহলোক বা পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান স্বরূপ। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীজনের সর্ব্বদা পূজনীয় অন্যকোন ইষ্টবন্ধু যে থাকিতে পারে তাহা আমি ভাবিয়াও খুঁজিয়া পাই নাই। কামাধীন হৃদয়ে কেবল শরীর ভোগার্থ— যাহারা স্বামীকে ভোগ করিতেই চায়—যাহারা কেবল ভরণপোষণার্থ কর্ত্তাকে নাথ বলিয়া থাকে সেই সকল অসতী স্ত্রী, গুণ ও দোষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মৈথিলি সেইরূপ অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই অকার্য্যের বশীভূতা; ইহারা অযশ প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়।

তদ্বিধাস্তু গুণৈ র্যুক্তা দৃষ্ট লোকপরাবরা।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্য কৃতস্তথা॥

কিন্তু তোমার মত গুণশালিনী যাঁহারা তোমার মত হিতাহিত জ্ঞান যাঁহাদের আছে তাঁহারা যথার্থ পুণ্যশীলের ন্যায় স্বর্গ লোকে পূজিত হয়েন।

তদেবমেনং ত্বমনুব্রতা সতী
পতিব্রতানাং সময়ানুবর্ত্তিনী।
ভবস্ব ভর্ত্তুঃ সহধর্ম্মচারিণী
যশশ্চ ধর্ম্মশ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি॥

অতএব তুমি পতিব্রতাগণের আচরণ অনুসরণ করিয়া সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বামীর সমান ধর্ম্ম আচরণ কর; তাহা হইলে তুমি যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই লাভ করিবে।

ভগবতী অনসূয়া এইরূপ বলিলে জনকনন্দিনী তাঁহার পূজা করিলেন, করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন আর্য্যে! আপনি আমাকে যে এই শিক্ষা দিবেন ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপনি যাহা বলিলেন যে "নার্য্যাঃ পতি গুরুঃ" নারিগণের পতিই গুরু ইহা আমিও বিদিত আছি।

যদ্যপেষ ভবেদ্ভর্ত্তা অনার্য্যো বৃত্তিবর্জ্জিতঃ।
অদ্বৈধমত্র বর্ত্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ॥

এই ভর্ত্তা যদ্যপি অনার্য্য হয়েন—পূজ্য-চরিত্রহীন হয়েন, যদ্যপি বৃত্তিবর্জ্জিত —জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় রহিত দরিদ্রও হয়েন তথাপি এইরূপ স্বামীকেও কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া প্রীতিসহকারে সেবা করিতে হইবে আর যেখানে স্বামী গুণবান, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, অবিচলিতঅনুরাগী, ধর্ম্মাত্মা, পিতামাতার মত প্রীতিমান তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? মহাবল রাম কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন রাজার অন্য স্ত্রীগণের উপরেও সেইরূপ ব্যবহার করেন। রাজা দশরথ একবার মাত্র যে নারীকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন ধর্ম্মবিৎ নৃপবৎসল রাম অভিমান শূন্য হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। আমি যখন এই ভয়াবহ বিজনবনে আগমন করি তখন আমার শ্বশ্রূ দেবী কৌশল্যা আমাকে যে উপদেশ করেন তাহাও আমার হৃদয়ে স্থিরভাবে অবস্থিত আছে। পূর্ব্বে আমার পাণিপ্রদান কালে অগ্নিসন্নিধানে আমার জননী যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাও আমি মনে করিয়া রাখিয়াছি।

ন বিস্মৃতন্তু মে সর্ব্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্ম্মচারিণি।
পতি শুশ্রূষণান্নার্য্যাস্তপো নান্যদ্বিধীয়তে॥

ধর্ম্মচারিণি! "পতি সেবা ভিন্ন নারীর অন্যবিধ তপস্যার বিধান নাই" আত্মীয়বন্ধুবর্গের এই উপদেশ বাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী পতি শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গলোকে পূজিত হইতেছেন। সাবিত্রী সমান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া—পতিসেবা করিয়া আপনিও স্বর্গলোক আয়ত্ত করিয়াছেন। সর্ব্বনারীর অগ্রগণ্যা স্বর্গদেবতা রোহিণীও চন্দ্র ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করেন না দেখা যায়। এইরূপ বহুসংখ্যক মহিলা দৃঢ়ভাবে পতিনারায়ণব্রত পালন করিয়া আপন আপন পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোকে পূজনীয়া হইয়াছেন।

অনসূয়া সীতার বাক্য শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, মস্তক আঘ্রাণ করিয়া মৈথিলীর হর্ষ উৎপাদন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন শুচিব্রতে সীতে! আমি নানাপ্রকার নিয়মানুষ্ঠান করিয়া বিস্তর তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি। সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া আমি তোমায় বর দান করিব। মৈথিলি! তোমার বাক্য যেমন যুক্তিপূর্ণ সেইরূপ পবিত্র। আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। বল, তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব? তাঁহার আদর পাইয়া অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া হাস্যমুখে সীতা সেই তপোবল সমন্বিতা দেবীকে যাহা বলিলেন তাহা পরে বলিতেছি—কিন্তু এই যে মায়ের হাস্যমুখে হর্ষ প্রকাশ করা—ইহা কেমন দেখাইল? মস্তক আঘ্রাণে সেই গলিত সুবর্ণপ্রতিমা কেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিল? সেই সৌন্দর্য্য লহরী কেমন ভাবে সৌন্দর্য্য ছড়াইল? বলাত যায়না সেই নীল নীরজদলায়তেক্ষণে কেমন হাসি ভাসিল —আর সেই রাম-মানস—সরো-মরালিকা কেমন ভাবে সেই সুখতরঙ্গে ভাসিলেন? সেই কুন্তলাকুল-কপোল-সুন্দরী মৃদুহাস্যে কেমন শোভা ধারণ করিলেন—ইহা বলাত গেলনা—শুধু নয়ন মুদ্রিত করিয়া কি যেন কি হৃদয়ে আনিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে—ইহা ভাবনায় আনাই ভাল— প্রকাশের চেষ্টা বৃথা। যাহা হউক রাজদুলারী হাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন— দেবি! আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্তই পূর্ণ হইয়াছে আর কোন কামনা আমার নাই। ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া সীতার কথায় অধিকতর প্রীতা হইলেন, বলিলেন বৎসে! তোমার লোভশূন্য বাক্যে আমার যে আনন্দ হইতেছে আমি তোমাকে কিছু দিয়া সেই হর্ষ সফল করিব। এই দিব্য সুরুচির মাল্য, এই বস্ত্র, এই আভরণ, এই অঙ্গরাগ—অঙ্গরঞ্জনকর মহামূল্য অনুলেপন—এই দিব্যগন্ধদ্রব্য—এই সমস্ত আমি তোমায় দিতেছি—ইহাতে তোমার দেহের অপূর্ব্ব শোভা হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপ-

ভোগেও এই সমস্ত কখন মলিন হইবে না এবং অশুচি ও হইবেনা। জনকাত্মজে! এই দিব্য অঙ্গরাগে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের শোভা বর্দ্ধন করেন তুমিও সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে—তোমার অঙ্গকান্তি রাম দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া তোমার রূপে রাম শোভা প্রাপ্ত হইবেন। মৈথিলী সেই বস্ত্র, অঙ্গরাগ, ভূষণ, মাল্য—তপস্বিনীর সেই প্রীতি-দান প্রতিগ্রহ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহে অনধিকার বলিয়া প্রীতি-দান বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণেরা যে দান করেন তাহা অক্ষয় হয়—আর সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে প্রীতিপূর্ব্বক দেবী অনসূয়ার এই দান—এতৎ সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য থাকিবে? প্রীতি-দান প্রতিগ্রহ করিয়া যশস্বিনী সীতা শিষ্টাঞ্জলি পুটে—রচিতাঞ্জলি হইয়া ধীর ভাবে তপস্বিনীর সমীপে উপবেশন করিলেন। তখন অনসূয়া কিছু প্রিয় কথা, শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সীতে! শুনিয়াছি রাম তোমাকে স্বয়ংবরে প্রাপ্ত হইয়াছেন আমি সবিস্তারে এই কথা শুনিতে ইচ্ছা করি—যেমন ঘটিয়াছিল তৎসমস্তই তুমি আমার নিকট প্রকাশ কর।

"দেবি! শ্রূয়তাং,- দেবি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া জানকী বলিতে লাগিলেন—ধর্ম্মবিৎ মিথিলাধিপতি বীর জনক—ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। লাঙ্গল হস্তে একদিন তিনি যজ্ঞের জন্য ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছিলেন ঐ সময়ে আমি ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহার পুত্রীরূপে উত্থিত হই। তৎকালে তিনি নিম্নোন্নত ভূপ্রদেশ সমতল করিবার জন্য মৃত্তিকামুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন পাংশুগুণ্ঠিত সর্ব্বাঙ্গী আমাকে পতিত দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি নিঃসন্তান—স্নেহভবে তিনি স্বয়ং আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এইটি আমার কন্যা এই বলিয়া তাঁহার সমস্ত স্নেহ আমার উপর নিপতিত হইল। এই সময়ে আকাশ হইতে মনুষ্যকর্ণে এই দৈববাণী হইল "রাজন্ এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন—নরপতি! ধর্ম্মমত ইনি তোমারই কন্যা।" পিতা আনন্দিত হইলেন, আমাকে গৃহে আনিয়া পিতা অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন পরে তিনি আমাকে লইয়া পুত্রার্থিনী পুণ্য পরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সিগ্ধহৃদয়া রাজমহিষী গর্ভধারিণীর ন্যায় অতি যত্নে আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পিতা আমার পতি-সংযোগ-সুলভ বয়ঃক্রম দেখিয়া, অর্থনাশে দরিদ্র যেরূপ চিন্তিত হয় সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। পিতা ভাবিতে লাগিলেন কন্যার পিতা ইন্দ্রের তুল্য প্রভাবশালী হইলেও বর

পক্ষীয় সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট হইতে তাঁহাকে অপমাননা সহ্য করিতে হয়। সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া পিতা অপার চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। আমি অযোনিসম্ভবা কন্যা—বহু চিন্তা করিয়াও পিতা রূপেগুণে আমার অনুরূপ পাত্র পাইলেন না। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বুদ্ধিতে উদিত হইল—ধর্ম্মানুসারে কন্যার স্বয়ংবরের বিধান করাই শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বে বরুণ—মহাদেব, মহাযজ্ঞে—দক্ষযজ্ঞে জনকের পূর্ব্বপুরুষ রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় শর ও দুই তূণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ধনু এতাদৃশ ভারসম্পন্ন ছিল, যে কোন মনুষ্য অতিশয় চেষ্টা করিয়াও ইহা চালনা করিতে পারেন না, আর কোন নরপতি স্বপ্নেও ইহা সন্নত করিতে পারেন না। আমার পিতা উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। আমার সত্যবাদী পিতা রাজগণকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন আপনাদের মধ্যে যিনি এই শরাসন উত্তোলন করিয়া ইহাকে জ্যা-যুক্ত করিতে পারিবেন আমার দুহিতা তাঁহারই ভার্য্যা হইবেন; নৃপতিগণ শৈলসম ভারবিশিষ্ট সেই ধনু দর্শন করিয়া উহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক চালনা করিতে চেষ্টা করিলেন; কেহই সফলমনোরথ হইলেন না—সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর মহাদ্যুতি রাম বিশ্বামিত্রের সহিত পিতার যজ্ঞ দর্শনে আসিলেন। পিতা রাম, লক্ষ্মণ ও ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের পূজা করিলেন। ভগবান্ বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান করিলেন। ইঁহারা ধনু দর্শনে অভিলাষী। তখন কার্ম্মুক আনীত হইল। রাম নিমেষমাত্রে ঐ ধনু আনত করিলেন এবং জ্যা-যুক্ত করিয়া এমন ভাবে আকর্ষণ করিলেন যে ঐ মহৎ ধনু দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ধনু ভগ্ন হইলে বজ্রনিপাতের ন্যায় এক ভীষণ শব্দে দ্যাবা পৃথিবী যেন পূর্ণ হইয়া গেল। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাম কিন্তু মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। আমার পিতা তখন আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনয়ন করিলেন এবং আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রিয়দর্শনা উর্ম্মিলা ভগ্নীকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সেই অবধি আমি রামের প্রতি অনুরক্তা।

৩৬ অধ্যায়।

কাণ্ড সমাপ্তি।

"রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্" বাল্মীকি।

তপোবনের এই যে সন্ধ্যাবর্ণনা—এ দৃশ্য, চক্ষু কি আর কখন দেখিবে না? ঋষিসেবিত ভারতে আর কি এ দৃশ্য নাই? হিমাচলের কোন নিভৃত প্রদেশে এ দৃশ্য এখনও আছে কি না কে বলিবে? থাকাইত সম্ভব—ঋষিরা ত গত হন নাই, হইতে পারেন না। যদি গত হইতেন তবে কি এই ঘোর কলিযুগেও অন্ততঃ কোন কোন মানুষের প্রাণে এইরূপ বর্ণনা সেই লুপ্তস্মৃতি জাগাইয়া এই কলি-মহোৎসব তুচ্ছীকৃত করিয়া নগরের সহরের এই জ্বালামালাময়, হৃদয় দগ্ধকর দৃশ্যকে অপসারিত করিয়া সেই দৃশ্য এখনও ফুটিয়া উঠিত; যদি ঋষিগণ এখনও না থাকিতেন তবে কাহাদের মঙ্গল আরতির শঙ্খ ঘণ্টার মধুর ধ্বনি এখনও কোন কোন হৃদয় বীণার তারে ভাসিয়া আসিয়া নরনারীর প্রাণকে সেই-দিকে—সেই মধুর সঙ্গীত-লহরীর দিকে এখনও ছুটাইয়া লইয়া যায় দেখা যায়? এখনও বুঝি কোথাও কোথাও এই দৃশ্য আছে, এখনও বুঝি এই সৌন্দর্য্য-লহরীর মধুর কম্পন বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া কোন কোন হৃদয়-বেলা-ভূমিতে নিপতিত হয়? নতুবা এখনও কোন কোন নরনারীর প্রাণ বুঝি আদৌ স্পন্দিত হইত না—কাহার কাহারও প্রাণে ঋষিপ্রদর্শিত ধর্ম্মভাব বুঝি একবারও স্পর্শ করিত না। ভগবান্ বাল্মীকির এই কাণ্ড পরিসমাপ্তির কথা আমরা এখন অনুসরণ করিতেছি।

ধর্ম্মপরায়ণা তপস্বিনী অত্রিপত্নী সীতার এই মহতী কথা শ্রবণ করিলেন, করিয়া মৈথিলীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন—জগন্মাতার মস্তক আঘ্রাণ করি-লেন। অতিবিকসিতাঙ্গী পদ্মিনী আনন্দভরে এই সুবর্ণকমলিনীকে বক্ষে ধরিয়াছেন—দুইটি হৃদয় একই আনন্দে ভরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্থির হইয়া ইহা একবার ধ্যান করিয়া দেখ না কেমন হয়। সমধর্ম্মী দুই চিত্তের সঙ্গম জনিত যে সুখ তদপেক্ষা অধিক সুখ বুঝি কোথাও পাওয়া যায় না। তপস্বিনী বলিতে লাগিলেন মধুরভাষিণি! তুমি তোমার স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত পরিস্ফুট

পদযুক্ত বিচিত্র মধুর বাক্যে বর্ণনা করিলে—আমি শুনিলাম শুনিয়া কত যে আনন্দভরিত হইলাম তাহাত বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ দেখ—

"রবিরস্তং গতং শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্"

ঐ দেখ! শুভা রজনীকে সমীপে আনিয়া শ্রীমান্ রবি অদৃশ্য হইলেন;

দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্।
সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ॥
এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ।
সহিতা উপবর্ত্তন্তে সলিলাপ্লুত বল্কলাঃ॥
ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু হুতেষু বিধিপূর্ব্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধতঃ॥
অল্পপর্ণা হি তরবঃ ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।
বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ॥
রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।
তপোবনমৃগা হ্যেতে বে দতীর্থেষু শেরতে॥
সংপ্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা।
জ্যোৎস্না প্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতে হ্যুদিতোঽম্বরে॥

সমস্ত দিন ধরিয়া পক্ষী সকল আহারান্বেষণে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যাইবার জন্য বৃক্ষশাখায় বসিয়া শব্দ করিতেছে শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ মুনিগণ সায়ংস্নান করিয়া হস্তে জলপূর্ণ কলস লইয়া আর্দ্রবল্কলে সকলে মিলিত হইয়া আশ্রমে আসিতেছেন। যথাবিধিহুত ঋষিগণের অগ্নিহোত্র হইতে কপোতাঙ্গারুণ ধূম, পবন চালিত হইয়া আকাশপথে উত্থিত হইতেছে দেখা যাইতেছে। যে সকল বৃক্ষের পল্লব অতি বিরল তাহারাও অন্ধকার প্রভাবে ঘন পল্লবাচ্ছন্নমত হওয়ায় দূরতর প্রদেশে দিক সকল আর অনুভূত হইতেছেনা। রাত্রিচর জীবজন্তু সকল চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ আশ্রমমৃগগণ পুণ্যক্ষেত্ররূপ অগ্নিহোত্র বেদির উপরে শয়ন করিতেছে। সীতে! নক্ষত্র সমলঙ্কৃতা রাত্রি আসিলেন আর চন্দ্রদেবও জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশে উদিত হইতেছেন দেখা যাইতেছে। এক্ষণে যাও, গিয়া পতিসেবা কর আমি অনুমতি করিতেছি। তুমি মধুর কথাবার্ত্তায় আমাকে অতিশয় তৃপ্তি দিয়াছ। মৈথিলি! তুমি আমার সমক্ষে অলঙ্কার পরিধান কর; বৎসে!

তুমি বিচিত্র অলঙ্কারে সুশোভিত হইলে আমার বড়ই আনন্দ হইবে। সীতা অলঙ্কার পরিধান করিলেন। সুরসুতোপমা জনকনন্দিনী তখন অবনতমস্তকে তপস্বিনীর চরণ বন্দনা করিয়া রামাভিমুখে গমন করিলেন। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ রাম সীতার সেই বেশ দেখিলেন—তপস্বিনীর প্রীতিদান জানিয়া অতিশয় হর্ষিত হইলেন। সীতা রামকে সব কথা—তপস্বিনীর প্রীতিদান মাল্য বসন আভরণ—সবই বলিলেন। মানুষে সুদুর্ল্লভ জানকীর এই সৎকার দেখিয়া মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

অনসূয়ার পুণ্যে কৃতালঙ্কারা সীতাকে দেখিয়া এবং তাপসগণ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া রাম সেই রাত্রি ভগবান্ অত্রির আশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। তাঁহারা স্নানাদি সমাপন করিলেন এবং তাপসদিগকে দণ্ডকারণ্যের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বনবাসী ঋষিগণ বলিলেন এই বনভূমি রাক্ষস দ্বারা সম্যকরূপে উপদ্রুত। রাঘব! নানাবিধ নরখাদক রাক্ষস এবং নানা রুধিরপায়ী হিংস্রজন্তু এই মহারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা অশুচি এবং অনাবধান ব্রহ্মচারী তাপসগণকে ভক্ষণ করে। তুমি রাক্ষসের উপদ্রব নিবারণ কর। বনমধ্যে ঋষিগণের ফলাহরণের এই পথ। এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিলেন আর রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত—মেঘমণ্ডলে যেমন সূর্য্য প্রবেশ করেন সেইরূপে গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

আমরা অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে এই অত্রি-রাম-সংবাদ দিয়া অযোধ্যাকাণ্ড শেষ করিতেছি।

রাজরাণী তপস্বিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ধ্যাকালে রামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সায়ংকৃত্য শেষ হইল। তখন ঋষি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে ভোজন করাইলেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুর মানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত—
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া॥

রাম! তুমিই এই ভুবন সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সংরক্ষণ জন্য দেবতা

মানুষ পশু পক্ষ্যাদির দেহ ধারণ করিয়াছ। সকল প্রাণীর স্বরূপই তুমি। তুমি কিন্তু দেহগুণে বিলিপ্ত হও না। কারণ অখিলমোহকরীমায়া তোমাকে দেখিয়া ভয় পান—তোমার মোহ উৎপাদন করিতে পারেন না।

প্রভাত হইল। প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া ভগবান্ অত্রির নিকটে সকলে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। মুনে! আমরা মুনিমণ্ডল-মণ্ডিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি আপনি আজ্ঞা করুন, এবং মার্গ প্রদর্শনের জন্য শিষ্যগণকে আজ্ঞা করুন।

মহাযশা অত্রি ভগবান্ রামের কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন, বলিলেন "সর্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ"—সকলের পথ প্রদর্শক তুমি তোমার পথপ্রদর্শক কে হইবে? তথাপি লৌকিক আচারে তোমার পথ দেখাইয়া দিতেছি। ঋষি শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সীতা, রাম, লক্ষ্মণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কতক দূর গমন করিলে রাম অত্রি ভগবানকে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিলেন। অত্রি ভগবান্ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

সকলে এক ক্রোশ আসিয়াছেন, সম্মুখে মহতী নদী। রাজীবলোচন রাম অত্রি ভগবানের শিষ্যগণকে নদী সন্তরণের কোন উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদৃঢ়া নৌকা আসিল। মুনি কুমারেরা সীতা, রাম ও লক্ষ্মণকে পার করিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। আর তাঁহারা ঝিল্লীঝঙ্কারনাদিত, নানা মৃগগণাকীর্ণ, সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ, ঘোর রাক্ষসগণ নিসেবিত, রোমহর্ষণ সেই ঘোর বিপিনে প্রবেশ করিলেন। বনে প্রবেশ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন ইতঃপর আমাদিগকে সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে—তুমি ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া শর হস্তে লইয়া চল।

অগ্রে যাস্যাম্যহং পশ্চাত্ত্বমন্বেহি ধনুর্ধরঃ।
আবয়োর্ম্মধ্যগা সীতা মায়েবাত্মপরাত্মনোঃ।

আমি অগ্রে অগ্রে যাইতেছি তুমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সর্ব্বপশ্চাতে আগমন কর আর পরমাত্মা ও আত্মার মধ্যে যেমন মায়া থাকেন সীতাও সেইরূপে আমাদের মধ্যে চলিবেন

রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে সীতা চলিলেন—যাহা সত্য কথা তাহাকেই এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহার করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব, জগন্মাতা পার্ব্বতীকে স্বরূপ দেখাইলেন—সর্ব্বত্রই পরমাত্মা ও আত্মার মধ্যে মহামায়া—নতুবা জগতে গতি বলিয়া কিছুই নাই।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

হে ভবতি—প্রকাশস্বরূপে যদি শিবঃ আনন্দময়ং পরব্রহ্ম শক্ত্যা ভবদ্রূপয়া চিৎশক্ত্যা প্রকৃত্যা যুক্তঃ তর্হি প্রভবিতুং প্রভুর্ভবিতুং (কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স প্রভুঃ) শক্তঃ। চেৎ যদি এবং শক্ত্যা যুক্তঃ ন—তর্হি স্পন্দিতুং কিঞ্চিচ্চলিতুমপি ন কুশলঃ খলু—সমর্থঃ খলু ন ইত্যাদি।

হে প্রকাশ স্বরূপে মহাচিতি! যদি আনন্দময় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরব্রহ্ম রাম বা শিব বা কৃষ্ণ, শব্দব্রহ্ম বা চিৎশক্তি বা সীতা, গৌরী, রাধার সহিত যুক্ত হন তবেই তিনি কিছু করিতে বা না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ হয়েন। যদি শক্তিযুক্ত না হন তবে নড়িতেও সমর্থ হয়েন না ইত্যাদি। এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে—এই স্বরূপটি বুঝিতে পারিলে শাক্ত শৈব বৈষ্ণবের কোন বিরোধ থাকে না। ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ—শক্তিযুক্ত ঈশ্বর এক, কেবল মায়া, বা শক্তি দ্বারা সেই একই বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন। বৈদিক আর্য্যগণ এক ঈশ্বরকেই বহু নামে বহুরূপে ভজনা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন এক ঈশ্বরই জীবের উপকারের জন্য সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি বহু দেবতা মূর্ত্তি ধারণ করেন। বৈদিক আর্য্যগণ এক ঈশ্বরই জানিতেন আর তাঁহার বহু বিভূতি দেখিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলিয়াছেন—সমস্ত দেবতাই সেই একেরই বিভূতি।

"বদরী পথে।"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দূর হইতে যাত্রীদের কণ্ঠধ্বনির হর্ষকলরব শোনা যাইতেছিল, নিম্নে ভাগীরথী তীরে ধ্রুবঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। নিকটেই ধ্রুবের এবং ধ্রুবের ইষ্ট ৺নারায়ণের মন্দির। ভক্ত আপন ইষ্টরূপে তন্ময় হইয়া বুঝি এই নীরবতার নিবিড় সঙ্গলাভে বিভোর হইয়া বিহার করিতেছেন? এ তন্ময়ত্বের ধ্যান ভাঙ্গাইতে বক্ষে যেন ব্যথা লাগে, এ যে তার বড় ব্যথার দরদে গড়া, ক্ষুধাতুরের ব্যাকুল প্রাণের আর্ত্তরোদনে তৃষিতের সমগ্র তৃষ্ণা ব্যাকুলতার পরশে আঁকা, ফুল্লমল্লিকার মত শুভ্র সুন্দর সরল বিশ্বাসভরা শিশুর ব্যগ্রতামাখা, কচি প্রাণের আহুতির কত পথ চাওয়া আকুল আকাঙ্ক্ষার—সাধনার ছানিত স্বর্গ চির দুর্ল্লভের দুর্ল্লভ প্রাপ্তি তার! পঞ্চমবর্ষের শিশু বড় অভিমানে জ্বালাময় বক্ষে বড় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার পদ্মপলাশলোচনের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। মায়ের স্নেহ উদ্যানের বিস্তৃতিতে কোমল ছায়ায় যাহার অবস্থান অজস্র স্নেহাবেশের উছলিত অমিত তরল স্নেহধারার মধ্যে যে পরিপ্লুত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, মাতৃরস আস্বাদনে যে এখনো চক্ষু মেলে, আবার ঘুমায়; মায়ের কোলটুকুই যার ক্রীড়ার প্রাঙ্গণে বিশ্রামের স্থান, মায়ের আঁচলের বাতাস, গায়ের গন্ধ, ঘুমপাড়ানিয়া গান এখনো যারে ঘুমের দেশে স্বপ্নময় ছবি দেখাইয়া তন্দ্রাবেশ টানিয়া আনে, সেই দুগ্ধের শিশুর কচিপ্রাণে এ বৈরাগ্যের নির্ম্মমতা কোমলতায় কঠোরতার সমাবেশ কেমনই দেখাইয়াছিল? মায়ের দুধের আস্বাদ তখনো ত ওষ্ঠে লাগিয়াছিল, কিন্তু অতটুকু বুকে কি ব্যথায় তীব্র তাপ অমনই জ্বালা কত প্রেম পিপাসায় আকুল হইয়া মায়ার কঠিন বাঁধন ছিনাইয়া ক্রীড়ামত্ত শিশুকেও অসীমের রস আস্বাদনে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল, আজ কামাতীতের সঙ্গ সব দ্বন্দ্বকোলাহল নিবৃত্তি করিয়া মনোবাক্যের অগোচর একমাত্র শান্ত আনন্দ সত্ত্বায় চিরস্থিতি আনিয়া দিয়াছে, এখানে শোক তাপ ব্যথা মোহ ব্যাকুলতা আর কিছুই নাই, আনন্দের সমাধি (শ্রীগুরুর অনন্ত কৃপায় অবিদ্যার চিরবিনাশে প্রেমময়ের দর্শনে সকল বাঞ্ছাপুরণ করিয়া তাঁহাকে অমৃতময় কোলে চিরস্থান দিয়াছে। ধ্রুবের মুখে তাই শান্তির স্নিগ্ধতা ফুল্লঅধরে

চিরমধুর হাস্য বিকশিত করিয়া স্মৃতির জাগ্রত দুয়ারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, আজ ভক্তের প্রাণ রসের গুঞ্জরণে অবশ হইয়া প্রিয়মুখের মধুর আস্বাদনে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া তাই বুঝি ভাবে বিভোর! অজ্ঞান স্বপ্ন ভাঙাইতে ভক্ত ভগবানের চরণে প্রাণের আকুল পিপাসা জানাইয়া প্রণাম করিলাম। ভক্তের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে প্রাণটাকে স্বপ্নময় করিয়া অতীত চিত্রকে ফুটাইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন ডুবাইয়া দিয়াছিল। ৺ছমনঝোলার সেতু ভগ্ন হওয়াতে এখানে নৌকার বন্দবস্ত রহিয়াছে, কালিকমলিবাবার লোকই খেয়া নৌকায় পার করাইয়া দিতেছে বিনা কড়িতেই এখানে পার হওয়া হইবে। পয়সা লওয়ার নিষেধ আছে বলিয়া তাহারা জোর করিয়া দিতে চাহিলেও কিছুই গ্রহণ করিবে না, একমাত্র 'সুঁইতাগা' গ্রহণ করিতে পারে বলিল। শেষ দিনের কাণ্ডারীর কথা মনে হইল, সম্বল ত কিছু নাই সেই দিনেও যদি রিক্ত হস্ত দেখিয়া এমনি করিয়া ভবপারে লইতে এস তবেই তোমার অপার করুণা পতিতপাবন নামের মহিমা জানা যাইবে। যাত্রিগণ হরিধ্বনি দিয়া এবং গঙ্গামাতার বন্দনা গাহিয়া "জয় জয় সীতারাম" নামে "জয় কেদারনাথ বাবা" "বদরীবিশাল স্বামীকে জয়" শব্দে গঙ্গাবক্ষ প্লাবিত করিয়া হর্ষকোলাহলে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছে। আমরাও "জয় গুরু দয়াল মহারাজের জয়" দিয়া তাহাদের সহিত সমবেত কণ্ঠে সীতারাম নামের মধুর ধ্বনি করিতে করিতে এপারে আসিলাম। পর্ব্বতরূপী তুমি, স্মরণে শৈলদেবকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পর্ব্বতারোহণে অগ্রসর হইলাম। হিমালয় যাত্রার উৎসাহ সকলের মুখমণ্ডলকে আনন্দাভায় উদ্ভাসিত রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। বৃদ্ধ বালক যুবা কি যেন আনন্দ পিপাসু হইয়া ভগবানের নাম স্মরণে প্রবল উৎসাহ তুলিয়া এখানে সমানবেগে অগ্রসর হইতে ছুটিয়াছেন যেন অদ্যই বুঝি সকলে সেই স্বর্গরাজ্যের মন্দির দ্বারে পৌছিয়া সেই আনন্দঘন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভে প্রবল পিপাসার নিবৃত্তি করিবেন। ৺নারায়ণের দর্শন প্রার্থনায় মহানন্দের রোল তুলিয়া প্রতি ধূলার স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিয়া মনে হইতেছে সত্যই বুঝি এ স্বর্গযাত্রা, স্বর্গের পথ ত বটেই। চারিদিকে সুন্দর পর্ব্বতমালা, মহানের ছবি অঙ্কিত করিয়া বিরাটের গাম্ভীর্য্য তুলিয়া ধ্যানমগ্ন হইতে উপদেশ দান করিতেছে। এখান হইতে প্রায় দুই মাইল পরে সন্ধ্যার অগ্রে আমরা গরুড় চটীতে কালী-কমলি বাবার ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম। সুন্দর গোলাপ বাগান বহু কদলী বৃক্ষাদি শোভিত উপবনে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া কতকগুলি পুষ্প সংগ্রহ করা

হইল, একপার্শ্বে নিভৃত স্থানে একটী ছোট মন্দির চারিদিকে খুব বড় চৌবা-চ্চার ন্যায় জলাধারে জল থই থই করিতেছে। ঝরণার সহিত সংযোগ থাকাতে জল অনবরত বহিয়া চলিয়াছে কৌশলের সহিত তাহাকে উদ্যানের মধ্য দিয়া বহাইয়া আনা হইয়াছে। জলের কুলু-কুলু শব্দের অস্ফুট মৃদু আলাপ বহুদূর হইতে শ্রুত হইয়া চন্দ্রালোকে যেন প্রেমের গুঞ্জনের ন্যায় সুমধুর করিয়া তুলিয়াছে। আমরা মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিয়া মন্দিরের পশ্চাতে জলের ধারে ঝরণার নিকট আসিয়া বসিলাম। আর আর সকলে অন্যদিকে গেলেন কেবল "ম" ও "ল" এবং আমি আমরা তিনজনে সেইখানে রহিয়া সন্ধ্যাক্রিয়াদি করিয়া বহুক্ষণ সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া রহিলাম। তখন চন্দ্রোদয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবনে মন্দিরপ্রাঙ্গনে চারিদিকের বাঁধান স্থানগুলি বিধৌত করিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকের গাছপালার মধ্যদিয়া অপূর্ব্ব ঝিল্লীধ্বনি সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ শব্দে তখন লহরীতে ভাসা-ইয়া দিতেছে। জলাধারের জলে চন্দ্রের কিরণ পতিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া হীরক খণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া কালজলে জ্যোতির আভা ছড়াইয়াছে। এখানে জলের বেশ সুবিধা। রাত্রে সেই প্রস্ফুট চন্দ্রালোকিত পুষ্পগন্ধামোদিত উদ্যানের মধ্যেই একটু পরিস্কৃত স্থান দেখিয়া আমাদের দশমীর জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হইল। তারপরে কালীকম্‌লি বাবার ধর্ম্মশালার দ্বিতল গৃহে আমরা বিশ্রামার্থ শয়ন করিয়া সে রাত্রি সেখানেই যাপন করিলাম।

১০ই বৈশাখ শুক্রবার আজ একাদশী। প্রাতে ৫৷৷০টার মধ্যেই প্রাতঃ সন্ধ্যার পর রাম রাম স্মরণে এখান হইতে বাহির হওয়া হইল। প্রায় দুই মাইল পরে 'ফুলবাড়ীচটি' আরো আধ মাইল গিয়া 'রথপানিচটী' পার হইয়া এখান হইতে দুই মাইল পরে ঘটুগাড়চটী মিলিল। কিন্তু এখনো সেরূপ বেলা হয় নাই সেজন্য এখানে বিশ্রামের মত কাহারও হইল না। আমরা আরো তিন মাইল অগ্রসর হইয়া 'মোহনচটী' পাইলাম। এখন সূর্য্যদেব ঠিক মস্তকের উপর প্রখর কিরণ বর্ষণে চতুর্দ্দিক জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছেন, সম্মুখে চটী পাইয়া সকলেই আশ্রয় লইয়া বাঁচিল। কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করিবার পর স্নান সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদিও সামান্য কিছু করা গেল। এ চটির স্থানও বেশ প্রশস্ত, সকলে বিশ্রামাদিতে কিছু ক্লান্তি দুর হইলে আরো কিছু অগ্রসরের বাসনা করি-লেন। আজ একাদশী সকলের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত সকালেও হাঁটা মন্দ হয় নাই তথাপি আহারাদির ব্যাপার না থাকাতে অনেকটা ঝঞ্ঝাট মুক্তি মনে হওয়ায়

নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা কেহই যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। সকলের সঙ্গেই সকলকে উদ্যম করিতে হইল। এইবার কিন্তু চড়াইয়ের পথ—ক্রমশঃ উপরে উঠা। "স"—রিষ্ট ওয়াচটী এখানে হারাইয়া আসাতে সময় নিরূপণের উপায় আর ঠিক রহিল না। এখান হইতে দেড় মাইল যাইলে "ছোট বিজলী"। অল্পে অল্পে ক্রমে চড়াইপথে উঠিতেছি যত অনুভব হইতেছে গমনের বেগও ততই হ্রাস হইতেছে। উৎসাহ চটী হইতে বাহির হইয়াই কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর ক্রমেই পা যেন টানিয়া টানিয়া চলিতে হয়, দ্রুত নিশ্বাস বাহির হইতে থাকে অবশ্য উপবাসে শরীর ক্লান্ত রৌদ্রের মধ্যে এই পাহাড়ে পথে চড়াই ভাঙ্গিতে যতদূর ক্লেশ মনে হয় অন্য সময় এতটা অনুভব হয় না। শরীরে ক্লেশ যতই অনুভব সীমায় আসিতে থাকে ততই চিত্তকে কাতর অবসন্ন করিয়া তোলে, মনে হইতেছিল মা জানকীর কথা আহা! কখনই যিনি পুরীর বাহিরে একপদও উত্তোলন করিয়া পদব্রজে কোথাও গমন করেন নাই স্বামীর সঙ্গে বনবাসে বনে বনে ভ্রমণে তাঁহাকে কত উদ্যমই জাগাইতে হইয়াছিল। তিনিও প্রথম গমনের উৎসাহে পুরী হইতে বাহির হইয়া সকল বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া বড় উৎসাহে চলিয়া ছিলেন কিন্তু কোমল চিত্ত সাধকের দুরাতিক্রম্য পথ দেখিয়া যে দুর্দ্দশা ঘটে সেইরূপ অতি কাতর প্রবণচিত্তে শ্রীগুরুর শরণাপন্ন লওয়ার ন্যায় তিনিও বলিয়াছিলেন—

"সদ্যঃ পুরী পরিসরেষু শিরীষমৃদ্বী—
গত্বা জবাত্রি-চতুরাণি পদানি সীতা।
গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্য সকৃৎ ব্রুবাণা
রামাশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারম্॥

শিরীষ কুসুমসম অতি কোমলাঙ্গী সীতা, পুরী সমীপে ভূমিতে অতিশীঘ্র চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তিন চারি পদ দ্রুত চলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কতদূর আর চলিতে হইবে? এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চক্ষের জল প্রথম সৃষ্টি করিলেন।

কি ভাবময় সরসতাযুক্ত এই রামায়ণের উপাখ্যান যাহার স্মরণ মাত্রেই চিত্তের ভাব এক ক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথায় যেন পৌঁছাইয়া গলাইয়া চিত্তকে কোমল সরস করিয়া তুলে। কত সুন্দর ভাবোদ্দীপক চিত্ত যেন এ লীলায় সন্নিবেশিত। আহা! শরণাগত জনের প্রতি করুণা বৎসল দয়ার্দ্র

কমললোচন সেই তরুণ তমালবর্ণ জটাচীর বল্কলধারী হইয়া কেমন সাজে সাজিয়াই বা জানকীর পশ্চাতে থাকিয়া সেই কাতর দৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সজল চক্ষে করুণার্দ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যথা মোচনের উপায় ভাবিয়াছিলেন—

"আদাবেব কৃশোদরী কুচতটীভারেণ নম্রা পুন—
লীলাচঙ্ক্রমণং নচৈব সহসে দোলাবিধৌ ভ্রাম্যসি।
স্রোতঃ কানন—গর্ত্ত—নির্ঝর—সরিৎ প্রায়ানপূর্ব্বানিমান—
ভূভাগানপি ভূতভৈরবমৃগান্ বৈদেহী যায়াঃ কথম্॥"

প্রথম হইতেই কৃশোদরী এই সীতা, তাহার উপর কুচভর নমিতাঙ্গী, ক্রীড়া কালে গৃহেও চঞ্চল ভাবে ঘুরিতে ফিরিতে অসমর্থা, দোললীলাতেও পরিশ্রান্তা, এই বনভূমিতে যেখানে সেখানে জলস্রোতঃ গর্ত্ত নির্ঝর নদী প্রাণিগণের ভয়প্রদ পশুপরিপূরিত এই প্রদেশে বৈদেহী কিরূপে গমন করিবে? ভগবানের চক্ষে জল, ভগবান তখন পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন।

"অরুণ দল নলিন্যা স্নিগ্ধ পাদারবিন্দা
কঠিন তনু ধরণ্যাং যাত্যকস্মাৎ স্খলন্তি
ধরণি! তব সুতেয়ং পাদ-বিন্যাস দেশে
ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাত্যরণ্যম্।"

যাঁহার চরণ বিনা অলক্তেই রঞ্জিত থাকিত সেই কোমলাঙ্গী বালা সীতার রক্ত কোকনদ আভাযুক্ত কোমল কমল চরণ যুগল যাত্রাকালে এই কঠিন মৃত্তিকায় ঘর্ষণে বার বার পদ স্খলন হইতেছে, ধরিত্রি! অতএব তোমার এই দুহিতার চরণবিন্যাসের পাদরক্ষার স্থানে তুমি তোমার কঠিনত্ব ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কোমল হইয়া যাও, জানকী যে বনে যাইতেছেন।

ধরণী সীতার যাত্রাপথের কঠিনতা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রার্থনায় কোমল হইয়া গিয়াছিলেন। সাধকও যখন শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া যাত্রা পথের বিঘ্ন সরাইতে কাতরপ্রাণে তাঁহাকে জানায় তখন তিনি নিজ হাতে তার পথের কণ্টকগুলি একটী একটী করিয়া বাছিয়া তুলিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তিনিত দূরের বস্তু নহেন, আমরাই তাঁহাকে দূর করিয়া দূরে রাখিয়াছি সর্ব্বহৃদিস্থ আমার আত্মারাম ত আমার মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন আজ এই "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং"—কে অবন্ধু করিয়া রাখিয়াছি নিজ কর্ম্ম দোষে। আর

সকলে কিছু কিছু অগ্রে গমন করিয়াছিলেন কেবল 'ম'—'ল'—ও আমি আমরা তিনজনে পশ্চাতেই একসঙ্গে যাইতেছিলাম। বড় বড় বৃক্ষ পাদপ শৈল-গাত্রে আশ্রয় স্বরূপ হইয়া স্নিগ্ধ ছায়াদানে সুশীতল বায়ু প্রবাহে স্থানটীকে মনোরম করিয়া মায়ের স্নেহাঞ্চলের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। আমরা একটী ছায়া শীতল স্থানে গিরিকন্দরকুঞ্জবায়ু পরিচালিত পল্লব বীজনে প্রকৃতির শান্ত শীতলতার স্নিগ্ধতা অনুভব করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামে ভগবৎরসালাপের মধুর প্রসঙ্গে দেহমনের জড়তা কাটাইয়া পুনরায় ধীরপদ সঞ্চালনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পথের ধারে একটী ডুম্বুর বৃক্ষ, অগনিত ফলভারে সমাচ্ছন্ন অবনত শাখা দেখিয়া কতকগুলি ভগবানের প্রকৃতিদত্ত উপহার সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। প্রকৃতির শ্যামক্রোড়ে উঠিয়া নৈসর্গিক সরলতা সৌন্দর্য্যের উপভোগে সহরস্থলীর বিলাস বৈভব কৃত্রিমতার আড়ম্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত চিত্ত যেন প্রকৃতির নগ্নশিশুর ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। নভঃ কিরীটী নব কিসলয়ভূষণ গিরিরাজী, শ্যামায়িত সরল বনশ্রেণী প্রকৃতির নিভৃত কুঞ্জ নৈসর্গিক শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া বিতরণের জন্যই উন্মুখ; কোন দানের অপেক্ষা রাখেনা। এখানকার নিশ্বাসে পার্ব্বতীয় মধুর বায়ু স্বননে, স্পর্শে, স্বার্থ শূন্য পবিত্রতার গন্ধই পরিমোদিত। রুক্ষ দৃষ্টি-ভেদজ্ঞান এখানে হারাইয়া যায়, স্বচ্ছ সরল সৌন্দর্য্যের নির্ম্মল ছবিই এখানে যেন সর্ব্বত্র পরিস্ফুটিত। রাম রাম রং মাখান কচি কচি পাতাগুলি, নামরূপের আবরণে আত্মগোপন করিয়া যে নিত্য চৈতন্য আনন্দস্বরূপ সকলের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত; তিনিই যে গোপনে থাকিয়া সব সাজিয়া আছেন রূপে রূপে মিশিয়া খেলা করিতেছেন বর্ণে বর্ণে তাঁহাকেই প্রকাশ করিয়া জানাইতেছে। এমন চক্ষু শীতল স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যাম শ্যাম বর্ণভাতি জগৎ বিমোহন রামরূপেই দেখা গিয়াছিল প্রকৃতি সেইরূপের ঝলক মাখিয়া তাই বুঝি এত সুন্দরী! এমনি শান্তি শীতল জন বিরল পথে কাহারা সে রূপের ঝলক তুলিয়া দিয়া কত গিরি কান্তার নির্ঝর উপত্যকার মধ্যে চমকায়িত বিদ্যুৎ প্রভা মিলিত শ্যামল ছবি অঙ্কিত করিয়া কতদিন চলিয়াছিল, দূর অতীতের সেই চিরাঙ্কিত চিরন্ময় পুণ্য চিত্রখানি অম্লান জ্যোতিতে স্মৃতিপট উজ্জ্বল করিয়া আজো তেমনি মানব মনের গূঢ় বেদনার ছায়া অপসারিত করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গেলে পবিত্র করিয়া তোলে, এমনি সে নামের মহিমা রূপের মাধুর্য্য প্রেমের

গৌরব। আহা! কেমনই সে রূপ! যাঁহারা নয়ন দিয়া এই রূপসুধা পান করিয়া ছিলেন, বন গমন কালে যে পবিত্র রূপ জ্যোতি সকল লোকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া কত নয়নানন্দ দান করিয়া তৃপ্তিতে ভরাইয়া তুলিত পথিক ললনাগণ সাশ্চর্য্যে সেই যুগলরূপ দর্শনে যখন ব্যগ্র কৌতূহলে সীতাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন তখনকার মাধুরীই বা কেমন ফুটিয়া ছিল। সেই যে—

"পথি পথিক বধূভিঃ সাদরং পৃচ্ছ্যমানা
কুবলয় দল নীলঃ কোঽয়মার্য্যে তবেতি।
স্মিত বিকসিত গণ্ডং ব্রীড় বিভ্রান্ত নেত্রং
মুখমবনময়ন্তী স্পষ্টমাচষ্ট সীতা॥"

পথে পথিক বধূ সকল আদর করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্যে! এই যে নীলকমল দলের ন্যায় কর্ণান্ত দীর্ঘ নয়ন—এই পুরুষ ইনি তোমার কে? তখন ঈষৎ হাস্যে সীতার গণ্ডস্থল বিকসিত, কুঙ্কুম বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, লজ্জায় নেত্রদ্বয় বিভ্রান্ত হইল। সীতা মুখ অবনত করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই সীতা দেখাইলেন ইনি কে, অথবা ইহাঁর আকার ইঙ্গিতে স্পষ্টই জানাইল ইনি আমার পতি। কত সুন্দর সেই যুগল ছবির আত্মপ্রকাশ ভক্ত চিত্তের সাধ অনুসরণে আপনাকে আস্বাদনের জন্য যাহা অব্যক্ত থাকিয়াও ব্যক্ত হইয়া ভক্তের সাধনাকে সহজ করিতে লীলা ফুটাইয়া রাখিয়াছে। গভীর অন্বেষমান দৃষ্টিতে দূর অতীতের সেই স্মৃতি আজো তেমনি উজ্জ্বলিয়া উঁকি দিয়া যায়। কেবল সাধনার অভাব, নহিলে ভক্তের উপর সেই কৃপা ত চিরদিনই একরূপ। এই বনে বনে পরিভ্রমণে তাঁহাদের পুণ্য নাম স্মরণে চিত্তকে যদি একাগ্র করিতে পারা যায়, সে পবিত্র ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া সমস্ত বাসনানলকে নির্ব্বাপিত করিয়া অপেক্ষার দেখা সাধিতে পারিলে তবে বুঝি সে হারানিধির দর্শন মিলিলেও মিলিতে পারে! অন্ততঃ তাঁদের রূপের ঝলক কোন চিহ্ন এমন রাখিয়া যাইতে পারে, যে দেখায় সব দেখার সাধ মিটিয়া যায়। কিন্তু চির অপরাধী দুর্ব্বল মোহভ্রান্ত চিত্ত কোথায় সে শুদ্ধতা লাভ করিবে? সে দেখা কিরূপে পাইবে? সে যে ভক্ত অন্তরের চির আরাধিত সাধনার দুর্লভ নিধি বিনা সাধনায় কি সাধ্য বস্তু মিলে? কিন্তু এখানকার পুণ্যময় গিরি-কাননের রজঃকণা স্পর্শে এই স্বর্গের বিমল ক্ষেত্রে অলকানন্দার পবিত্র সমীরের বিশুদ্ধতায় কত ভক্তের তপস্যামণ্ডিত পুণ্যস্থান মাহাত্ম্যে কি এ মলিন দেহাত্ম

জ্ঞান অজ্ঞান বাসনার নাশ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার প্রসাদ লাভের অধিকারী হইবে না? একবার দেখা দিয়া এ জড়ের জঞ্জালের হাত হইতে মুক্ত করিয়া তোমার চরণের দাসী করিয়া এ জীবনের চির সঞ্চিত আশা পূর্ণ কর দয়াময়! ইহাই ভিক্ষা। ভক্তজনের সাধের মত এ কাঙাল চিত্তেও যে তোমায় পাইবার বাসনা জাগে, তুমি যে সকলের হৃদয়বল্লভ প্রাণারাম প্রাণের বস্তু একমাত্র তুমিই। আমার মতন দীন পতিত কাঙাল মহাপাতকী না থাকিতে পারে, কিন্তু "পাপঘ্নী তৎসমা নহি" তবে তোমার এ কৃপা এ অজ্ঞান অধমের উপর হওয়াও দুর্ল্লভ নহে! একান্ত ভাবে আপন মনের অনুসরণে কতদুর আসিয়া দেখি সঙ্গিনীসকলকে পশ্চাতে রাখিয়া সঙ্গবিহীন হইয়া বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। একাদশীর উপবাসে পাহাড়ের চড়াই ভাঙিয়া শরীরের ক্লান্তির পিপাসা, শ্রান্ত দেহের ভার নামের আশ্রয় গ্রহণে লঘু হইয়া চটির নিকটে আনিয়া দিয়াছে। চটিতে যাহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়া অগ্রেই পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিলেন "এখনো বেলা আছে আরেকটু অগ্রবর্ত্তী এগনো হওয়া যায়" "শৈ" একটু জেদ ধরিয়া বলিলেন "আর এক চটি এগাইয়া যাইতে হইবে"। সকলের দেহেই কিন্তু শ্রান্তি দেখা দিতেছিল, তথাপি তাঁহারা গমনের উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন। "ম"—"ল"—তখনো আসে নাই, বুঝিলাম তাহারা খুবই শ্রান্ত হইয়াছে আমি তখন একটু জোর করিয়াই এখানেই সে রাত্র থাকিবার কথা বলিলাম। এইরূপ কথোপকথনের কিছুক্ষণ পরেই তাহারা দুইজন পৌঁছিয়াই বলিল—"আর আমাদের শক্তি নাই আমরা আর একপাও চলিতে পারিতেছি না"। তখন সেইখানেই ডেরা ফেলা হইল। তখনো অল্প অল্প বেলা দেখা দিতেছিল, শেষ বেলার পড়ন্ত রৌদ্র টুকু পর্ব্বত গাত্রে তরুশীর্ষ পরে ঝিকি মিকি রশ্মিতে চঞ্চল মনে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পীত আভাটুকু ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া আকাশের গায়ে হোলীর উৎসবে রংয়ের পিচকারী গুলিয়া ছড়াইয়া পড়ার ন্যায় কুঙ্কুম আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি তখন জলের অনুসন্ধানে একাকীই চটির বাহিরে গেলাম, অস্ফুট জল কলরব শোনা যাইতেছিল, নিকটেই চটি হইতে অল্প দূরেই কল ও ঝরণা। সে স্থানটী অত্যন্ত রমণীয়। নির্ঝরিণীর জলে পাইপ লাগাইয়া চটিতে চটিতে প্রায়ই কলের আকারে জল পড়িবার বন্দবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলের জলে গাত্রাদি ধৌত করিয়া আসিয়া দেখি, শয়নের বিলম্ব কাহারো সহে নাই, যাঁহারা আরও কিছুদূর যাইবার জন্য বেশী

উৎসুক হইয়াছিলেন তাঁহারাই আরো বেশী শ্রান্ত হইয়া যে যেখানে কম্বল বিছাইয়া শ্রান্ত দেহ এলাইয়া পড়িয়াছেন। আজ আর বেশীক্ষণ বসিবার অবস্থা কাহারোই ছিল না, সন্ধ্যাদি করিয়া সন্ধ্যার পরই ক্লান্ত দেহে-শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

(ঘ) "সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইব না যে দেশে সন্ধ্যা নাই, শর্ব্বরী নাই, যেখানে নিদ্রা নাই, স্বপ্ন নাই, যেখানে তাপ নাই, বিক্ষেপ নাই, আমি সেই দেশের লোক পাইয়াছি। (পুষ্পাঞ্জলি—"জীবের নিদ্রা ভঙ্গ"— ২৮৭ পৃষ্ঠা।)

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে পূর্ব্বার্দ্ধ অবিকল আছে, পশ্চার্দ্ধ ("যেখানে তাপ নাই বিক্ষেপ নাই" ইত্যাদি স্থলে) "শোক নাই দুঃখ নাই আমি সেই দেশে যাইয়া সেই দেশের লোকের সঙ্গে থাকিব।" এই আছে। পূর্ব্বার্দ্ধের 'নিদ্রা নাই' এর পূর্ব্বে "যেখানে" শব্দটি নাই। (১৫৭ পৃঃ ১—৪ পংক্তি)

(২) তত্ত্বোপদেশে "গুরুও শিষ্য" প্রবন্ধের যে সব স্থলে শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলির "গুরু ও শিষ্য" প্রবন্ধের ছায়া দেখা যায় তন্মধ্যে একটী মাত্র স্থল উদাহৃত হইতেছে :—

"পৈতৃক বাগবাগিচা গৃহসম্পত্তির ন্যায় তুমি শিষ্যঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়াছ। একবারও কি মনে ভাবনা, যে মন্ত্র দীক্ষা তামাসা নহে, ক্রীড়া নহে, শিষ্যকে সংসারসিন্ধু পার করিবার গুরুভার তোমার উপর ন্যস্ত, ভগবানের সম্মুখে তুমি শিষ্যের জন্য দায়ী।" (পুষ্পাঞ্জলি ১৪২ পৃষ্ঠা)।

উমাচরণ বাবুর প্রবন্ধে ইহাই একটু রকম ফের গোচের রহিয়াছে—'তুমি' 'তোমার' স্থলে 'তাঁহারা' 'তাঁহাদিগের' (শেষের বাক্যে 'তিনি') আছে ও ক্রিয়াপদও মধ্যম পুরুষেই রহিরাছে। 'পৈতৃক' স্থলে 'পৈত্রিক,' 'মন্ত্রদীক্ষা' স্থলে 'দীক্ষা দেওয়া' এবং ন্যস্ত স্থলে নির্ভর করিতেছে এইরূপ সামান্য বিভেদ আছে। এখানেও বিবেচ্য, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী উপদেশ প্রদানের সময় এরূপ নিন্দাবাদের অবতারণা কেন করিবেন?

এস্থলে বক্তব্য এই যে "শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি" ১৮০৩ শকে মাঘ মাসে (১৮৯২ ইং জানুয়ারীতে) সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তখন বাঙ্গলা ১২৯৮ সাল। (প্রথম সংস্করণের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য)। ইহারও বহু পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রচারক পত্রে ঐ সব প্রবন্ধ ছাপান হয়। এই গ্রন্থের বর্ত্তমানে তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে—তাহাও ১৩২১ সালে।

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ইহার পরে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে উমাচরণ বাবুর পক্ষ হইতে একটী কথা বলা যাইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধেও ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; উমাচরণ বাবু মুঙ্গেরে গিয়া (১২৮৮ সালে তাঁহার প্রবন্ধের খাতা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রুতিধর পরিব্রাজক হয়তো তাহাতেই ঐ সব তত্ত্বোপদেশের ভাবগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বেশ কথা; কিন্তু পরিব্রাজকের তো ভাষার দৈন্য ছিল না যে তিনি উমাচরণ বাবুর লিখিত বিষয়গুলির ভাষাও সযত্নে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়া যথাযথ স্বীয় প্রবন্ধে লিখিয়া যাইবেন।

ফল কথা, উমাচরণ বাবুই পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রবন্ধ হইতে তত্ত্বোপদেশের অনেক কথা আহরণ করিয়াছেন—তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উমাচরণ বাবু ১২৮৭ সালে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামীর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ১৮০০ শকের (১২৮৫ সালের) ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "তুমি কে?" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (ঐ সংখ্যার ১১৬-১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) *

---

* শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলিতে ঐ প্রবন্ধ অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; তবে উদ্ধৃত অংশে 'অগাধ সলিলরাশি' ধর্ম্মপ্রচারকে 'অগাধসাগররাশি' ছিল, বোধ হয় মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ।

অবশ্য পরিব্রাজকের অন্যান্য প্রবন্ধ ১২৮৭ সালে † বা তারও পরে 'ধর্ম্ম-প্রচারকে' প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু হাঁড়ির একটা ভাত হইতেই যেমন সমস্ত ভাতের খবর পাওয়া যায় তেমনই উমাচরণ বাবুর এই তত্ত্বোপদেশের প্রবন্ধ-গুলি কিরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তথ্য এই একটি হইতেই অবগত হওয়া গেল। §

উপসংহারে বক্তব্য যে মহাপুরুষ ত্রৈলিঙ্গস্বামীজির জীবন আখ্যায়িকা বিষয়ে ৺নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুস্তকখানিই অধিকতর প্রামাণিক এবং উমাচরণ বাবুর সম্পর্কিত যেসব ঘটনা নিবারণ বাবুর পুস্তকে আছে তাহা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য কেননা তখন উমাচরণ বাবু লোকের নিকট যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে ভেজাল কিছু না থাকিবারই কথা—তখন মহাত্মা স্বামী-জির প্রদত্ত মন্ত্রদীক্ষার ফলে উমাচরণ বাবুর রজোভাব অনেকটা নির্জ্জিত ছিল।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া সাড়া পাই নাই একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রবন্ধ যদি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় তবে এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার কি বক্তব্য আছে আশা করি তাহা তিনি সাধারণের গোচরীভূত করিবেন।

---

‡ "জীবের নিদ্রাভঙ্গ" প্রবন্ধটি ১২৮৭ সালে (১৮০২ শকে) কার্ত্তিক পূর্ণিমায় ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত হয়। উমাচরণ বাবু ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে মুঙ্গের হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তারও আট মাস পরে মুঙ্গেরে ফিরিয়া যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে তত্ত্বোপদেশের খাতা দেখাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

§ উমাচরণ বাবুকে ত্রৈলিঙ্গস্বামীজি তৎ প্রকাশিত "মহাবাক্যরত্নাবলী" নামক একখানি পুস্তক (ঐ দুই খাতা উপদেশ লিখাইবার পরে) দিয়াছিলেন (৭৩ পৃষ্ঠা) এই খানির কথা নিবারণ বাবুর পুস্তকেও আছে। (৬৮ পৃষ্ঠ) ইহা সংস্কৃতে লিখিত এবং বহু সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ। উমাচরণ বাবু যদি এই খানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেন তবে একটা প্রকৃত কাজ হইত। আমরাও একটা খাঁটি জিনিষ পাইতাম।

সিদ্ধ সাধক, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উপদেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩৩। তুমি যে দেবতার উপাসক, সেই দেবতার তত্ত্বমাহাত্ম্য প্রচার করা যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তুমি অন্য শাস্ত্র পরিহার করিয়া সেই শাস্ত্রকেই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন কর।

৩৪। নিজ সাধনশাস্ত্রের কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইলে, সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে যাহার তাহার নিকটে যাইও না। সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি থাকিলেই শাস্ত্রতত্ত্বের অভিজ্ঞ হয় তাহা নহে। যে কোন সন্দেহ হউক না কেন, গুরুদেব বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট হইতেই সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। গুরুদেব অন্তর্হিত হইলে অথবা অন্য কোন বাধাবিঘ্ন থাকিলে নিজ সাধনপথের অনুকূল পথিক কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিকট হইতে তাহার মীমাংসা করিয়া লইবে।

৩৫। অন্য শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় বা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ হইলেও তাঁহাকে নিজ সাধন বিষয়ে কোন সন্দেহের কথা কদাচ জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ, তিনি যদি ভাল লোক হয়েন, তাহা হইলে হয়ত তোমার ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে উত্তর করিতে না পারিয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইবেন। আর যদি মন্দলোক হয়েন, তাহা হইলেও বোকা বুঝাইবার মত তোমাকে একটা যাহা কিছু বুঝাইয়া দিয়া নিজের গৌরব বজায় রাখিবেন। তাঁহার সেই সকল কথায় তোমার হয় ত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

৩৬। গৃহী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, ভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী, যিনিই যাহাই কেন না হউন সাধু দেখিলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান গৌরব করিবে। তিনি কোন আদেশ, সাহায্য বা ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে যথাসাধ্য তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবে, কিন্তু যতদিন যতক্ষণ তাঁহাকে তোমার নিজ সাধনপথের পথিক বলিয়া না জানিবে, ততদিন ততক্ষণ সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি তোমার আত্মসাধনতত্ত্ব তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিও না।

৩৭। সাধু সন্ন্যাসী সাধক সাধিকাবর্গ যিনি যে পথেই কেন নিজ সাধন রাজ্যে অগ্রসর হউন না, তুমি তাঁহাদিগের কাহাকেও অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ বা উপহাস অবহেলা কিছু করিও না। নিশ্চয় জানিও সাধনরাজ্যে কিছুই অবিশ্বাস উপহাস অবহেলার বিষয় নাই।

৩৮। সাধু, প্রকৃত সাধু কি না; ইহা জানিবার জন্য, বুঝিবার জন্য, একটা বিশেষ কিছু পীড়াপীড়ি করিও না, অগ্নিকে কেহ যেমন চাপিয়া রাখিতে পারে না, সাধকের সাধন-তেজঃও তদ্রূপ কখনই গোপন থাকে না। বুঝিতে ইচ্ছা হইলে তুমি ধৈর্য্য সহকারে বুঝিও, কিন্তু হঠাৎ সব বুঝিয়া উঠিবার জন্য কোন উৎকট চেষ্টা করিও না।

৩৯। তুমি সাংসারিক দৃষ্টিতে যেটাকে মন্দ বলিয়া জান, সাধকের সাধন-তেজে তাহা তাঁহার পক্ষে ভাল অপেক্ষাও ভাল হইতে পারে। তুমি যদি তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পার, তাহা হইলে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইয়া অতি বিনীত ও বিশ্বস্তভাবে তাঁহাকে তোমার জানিবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিও। যদি তিনি তোমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দয়া করিয়া বলিয়া দেন, ভালই; আর যদি না বলেন তাহা হইলে জানিও, তখনও তুমি তাহা শুনিবার বা বুঝিবার অধিকারী হও নাই। তুমি নিজে অধিকারী হইলে বিনা প্রার্থনায় সাধক সে তত্ত্ব তোমাকে আপনই বুঝাইয়া দিবেন তাহার জন্য ব্যস্ত হইও না।

৪০। কে কি করেন, তাহা ভাবিয়া বা দেখিয়া সময় নষ্ট না করিয়া তোমার নিজের যাহা করিবার আছে, ততক্ষণ তুমি তাহাই করিয়া যাও তোমারও মঙ্গল হইবে, জগতেরও মঙ্গল হইবে।

৪১। মহানুভব, মহাপুরুষ, মহাযোগী, যিনিই কেননা হউন, তুমি তাহার কাহারও সহিত নিজ গুরুর তুলনা করিও না। যদি সাধনপথে কল্যাণ চাও, গুরুদেবকে কদাচ মনুষ্যজ্ঞানে ধ্যানধারণা করিও না। জানিও, ইষ্টদেবতাই গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মরূপ গুরুকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া কদাচ নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না।

৪২। গুরু সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার যাহা করিবার আছে, জানিও সে সমস্তই দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে গুরু ইষ্টদেবতা অপেক্ষাও গুরুতর। তোমার দীক্ষাগ্রহণের পর গুরু, ভ্রষ্ট দুষ্ট নষ্ট লৌকিক দৃষ্টিতে যাহাই কেন না হউন, তুমি তাঁহাকে সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ইষ্টদেবতার অবতার বলিয়াই

জানিবে। এমন কি দীক্ষাপ্রদানের পর তাঁহার যেমন অবস্থাই কেন না হউক, তাহার কোন অবস্থাতেই তুমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ পরব্রহ্ম বই আর কিছুই ভাবিতে পার না।

৪৩। যদি সাধক হইতে ইচ্ছা থাকে, সিদ্ধি সাধনার সাধ থাকে, সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধেশ্বরীর পুত্রনামের লালসা থাকে, তবে সর্ব্বসিদ্ধিময় স্বরূপ গুরুচরণাম্বুজে নিজের জ্ঞান সিদ্ধি, ভাবসিদ্ধি ও ভক্তিসিদ্ধি সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধ কর! অন্যথা, উপায় নাই, নাই—নাই !!

৪৪। সিদ্ধি সাধনার জন্য বিশেষ তাড়াতাড়ি করাটা শুভলক্ষণ নহে। আহারের অভাবে যেমন কোন কাজ করিতে বল পাওয়া যায় না, অতিরিক্ত আহার করিলেও আবার তেমনি কোন কাজ করিতে পারা যায় না; তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ্যে যথাসাধ্য যথাসম্ভব অনুষ্ঠান না করিলেও অগ্রসর হওয়া যায় না, আবার অসাধ্য অসম্ভব অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাও কখন সিদ্ধ হয় না!

৪৫। তাড়াতাড়ি করিয়া একঘটী জল যে তুলিতে পারে না, ধীরে ধীরে সে কিন্তু এক ঘড়াও উঠাইতে পারে।

৪৬। নিজের শক্তি সাধ্য অপেক্ষা না করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া কতকটা অন্তর্গত নাস্তিকতার পরিচয়।

৪৭। ভগবান বা ভগবতীর রাজ্যে কখনও অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না, তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া এই জন্মেই সকল সাধনার সিদ্ধি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

৪৮। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে এবার যতদূর হইতে পারে তাহাই করিয়া রাখ, অবশিষ্টভাগ না হয় পরজন্মেই হইবে, তাহার জন্য ব্যস্ততা কি?

৪৯। পরজন্মে যাহার যত বিশ্বাস অল্প, ইহজন্মে তাহার সকল ফল সিদ্ধির জন্য তত ব্যগ্রতা।

৫০। যে ধর্ম্মে যে পথের পথিক হও না কেন ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি করিতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে সংযমের শিক্ষা ও অভ্যাস কর।

৫১। সংযম বলিতে কেবল দেহের সংযম বুঝিও না; দেহের সংযম, বাক্যের সংযম, মনের সংযম এই তিন সংযম যাঁহার সমান অভ্যস্ত, তিনিই ধর্ম্মজগতে সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ।

৫২। দেহের সংযম করিয়াছ বলিয়া বাক্যে যদি তাহা বিজ্ঞাপন কর, আর মনে যদি তাহার জন্য অভিমান অহংকার জন্মিয়া থাকে, তবে জানিও—তুমি এক দেহের সংযম করিতে গিয়া মন ও বাক্য দুইয়ের সংযমই হারাইলে।

৫৩। সংযম যদি শিক্ষা করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে কথার সংযম কর। কথা যে অধিক বলে, কাজ তাহা দ্বারা অল্পই হয়। কথা বলিতেই যদি সময় কাটিয়া গেল, তবে কাজ করিবে কখন? তাই কাজের লোক যে হয়, কথা বলিবার অবসর তাহার অল্পই হইয়া থাকে।

৫৪। যাহার সে কথা শুনিবে, তাহার সেই কথারই উত্তর দিতে হইবে, ইহা বাগ্‌ব্যাধি বিশেষ।

৫৫। যখন তখন দেখা হইলেই যাহার তাহার সঙ্গে আলাপ করা আলাপ নহে, উহাও আলাপ-রোগের প্রলাপ বলিয়া জানিবে।

৫৬। সদা সর্ব্বদা অনর্থক আলাপ না করিলে লোকে যদি তোমাকে অহঙ্কারী অভিমানী বলে, তুমি তাহাতে ক্ষুব্ধ হইও না, তোমার কার্য্যের পরিচয় না পাইলে তাহারা তোমার সহিত ঐরূপ আলাপ করিতে নিজেই লজ্জিত হইবে।

৫৭। সামান্য কথার উপলক্ষ্যে লম্বা চওড়া গল্প তুলিয়া ছোট পালাকে বড় করিও না। কথায় কথায় গল্প করা সংক্রামক রোগ বিশেষ। কাহাকেও ঐরূপ গল্প করিতে দেখিলে তাঁহাকে দূরে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে।

৫৮। অন্য কেহ কোন বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহাদের সেই কথায় তোমার কোন কথার প্রসঙ্গ মনে হইলে, তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া নিজের কথা প্রবল করিও না।

৫৯। দোকানদার যেমন খরিদদারকে দ্রব্য ওজন করিয়া দেয়, কিন্তু দৃষ্টি স্থির রাখে তুলাদণ্ডের উপরে; তদ্রূপ সংসারের ব্যবহারে বাক্যের নিয়োগ করিবে, কিন্তু দৃষ্টি রাখিও সত্যের তুলাদণ্ডের উপরে।

৬০। ব্যবহারে সত্য, বাক্যে সত্য ও মনে সত্য এই ত্রিসত্য যাঁহার স্থির আছে, শাস্ত্র ও ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার সাধনার সিদ্ধি অদূরে।

৬১। সত্য-:সবার সুযোগ পাইয়া পরের নিন্দা বা গ্লানি কুৎসা রটনায় নিজের জিহ্বা কলঙ্কিত করিও না। একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির নিন্দা কুৎসা

কীর্ত্তন করিয়াও তুমি সত্য কথা বলিতে পার, কিন্তু জানিও, তোমার দুষ্ট অভিসন্ধির দোষে সে সত্য, সত্য হইলেও মিথ্যার অধম হইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ইহা সত্য; কিন্তু তুমি যে তাহার দোষকীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, ইহা তোমার কোন্ সচ্চরিত্রতার পরিচয়?

৬২। যাহার অভিসন্ধি দূষিত, সে কথা সত্য হইলেও জানিবে তাহাতে মিথ্যার ফল পাপই হইবে; আর যাহার অভিসন্ধি সৎ, জানিও—মিথ্যা হইলেও সে মিথ্যা কথায় সত্যের ফল পুণ্যই উৎপাদন করিবে। ধর্ম্মের এই সূক্ষ্মগতি বশতঃই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসে বিরাটরাজ গৃহে শত শত মিথ্যা কথা বলিয়াও ধর্ম্মরাজ্যে সত্যতেজে সূর্য্যবৎ তেজীয়ান্ ছিলেন।

৬৩। স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যদি মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তবে জানিও—ধর্ম্মের প্রভাবে সে মিথ্যাও তোমার পক্ষে সত্য হইয়া যাইবে। এই জন্যই শাস্ত্রের আজ্ঞা—নিজের ইষ্ট দেবতা, আচার, মালা ও মন্ত্র এ সমস্তই মাতৃ-দোষের ন্যায় গোপন করিবে অর্থাৎ মাতৃ দোষ প্রকাশ হইলে তাহা যেমন নিজেরই ক্ষতিকর, মালা মন্ত্র ইত্যাদির প্রকাশ হইলে তাহাও সাধকের পক্ষে তদ্রূপ আত্মক্ষতিকর। এই জন্যই আবার আদেশ—"অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ।" অন্তরে শাক্ত থাকিবে, বাহিরে শৈবের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিবে, সাধারণ সভায় বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার ও বাক্য প্রয়োগ করিবে।

৬৪। মনের সংযম যাহার না হইয়াছে, দেহের সংযম তাহার পক্ষে অসম্ভব।

৬৫। মনঃ-সংযমের অভাবেও যদি কোথাও দেহের সংযম লক্ষিত হয়, তবে জানিও উহা সংযম নহে, সংযমের অভিনয় মাত্র।

৬৬। মনঃ সংযমের একমাত্র উপায় জানিও—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস।

৬৭। শাস্ত্রে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মনঃ সংযমের চেষ্টা করা নিশ্চয় জানিও—গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা মাত্র।

৬৮। শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রমানুসারে যিনি যে আশ্রম ধর্ম্মের অধিকারী, তাহা অতিক্রম করিয়া মনঃ সংযমের চেষ্টা করিলেও সে সংযম প্রকৃত পক্ষে সংযম হইবে না অর্থাৎ স্বস্ত্যয়নে অভিচারের ন্যায় উহাতে বিপরীত ফলই ফলিবার কথা।

৬৯। গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসের উপযোগী সংযমের শিক্ষা করিও না।

৭০। স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতা যত দিন আছে, ততদিন সম্পূর্ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের সংকল্প করিও না।

৭১। সংসারকে যেদিন সত্য সত্যই বন্ধন বলিয়া অনুভব করিবে, সেই দিন মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিও, নহিলে কথায় কথায় মুক্তির জন্য কামনা করিও না। সংসারের কোন বিষয়ে সুখের উপলব্ধি যত দিন আছে, জানিও তত দিন সংসারে প্রকৃত বন্ধনজ্ঞান হয় নাই।

৭২। ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের প্রার্থনা উত্তরোত্তর জাগরিত হয়, ত্রিবর্গ-বাসনা যাঁহার বিলুপ্ত হইয়াছে, তিনিই মুক্তিপথের প্রকৃত অধিকারী।

৭৩। ধর্ম্ম সাধনার উপায় সংযম, অর্থ সাধনার উপায় ধর্ম্ম, আবার কাম সাধনার উপায় অর্থ, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে মোক্ষ সাধনার উপায়ও কাম; মুক্তির অধিকারে অন্য কামনা না থাকিলেও মুক্তির কামনা অবশ্যই রাখিতে হয়। সকল কামনার অভাব যাঁহার হইয়াছে, জানিও তিনি মুক্তির সাধক নহেন, কিন্তু মুক্তি সিদ্ধ।

৭৪। যে বিষয়ে মনঃ সংযম করিতে হইবে, সেই বিষয় হইতে কি শরীরে, কি বাক্যে সর্ব্বথা দূরে থাকা ঐ সংযম শিক্ষার বিশেষ উপায় জানিবে।

৭৫। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া কেবল আত্মবলে (অর্থাৎ গুরু মন্ত্র ও সাধনার সাহায্য ব্যতিরেকে) মনঃ সংযমের শিক্ষা করিতে হইবে, এ সকল কথা জানিও কেবল অকাল পক্কতা রোগের বিকার মাত্র।

৭৬। মনঃ সংযম করিতে হইলে নিজের মনকে সংযত করিতে হইবে একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও অর্থাৎ মন তোমারই নিজের, অথবা তুমিই মনের নিজের, তাহা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিও। মনের কর্ত্তা তুমি, কি তোমার কর্ত্তা মন, তাহা আগে স্থির করিয়া পরে তাহার সংযমের চেষ্টা করিও।

৭৭। অধিকার ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া মন যদি উচ্চ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকার প্রবেশ করে, আর ধর্ম্মকার্য্যে অধ্যবসায় বলিয়া তুমি যদি তাহাতে প্রশ্রয় দাও, তবে জানিও—মনঃ সংযমের ছলে মনকে তুমি আরও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবে। তাই, ধর্ম্মের অধ্যবসায় হইলেও জানিও সে সংযম সংযম নহে।

৭৮। মনঃ সংযম করিবার পূর্ব্বে যে বিষয়ের সংযম করিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে সেই বিষয় হইতে মনকে একটু স্বতন্ত্র ও স্থির করিয়া তবে তাহার সংযমের চেষ্টা করিও। অন্যথা নানা বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ শত চেষ্টাতেও কোন বিষয়েই তাহার বৃত্তিব্যাপার সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

৭৯। স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া সদসৎ বিচার করিয়া মনঃ সংযমের চেষ্টা করিলে শত বারের চেষ্টায় যে ফল ফলিবে, সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে মনঃ সংযমের চেষ্টা করিলে একবারের চেষ্টাতেই তাহা সিদ্ধ হইবে। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ —নিজের ইহপরলোকের শুভাশুভ চিন্তার ভার গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া তুমি তাঁহার চরণে সমাগত হইবে, তিনি তোমাকে যাহা করিতে বলিবেন, সৌভাগ্যক্রমে তুমি যদি তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হও, তাহা হইলে মনঃ সংযম তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, উহার জন্য আর পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

ছোট গল্প।

(প্রাপ্ত)

চণ্ডীচরণবাবু ৩০।৩২ বৎসর চাকরী করার পর সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নানাস্থানে কাজ করিতেন সুতরাং চিরকাল ভাড়ার বাড়ীতেই কাল কাটাইয়া আসিতেছেন। এখন সকলেই তাঁহাকে একটি বাড়ী করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একস্থানে বাস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কথাটা যে তাঁহার কাছে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাঁহার কথার ভাবে তাহা বোধ হয় না। তবে সচরাচর বাঙ্গালীরা চাকরীতে থাকিতে যেমন কাজে উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা প্রকাশ করেন, চাকরীর পর তাঁহাদের সকল বিষয়ে তেমনি শিথিলতা দেখা যায়। চণ্ডীবাবুরও তাহাই হইয়াছে। তাই এ বিষয়ে তাঁহার কোন চেষ্টা নাই। বাড়ীর লোকে বেশী চাপাচাপি করিয়া ধরিলেই

বলেন ভগবান যখন দিবেন তখন হবে। ভগবানের এ বিষয়ে আগ্রহের বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না—ফলতঃ তাঁহার বাড়ী হইবার এখন কোন সম্ভাবনা নাই।

যাঁহার বাড়ীতে তিনি বাস করেন তাহার নাম শ্রীযুত দণ্ডপাণি চক্রবর্ত্তী। দণ্ডপাণি বাবু লোক খুব ভাল তবে মেজাজটা বড় একগুঁয়ে রকমের। প্রথম প্রথম যাহাতে বেশী ভাড়া পান সেদিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল কিন্তু এখন পুরাতন ভাড়াটে বলিয়া আর বেশী ভাড়া অথবা সময়মত আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন না। যতদিন তাঁহার ইচ্ছা থাকিতে পারা যায়, কিন্তু যে দিন তিনি বাড়ী খালি করাইতে চাহিবেন সেই দিন তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে। সে বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না। সহজে না বাহির হইলে তিনি বিশেষ কষ্ট দিয়া বাহির করেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাড়না পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না।

এরূপ লোকের বাড়ীতে বাস করা একটা বিপদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দণ্ড পাণি বাবুর বিস্তীর্ণ জমিদারী এবং তাহাতে অনেক লোকের বাস। অন্যত্র বাড়ীর তত সুবিধা নাই বলিয়া চণ্ডীবাবুও অগত্যা তাঁহারই একখানা বাড়ীতে বাস করিতেছেন। দিন কাটিয়া যাইতেছে তাই তাঁহারও কোন উদ্বেগ নাই।

চণ্ডীবাবুর আসল বাড়ী কোথায় এবং সেখানে তাঁহার ঘর বাড়ী অথবা আত্মীয় স্বজন আছে কিনা কেহ জানে না। এরূপ শুনা যায় যে তাঁহার পিতা মাতা এখনও বর্ত্তমান। তাঁহারা খুব বড় লোক। যদিও তাঁহারা খুব প্রাচীন হইয়াছেন বটে কিন্তু অথর্ব্ব নহেন। তাঁহারা সম্প্রতি গঙ্গাতীরে পিতৃবন নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন, সেখানে যাইবার পথ বড় দুর্গম। দণ্ডপাণি বাবুর জমিদারী অতিক্রম করিয়া সেখানে পঁহুছিতে হয়। পথে বহুপ্রকার কষ্ট আছে এবং জমিদারের কর্ম্মচারীরাও নানাপ্রকার উপদ্রব করে। সেই জন্য চণ্ডীচরণ বাবু সেখানে যাইতে চাহেন না। আর কিছুদিন পরে সেখানে যাইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চণ্ডীচরণ বাবুর পিতা গিরিশ বাবু বড় উদার প্রকৃতির লোক। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। দণ্ডপাণিবাবু তাঁহার বিশেষ অনুগত। গিরিশ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য। চণ্ডীবাবুর দুর্ভাগ্য যে এমন পিতার পুত্র হইয়া তিনি চাকরী করিতে বাহির হইয়াছিলেন, যাহাহউক তিনি পিতামাতাকে ছাড়িয়া দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং চাকরীর উৎসাহে তাঁহাদিগের কথা সব সময়ে মনে

করেন না। তাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। যে দেশে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা তাহা জানেন। তাঁহাদেরই উপদেশ মত দণ্ডপাণিবাবু তাঁহাকে আপনার একটি বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছেন। এখন তাঁহারা অমরাবতীর তুল্য আপনাদের আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চণ্ডীবাবুর কাছাকাছি পিতৃবনে আসিয়া বাস করিতেছেন।

স্থানটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। উহার বাহিরের দৃশ্যটি বড় ভয়ানক। মনে হয় যেন একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা জীবপুঞ্জকে দগ্ধ করিবার জন্য স্থানটির চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কত দগ্ধ মন্দিরের অঙ্গার ভস্মাদিতে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। ঐ অঙ্গার ভস্মসমূহের কিয়দংশ বায়ুতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কিয়দংশ বা গঙ্গাজলে ভাসিয়া চলিয়াছে। চারিদিক হইতে যেন একটা হাহাকারধ্বনি উঠিয়া গগনমণ্ডলে মিলাইয়া যাইতেছে। নানাপ্রকার বিভীষিকা সকল যেন জীবন্ত কঙ্কালমূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি জীব এই বিকট দৃশ্যকে আপনাদের স্বভাবের অনুকূল মনে করিয়া উল্লাসে বিকট চিৎকার করিতেছে; এই ভীতিপ্রদ স্থান পিতৃবন। কিন্তু তাহারই ম ধ্য একটি পরমসুন্দর, অতি সূক্ষ্ম, মনোময় স্থান আছে। সেইখানেই তাঁহারা বাস করেন। সেখানে কোনপ্রকার শোক, দুঃখ বা ভয় নাই। একটি স্নিগ্ধজ্যোতিতে স্থানটি সদাই উদ্ভাসিত। এই স্নিগ্ধজ্যোতির অভ্যন্তরে কোটি সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন রক্তবর্ণ সহস্রদল পদ্মের উপরে উন্মাদিনী বেশে কে যেন নৃত্য করিতেছে। তাঁহার পদতলে রজতগিরির ন্যায় মহাকায় এক পুরুষ পড়িয়া আছেন। এদিকে দৃষ্টি পড়িলেই মন যেন কোথায়, কোন আনন্দময় শূন্যে লয় হইয়া যায়। আছি কি নাই বুঝা যায় না—বুঝিবার ইচ্ছাও থাকে না। থাকে শুধু—কি যে তাহা বলিতে পারি না।

সেখানে গেলে কি আর ঘর বাড়ীর ভাবনা থাকে। এই সব ভাবিয়াই বোধ হয় চণ্ডীবাবু বাড়ী করিবার জন্য তত ব্যস্ত নন। তাই একদিন তিনি চুপি চুপি আমাকে বলিয়াছিলেন—যার বাপ মা শ্মশানে বাস করেন সে আবার বাড়ী করিবে কি?

———

ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা ও তাহার সাধনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সত্যেনার্কঃ প্রতপতে সত্যেনাপ্যায়তে শশীঃ
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতম্ সত্যে লোকপ্রতিষ্ঠিতঃ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিগ্রহ উপগ্রহ এক সত্যের সূত্রে মণিমালার ন্যায় গ্রথিত। এই সত্যের বৈজ্ঞানিক নাম নিয়ম। এই নিয়মের অধীন হইয়া সূর্য্যদেব তাপদান করিয়া সৌরজগৎকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ও চন্দ্র সুস্নিগ্ধ কিরণে সকলকে আপ্যায়ন করিতেছেন ; এই সত্য বা নিয়মের ফলে অমৃত উদ্ভূত হইয়াছে এবং এই নিয়মের অধীন হইয়া ত্রিলোক (ভূভুর্বঃস্বঃ) স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তখন বিশ্বের আশ্রয়ভূত পদার্থ ও জীবনিচয় যে নিয়মাধীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিয়মের আশ্রয়ে রক্ষা বা স্থিতি, আর উল্লঙ্ঘনে অবস্থান হইতে চ্যুতি বা ধ্বংশ। নিয়মের চ্যুতিতে যেরূপ জড়-জগতে গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, জীব-জগতেও সেইরূপ নিয়মের উল্লঙ্ঘনে বিপ্লব বা বিপর্য্যয় অনিবার্য্য।

যে সত্যে বা নিয়মে বাহ্য জগৎ নিয়ন্ত্রিত তদ্বিষয়ক বোধের নাম বিজ্ঞান, আর যে সত্যে অন্তর-জগৎ পরিচালিত তদনুভূতির নাম জ্ঞান। বাহ্য জগতের নিয়ম বা সত্যের আলোচনায় ও আবিষ্ক্রিয়ায় যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করেন—তাঁহারা বৈজ্ঞানিক, আর সূক্ষ্ম বা অন্তর-জগতের সত্য বা নিয়ম যাঁহারা মনশ্চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষদর্শন করেন তাঁহারা ঋষি, ঋষির অপর নাম মন্ত্রদ্রষ্টা।

---

* সন ১৩৩৪ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিকের "উৎসবে" প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধ দেখুন।

জীব-জগতে বাহ্য ও অন্তর দুইটি অবস্থা আছে; বাহ্য বা শরীর এবং অন্তর বা মন উভয়ই নিয়মের অধীন অর্থাৎ নিয়মের আশ্রয়ে সুস্থ থাকে ও নিয়মের উল্লঙ্ঘনে অসুস্থ হয়। শারীরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘনে দেহ অসুস্থ বা পীড়িত হইলে যেরূপ শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়াবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে সেইরূপ মন, যে নিয়মাধীন হইলে সুস্থ থাকে তাহার অন্যথায় মনোবৃত্তি সমূহেরও অসুস্থতা ঘটিয়া বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। এই বিকৃতি, শরীর ও মন উভয়েরই একই প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ বাহ্যপ্রকৃতি বা শরীর যেরূপে নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ব্যাধিগ্রস্থ বা পীড়িত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হয়, অন্তর-প্রকৃতি বা মনও ঠিক সেইরূপে নিয়মের বিরুদ্ধাচারে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া দূষিত বা বিকৃত হইয়া থাকে। যেমন শরীরকে যথা সময়ে আহার না দিলে পিত্ত বিকৃত হইয়া যেরূপ ক্রমশঃ অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ মনোবৃত্তির জাগরণে তাহারও আহার না দিলে ঐ বৃত্তিও বিকৃত হইয়া তাহার আর জাগরণ হয় না; এ বিষয় প্রবন্ধের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রস্তাবে বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অপর পক্ষে শরীর যেরূপ নিয়মের পুনরাবলম্বনে ব্যাধিমুক্ত হয়, মনও ঠিক সেইরূপ নিয়মে পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব জীবের প্রকৃতিগত তত্ত্ব বিশেষভাবে অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত বিরাট বিশ্বজগৎ একটী অদৃশ্য নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে সেইরূপ মনুষ্য প্রকৃতিও নিয়মাধীন; তাহা হইতে স্খলিত হইলেই উহার বিকার বা বিপ্লব অনিবার্য্য। এই বিকৃতি বা ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ মানব-চিন্তার উৎকর্ষের ফল।

শরীর রক্ষার জন্য বিধি বা শাসন সর্ব্ব দেশেই আছে, কিন্তু মনকে রক্ষা করিবার বিধি বা শাসন যেরূপ আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির সহিত মিলাইয়া ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে এরূপ আর পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আর্য্য ঋষিগণ যোগযুক্ত অবস্থায় মানস চক্ষে মনস্তত্ত্ব বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই বিধি বা শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই বিধি বা শাসন মূলক গ্রন্থের নাম <u>শাস্ত্র</u>।

দুষ্টের উশৃঙ্খলতায় দেশে যাহাতে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সুশৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট না হয় এজন্য রাজা যেরূপ নিয়ম বা শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া রাজ্য শাসন করেন সেইরূপ সমগ্র মানব জাতীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরহিত-ব্রত আর্য্য

ঋষিগণ, মানবজাতির প্রকৃতি যাহাতে দুষ্ট হইয়া অন্তর ও বাহ্যজগতে বিপ্লব উপস্থিত না হয় তদুদ্দেশ্যে অন্তর-প্রকৃতি অর্থাৎ মনোবৃত্তি রক্ষার নিয়ম বা শাসন মূলক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা ভিতরের পীড়ার বা অভ্যন্তরদুষ্টির অভিব্যক্তি বা ফল। রাজ্য শাসনের জন্য যে রাজ্যে যত অধিক প্রকারের দণ্ড বিধি আইন প্রচলিত, সে রাজ্যে লোক সমূহের মনোবৃত্তি তত অধিক কলুষিত বা বিকৃত ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। অপরাধ করিলে রাজা দৈহিক দণ্ড দেন কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে যে কারণে লোকে অসৎকর্ম্ম করে তাহার নিবৃত্তিমূলক চিকিৎসা নহে। বিকারগ্রস্থ রোগীর উচ্ছৃঙ্খলতার চিকিৎসা তাহার হস্তপদাদি বন্ধনে নহে, পরন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ রোগের কারণ-নিবৃত্তিমূলক চিকিৎসায়। মানব-প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইলে বাহিরের শাসনের প্রয়োজনই হয় না। বাহিরের সাম্রাজ্য মানবজাতি লইয়া আর ভিতরের সাম্রাজ্য প্রতিমানবের হৃদয় লইয়া। ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টি, ব্যষ্টির উৎকর্ষে সমষ্টির উৎকর্ষ হয়। তাই অন্তর-দৃষ্টি-নিপুণ ঋষিগণ ব্যষ্টির অর্থাৎ প্রতিমানবের মনোবৃত্তি যাহাতে পরিশুদ্ধ হইয়া বাহ্য ও অন্তর জগতে শান্তি স্থাপিত হয় তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে নিয়মের উল্লঙ্ঘনে বা বিরুদ্ধাচরণে শারীরিক পীড়া যেরূপে উৎপন্ন হয় ও নিয়মের পুনরাবলম্বনে বা পালনে যেরূপে বিদূরিত হয়; ঠিক সেইরূপে যে নিয়ম বা বিধির যথাক্রমে বিরুদ্ধাচরণে ও পালনে মনও ব্যাধিগ্রস্থ ও ব্যাধিমুক্ত হয় তদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে আহার, নিদ্রা ও কামাদি বৃত্তির চরিতার্থতা প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ সংযম ও উপবাসাদি অবলম্বন করিতে হয়; সেইরূপ মনোবৃত্তির স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে অর্থাৎ মন বিকৃত বা দূষিত হইলে চিন্তার সংযম অভ্যাস আবশ্যক অর্থাৎ কুপথ্যের ন্যায় অসৎ চিন্তা বর্জ্জন কর্ত্তব্য। সংযম এবং উপাসনাদিতেও শারীরিক পীড়া যদি যান্ত্রিক বিকৃতি বশতঃ সম্পূর্ণ-রূপে দূর না হয়, তাহা হইলে যেরূপ ঔষধ সেবন আবশ্যক হয়, সেইরূপ অসৎ চিন্তার সংযমেও যদি পূর্ব্বার্জ্জিত অসৎ সংস্কারবশতঃ মনের দুষ্টি বা বিকৃতি না যায়, তাহা হইলে সৎসঙ্গ, সৎআলোচনা ও সৎকর্ম্মরূপ ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয়। আবার দৈহিক পীড়ায়, ঔষধ সেবনের ফল যদি স্থানীয় অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর ক্রিয়ার নিকট পরাভূত হইয়া পীড়া সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকগণ যান্ত্রিক বিকৃতি ঘটিয়াছে স্থির করিয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা

বা উপদেশ দিলে যেরূপ স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া তথাকার জলবায়ু সেবনে ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশ যান্ত্রিক বিকৃতি দূর হইলে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়, সেইরূপ যে সঙ্গ সর্ব্বদা করা যায় ও যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বেষ্টিত হইয়া নিয়ত থাকা যায়, তাহার হীনতার প্রভাব যদি সাময়িক সৎসঙ্গ ও সৎআলোচনার প্রভাব অপেক্ষা অধিকতর হয় তাহা হইলে ঐ সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনপূর্ব্বক তীর্থযাত্রাদি করিয়া দেব বিগ্রহাদির দর্শন, পূজা এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিলে তাঁহাদের নিকট অহরহঃ ভগবৎকথা শ্রবণেও তাঁহাদের আচরণ দর্শনে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া চিত্তবৃত্তির প্রসারণে ও স্ফুরণে মনের বিকৃতি বা দুষ্টি বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া দুর্ভাগ্যের ফল ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হয় না। আচরণ দ্বারা ফল পরীক্ষা না করিয়া চিত্তে সন্দেহ পোষণ করা নিতান্ত অযুক্তিকর।

চিত্তবৃত্তি সঙ্কীর্ণ হয় স্বার্থে, আর স্বার্থের প্রভাব হয় সেই স্থানে যে স্থানে মানুষ তাহার বিশ্ব-বিস্তৃত প্রাণটাকে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে—সে গণ্ডী তাহার ভোগ-পিপাসা মিটাইবার একটী ক্ষুদ্র বিষয় বা স্থান, এই স্থানে সে তাহার বিশ্বজোড়া আমিটাকে ছোট করিয়া—তাহার হৃদয়ের সকল সৎবৃত্তিগুলিকে বন্ধন করিয়া আপনার কবর আপনি খননপূর্ব্বক তাহাতে সমাধিস্থ হয়। গণ্ডীর ভিতরে কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলে সে অভিভূত হইয়া আত্মহারা হয়, আপনার গৃহে আগুণ লাগিলে সে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, আপনার প্রাচীরের মধ্যে একটী জীবন নষ্ট হইলে সে হাহাকাররবে গগন বিদীর্ণ করে; কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে শত বিপ্লব ঘটিলেও সে আত্মহারা হয় না; তাহার প্রাণের স্পন্দন তাহার দেওয়া প্রাচীরের বাহিরে যায় না। বিশ্ববিরাট অনন্তপ্রাণ ও ভাবের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সে মহাসমুদ্রের মধ্যে উন্নত বালুকার স্তূপ বা তাহার পার্শ্বে মৃত্তিকার বাঁধ বা প্রাচীর বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পঙ্কিল জলাশয়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। সাগরের তরঙ্গলহরী তখন আর তাহার হৃদয়ে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতে পারে না। ভগবান ভাবময়, ভাবের শরীর প্রাণ, প্রাণের সঙ্কীর্ণতায় ভাবের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমরা চাই যাহা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা পাইলে সুখী হই আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডী যদি তাহা হইত বা তাহা দিতে পারিত তবে গণ্ডীর বাহিরে একটা মুক্ত অবস্থা লাভ করিবার জন্য মাঝে মাঝে প্রাণ উদ্বেলিত হইত না।

এই উদ্বেলন জড়ের ভিতর দিয়া শিশুর অব্যক্ত ক্রন্দনের স্থায় সকলেরই ভিতর অল্পাধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, তাই আমরা কখন উন্মুক্ত প্রান্তরে, কখন নদীর কূলে, কখন গিরিশিখরে, কখন প্রশান্ত বারিধি-বক্ষে ছুটিয়া যাই। কেন যাই তাহা শিশু বা পশুর মত বুঝিতে পারি না। আমরা চাই উন্মুক্ত অবস্থা তাই আপনার রচিত সাধের সুরম্যহর্ম্মেও ক্লান্তি অনুভব করিয়া গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া সুস্থ হইতে চাই। ইহা উন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রাণের অব্যক্ত স্পন্দন। জড়ের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মের এই স্পন্দন বা সাড়া অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মদর্শী ও সূক্ষ্মানুভবকারী মনিষী ঋষিগণ মুক্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে জগতের সকল সম্পৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ের ধ্যানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চিত্তবৃত্তি মলিন হইলে জড়ের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মের সাড়া উপলব্ধি হয় না। বদ্ধতা বা সঙ্কীর্ণতাই মলিনতার কারণ। জলপ্রবাহ আবদ্ধ হইলে যেমন ক্রমশ মলিন ও দূষিত হয়, তেমনি জীবনের প্রবাহ বিষয়াসক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে স্বভাবতঃ পঙ্কিল ও দূষিত হইয়া থাকে। আসক্তির অন্য নাম কাম; কাম প্রেমের সঙ্কীর্ণতা মাত্র। আসক্তি বা ভালবাসা কেবলমাত্র স্বীয় স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গে আবদ্ধ হইলে কাম আখ্যাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু ঐ ভালবাসা জগতের জীবে ছড়াইয়া পড়িলে উহাই আবার প্রেম হয়। সঙ্কীর্ণতা হইতে স্বার্থের উৎপত্তি, তাহা হইতে সঙ্কীর্ণ **আমি** বা **আমার** প্রাধান্য। **আমির** প্রাধান্যে অহঙ্কারের উৎপত্তি। পর্ব্বত যেরূপ অভ্রভেদী শৃঙ্গ উন্নত করিয়া সমস্ত মেঘ ও মেঘবর্ষিত বারি ধারণ করিলেও এবং উক্ত বারিরাশি ঘনিভূত হইয়া তাহার শিরোপরে তুষাররূপে জমাট বাঁধিয়া থাকিলেও, ঐ বারিরাশি ও তুষার-স্তুপ বিগলিত হইয়া যেরূপ তীরবেগে নিম্নভূমির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ অহঙ্কারে উচ্চশির মানবের উপর ভগবানের করুণার দানরূপ ধারা স্বভাবত অজস্র বর্ষিত হইলেও সে তাহার একবিন্দুও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাচীরবেষ্টিত রুদ্ধগৃহে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে না পারার কারণ উহার রুদ্ধতা। রুদ্ধতার কারণ গৃহস্বামীর আলোকের অভাবের অনুভূতির অবিদ্যমানতা। অনুভূতির অভাব বা অবিদ্যমানতার কারণ গৃহস্বামীর অন্ধকারে আসক্তি বা সন্তোষ। অন্ধকার ও আলোকের একস্থানে সমকালীন স্থিতি অসম্ভব এজন্য কবি বলিয়াছেন—

এতটুকু আঁধার যদি
লুকিয়ে থাকে বুকের পরে,
আকাশ ভরা সূর্য্যতারা
মিথ্যা হবে তোদের তরে।

যদি আলোকপ্রাপ্তির আগ্রহ অন্ধকারের আসক্তি বা সন্তোষ অপেক্ষা অধিকতর হয় তাহা হইলে গৃহের দেওয়াল ভগ্ন করিয়া গবাক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক আলোক আনয়ন করিতে অধিক বিলম্ব হয় না। সেইরূপ স্বার্থের প্রাচীরবেষ্টিত হৃদয়ে ভগবানের আলোক আনয়ন করিতে হইলে ভগবদালোকের জন্য **আগ্রহ** জাগাইয়া স্বার্থের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গবাক্ষ বসাইতে হয়; এইগবাক্ষ জগত জীবে অনুপ্রাণতা বা **প্রেম**। অনুপ্রাণতায় প্রেম উপচিত হইলে হৃদ্বৃত্তির স্পন্দনে ও স্ফুরণে ক্রমশঃ **চিত্তশুদ্ধি** হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহাতে ক্রমশঃ **ভাবসঞ্চয়** হয়, ভাবের আকর্ষণে ভগবানের সহিত **সম্বন্ধ** হয়; সম্বন্ধের নৈকট্যে **প্রাপ্তি**।

জগৎজীবে যে প্রেম হয় তাহার প্রতিধ্বনি দয়া। দয়ার নাম অনুপ্রাণতা; হৃদ্বৃত্তির প্রসারনে বা স্পন্দনে অনুপ্রাণতা উপস্থিত হয়। **বৃত্তির স্পন্দন বা জাগরণ হয় অনুভূতিতে, অনুভূতি হয় ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের সংযোগে।** আমরা ত সর্ব্বদাই কত কি দেখিতেছি কিন্তু চোখে দেখিলেই দেখা হয় না, দেখার সঙ্গে প্রাণ চাই, তাই কবি বলিয়াছেন—

চোখে দেখিস প্রাণে কানা—
হিয়ার মাঝে দেখ্‌না ধ'রে ভুবন খানা।
প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা
সেথায় তারি আসন পাতা
বাইরে তারে রাখিসরে তাই
অন্তরে তার যেতে মানা।

ভগবান স্বপ্রকাশ তিনি সকলের চিত্তে সর্ব্বদাই উদয় হইয়া আছেন, কেবল স্বচ্ছতা বা চিত্তশুদ্ধির অভাবে প্রতিভাত হইতে পারেন না।

সূর্য্যদেব জগতের প্রতিপদার্থের উপর উদয় হইয়া কিরণ বর্ষণ করিতেছেন কিন্তু প্রতিভাত হন কেবল স্বচ্ছ পদার্থে। মৃত্তিকা ও জল উভয়েরই উপর সূর্য্যের কিরণ পড়ে কিন্তু মৃত্তিকায় প্রতিভাত হয় না, কেবল জলেই হয়; তাহার কারণ মৃত্তিকা মলিন বা অস্বচ্ছ কিন্তু জল স্বচ্ছ। মৃত্তিকা গাঢ় করিয়া তাহাতে জল সঞ্চয় করিলে ঐ জল স্থির হইয়া স্বচ্ছ হইবামাত্রই যেমন তাহাতে সূর্য্যদেব প্রতিভাত হন, সেইরূপ **অহঙ্কার বর্জ্জনে দীনতায় হৃদয় গাড় করিয়া তাহাতে প্রেমরূপ সলিল সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহার স্বচ্ছতা বা বিশুদ্ধতা সম্পাদনে ভগবানের প্রকাশ হয়।**

চুম্বকের ধর্ম্ম সে লৌহকে আকর্ষণ করে; কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের বাহিরে সে আকর্ষণ কার্য্যকরী হয় না; আর নিকটেও কার্য্যকরী হয় না যদি লৌহের গাত্রে কোন ভিন্নজাতীয় আবরণ থাকে। **লৌহের প্রতি চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় জীবের প্রতি ভগবানের একটী আকর্ষণ বা প্রেম আছে** কিন্তু সে আকর্ষণের ক্রিয়া কোন দূরত্বে আবদ্ধ নহে, কারণ ভগবান ও জীবের মধ্যে কোন দূরত্ব নাই; তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল জীবে তাঁহার সত্ত্বা বিরাজমান। তবে আকর্ষণ কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কেবলমাত্র আবরণ; সে আবরণ চিত্তবৃত্তির মলিনতা। মলিনতার অর্থ সঙ্কীর্ণতা। সঙ্কীর্ণতা বা চিত্তবৃত্তির সঙ্কোচন অসত্যে হয়; কারণ অসত্য সঙ্কোচক আর সত্য প্রস্ফুরক। কেবলমাত্র নিষ্ঠাসহকারে সত্য অবলম্বনে চিত্তবৃত্তির স্ফুরণে মলিনতা দূর হয়; মলিনতার আবরণ দূর হইবামাত্রই ভগবানের আকর্ষণ জীবকে টানিয়া তাঁহার দিকে লইয়া যায়। যতই তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় ততই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় ও বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে তাঁহার প্রেমালিঙ্গন অনুভূত হয়। চুম্বকের যেমন **আকর্ষণ করিবার** এবং লৌহের যেমন **আকৃষ্ট হইবার** ধর্ম্ম আছে তেমনি ভগবানে যেরূপ আকর্ষণ আছে জীবে সেইরূপ আকৃষ্ট হইবার ধর্ম্ম আছে, এজন্য সাধারণতঃ ভক্তিমার্গ অবলম্বীরা বলেন যে জীব যদি তাঁহার দিকে এক পা অগ্রসর হয় তাহা হইলে তিনি জীবের দিকে তিন পা অগ্রসর হইয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান জীবকে আকর্ষণ করেন বা ভালবাসেন। জীবের এই ভালবাসা পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা ভগবানের **দেওয়ার** আনন্দ অধিক হয়; কারণ **গ্রহণ** অপেক্ষা **দানের**

সুখ অনেক অধিক। **ত্যাগের সুখের সহিত গ্রহণের সুখের তুলনা হয় না।** অতএব চিত্তের বিশুদ্ধতার উপর সকল সাধনার সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে; তাই সকল প্রকার সাধনার মূলে চিত্তশুদ্ধির উপদেশ এবং তজ্জন্য হিন্দুশাস্ত্রে চিত্তকে দর্পণ বলা হইয়াছে; কারণ দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি চিত্তদর্পণে ভগবান প্রতিবিম্বিত হন। চিত্ত-দর্পণ মলিন হইলে তাহাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না।

প্রতি জীবের লক্ষ্য বস্তু **আনন্দ**। এই আনন্দের সন্ধানে সে চিরদিন ধাবিত। যাহা অপেক্ষা তাহার প্রিয়তর বস্তু আর কিছু নাই সেই জীবনকেও সে তাহার লক্ষ্য বস্তু পাইবার জন্য কত বিপদাপন্ন করিতেছে; পাইতেছেন না, তথাপি নিবৃত্তি নাই। এই আনন্দের অনুসন্ধানে জীব ধাবিত হইবার কারণ, সে আনন্দময় ভগবানের সত্বায় সঞ্জীবিত। ভগবান সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ অস্তি ভাতি ও প্রিয় এই তিনটি অবস্থা একাধারে তাঁহাতে আছে। তিনি আছেন, তাঁহার প্রকাশ আছে ও তাঁহাতে আনন্দ আছে। প্রতি জীবেও এই তিনটি অবস্থা খণ্ডিত ভাবে আছে; কিন্তু তাহার স্থিতি ও প্রকাশ থাকিলেও তৃতীয় বস্তুটী অর্থাৎ আনন্দ সে খুঁজিয়া পায় না কারণ, তাহার চিৎশক্তি সঙ্কীর্ণ বিষয়ে আসক্ত হইয়া মোহাচ্ছন্ন বা আবৃত থাকায় প্রকৃত আনন্দ কি—ভূমানন্দ কোথায়, তাহা ঠিক করিতে পারে না। আলোকের অভাবে বা অল্পতায় যেমন বস্তু নির্ণয় হয় না তেমনি চিৎশক্তির প্রকাশের অভাবে বা অল্পতায় প্রকৃত **ভূমানন্দ** কি তাহা নির্ণয় হয় না। অন্ধকারে লোকে লক্ষ্য বস্তু ঠিক করিতে না পারিয়া যেরূপ স্পর্শশক্তি দ্বারা তদাভাসজ্ঞাপক বস্তুকেই তাহার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করে ও পরক্ষণে ভুল বুঝিয়া দ্রব্যান্তরে হস্তার্পণ করে; সেইরূপ আচ্ছন্ন বা আবৃত চিৎশক্তির সাহায্যে জীব আনন্দ কি—ভূমানন্দ কোথায়, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া তদাভাস-বোধক পদার্থে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হয়। **প্রকৃত বস্তুর নির্ণয়াভাবে এই যে বারংবার প্রতারিত হইয়া ঘোরা ইহারই নাম জন্ম জন্মান্তর ভ্রমণ।**

এই ভ্রাম্যমাণ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায়—যে বস্তু স্থির, নিশ্চল নির্ব্বিকার তাহাকে আশ্রয় করা। আশ্রয় করিতে গেলে আশ্রয় ও আশ্রিতের মধ্যে এমন একটী বন্ধন বা আকর্ষণ থাকা চাই যে আশ্রয় হইতে আশ্রিতের

চ্যুতি না হয়। সে আকর্ষণ বা বন্ধন প্রেম। প্রেম কি তাহা বুঝিতে হইলে তাহার তত্ত্ব আলোনোর প্রয়োজন। এই আলোচনার পূর্ব্বে বুঝিতে হইবে কোন্ অচঞ্চল বস্তুর সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হইলে—কোন্ অচ্যুতের সহিত প্রেমের ডোরে আমাকে বাঁধিতে পারিলে আমারও চ্যুতি হইবে না। ইহা বুঝিতে গেলে বোধশক্তি যাহা চিৎশক্তির প্রকাশ মাত্র, তাহার এরূপ উৎকর্ষ হওয়া চাই যে ভ্রান্তি আসিয়া উহাকে অবরোধ না করে। সে উৎকর্ষ হয় কেবলমাত্র চিত্ত শুদ্ধিতে। চিত্তশুদ্ধির বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বোধশক্তির ঐ উৎকর্ষ অবস্থা হইতে **নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি** জন্মে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে বস্তুনিরূপণ হইলে সন্দেহ বিবর্জ্জিত চিত্তে স্বভাবত তাহার প্রতি—সেই অভিলষিতের প্রতি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়; শ্রদ্ধা নিষ্ঠা সহকারে ঘণীভূত হইলে তাহা হইতে শশিকলানিভ নির্ম্মলা ভক্তি ও তাহা হইতে প্রবাহিত অনুরাগের রশ্মিধারা ধরিয়া প্রেমরূপ সুধার ক্ষরণ হয়। এইতত্ত্ব গভীর অনুভব-সমুদ্রের রত্ন। এই প্রেমের তত্ত্ব-সমুদ্রে অবগাহন করিবার সামর্থ্য প্রেমময়ের নিকট প্রার্থনা করি।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।
কৈপুকুর, শিবপুর, হাবড়া।
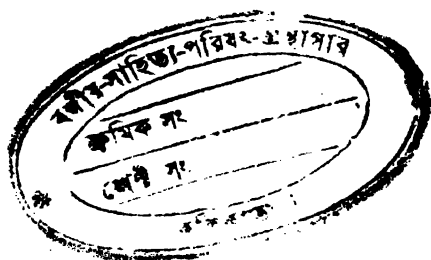
শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

নবম স্পন্দন।

ওরে তুই নাম কর নাম যে করে আমি তার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হই এ কলিযুগে নাম কীর্ত্তনই পরম তপস্যা।

নাম করা তপস্যা নাকি ?

হাঁরে তুই কি শুনিস্ নাই নাম করা উত্তম তপস্যা।

তথাচৈবোত্তম লোকে তপঃ শ্রীহরি কীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

স্কন্দ পুরাণ

আমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করা সকাম ব্যক্তিগণের যে কত কঠিন যারা কর্ম্ম করে তারা তাহা বুঝে অন্যে ধারণা করতে পারে না, এদিকে কামনা ত্যাগ কর্‌তে সমর্থ হয় না, এবং আমার প্রীতিও চায় তাদের পক্ষে সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করাই প্রশস্ত উপায়, কামনা স্বতঃই বিগলিত হ'য়ে যায় এ কলি যুগে নাম করা পরম তপস্যা।

দেখ নাম কর্‌তেই চাই কিন্তু ঘাত প্রতিঘাতে নামের বড় বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

ইহা যুগ ধর্ম্ম ; কলি সমগ্র দোষের আকর কলি কা'কেও স্থির থাকৃতে দেয় না, কলি কেবল শত ব্যভিচারের সৃষ্টি করে জগৎকে ধ্বংশের দিকে নিয়ে চলেছে, চারিদিকে কলির ভীষণ পীড়ন, শুধু ভোগ শুধু ভোগ, কলি মানুষকে পশুতে পরিণত করেছে কেবল হাহাকার তাই আজ আমি তোদের ডাকৃছি ওরে কলির জীব তোদের কোন ভয় নাই। তোরা যত দুর্ব্বল হ'স্‌না কেন, যত অপরাধ করিস্ না কেন, তথাপি তোদের উপায় আছে কলি দোষের আকর হ'লে ও একটী তার মহান গুণ আছে।

কলের্দোষ নিধে রাজন্নস্তি হেকো মহান গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃপরং ব্রজেৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

শুক রূপে আমি শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছি আমার নাম কীর্ত্তনের দ্বারা মুক্ত বন্ধন হয়ে আমাকে লাভ করে। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ধারণা ধ্যান কর্‌তে পারিস্ না বলে তুই ক্ষুব্ধ হ'স্‌না তোর মত যে শক্তিহীন তারও উপায় আছে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট কলিকাল রূপ কুসর্পের ভয়ে ভীত হ'স্‌না কলির যতই বিষ থাকুকনা কেন তথাপি তোর কোন ভয় নাই স্কন্দ পুরাণে বলেছি—

কলিকাল কুসর্পস্যতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রস্য মাভয়ম্।
গোবিন্দ নাম দাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্॥

দগ্ধ হ'য়ে যাবে আমার নামরূপ দাবানলে কলি কাল রূপ মহা সর্প ভস্ম হয়ে যাবে। খুব নাম কর। ধ্যান কর্‌তে পারিস্ না বলে দুঃখ করিস্ না আমার নাম কর্‌লেই ধ্যান করা হ'বে সদা সর্ব্বদা নাম ল'য়ে থাক্‌লে আপনা আপনি ধ্যানে ডুবে যাবি। বিষ্ণুপুরাণে বলেছি—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্চ্চায়াংকলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ।

সত্যযুগে আমার ধ্যান কর্‌লে যে ফল লাভ হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্‌লে যে ফল হয় দ্বাপরে পরিচর্য্যা কর্‌লে যাহা হয় এই কলিযুগে নাম কীর্ত্তনের দ্বারা জীব তাহা লাভ কর্‌তে সমর্থ হয়। তবে তুই কেন নিরাশ হ'চ্ছস্ মানস জপে আনন্দ পাস্‌না বলে আকুল হ'য়ে পড়িস, ধ্যান কর্‌তে না পেরে ব্যস্ত হ'স, তুই নাম কর আমি তোর সব করে দিব। ভোগপ্রবণতা ও চঞ্চলতা কলির ধর্ম্ম, যখন তুই এ অবস্থায় থাক্‌বি তখন খুব নাম করবি আমি তোর হাত ধরে দ্বাপর যুগে লয়ে যাব, তোর চিত্ত যখন দ্বাপর যুগে থাক্‌বে তখন সে আমার সেবা পূজা করবে তারপর আমি তোকে ত্রেতাযুগে লয়ে যাব সেখানে গিয়া তোর চিত্ত যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর্‌বে "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" মানস জপরূপ যজ্ঞ কর্‌তে কর্‌তে তুই সত্যযুগে যাবার অধিকার লাভ কর্‌বি আমিই তোকে সত্যযুগে ল'য়ে যাব সেখানে আমিই তোকে স্থূল ধ্যান, সূক্ষ্ম ধ্যান, জ্যোতি ধ্যান, স্বরূপ ধ্যান, সব ধ্যানই দিব? যখন কলিযুগে থাক্‌বি অর্থাৎ পুরামাত্রায় দেহাত্মবোধ থাক্‌বে তখন কলিযুগের মত উপাসনা কর্‌বি অন্য যুগের উপাসনা কর্‌তে গেলে অভিনয় করা ছাড়া আর কিছু হবে না কারণ উপাসনা কর্‌বে মন সেই মনোমর্কট যদি যদি ডালে ডালে লাফালাফি করে বেড়ায় তাহ'লে পূজা জপ বেদান্ত শ্রবণ কে কর্‌বে

অবিরাম রাম রাম কর মনোমর্কট ক্লান্ত হ'য়ে স্থির হ'য়ে যাক্ তখন সে সব কর্‌তেই সমর্থ হবে। নামকীর্ত্তন নিম্নাধিকারীর কার্য্য বলে অবজ্ঞা করিস না তুই নিজের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি তুই কিসের অধিকারী? একটু ভোগের ত্রুটী হ'লে, অথবা তোর মতের কেহ প্রতিবাদ কর্‌লে, কিম্বা আপনি না বলে কেহ তুমি বল্‌লে তোর মন কত তরঙ্গ তুলে তথাপি তুই উচ্চাধিকারী হ'তে চাস এ হাসির কথা বটে।

আমি দেখ্‌ছি তুই এখন কলিযুগে রইছিস্ তুই নাম কর আমিই তোকে দ্বাপর ত্রেতা সত্যযুগে ল'য়ে গিয়া আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে দিব। ওরে আমার আনন্দের দুলাল "তোরা যে অমৃতের সন্তান" কেন কাঁদ্‌ছিস? মুছে ফেল্ চোখের জল মুছে ফেল্! নাম কর; একভাবে থাক্‌তে পারিস্ না বলে দুঃখ করিস্ না সুকর্ম্ম কুকর্ম্মের দ্বারা তোর দেহটা গঠিত হ'য়েছে সে কর্ম্মগুলা ক্ষয় করা চাই ত তাই ভাবান্তর আসে, কর্ম্মদোষ থাক্‌তে ত নির্ম্মল জ্ঞান জন্মাবে না। তোর সর্ব্বকর্ম্ম আমিই ক্ষয় করে দিব কোন চিন্তা নাই তুই কেবল নাম কর অবশ্য "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" একথা ভুল্‌বি না যথাকালে সন্ধ্যা কর্‌বি আর নাম কর্‌বি

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ ন কলির্ব্বাধতে হি তান্॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরিয়ন্তি যে নিত্যং নহি তান্ বাধতে কলিঃ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ

এখন তোর চিত্ত কলিযুগে রয়েছে তাই কলহ কর্‌ছে, ভাল মন্দ কত কি ভাব্‌ছে—"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা" একথা ভুলে গেছে ক'রও নিন্দা ক'রও প্রশংসা করছে—অভাব ঋণ হাহাকাররূপ করাল বদন ব্যাদান করে কলি তোকে গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে মাভৈঃ ঘোর কলিযুগেও উপায় আছে আমার নাম কর আর কলি কোন বাধা দিতে পার্‌বে না তুই অবাধে দ্বাপর ত্রেতা সত্যযুগে যেতে পার্‌বি বল বল কেবল বল

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়

এই নাম সকল অনিবার উচ্চারণ কর। তুই ভাব লয়ে পূজা কর্‌তে পার্‌বি,

মানস জপে আর লয় বিক্ষেপ হ'বে না। আমার লীলাধ্যান ঠিক ঠিক হবে, লীলাধ্যান কর্‌তে কর্‌তে তুই আমার স্বরূপে ডুবে যাবি কেবল নাম কর এ কলিযুগে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন। বল বল বলি—

হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে রাম।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ।

মা দুর্গা।

নিত্যা জগন্মূর্ত্তি মায়ের প্রতি।

মাগো সচ্চিদানন্দময়ি! তুমি নিত্যা, অতীন্দ্রিয়া। তোমার উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, অপচয় নাই। তোমার নাম, রূপ, গুণ কিছুই নাই। তুমি অদ্বিতীয়া—স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিতা। বাক্য ও মনের অগোচরা। মাগো দয়াময়ি! তুমি দয়া করিয়া তোমার তত্ত্ব "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যে জীবকে না জানাইলে জীবের সাধ্য কি তোমায় বুঝিতে পারে?

বেদ পাঠে, মেধাগুণে, কিংবা শাস্ত্রজ্ঞানে
তোমাকে বুঝিতে কেহ পারে না কখনে।
প্রীতিতে আপনি যাঁকে কর মা বরণ
তোমাকে বুঝিতে মাত্র পারে সেই জন।
যাঁর কাছে নিজ তনু কর মা প্রকাশ,
জানিতে সে জন পারে সেই "স্ব প্রকাশ"।

রজ্জুকে জানা না থাকিলে যেমন সর্প ভাসে, আর জানা থাকিলে ভাসে না, তদ্রূপ তোমাকে না জানা হইতেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়, তোমাকে জানা থাকিলে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আর ভাসে না।

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্নভাসতে।
রজ্জু জ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ভাসতেনহি॥

মাগো লীলাময়ি! মরুভূমিতে ময়ূখমালা যেমন হ্রদ তড়াগাদি কত কি বিচিত্ররূপে প্রতিভাসিত করে, তদ্রূপ তুমিই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছ।

একামেবাদ্বিতীয়ং সৎ নাম রূপ বিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টে পুরাধুনাপ্যস্যতাদৃক ত্বং তদিতীর্য্যতে॥

মাগো সচ্চিদানন্দময়ি! তুমি চিরদিনই একা একরূপা আছ, ছিলে, থাকিবে।

আমি যেখানে "মা" থাকি তব বুকে রই,
তুমি পরমাত্মা নহি তোমা বই।
তুমি ছাড়া কোথা আমার আমিত্ব?
তুমি আমি "এক" এই সার তত্ত্ব।

একা একা খেলা হয় না, তাই তুমি দ্বিতীয় ইচ্ছা কর। "একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছত।" আর তাই "একোঽহং বহুস্যাম্" "আমি এক আছি বহু হইব" এই সংকল্প পূর্ব্বক আত্ম মায়া দ্বারা ইচ্ছা মাত্রে এই চরাচর বিশ্ব রচনা করিয়া তুমি বহু হও। মাগো অচিন্ত্যরূপিণি! তুমি আপনিই বহু হইয়া আপনিই আপনাকে পর করিয়া অনাদি কাল হইতে আপনা আপনিই কত খেলাই খেলিয়া আসিতেছ। মা তুমি আপনিই এক আপনিই দ্বিতীয়া, আপনিই শক্তিমান আর আপনিই শক্তি। মাগো মহামায়া! অবোধ বালক যেমন দর্পণ প্রতিবিম্বিত স্বীয় মূর্ত্তির সহিত সানন্দে ক্রীড়া করে, তোমার এ বিশ্বলীলাও অনেকটা তদ্রূপ। শিশু খেলা করে অজ্ঞানে, বিশ্বেশ্বরি! তুমি বিশ্বলীলা কর সজ্ঞানে।

ব্রাহ্মীরূপে সৃষ্টি তুমি করেছ ভুবন,
তুমিই বৈষ্ণবীরূপে করিছ পালন।

অন্তে তুমি রৌদ্রীরূপে করহ ভক্ষণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের তুমিই কারণ।
সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা তুমিই জননি !
পালনে তুমিই পাল আপনা আপনি।
সংহার রূপিণী তুমি প্রলয় সময়ে,
নিজেই নিজেতে লীন হও জগন্ময়ে !
বিশ্বেশ্বরী রূপে বিশ্ব করিছ পালন,
বিশ্বাত্মিকা রূপে বিশ্ব করিছ ধারণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পূজ্যা তুমি দেবি,
ভক্তি-নম্র-ভক্ত তব শ্রীচরণ সেবি
চরাচর এ বিশ্বের হয়েন আশ্রয়
আমি মা সন্তান তোর মাগি পদাশ্রয়।

মা ! "আমি তোমার" বলিয়া যে জন তোমার অভয় চরণে শরণ লয়, সে যদি নীচ হইতেও নীচ হয় তথাপি তাহাকে তুমি অভয় প্রদান কর এই ত তোমার ব্রত।

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥
আমি জানি তুমি হও প্রেম স্বরূপিণী
প্রেমকণা তোমা হ'তে লভিয়া জননি।
মাতা ছেলে রেখে বুকে,
প্রেমানন্দে ভাসে সুখে,
মায়ের কোলেতে ছেলে আনন্দের খনি,
অপরূপ কিবা দৃশ্য সৃজিয়াছ তুমি।

মাগো ! জগতে তোমারই অংশরূপা যে অগণিত মাতৃমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা যে তোমারই স্নেহের এক কণিকা লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। জীবধাত্রী জননীর স্নেহ সুধারসে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই সতত সঞ্জীবিত রহিয়াছে ও পরিপুষ্ট হইতেছে। স্ব স্ব সন্তানের জন্য এ মায়েরই যখন অপরিসীম মমতা দেখিতে পাই তখন কেমন করিয়া বলি—"প্রেমস্বরূপিণী মা তুমি

নিষ্ঠুরা"। সন্তানের কান্না শুনিয়া মায়ের প্রাণ স্থির রহিয়াছে, এ দৃশ্যত এ বিশ্বে কোথায়ও দেখি না। এ "মা"ই যখন এমন, এ মায়ের ভালবাসাই যখন অতুলন, তখন প্রেমস্বরূপিণী মা! তুমি যে কেমন, তাহা আমার ধারণার অতীত। কিন্তু আমার জন্য যে তোমার স্নেহ-সুধার অন্ত নাই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করি।

সুপুত্র লাভ করিতে হইলে এ জগতে জনক জননীর সাধনার প্রয়োজন হয় বটে কিন্তু ত্রিজগতে মা বাপ পাইতে অথবা মা বাপের স্নেহাকর্ষণ করিতে কাহারও সাধনার দরকার দৃষ্ট হয় না। সন্তান জন্মিলে মায়ের প্রাণে স্নেহের উৎস স্বতঃই উথলিয়া উঠে। যে সন্তান পিতামাতার স্নেহের মান রাখেনা, জনক জননীর মর্য্যদা বুঝে না, অমন হতভাগা কুলাঙ্গারের জন্যও মা বাপের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। অসহায় শিশুর আর্ত্তকণ্ঠের এক একটী ধ্বনি মুষলের ঘায়ের মত মায়ের বুকে বাজিয়া থাকে, মাগো! তুমি প্রেম স্বরূপিণী! জনক জননী হইতেও আপনার জন। তোমার মত ভালবাসিতে জানে কোন জন? "তোমাকে ডাকিলে তুমি সাড়া দেওনা, ও তোমাকে পাইতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন," এক কথায় আমার প্রাণ সায় দেয় না। কারণ সারাৎসার তত্ত্বে যাহা কায়া, এ বিশ্ব সংসার যে তার ছায়া।

মা! তোর সুধামাখা পরশ পাইতে যাঁর প্রাণ চায়, "সে চ'খের জলে বুক ভাসাইয়া একবার 'মা' বলে ডাকিলেই তুমি সাড়া দেও" এই আমার ধারণা, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু এই সরল "মা" ডাকটা মায়ার দরুণ মানুষের মুখে সহজে আসে না, তোমার সুধামাখা পরশ পাইয়া প্রকৃত পক্ষে চিরতৃপ্ত হইতে ও চিরশান্তি লভিতে মানুষ সচরাচর চায় না।

তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তুমি বলিয়াছ—

সহস্র সহস্র লোক মাঝে কোনজন,
আত্মজ্ঞান লাভে হয় যত্ন পরায়ণ।
যত্নশীল সিদ্ধগণ মাঝে ধনঞ্জয়।
কশ্চিৎ স্বরূপ মোর কেহ জ্ঞাত হয়।

মা! তুমি নিত্য স্বরূপে অতীন্দ্রিয়া। কাহারও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা ভোগ্যা নও। তথাপি জগৎ ভোগে অভ্যস্থ জীবের জন্য নিত্য ভোগ্য এই স্থূল জগন্মূর্ত্তিতে তুমিইত সতত বিরাজিতা, মাগো ব্রহ্মময়ি! আমরা তোমার কোলেই

রহিয়াছি তোমারই স্তন্য-স্নেহ-সুধাপানে অহঃরহ পরিপুষ্ট হইতেছি, সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতেছি অথচ মা বলিয়া তোমাকে বুঝিতে পারিতেছিনা, এইত মা আমাদের দুর্দ্দৈব।

মা! "যোগের প্রভাবে চিত্ত যাঁর সমাহিত সমদর্শী সেই যোগী নেহারে নিয়ত" "সর্ব্বভূতে বিরাজিত আত্মা সর্ব্বময়, আত্মাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত রয়।"

২৯।৬ অমীময় গীতা।

মা! তুমি গীতায় শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছে:—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০।৬
সর্ব্ব ভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৩১।৬
আত্মজ্ঞানদ্বারা যিনি মোরে সর্ব্বভূতে,
সমস্ত প্রপঞ্চ পুনঃ দেখেন আমাতে।
সেই পুরুষের পক্ষে পরোক্ষ কখন
হই না, তিনিও মোর পরোক্ষ না হন।
সর্ব্বভূতে স্থিত আমি জানি যেই জন
একান্ত অভিন্নরূপে করেন ভজন
থাকিলেও রত তিনি বিষয় ব্যাপারে
আমাতেই অবস্থিত জানিও তাঁহারে।

৩০।৩১।৬ অমিয় গীতা

মা তুমি ভক্ত বৎসলা! ভক্তের অভিলাষ অনুসারে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সখা প্রাণেশ্বর প্রভৃতি কতই রূপ না তুমি ধারণ কর। তাই শাস্ত্র বলেন:—

ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ।

মা! তুমি প্রেমস্বরূপিণী। তুমি এত আপনার, তুমি এত কাছে, আর 'মা' ডাক এত মধুর, তবু আমরা বিষয় ভুলিয়া সরলপ্রাণে মা বলে তোমায় ডাকিনা, তোমার বিচ্ছেদে নয়নজলে বক্ষঃ আমাদের ভাসে না অথচ অভিমান করিয়া বলি—মা নিষ্ঠুরা! মা পাষাণী।

মা! তোমায় ভুলিয়া বিষয় মদে মত্ত হইয়া খেলায় মজিয়া দুঃখ পাই আর কাঁদিয়া বলি ঃ—

"থাক্‌লে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।"

এই ত মা মায়া!

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥

মাগো! তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি প্রসন্না বরদা হইলেই মানুষ মুক্তি লাভ করে। মা আমি তোমার শরণাগত সন্তান। আমার উপর প্রসন্ন হও। আমার মুখে সহজ মধুমাখা মা ডাক ফুটাও এবং তোমার সুধামাখা পরশদিয়ে আমায় চিরশান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও।

পিতামাতা, পুত্রকন্যা, দারা পরিজন,
যাঁহদের ভাবি সদা আপন আপন,
ভুলিয়া রয়েছি মাগো তোমা হেন ধন,
তাঁহারা কেহই নয় প্রকৃত আপন।
সকল ক্ষেত্রেই তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ যখন,
তোমাকে পেলেই আমি পাব সবজন।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু
জগদম্বা তপোবন
পোঃ বারদী ঢাকা
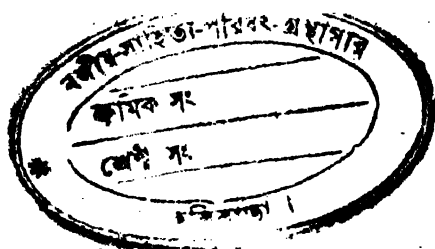
প্রবৃত্তি

উৎকল দেশে প্রতিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে পদব্রজে যাইতেছি, পথিমধ্যে শ্রান্ত হইয়া একটি উদ্যানের বটবৃক্ষতলে উপবেশনে করিলাম। সম্মুখের বৃক্ষসমূহে নানা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুষ্প সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখি প্রত্যেক পুষ্পবৃক্ষে দুই প্রকারের জীব—মধুমক্ষিকা ও মাকড়সা—বসিয়া আপনাপন রুচি অনুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত। একই বৃক্ষের পল্লবে বসিয়া জীবদ্বয় আপনাপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য তৎপর। মধুমক্ষিকা মধু ও মাকড়সা গরল সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত। এই দৃশ্য স্মরণে রাখিয়া শ্রীজগন্নাথের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম, ভগবন্! তুমি অবোধ কীট পতঙ্গকে পর্য্যন্ত দুইপ্রকারের প্রবৃত্তি দিয়া যে জগতে পাঠাইয়াছ, ইহার তোমার অদ্ভুত লীলা। ভাবিতে ভাবিতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের সন্নিধানে পৌঁছিলাম। তথায় দেখি নানা প্রকৃতির সহস্র সহস্র স্ত্রী পুরুষ, তীর্থ যাত্রীরূপে গমন করিয়া জগন্নাথের মন্দিরের বাহিরের নানাপ্রকারের কুৎসিৎ পুত্তলির ও ছবির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া দেখিতেছে ও কেহ কেহ অতি মৃদুস্বরে, কেহ কেহ ঈষৎ স্পষ্টস্বরে ঐ ছবি ও পুত্তলিগুলিনসম্বন্ধে নানাভাষায় আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে করিতে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও হস্ত পদাদিশূন্য নাসিকা বিহীন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আপনাপন মনোভাব সন্তর্পণে প্রকাশ করিতেছে। সাবধানে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে দুই শ্রেণীর যাত্রীতে মন্দির পরিপুর্ণ। এক শ্রেণীর সংখ্যা অতি অল্প, অপর শ্রেণীর সংখ্যা অতি অধিক। অধিক শ্রেণীর দর্শকগণ বলিতেছে,—"একি বাবা শ্রীভগবানের দৃশ্য! হাতপা কাটা দেবতা! দেখিলে ভয় হয়। ইহার ত বংশীধারী নুপূর চূড়ায় শোভিত শ্রীবৃন্দাবনের রাধারমণের সুন্দর মূর্ত্তির সহিত কোন প্রকারে তুলনা হয় না। চল আমরা মন্দিরের বাহিরে যাই, আর সেখানে যে সকল সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও ছবি আছে তাহা দেখিয়া জীবন সার্থক করি, পরে আহারের ব্যবস্থার চেষ্টা করিব।" আর অল্প শ্রেণীর যাত্রীগণ বলিতেছে—"দেখ মনকে দৃঢ় করিয়া মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য একেবারে ভুলিয়া যাইয়া হস্তপদাদি বিহীন, বিশাল চক্ষু

বিশিষ্ট দেবাদিদেব শ্রীজগন্নাথের রূপদর্শন করিয়া আজ জীবন সার্থক হইল। শ্রীভগবন্! মানুষ অতি গোপনেও পাপ কর্ম্ম করিলে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। অদ্য হইতে মনে দৃঢ় ধারণা হইল, অতি গোপনেও পাপ কর্ম্ম করিলে শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট ধরা পড়িব, আর সদা সংকর্ম্ম করিলে তিনি সেই সৎকর্ম্মের অতি সঙ্গত বিচার—করিয়া আমাদের ইহ ও ভাবি জীবনের কর্ম্মফলের সুদসমেত পুরস্কার দিবেন। মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য অদ্য হইতে ভুলিয়া যাইব। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে যত যত নারী রত্ন দেখিব সকলকেই বলিব, তুমি আমার জননী আমি তোমার সন্তান।

মা হয়ে এসেছ মাগো দেখাতে স্নেহের অভিনয়।
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্রে আমি তোর হয়েছি তনয়॥

সহধর্ম্মিনী পত্নী ব্যতীত সকলকেই মাতৃজ্ঞানে—দেবীজ্ঞানে দেখিব আর মনে করিব এই শিক্ষা আমায় উৎকলের শ্রীজগন্নাথদেব দিয়াছেন। ধন্য সেই মহর্ষি যিনি শ্রীজগন্নাথকে ও তাঁহার মন্দির ঐরূপে সাজাইয়াছেন, কর্ম্মের প্রধান্য ভারতক্ষেত্রে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে যিনি শ্রীভগবানের ঐ প্রকার মুর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ঘোর কলিযুগের অধিকাংশ ব্যক্তিই মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হয়, কিন্তু অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার পাপ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া দিয়া শুদ্ধমনে কর্ম্মদ্রষ্টা শ্রীজগন্নাথ দর্শন যে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যের ফল তাহা অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করেন না। ইহাই মনে করিতে করিতে সাধ্যানুসারে তন্ময় হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলাম বটে, কিন্তু যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা, তাহা কিছুতেই মনে আসিল না। কত শ্লোক, কত মন্ত্র সর্ব্বদা কণ্ঠাগ্রে থাকে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য সে সকল মন্ত্র সে সকল শ্লোক ভুলিয়া যাইলাম। সর্ব্বশেষে "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিং পরমেশ্বর" এই মহাদেবের প্রণাম মন্ত্রের কিয়দংশ উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলাম। পরে ভাবিলাম, উহাতে কোনও দোষ হয় নাই, কারণ যিনিই মহাদেব তিনিইত জগন্নাথ, আপনাকে নিবেদন করাইত উদ্দেশ্য, তাহাইত প্রার্থনীয়, তাহাইত জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থায় মনে আকাঙ্ক্ষা করি। সমুদ্রে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যখন মন্দিরের বাহিরে আসিলাম তখন দেখি বস্ত্র শুকাইয়া গিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে মনও শুকাইয়া গেল, সরস তন্ময় ভাব অন্তর্হিত হইল, বিস্মৃত মন্ত্র সকল,

স্তব সকল মনে জাগিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে উদরও জ্বলিয়া উঠিল। যে সকল মন্ত্র মনে আসিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তন্ত্রসারের আগমসারোক্ত বৈষ্ণবাচারের কয়েকটী মন্ত্র মনের প্রধান স্থান অধিকার করিল। শ্লোক তিনটী মদ্য মাংস ও মৈথুন শব্দের তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে অর্থবোধক।

(১) সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দ ময়ীং তাং যঃ স এব মদ্য সাধকঃ॥
(২) মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদাচ ভক্ষয়েৎদেবি স এব মাংস সাধকঃ॥
(৩) সহস্রারোপরিবিন্দৌ কুণ্ডল্যা মিলনাংশিবে।
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনং পরিকীর্ত্তিতং॥

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে প্রথম শ্লোকের অর্থঃ—ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত সহস্র কমলদল বিনির্গত সুধা ধারা পানে সাধকের যে মত্ততা লাভ হয়, মদ্যপান অর্থে তাহাই বুঝায়।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থঃ—বাসনা ভক্ষণ বা সঙ্কোচনাদি দ্বারা সাধকের যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা দূরীভূত হয় মাংস ভক্ষণ অর্থে তাহাই বুঝায়।

তৃতীয় শ্লোকের অর্থঃ—বহ্মরন্ধ্রে স্থিত সহস্রারের বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির যে মিলন তাহাই মৈথুন কার্য্য।

মদ্য, মাংস ও মৈথুনের সাধারণ অর্থ বা ব্যবহার ও কার্য্য লিখিবার প্রয়োজন নাই। উহাদের ব্যবহারের ও কার্য্যের ছবি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্ভাগে সুন্দররূপে প্রতিফলিত আছে।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যে পাঠকের প্রবৃত্তি অনুসারে হইয়া থাকে তাহাই উপরে দর্শিত হইল। মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবন লীলা আদিও ঐ প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কোন কোন পাঠক উক্ত মহাগ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট চূড়ামণি, কৌশলীরাজনীতিজ্ঞ ইত্যাদি মনে করেন, আবার অপরে নিষ্কাম ধর্ম্ম দাতা, দেবাদিদেব ব্রহ্মের অবতার মনে করেন। আমরা শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে যাইয়াও ঐ প্রকার দুই শ্রেণীর তীর্থ যাত্রীর দল দেখিয়াছিলাম, অর্থাৎ কেহ কেহ বা বৃন্দাবনের মন্দিরের অভ্যন্তরে নিশা আগমনে শ্রীরাধা

কৃষ্ণের সজ্জিত ফুল শয্যায় মিলনের ও প্রাতে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন কালে ঐ শয্যার বিশৃঙ্খল ভাবের রহস্য, কল্পনাচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অনুসরণ করিয়া, নিত্য যাহাতে আপন গৃহে ফুলশয্যার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য চেষ্টিত, আর কেহবা শ্রীবৃন্দাবন আকাশে বায়ুতে, জলে স্থলে এমন কি সর্ব্বত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত লীলা ভূমি রূপে দেখিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব হইয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব দান করিয়া দেহত্যাগ করিবার প্রয়াসী। পাঠক! প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাওয়া কঠিন কর্ম্ম মনে হইলে, শুদ্ধ মনে তীর্থ যাত্রা করিতে অক্ষম হইলে, দান, ধ্যান, পূজা ইত্যাদি করিতে অক্ষম হইলে, সাবকাশ মত মধ্যে মধ্যে নিম্নে লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিবে আর যোড়করে সৎপ্রবৃত্তি লাভের জন্য, মনকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট নিত্য নিত্য প্রার্থনা, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

"ন জানামি দানং ন চ ন্যাসযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং, ব্রতং বাপি মাতঃ! গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ॥"
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মা (রায়চৌধুরী)।
৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায়।

রাজরাজেশ্বরী তুমি—মানুষের সকল কথা বুঝি তোমার কাছে পৌঁছায় না। মানুষ বুঝি ডাকার মত ডাকিতে পারে না তাই তোমার সাড়া পায় না নতুবা তুমি সর্ব্বদাই মানুষের দুর্গতি নাশের জন্য আছই। দুর্গতি নাশের জন্য তোমাকে ডাকিতে হয়, দুর্গতি নাশের জন্য তোমার পূজা করিতে হয়। যিনি যখন তোমায় ডাকিয়াছেন, তোমার পূজা করিয়াছেন, ডাকার মত ডাকা হইলেই, পূজার মত পূজা হইলেই, তুমি তোমার আনন্দধাম ত্যাগ করিয়া জীবের দুর্গতি বিনাশ করিয়াছ তাই তোমার নাম দুর্গা। দুর্গা যেমন দুর্গতি নাশ করেন দেখা দেন—সেইরূপ আবার সংসার সাগর হইতে মুক্তিও প্রদান করেন। সংসারসাগরে উন্মজ্জন নিমজ্জনই প্রধান দুর্গতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তোমার স্তব করিয়া ডাকিতে বলিয়াছিলেন, তুমি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিলে, অভয় দিয়াছিলে। রাবণ বিনাশের জন্য শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র শরৎকালে কিষ্কিন্ধ্যায় একবার অকাল বোধন করিয়া তোমার পূজা করিয়াছিলেন, আবার লঙ্কায় বসন্তকালে দ্বিতীয়বার তোমার পূজা করিয়াছিলেন, আর তুমি রাবণ বধের সহায়তা করিয়াছিলে। লোকে বলে বাল্মীকি রামায়ণে রামের দুর্গা পূজার কথা নাই। যে বাল্মীকি রামায়ণ এখন আমরা পাই তাহাতে নাই বটে কিন্তু রামায়ণ ত অনেক। কোন রামায়ণে যে ইহা নাই তাহা কে বলিবে? নতুবা দেবী ভাগবতে শরৎ ও বসন্তকালে রামের দুর্গা পূজার কথা কখনই থাকিত না। ভগবান্ বাল্মীকি এই রামায়ণে দুর্গা পূজার কথা বর্ণনা করেন নাই, সকল কথা সকল সময়ে লেখা না হইতে পারে, তজ্জন্য ইহা বলা যায় না যে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র দুর্গা পূজা করেন নাই ইহা অবিশ্বাসীর কথা। দেবী ভগবতে দুর্গা পূজার কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে অন্য পুরাণেও আছে আর সেই জন্য শরৎকালে এবং বসন্তকালে এই পূজা হইয়া থাকে।

সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য বিপদে পড়িয়া মেধস ঋষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ঋষি, রাজা ও বৈশ্যের আপদ নিবারণের জন্য দুর্গার লীলা শুনাইয়াছিলেন; পরে ইহাঁরা তিন বৎসর পূজা করিয়া দুর্গার দর্শন লাভ করেন এবং

অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হয়েন, একজনের হইল রাজ্যপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়ের মোক্ষ। দুর্গা পূজা কেন করিতে হয় ইহার একমাত্র উত্তর শুভের জন্য বিশেষতঃ দুর্গতি নাশ জন্য। এই যে এই শরৎকালে ও বসন্তকালে দুর্গা পূজা এখনও হয় ইহাও কিন্তু আপদনাশের জন্য।

বৎসরের মধ্যে শরৎ ও বসন্ত ঋতু অতি দুঃসময়। দেবী ভাগবতে পাওয়া যায়

> দ্বাবৃতু যমদংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্ব্বজনেষু বৈ।
> শরদ্বসন্ত নামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ ॥
> তস্মাদ্ যত্নাদিদং কার্য্যং সর্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা।
> দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতূ রোগকরৌ নৃণাম্।
> বসন্ত শরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥
> তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ।
> চৈত্রেঽশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ ॥

সকল মানুষের পক্ষে শরৎ ও বসন্ত ঋতু যমদংষ্ট্রা নামে খ্যাত। প্রাণিগণের পক্ষে এই দুই ঋতু অতি দুঃখে আবহনীয়। যাঁহারা শুভ ইচ্ছা করেন তাঁহারা অতি যত্নে এই কালে নবরাত্রি ব্রত করিবেন। এই দুই ঋতু অতি ভয়ঙ্কর। ইহারা মানুষের রোগকর ও জননাশকর। এইজন্য জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহাদের ভক্তিপূর্ব্বক চণ্ডিকার পূজা করা কর্ত্তব্য।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় কিরূপ হাহাকার সর্ব্বত্র। বন্যাতে দেশ ভাসিয়া গেল, তার পর দুর্ভিক্ষ, নানাপ্রকারের রোগ, ঘরে ঘরে কতই অকালমৃত্যু—মানুষের আপদের অবধি কোথায়? এই সমস্ত আপদের প্রতীকার জন্য দুর্গাকে স্মরণ করিতে হয়, দুর্গার পূজা করিতে হয়।

ভগবান্ সকলের হৃদয়ে আছেন, জগতের সর্ব্বত্র আছেন, তাঁহারই উপরে এই বিচিত্র জগৎকোটি ভাসিয়াছে। তাঁহাকে না ডাকিলে কিন্তু জীবের কোন দুঃখের প্রতীকার হয় না। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বকালে আপনি-আপনি মগ্ন—বিশেষভাবে ডাকিতে না পারিলে তাঁহার সাহায্য পাওয়া যায় না। লোকে বলে না ডাকিলে তিনি সাড়া দেন না কেন? যিনি সব জানেন, সব দেখেন, মানুষ তাঁহাকে ডাকার মত না ডাকিতে পারিলে তিনি মানুষের কোন উপকার করেন না ইহা কেন হয়? তিনি না করুণাময়ী, তিনি না করুণাবরুণালয়া?

পার্থিব মাতা বা পিতা সন্তানকে কুপথে যাইতে দেখিলে স্থির থাকিতে পারেন না, ছুটিয়া গিয়া সর্পের মুখ হইতে সন্তানকে বাঁচান কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিময়ী—যিনি অনন্তদয়া হৃদয়ে রাখেন তিনি আপনা হইতে জীবকে রক্ষা করেন না ইহাতে প্রাণে যে একটা ভারি সংশয় উঠে? আজকালকার দিনে মানুষ জগদম্বার স্বভাব ধরিতে পারে না বলিয়া সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মা নিগুর্ণ বা সগুণ বা আত্মা বা অবতার যে ভাবেই থাকুক না কেন তাঁহার স্বভাব হইতেছে আত্মানন্দে বিভোর থাকা। তিনি সর্ব্বদাই আপন পরিপূর্ণ আনন্দে ভরিত থাকেন—তুমি যখন প্রাণকে অতিশয় কাতর করিয়া তাঁহাকে ডাক তখনই তাঁহার সাড়া পাও তদ্ভিন্ন পূর্ণকে খণ্ডভাবে আনিতে পারে কে?

বল দেখি আজকালকার জীবের হাহাকারে তুমি কতটুকু ব্যথিত? কতটুকু কাতর? হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া অকপটে বল আজ এই দেশব্যাপী হাহাকার তোমার প্রাণকে কতটুকু আলোড়িত করিয়াছে? মুখে যাহা বলিতেছ তোমার অন্তর কি তাহাতে বিগলিত হইয়াছে? সেই এক রাজপুত্রের হৃদয় জীবের দুঃখে হাহাকার করিয়াছিল—আকাশে থাকিয়া নক্ষত্ররাজি তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছিল; এই রাজপুত্র সকল ত্যাগ করিয়া দুঃখের প্রতীকার করিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আর ঐ অল্প দিনের কথা—আহা! সেই সুন্দর পুরুষ জীবকে ভগবৎ বিমুখ দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে তোমার নাম করিয়া নাম ধরাইয়াছিলেন। তোমার অন্তর কি সেইরূপ ব্যথিত? যদি সত্য সত্যই ব্যথিত হইত তবে তুমি বুঝিতে তাঁহাকে না ডাকা পর্য্যন্ত জীবের দুঃখ কিছুতেই দূর হইবে না। তোমার বুদ্ধিতে যাহা উপায় বাহির করিয়াছ কর কিন্তু যদি মার সাহায্য প্রার্থনা না কর তবে এ দুঃখের প্রতীকার তোমার বুদ্ধি আবিষ্কৃত উপায়ে হইতেই পারেন না—কালের স্রোত কি তোমার চেষ্টায় ফিরিবে? না কাঁকড়ার বাচ্চা সমুদ্রের তরঙ্গ শান্ত করিবে? তাঁহাকে না ডাকিয়া জীবের দুঃখ দূর করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তথাপি বলিতে হয় শাস্ত্র আলস্যের প্রশ্রয় কোথাও দেন নাই। জীবে দয়া নিঃশ্রেয়সেরই অঙ্গ।

পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে যাহারা আপদ নাশ করিয়াছেন তাঁহারা দুর্গাকে ডাকিয়াই দুর্গতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এখনও ত লোকে প্রভাতে দুর্গা দুর্গা করিয়া শয্যা ত্যাগ করে কিন্তু আপদ স্তস্ত নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা—ইহা হয় না কেন? এখনও ত দুর্গা দুর্গা করিয়া মানুষ আপদ উদ্ধারের চেষ্টা করে কিন্তু

শূলং শূলী চক্রমাদায় চক্রী
বজ্রং বজ্রী পাশমাদায় পাশী।
ধাবন্ত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ
দুর্গা দুর্গা বাদিনাং রক্ষনায়॥

দুর্গা দুর্গা যিনি বলেন তাঁহার রক্ষার জন্য শূল হস্তে মহাদেব তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকেন, সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিয়া নারায়ণ তাঁহার পশ্চাৎভাগে চলেন, ইন্দ্রবজ্রহস্তে এক পার্শ্বে এবং বরুণ পাশ হস্তে অন্য পার্শ্বে থাকেন—ইহা আজ কয় জন অনুভব করেন? কেন করেন না? মানুষ আজ বিশ্বাস হারাইয়াছে, মানুষ তপস্যা ছাড়িয়াছে, মানুষ ভুলিয়াছে যে তোমাকে স্মরণ করিয়াই কার্য্য করিতে হয়, তোমাকে স্মরণ করিয়াই বাক্য বলিতে হয়, তোমাকে স্মরণ করাই মানুষের একমাত্র ভাবনার বিষয়—তৎপরতাই মানুষের একমাত্র সাধনা, মানুষ ইহা হারাইয়াছে—মানুষের দুঃখ দূর করিবে কে? আবার প্রাণকে সত্য সত্য ব্যাকুল করিয়া মানুষ ভাবুক, মানুষ তোমার পূজা করুক—সে কালের মত একালেও দানব-দলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে দানব দলন করিবার জন্য নিশ্চয়ই আসিবেন অন্যপরতা ছাড়িয়া তৎপরতা যাঁহার আসিবে তিনিই দেখা পাইবেন।

(২)

তৎপরতাই সাধনা—আর তৎপরতাই জীবের স্বভাব। জীব শুদ্ধ হউক সে আপনা হইতেই অন্যপরতা ত্যাগ করিয়া তৎপরই হইবে। জীবের চিত্ত নির্ম্মল হইলেই জীব আপনিই অনুভব করিবে অন্যপরতা আসিলেই জীবের দুঃখ বৃদ্ধি আসিবেই। তৎপরতাই ভক্তিযোগ। জগদ্ধাত্রী সকলের হৃদয়ে আছেন বিশ্বাস করিয়া—দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া মানুষ সর্ব্বদা সেই রক্ষা কর্ত্রীকে স্মরণ করুক মানুষকে তিনি ভক্ত করিয়া জ্ঞানী করিয়া দিবেনই।

আহা! তিনি ত পূর্ব্বলব্ধ ছিলেনই কিন্তু এতকাল লক্ষ্য হয় নাই। শ্রীগুরু ও শাস্ত্র লক্ষ্য করাইয়া দিলেন, এখন কর্ত্তব্য হইতেছে বাক্যে, কার্য্যে, ভাবনায় সর্ব্বদা স্মরণ। ইহা হইলেই মানুষ তোমাকে লইয়া সর্ব্বদা ভরিত হইয়াই থাকিবে আর যাহা করিবে তাহাই তোমার পূজায় লাগাইবে।

আহা! এততেও যখন হৃদয় নড়ার মত নড়িল না, প্রাণ যথার্থভাবে কাতর হইয়া সব ছাড়িয়া তোমায় ডাকিল না তখন বুঝা যাইতেছে আরও যাতনা হওয়া আবশ্যক, তোমার সংহার মূর্ত্তির ক্রীড়া আরও আবশ্যক।

হৃদয় কিরূপ ভাবে ব্যাকুল হইলে তোমাকে ডাকার মত ডাকা হয়? মানুষকে ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদ্যম করিতেই হইবে, কিন্তু মানুষ যখন দেখিবে মানুষের উদ্যম কখনই কার্য্যকারী হইবে না, যতদিন না তুমি মানুষের সকল উদ্যমের উপর, সকল কর্ত্তব্যের উপর চরণ ছায়া না দিতেছ ততদিন মানুষের হইবে না। মানুষ যখন প্রাণে প্রাণে বুঝিবে মানুষের বুদ্ধি উদ্ভাবিত কৌশলেই শুধু জাতির মঙ্গল হয় না, জীবের হাহাকার দূর হয় না, চেষ্টা করিয়া করিয়া মানুষ যখন বুঝিবে মানুষের সকল চেষ্টার উপরে তোমার সাহায্য চাই, মানুষ যখন বুঝিবে তুমি ভিন্ন আর আমাদের কেই নাই, তখন মানুষের হৃদয় কাতর হওয়ার মত কাতর হইবে—তখন মানুষের ডাকাও ঠিক হইবে—তখনই তুমি আসিবে। কখন কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছ তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই? এই চিন্তা প্রত্যহ অভ্যাস কর।

(৩)

আহা! সে দিন মানুষের কবে আসিবে, যখন মানুষ অন্তরের অন্তস্তল হইতে কম্পিত হৃদয়ে, উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে, অন্যপরতা ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে পারিবে জগজ্জননি আমাদের আর কেহই নাই, তুমি ভিন্ন আমাদিগকে কেহই আর রক্ষা করিতে পারিবে না, যখন মানুষ অন্য সকল চেষ্টার উপরে প্রাণ হইতে বলিতে পারিবে—

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যম্
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

*　　*　　*　　*　　*

তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

আহা ! তোমার এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে তোমার স্নেহভরা চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া মানুষ যখন বলিতে পারিবে যে মা আমাদের আর কেহ নাই, তুমি ভিন্ন আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই, নান্যগামীচিত্তে মানুষ যখন শুধু তোমাকেই ডাকিবে শ্রুতিসিদ্ধ নির্ম্মল স্তোত্রে তোমার স্তব করিয়া গদ্গদ্ কণ্ঠে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিবে তখন বুঝি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না আসিয়া তুমি থাকিতে পারিবে না।

এস মা, এস—আমাদের হৃদয়কে সত্য সত্য ব্যাকুল করিয়া তোমার পূজাতে নিযুক্ত কর, সত্য সত্যই জীবের দুঃখের অনুভব, আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোমার চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া ইহাকে স্থির করুক, আর কি বলিব মা আমাদের সকল উদ্যম তোমাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠুক তুমি ভিন্ন আমাদের অন্য আশ্রয় নাই ইহা যেন আমরা প্রাণে প্রাণে সর্ব্বদা অনুভব করিয়া তোমার আজ্ঞামত কার্য্য করিতে পারি ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

(৪)

শরৎকাল যমদ্রংষ্ট্রা সদৃশ হইলেও এই কালে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভারতের সারা প্রকৃতিতে তোমার আগমন বিঘোষিত হইয়া থাকে। আহা তোমার আগমনে, নদী তড়াগের জল নির্ম্মল হইল, কুমুদ কহ্লার পদ্ম তোমার পূজায় লাগিবে বলিয়া ফুটিয়া উঠিল ; স্থলে শেফালিকা জবা হাসিল , সুনীল আকাশে সুন্দর চাঁদ ভাসিল ; তারা ঝকমক করিয়া শোভা ছড়াইল ; প্রকৃতি তোমার পূজা করিতে সাজিয়া আসিলেন—মানুষ প্রকৃতির সাড়া ধরিয়া তোমার পূজা করুক এই ত তোমার ইঙ্গিত। উঠুক্ না তোমার ধ্বংসলীলার শঙ্খ ঘণ্টা-ধ্বনি—ইহার মধ্যেও মঙ্গলময়ীর মধুর হাস্য দেখি এস। জগৎ জুড়িয়া তুমিই দাঁড়াইয়া আছ, কে বা কাহাকে বিনাশ করে ? মানুষে বিনাশ দেখে সত্য, কিন্তু তুমি তোমার জীবকে ফেলিবে কোথায় ? ফেলিবার স্থানও তুমি কাজেই আপনার ছেলের মুণ্ড কাটিয়া আপনার গলায় ঝুলাইয়া রাখ তুমিই। এই ত অভয় মন্ত্র। জীবিত কালে তোমার ছেলেকে তুমিই কোলে করিয়া রাখ আবার মৃত্যুতে মৃত পুত্রের মুণ্ডমালা গলায় গাঁথিয়া রাখ। তোমার যে সংহার সেথাও তোমার দয়া প্রকাশ করে যদি কেহ দেখিতে পারে। কি স্বভাব তোমার !

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখ ভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

দুর্গতিতে পড়িয়া—শঙ্কটে পড়িয়া তোমায় স্মরণ করিলে, তুমি সকল প্রাণীর ভয় দূর কর, আত্মনিষ্ঠগণ তোমায় স্মরণ করিলে তুমি তাহাদিগকে অতি শুভ-মতি—তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণা বুদ্ধি প্রদান কর; হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! তুমি ভিন্ন সকলের উপকার করিতে সর্ব্বদা করুণহৃদয়া এমন কি আর আছে?

তুমি যে অসুরগণকে বিনাশ কর ইহাও তোমার করুণা। চিরকাল নরক ভোগের জন্য ইহারা পাপই করিবে কিন্তু তোমার হস্তে সংগ্রাম-মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া ইহারা স্বর্গে যায় এই অনুগ্রহ বুদ্ধিতে তুমি দানব বধ কর। তুমি দৃষ্টি মাত্রেই সকলকে ভস্ম করিতে পার তথাপি অস্ত্রপ্রয়োগে যে বধ কর সে কেবল শত্রু সকলকে শস্ত্রপূত করিয়া উত্তমলোকে পাঠাইবার জন্য; শত্রুর উপরেও দয়া করিতে এমন আর কে আছে? তোমার খড়্গ ও শূলের প্রভায় অসুর-গণের দর্শনশক্তি লোপ পাইবারই কথা কিন্তু তাহা হয় নাই কারণ তাঁহারা তোমার চন্দ্রকিরণ-মণ্ডিত অর্দ্ধচন্দ্র সমন্বিত বদনমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিল, আর সেই জন্য তোমার প্রচণ্ড অস্ত্রের তেজও তাহারা সহ্য করিতে পারিয়াছিল।

দুর্ব্বৃত্ত-বৃত্ত-শমনং তব দেবি! শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যসমতুল্যমন্যৈঃ
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেব পরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়াত্বয়েত্থম্॥

দেবি! তোমার স্বভাব হইতেছে দুর্ব্বৃত্তগণের দুষ্টবৃত্তির নিবারণ করা আর তোমার রূপ এত সুন্দর যে তাহা সকল লোকের বিচার অতীত এবং যত সুন্দর সামগ্রী সংসারে আছে তাহার কাহারও সহিত ইহার তুলনা হয় না; রূপ তোমার সকল সৌন্দর্য্যের আধার; তথাপি তোমার তেজ দেবতাদর্পহারী অসুরগণের বিনাশক; আহা! এত বড় প্রচণ্ডশক্তি থাকিলেও তোমার দয়া কিন্তু শত্রুগণের উপরে প্রকটিত হইয়া থাকে।

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

হে দেবি! তোমার এই পরাক্রম, ইহার সহিত কাহার উপমা দেওয়া যায়? আর তোমার রূপ! একদিকে অতি মনোহর অন্যদিকে অতি উগ্র অতি রণকর্ক্কশ শত্রুগণের অতিশয় ভীতিপ্রদ। কৃপাময়ী হইয়াও তুমি অসুরনাশিনী! হৃদয়ে তোমার অনন্ত কৃপা আবার যুদ্ধে ঘোর নিষ্ঠুরতা এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ ত্রিভুবনে একমাত্র তোমাতেই সম্ভব।

গুণের সঙ্গে রূপের বর্ণনা ইহা ত ধ্যানের জন্য। গুণ, রূপ, স্বরূপ ভাবনা—এই সমস্তেই ধ্যান হয়।

রূপের পশ্চাতে মানুষ কতই না ছোটে সে ত ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্তি জন্য। এই যে গুণের সঙ্গে মায়ের রূপ বর্ণনা—এরূপ ত অপার্থিব রূপ। এই অপার্থিব রূপের ভাবনাতে মানুষের যে আত্মতৃপ্তি তাহাই হইতেছে উৎকৃষ্ট সাধনা।

আহা! সেই স্মেরানন সেই ঈষদ্ধাস্য জড়িত মুখমণ্ডল—পরিপূর্ণ চন্দ্র-বিম্বের মত রুচির গলিত সুবর্ণের মত মনোভিরাম—আহা! ইহা দেখিলে কেহ কি মরিতে পার? রূপজ মোহ এক পদার্থ আর এই অপার্থিব রূপ অন্য পদার্থ। এই রূপ দেখিলে অসুরেরও রিপুনাশ হইবার কথা, চিত্তশুদ্ধি হইবার কথা, আত্মতত্ত্ব অনুভূত হইবার কথা। তথাপি অসুর বিনাশে যখন তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলে তখন তোমার উদীয়মান শশাঙ্কসদৃশ পল্লবরাগতাম্র ও ভ্রূকুটীকরাল মুখমণ্ডল না জানি কেমন দেখাইয়াছিল?

কখন ত দেখিলাম না তথাপি বলি শুধু শাস্ত্রে দেখিয়া ভাবনা করিলে যখন এতদূর আত্মহারা হইতে হয় তখন যাঁহাদের ভাগ্যে দর্শন মিলে তাঁহাদের চরণ রেণু হইয়া কি থাকিতে ইচ্ছা হয় না?

বিশ্বাস কি রাখ এই মা জগতের মা, এই মা তোমারও মা? নিরাকার নিরাকার করিলে তোমাকে একটি বিশিষ্ট সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। নিরাকারের নরাকার বা নার্য্যাকার মূর্ত্তি যদি বিশ্বাস করিতে না পার—তবে আর কি বলিব—এই মাত্র বলি তোমার কপাল! তবুও

বলিতে হয়, ভারতের মাটীতে জন্মিয়াছ ভারতবাসীর মত একটু চেষ্টা কর। স্বধর্ম্মানুরাগী হইয়া একটু সদাচার কর, একটু সদাহারের দিকে প্রযত্ন কর ভারতের ধর্ম্মভাব একটু জাগাও, দেখিবে এই জগন্মাতার পূজা না করিয়া থাকিতেই পারিবে না। একটু অধ্যবসায় কর জগৎজননী ত তোমারও জননী—ইহাঁর পূজায় বিশ্বাস হইবেই। ভারতের নরনারী ভারতের আদর্শেই মানুষ হইবে—অন্যদেশের আদর্শ এদেশের কোথায় পড়িয়া থাকিবে তাহা একটু স্বধর্ম্মে থাকিলে মানুষ আপনিই বুঝিতে পারিবে।

আহা! যাঁর রূপের চিন্তায়, যাঁর গুণের ভাবনায়, যাঁর স্বরূপ অনুভূতির বিন্দুমাত্র আস্বাদে প্রাণ ভরিয়া উঠে, হায়রে কলির মানুষ! যিনি শতবার শত ভাবে আশ্বাস দিতেছেন আমি তোদের আছি—বিপদে সম্পদে আমিই তোদের রক্ষা করিয়া থাকি, চিরদিন করিয়া আসিতেছি—অমৃতের পুত্র কন্যা তোরা—তোদের ভয় নাই—কেহই তোদের কিছু করিতে পারিবে না—তোরা আমার আজ্ঞাপালন রূপ কর্ত্তব্য করিয়া যা—এখানে কুটিলতা—এখানে চতুরালি করিও না আমি সবার হৃদয়ে থাকিয়া সকলেরই মঙ্গল করিব।

দুঃখে পড়িয়াছ, আমার স্মরণে কাতর প্রাণকে আমার চরণে ধারণা করিয়া আমাকে ডাক, আমার পূজা কর, তুমি চেষ্টা কর আমিই তোমার শুভ আনিয়া দিব। আমার সংহারমূর্ত্তির ভ্রুকুটী দেখিয়া ভয় পাইওনা ইহাও তোমার মঙ্গলের জন্য জানিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়া চল।

মা সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, তিরস্কারে পুরস্কারে, রোগে সুস্থতায় যেন তুমি হৃদয়ে আছ, আমার হৃদয়ে আছ, সকল নরনারীর হৃদয়ে আছ, সকল সৃষ্টবস্তুর অভ্যন্তরে আছ ইহা আর ভুল না হয় তুমি এই করিয়া দিও; পূজার অঞ্জলি দিয়া তোমার নিকটে এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

নাম সম্বল।

১

ভুলে গেছি আমারেও যেতে হবে একদিন
ভুলে গেছি হইতেছে দিন দিন আয়ু ক্ষীণ।
ভুলে গেছি দিন শেষে শমন শিয়রে এসে
দাঁড়াইবে হেসে হেসে, পেয়ে নিজ অধিকারে।
ভুলে গেছি সে ভীষণ প্রেতপুরী অন্ধকারে।

২

ভাবি শুধু রব আমি চিরদিন এইভাবে।
আর সবে যাবে চলে আমারে রহিতে হবে।
থাকিবারে চিরকাল চাহি যে আশ্রয় ভাল
থাক মোর সাথি হয়ে, সঞ্চিত অর্থের রাশি।
হায় মোরে ঘিরিয়াছে একি ভ্রান্তি সর্ব্বনাশী ?

৩

ভুলে গেছি ইহকাল শুধু মাত্র নহে সার।
ভুলে গেছি পারে যেতে হবে ভব পারাবার।
মরণের যবনিকা দেখাবে কি বিভীষিকা
ভুলেও ভাবি না তাহা, নাহি হয় মনে লাজ।
পথের সম্বল তরে, করিছি কি ভাল কাজ !

৪

অসহায় হই পাছে ভয় পাই অনুক্ষণ।
ভুলে গেছি সহায় যে আছে শুধু একজন।
আছি নিয়ে ইহকাল, ভুলে গেছি পরকাল,
পরমার্থ ভুলে গিয়ে, বৃথা অর্থে ভুলে মন
ভুলে গেছি জীবনের একমাত্র সার ধন।

৫

ভুলে গেছি পূজিবারে জবা বিল্বদল লয়ে।
ডুবে আছি মোহকূপে সংসারের কীট হয়ে।
আপনার ভাল যাহা
ভুলে গেছি সবই তাহা,
ভুলে গেছি কিছু নহে এজগতে আপনার।
ভুলি নাই শুধু আমি নামটি মা অভয়ার।

শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবী, ৺কাশীধাম

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আমরা একদিন প্রাতে কৈলাস পাহাড়ে গিয়া দেখি সাধুবাবা পূর্ব্বের মত তেমনি বারান্দার নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রসন্নাননে একাকী প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি বসিতে বলিলেন। আমরা তাঁহার নিকট একটী গল্প শুনিতে চাহিলাম। পুরস্কারের লোভে কিছুদিন মাত্র কৃত্রিম সাধুর বেশ ধারণ করিয়া লোকের অনুরোধে পড়িয়া কিছুদিন ভগবদ্‌নাম লওয়ায় ও অল্পদিন ধরিয়া কৃত্রিম সাধুগিরি করিতে গিয়া সেইরূপ হাবভাব অবলম্বনের ফলে ভগবদ্ কৃপায় সময় সময় মানবের যে অদ্ভুত অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে সাধুবাবা সেই দিন আমাদের একটী গল্প বলিয়া শুনাইয়াছিলেন। গল্পটী এই :—

এক রাজা ইচ্ছা করিলেন যে তিনি কোন একজন বড় সাধু মহাত্মাকে দর্শন করিবেন। এই ইচ্ছা মনে উদয় হওয়ায় তাঁহার মন্ত্রীকে ডাকিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে তাঁহাকে কোন, বড় সাধু দর্শন করাইতে হইবে। রাজা সাধু দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে তিনি মন্ত্রীকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, "যদি আমাকে ছয় মাসের মধ্যে তুমি কোন ভাল সাধু দর্শন করাইতে সক্ষম না হও, তবে তোমার বিশেষরূপে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর যদি ভাল বড় সাধু দর্শন করাইতে সমর্থ হও তাহা হইলে আমার নিকট বিলক্ষণ পুরস্কার পাইবে।" রাজার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মন্ত্রী মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি এখন কোথা হইতে হঠাৎ তেমন উপযুক্ত সাধু

মহাত্মা খুঁজিয়া বাহির করিবেন? বিশেষতঃ লোকের বহু পুণ্যফলে উচ্চদরের প্রকৃত সাধু দর্শন লাভ হয়। বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে মন্ত্রী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রাজার আস্তাবলে বহু ঘোড়ার সহিস্ ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বেশ চতুর, খুব বুদ্ধিমান ও সুশ্রী চেহারার সহিসকে মনোনীত করিয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অতি গোপনে তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, রাজা আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, যদি তাঁহাকে আমি সাধু দর্শন করাইতে পারি তাহা হইলে তিনি প্রচুর পুরস্কার দিবেন। এইজন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি কিছুদিনের জন্য কৃত্রিম সাধুর বেশ ধারণ ও সাধুর মত হাবভাব গ্রহণ করিয়া যেন প্রকৃতই ভগবদ্স্মরণে নিযুক্ত আছ এবং সাধু ব্যক্তির মত আসন করিয়া বসিতে অভ্যাস কর যদি একার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, অর্থাৎ রাজা তোমাকে দেখিয়া যদি প্রকৃত সাধু মনে করিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার পাইবে। আমিও রাজার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য তাঁহার সুদৃষ্টি লাভ করিব। কাজেই তোমার একার্য্য করিতেই হইবে। মন্ত্রীর এই প্রস্তাব শ্রবণে সহিসটী প্রথমে আতঙ্কিত হইলেও অবশেষে মন্ত্রীর বিস্তর অনুরোধে ও অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে সম্মত হইল। মন্ত্রী সন্তুষ্ট হইয়া তখন তাহার গৈরিক বেশ ভূষা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন ও তাহাকে কিরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে ক্রমাগত কিছুদিন ধরিয়া অনবরত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার পর ভগবানের একটী নাম বলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাম তোমার প্রত্যহ জপ করিতে হইবে ও রাজা যেদিন সাধুজ্ঞানে তোমাকে দর্শন করিতে যাইবেন ও প্রণামাদি করিবেন, সেদিন তুমি এমন ভান করিয়া বসিয়া রহিবে যেন রাজা তোমাকে দেখিয়া মনে করেন তুমি একাগ্রচিত্তে ভগবদনাম জপ করিতেছ ও তাঁহাকেই একান্তমনে স্মরণ করিতেছ। কোন কারণে কোন কথাবার্ত্তা তুমি আদৌ বলিবে না।" কিছুদিন অনবরত এই প্রকার নানাবিধ শিক্ষাদির পর মন্ত্রী একদিন রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! বহুদিন অবধি বহু অনুসন্ধানের ফলে একজন প্রকৃত সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ সাধু মৌনী, তিনি কাহারও সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন না। সতত কেবল ভগবদ্ আরাধনায় কালক্ষেপ করেন।" রাজা মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণে এতদিনে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ভাবিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া মন্ত্রীকে সেই সাধুর নিকট যাইবার জন্য আয়োজন

করিতে আদেশ করিলেন ও বহুমূল্যবান্ নানাবিধ সামগ্রী সাধুকে উপঢৌকন দিবার জন্য সঙ্গে করিয়া লইতে বলিলেন। কারণ রাজা, বৈদ্য, জ্যোতিষী ও সাধুর নিকট কখনও রিক্তহস্তে যাইতে নাই। উপযুক্তমত সমস্ত আয়োজন হইলে শুভদিন দেখিয়া একদিন রাজা মন্ত্রী সমভিব্যাহারে সাধুসকাশে গমন করিলেন। মন্ত্রীর উপদেশমত কৃত্রিম সাধু যেরূপ ছয়মাস হইতে শিক্ষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছে সেইরূপ অতিশয় শান্ত অবিচলিত ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মৌনী হইয়া বসিয়া রহিল। রাজা সেইস্থানে পৌঁছাইয়া সাধুর সম্মুখে অতি ভক্তির সহিত ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া সাষ্টাঙ্গে ঐ কৃত্রিম সাধুকে প্রণাম করিলেন ও যে সমস্ত বহুমূল্য উপহার সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত সাধুজ্ঞানে ঐ কৃত্রিম সাধুর চরণ প্রান্তে সমর্পণ করিলেন। অধিকক্ষণ সাধুর নিকট থাকা নিষ্প্রয়োজন, কারণ মৌনী সাধুর নিকট কোন উপদেশ লাভের সম্ভাবনা নাই, কাজেই রাজা তল্লক্ষণপর সেস্থান হইতে রাজপ্রাসাদে চলিয়া আসিলেন। মন্ত্রী কর্ত্তব্যবোধে তখন রাজ সমভিব্যাহারে আসিলেন বটে, কিন্তু চিত্তটী ঐ রাজপ্রদত্ত উপহার সামগ্রীর প্রতি নিবদ্ধ রহিল। মন্ত্রীর ঐ দ্রব্যগুলির প্রতি এতই লোভ হইয়াছে যে মধ্যে মধ্যে মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে এতক্ষণ বুঝি বা ঐ ব্যক্তি দ্রব্যগুলি লইয়া পলায়ন করিল। অত সুন্দর সুন্দর রাজপ্রদত্ত উপহারগুলি হইতে বুঝি তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইলেন। রাজাকে মন্ত্রী রাজপ্রাসাদে পৌঁছাইয়া অশ্বারোহণে যত সত্বর সম্ভব ঐ সাধুবেশ-ধারীর নিকট রওনা হইলেন।

ওদিকে কিন্তু সাধুবেশধারী সহিসের মন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে সেই নির্জ্জন স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছে যে এই রাজা আমাকে পূর্ব্বে বহুবার দেখিলেও তাঁহার অগণ্য সহিসদের মধ্যে কখনও আমাকে লক্ষ্যও করেন নাই। আর যে রাজাকে প্রণাম করিতে পারিলে আমি সৌভাগ্য মনে করিয়াছি,তিনি কিনা আজ, আমি ভগবদ্ স্মরণ করিতেছি মনে করিয়া ও আমার এই কৃত্রিম সাধুবেশের জন্য মুগ্ধ হইয়া এতখানি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। যে বেশের এরূপ প্রাধান্য, এত সমাদর, যাঁহার নাম লইতেছি মনে করায় আমার এতদূর সম্মান, না জানি বাস্তবিক তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিলে কত আনন্দ, কত সুখ! সামান্য একটী সামগ্রী লাভেরজন্য ইচ্ছা হইলে কত ত্যাগ ও কত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় আর আজ অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় ক্ষণকাল মিছামিছি সেই নাম

লওয়ার মাহাত্ম্যেই কত শত সহস্র টাকার উপহার আমার চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহার শরণ লইয়াছি মনে করিয়া রাজার অমন গর্ব্বিত মস্তকও ভূলুণ্ঠিত হয়, না জানি তিনি কেমন, কিরূপ সুন্দর, কত ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহাকে কি বাস্তবিক সত্য সত্য সাধু হইলে লাভ করা সম্ভব? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তার ফলে যখন সাধুবেশধারীর অন্তঃকরণ বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তখন মন্ত্রী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত রাজ প্রদত্ত উপহার দ্রব্যগুলি রাজা যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছেন সেইরূপ ভাবেই সজ্জিত আছে দেখিয়া মন্ত্রী অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কারণ দ্রব্যগুলি লইয়া পলায়ন দূরের কথা সেগুলি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি তুলিয়াও দেখে নাই। মন্ত্রী আসিয়া প্রথমেই যখন ঐ উপহার সামগ্রী-গুলি উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক করিয়া ভাগ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন সে ব্যক্তি ঐ সকল সামগ্রীতে তাহার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই, মন্ত্রীর ইচ্ছা হইলে সমস্তই গ্রহণ করিতে পারেন, বলিয়া অত যে সুন্দর সুন্দর নানাবিধ বহুমূল্যবান্ সামগ্রী, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়া ভগবৎ উদ্দেশ্যে সেই দিন তন্মুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া পড়িল।

আজ এই গল্পটী লিখিতে বসিয়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট একদিন একটী কথা শুনিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়িতেছে। এক দিন শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে কথা হওয়ায় নিবৃত্তি যে অবশ্য গ্রহণীয় তাহা বলিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব আরও একটী কথা বলিয়াছিলেন যে, "ভিতরে নিবৃত্তি কিন্তু বাহিরে প্রবৃত্তি ভাব দেখাইলে কোন ক্ষতি হয় না। এমন কি মনের মধ্যে প্রবৃত্তি কিন্তু বাহিরে নিবৃত্তি ভাব ইহাও মন্দের ভাল। ইহা হইতেও পরিণামে ভাল ফল হইতে পারে।" আমি উহা শুনিয়া বলিয়াছিলাম, "এ কেমন কথা? ইহা ত অতিশয় কপটাচার, কাজেই উহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়।" ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন যে, "ইহা মন্দের ভাল এই অর্থে যে বাহিরে নিবৃত্তি ভাব দেখাইতে দেখাইতেও হয়ত কোন সময়ে এক দিন মনের মধ্যে ঐ ভাব সংক্রমিত হইতে পারে; কিন্তু ভিতরেও যাহার প্রবৃত্তি প্রবল ও বাহিরেও সেই প্রবৃত্তির পথে অবাধে চলিয়াছে তাহারআর সহজে নিবৃত্তির পথে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না।" এই সহিসের কপটাচারের ফলে কিছু দিন মধ্যে মনের আশ্চর্য্যরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের গল্পে শ্রীগুরুমহারাজের সেই বাক্যটী আজ স্মরণ হইতেছে।

আর একদিন সাধুবাবার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন যে জীবের একবার ত্রিতাপ জ্বালার ভালরূপ অনুভব হইলে তাহাকে আর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, কিছুই মোহিত করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। এ সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া একটী গল্প বলিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। গল্পটি এই :—

এক ব্যক্তি এক গৃহে বাস করিত। সেই গৃহখানির উপর খড়ের চাল দেওয়াছিল। তাহার গৃহে প্রত্যহ তেল সলিতার প্রদীপ জ্বলিত। একদিন প্রদীপ হইতে জ্বলন্ত পলিতাটী ইঁদুরে মুখে করিয়া লইয়া যাওয়ায় সেই সলিতার অগ্নি গৃহের চালে সংযোগ হওয়ায় গৃহখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। গৃহস্বামী প্রথমে নিদ্রামগ্ন থাকায় উহা জানিতে পারে নাই। অবশেষে গৃহের চাল ভাঙ্গিয়া পড়ায় নিজ দেহে যখন অগ্নির ভীষণ তাপ আসিয়া লাগিল তখন চমকিয়া উঠিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল ও ঐ ব্যক্তি গাত্রের অসহ্য জ্বালা নিবারণার্থে যেদিকে অতি সুশীতল জলাশয় আছে সেই দিকে প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। জলাশয়ের পথে দুইধারে কত বড় বড় দোকান ও সেই দোকানগুলিতে কত সুন্দর সুন্দর নানাবিধ মনোমুগ্ধকর সামগ্রী সজ্জিত ছিল। উহাকে যাইতে দেখিয়া দোকানদারগণ ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া দোকান স্থিত সামগ্রীগুলি দেখাইতে চাহিলেও সে সকল সামগ্রী তখন তাহার দেখিবার কোন স্পৃহা হইতেছিল না। কারণ তখন সে মনে করিতেছিল 'কখন্ আমি অমৃতসাগরে গিয়া পৌছাইব ও অমৃতের সংস্পর্শে এই ভীষণ অসহনীয় গাত্রদাহ নিবারণ করিব।' গাত্রের ভয়ঙ্কর জ্বালাতে সে তখন এত কাতর ও এরূপ ব্যতিব্যস্ত যে দোকানদারগণের সাদর আহ্বান ও বহুবিধ চাকচিক্য বিশিষ্ট দ্রব্যগুলির লোভনীয় সৌন্দর্য্য তখন আর তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। সেইরূপ যে ব্যক্তি একবার ত্রিতাপ জ্বালা উত্তমরূপে অনুভব করিয়া অমৃতের সন্ধানে অর্থাৎ ভগবৎ চরণোদ্দেশে ব্যাকুল অন্তরে ছুঠিয়াছে, তাহার চিত্তকে সংসারের আপাতঃ মধুর ক্ষণিক সুখ আর মোহিত করিতে পারেনা।

আর একদিন সাধুবাবার নিকট কৈলাস পাহাড়ে গেলে তিনি একটী কাহিনী বলিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। কাহিনীটী এইরূপ :—

এক স্থানে খুব বড় একজন সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন অতি বৃহৎ ও খুব সুন্দর একখানি বাগান প্রস্তুত করাইবেন! সে বাগানের শোভা সৌন্দর্য্য অতি অপরূপ হইবে ও তাহাতে নানাবিধ নয়নপ্রাণ তৃপ্তিদায়ক দ্রব্য ও নানারূপ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিবে। সম্রাটের ইচ্ছানুসারে

অল্পকাল মধ্যেই এইরূপ নানা শোভায় শোভিত সুন্দর একখানি উপবন প্রস্তুত হইল। তখন তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে এই উদ্যানটী সকলেই দেখিতে আসিতে পারে এবং ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়াকৌতুক ও তামাসাদি উপভোগ করিতে পারে। তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করিয়া দিয়া বলিলেন যে যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে এই সময়ের মধ্যে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। আরও তিনি একটী কথা বলিলেন যে যদি কেহ এই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয় তবে তাহাকে আমি বিলক্ষণ পুরস্কার দিব এমন পর্য্যন্ত বলিলেন যদি সে আমার সৃষ্ট উদ্যানখানি গ্রহণ করিতে চায় তবে তাহাও আমি দান করিতে পারি। সম্রাটের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বহু ব্যক্তিরই অতিশয় আকাঙ্ক্ষা হইতে লাগিল যে গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি সম্রাটের তৈয়ারি বাগানের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে তাহার আর সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের নির্দ্ধারিত সময় কাল স্মরণ থাকে না। কারণ বাগানখানি এতই চমৎকার ও তাহাতে এতই মন মোহিত করিবার মত বিরাট বন্দোবস্ত আছে যে উহাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করুক না কেন, সেই বাগান খানি দেখিতে দেখিতে ও তাহার ভিরতকার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সম্রাটের দর্শনের নির্দ্ধারিত সময় যে কখন চলিয়া যায় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। এই প্রকারে কাহারও আর সম্রাটের নিকট যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভাবিল যে সে পূর্ব্বে গিয়া সম্রাটের সহিত দেখা করিবে, কারণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলে এবং এই আনন্দ উদ্যানের সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে নিশ্চয়ই অধিকতর আনন্দ লাভ হইবে ও হয়ত তখন তিনি এই উদ্যানের রহস্য ও কিছু বলিয়া দিতে পারিবেন।

এই গল্পটী বলিয়া সাধুবাবা বলিলেন যে এই সম্রাটই ভগবান্ আর ঐ বিচিত্র উপবন এই পার্থিব সংসার। এই গল্পের মর্ম্ম এই যে লোকে তাঁহার সৃষ্ট এই সংসারে কিছুদিনের জন্য আসিয়া ইহার বিচিত্র মনোমুগ্ধকর আকর্ষণে, বিষয়ানন্দাদিতে মোহিত হইয়া তাঁহার দিকে মনোযোগ দিবার কিছুই সময় পায় না। সংসারের তুচ্ছ বিষয়ানন্দে মোহিত হইয়া সমস্ত জীবিত কাল কাটাইয়া যায়। কিন্তু যে বুদ্ধিমান্, বিচার পরায়ণ সাধু হয় সে সংসারের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হয় না ও সে ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ বিষয়ানন্দ উপভোগে নিযুক্ত হইয়া জীবনের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য মনে করে। সে ব্যক্তি আপাতঃ মধুর তুচ্ছ

বিষয়ানন্দের মায়িক সুখে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া উচ্চতর আনন্দ লাভের জন্য সেই অপার আনন্দের উৎস, এই অপরূপ সংসার উদ্যানের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সর্ব্ব সুখের আধার সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকিবার বাসনা করে। সাধুবাবার এই গল্প বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আমরাও যদি তেমনই পূর্ব্বেই তাঁহাকে লাভ করিব ভাবি তাহা হইলে সব সহজ হইয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এই প্রকারের একটী গল্প বলিতেন। ছোট ছোট বালকগণ যখন "চোর, চোর" খেলা করে, তখন মাঝে একটী বালক "বুড়ী" ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে বালকটী যখন "বুড়ী" ছাড়িয়া দিয়া দৌড়াইয়া অন্য একটী বালককে ছুঁইতে যায় তখন অন্যান্য বালকগুলি দৌড়াইয়া আসিয়া মাঝের ঐ "বুড়ীটী" স্পর্শ করিবার চেষ্টা করে, কারণ পূর্ব্বে আসিয়া যে "বুড়ীটী" স্পর্শ করিতে পারে তাহার আর আদৌ "চোর" হইবার ভয় থাকে না। সেইরূপ যে এই সংসাররূপ গোলকধাঁধাঁর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে মনে তাঁহাকে লাভ করিবার সঙ্কল্প করে, যাহার লক্ষ্য ভগবানে, যাহার উদ্দেশ্য সৎ, তাহাকে আর সংসারের অলীক সৌন্দর্য্যে,স্বল্পকাল স্থায়ী সুখভোগে মোহিত করিতে পারেনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আর একটী উপদেশ,—'দুধ যদি জলের সহিত একত্র রাখা যায় তবে তাহা মিশিয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু ঐ দুগ্ধ যদি আগে নির্জ্জনে দৈ পাতিয়া তাহা হইতে মাখন তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই মাখন জলে ছাড়িয়া দিলে উহা আর জলের সহিত মিশিয়া যায় না। সেইরূপ আমাদের মন অপরিপক্ক অবস্থায় সংসারে থাকিলে সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মিশিয়া যায়, কিন্তু ঐ মনকে নির্জ্জন সাধন দ্বারায় মাখনরূপে পরিণত করিতে পারিলে, অর্থাৎ রূপান্তরিত ও পবিত্র ঘৃত করিতে পারিলে তখন উহা আর সংসারে থাকিলেও সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাতে মিশিয়া যাইতে পারে না। যদি কেহ সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, উহার মলিনতার দ্বারা লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, নির্জ্জন সাধন দ্বারা ভগবানের উপাসনায়, জপধ্যানে এবং ভগবানের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তবেই সে উচ্চাবস্থা লাভে সমর্থ হয়—তাহা হইলে সে সংসারের মধ্যে বাস করিলেও আর মনোহারী মায়ায় মুগ্ধ হয় না এবং তাহার আর নূতন নূতন কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই অনিত্য অসুখপূর্ণ ইহলোকে যাতায়াত যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয় না।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ৫।১০॥

অর্থাৎ—

"ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম নিষ্কাম যে কর্ম্ম-রত;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জলমত।"

তা যদি তাঁহাকেই জীব না জানিল, তাঁহার বিষয়ই যদি কিছু না শুনিল, তবে তাঁহাকে কর্ম্ম সমর্পণ করিবে কি প্রকারে? কাজেই প্রথমে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য সৎগুরুর নিকট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমে তাঁহাকে অবগত হইয়া, সর্ব্বদা মনে মনে তাঁহার স্মরণ মনন করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে পারিলে বাহিরের সামগ্রী দ্বারা মুগ্ধ বা বাহ্যিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে না, কাজেই বহু দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভে সক্ষম হয়।

ক্রমশঃ—

রাজসাহী।
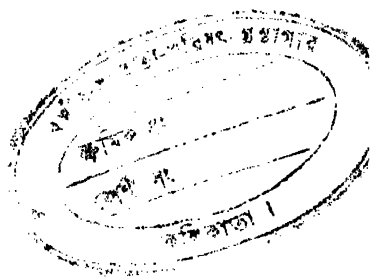
তোমায়—আমায়।

আজ কয়েকদিন হইল তুমি ঘুমাইতেছ। কেন এই কপট নিদ্রা? আর আমি? তুমি জাগিলে আমার সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে তোমার প্রকাশ দেখি। আর ঘুমাইলে আমার কোন কিছুর স্ফুরণ থাকে না। তাই জিজ্ঞাসা করি তোমার এই কপট নিদ্রা কেন? আহা! বুঝিতেছি তুমি জাগিয়া আমায় পাওনা বলিয়া তুমি কপট নিদ্রায় থাক, এই না? তোমার জাগরণে আমি তোমায় স্পর্শ পাইয়া বাহিরে সবার কাছে আমার আনন্দ ছড়াইতে ছুটিয়া যাই আর তুমি অবাক হইয়া দেখ যাহার পরশে আমি প্রাণ পাই আমি তাহার কাছে না বসিয়া, তাহার সঙ্গে কথা না কহিয়া কোথায় ভাসিতে ছুটিয়া যাই?

এই যে বাহিরে ছুটি—বাহিরে আমার কে আছে? বাহিরের লোকে এই যে চটুল-চাটু-পটু-চারু—চঞ্চল নানাপ্রকার প্রীতিকর কৌশলপূর্ণ মনোহর বাক্য আমার কর্ণে ঢালে আমি ইহার আপাতরমণীয়—পরিণামে বিষোপম প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তোমায় ছাড়িয়া অন্যের কাছে ছুটিয়া যাই বলিয়া তুমি কপটনিদ্রায় থাক—ইহা ত বুঝি। তুমি তথাপি আমায় ত্যাগ করনা—আমি কত অকৃতজ্ঞ? তোমার মত আমার কে আছে? কে এমন ভাল বাসিতে জানে? অন্তরের দেবতা তুমি! তোমার কাছে ভিতরে থাকি যখন তখন যে গ্লানিশূন্য সুখে আমি ভাসি সে সুখ ত আমায় কেহ দিতে পারে না—ইহাত তুমিই দেখাইয়া দিয়াছ! তবু আমি বাহিরে থাকি? ধিক্ আমাকে ধিক্ আমার ইন্দ্রিয় লালসায়। আহা! একি ব্যবহার আমার? তুমি আমার জন্য বসিয়া আছ আর আমি বাহিরে কোন কিছু দেখাইতে, কোনকিছু দেখিতে ছুটিতেছি। ধিক্—ধিক্!

এই করিয়া করিয়া কতজন্ম খুয়াইয়াছি। তথাপি আমার অনুতাপ হইল না। আমি আমাকে শত ধিক্কার দিয়া আবার তোমায় লইয়া থাকিতে প্রাণপণ করিব। অনেকবার মুখে ইহা বলিয়াছি কিন্তু কাজে কথা রক্ষা করিতে পারি নাই—তুমি সেজন্য আমায় অবিশ্বাস করিও না। আমি অনেকবার হারিয়াছি—তথাপি আবার চেষ্টা করিব, আবার তোমারই হইবার জন্য প্রাণপণ করিব তুমি আমার সহায় তখন হইবেই আমি জানি।

হায়! আমি কি দেখিতে বাহিরে যাই?—কি শুনিতে বাহিরে যাই? বাহিরের কেহ কি আমায় রক্ষা করিতে পারে? সেই মরণমূর্চ্ছায় তুমি না দাঁড়াইলে কে আমায় উদ্ধার করিতে পারে? তুমি ভিন্ন আমার কে আছে? কে এত ক্ষমাসার? পতিত জানিয়াও এমন পতিতপাবন আর কে আছে? কাহার রূপ, কাহার গুণ, কাহার স্বরূপ ভাবনা এত প্রীতিকর? আমাকে রক্ষা আর কে করিতে পারে?

অহো! আমি বুঝিয়াছি তুমি ভিন্ন আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই। হরি হরি তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই, যাহারা আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আমি জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, কেহই আমার পাপের অংশ লইতে পারে না —কেহ আমার পাপ ধোয়াইয়া আমাকে নির্ম্মল করিতে পারে না। তাই বলি আমার কেহ নাই।

এবার হইতে আমার প্রথম কার্য্যই হইবে আমার কেহই নাই ভাবনা করা। নিত্য অভ্যাস যদি করি তবেই বুঝিতে পারি আমার কেহ নাই। আমার কেহ নাই যখন ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভূত হইবে তখন দেখিব আমার তুমি আছ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার

গত সালের বিজয়া—

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

অসময়ে আজ কাঁদায়ে সবারে
কোথা যায় মোদের জননী।
পা দু'খানি ধরি' বলি বিনয় করি'
শুনেনা যে তবু শিবানী ॥
ঝরিছে অশ্রু সবার নয়নে,
তাতে কি মা ব্যথা বাজে না পরাণে ?
মায়ের পরাণ এত কি নিঠুর,
(বুঝি) পাষাণের মেয়ে তাই পাষাণী ॥
এলে যখন ওমা শূন্য গৃহেতে
কত সুখ, আশা জাগিল মনেতে ;
আজি কেন তবে এখনি মা যাবে
চোখে দেখার সাধ মেটেনি ॥
চারিদিকে বাজে বিদায়-বাজনা
হৃদি-বীণায় উঠে ব্যথার মূর্চ্ছণা,
তাই বলি ওমা যেওনা যেওনা
নয়নানন্দদায়িনী ॥
একান্তই যদি চলে যাবে উমা,
(মোরা) হেরিব হৃদয়ে তব মানস-প্রতিমা,
বরষের পরে যেন প্রাণ ভ'রে
(আবার দেখিতে পাই মা ভবানী ॥

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
চন্দ্রভাগ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা উপক্রমণিকা ও ১ম এবং ২য় খণ্ড একত্রে ২৲। ৩য় ভাগ ১৲।

দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্রি তত্ত্ব—

পূজাতত্ত্ব সম্বলিত—প্রথম খণ্ড—১৲।

শ্রীরামাবতার কথা—১ম ভাগ মূল্য ১৲।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাম কিঙ্কর

যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

এই পুস্তক তিনখানির অনেক অংশ "উৎসব" পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই প্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে আছে, তাহা যাঁহারা এই পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। শিব কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ত্ব এই পুস্তকে প্রকাশিত। দুর্গা ও রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আলোচনা হইয়াছে। আমরা আশা করি বৈদিক আর্য্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের আদর করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস।

সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ।

প্রথম খণ্ড মূল্য ৸৹। সচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৷৹

আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য।

শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বিএ, বিএল, প্রণীত।

উকীল—হাইকোর্ট।

বঙ্গবাসী—"প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ্য—প্রত্যেক নর নারীর পাঠ্য"।

প্রাপ্তিস্থান—

উৎসব আফিস—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও কৃষ্ণনগরে গ্রন্থকারের নিকট।

[illegible]

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল। [৮ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটার এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভায় সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

উদ্বোধন।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৩শ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল। | ৮ম সংখ্যা

ভারতের সুপুত্র ও সুকন্যা কাহারা ?

ভারতের যুবক ও যুবতী সম্প্রদায়ের নিকটে আজ নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কি তরুণ, কি প্রাচীন—স্বীকার করিয়া লইলাম—সকলেই ভারতের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন। তরুনের কার্য্যও দেখা যাইতেছে, এখন প্রাচীনের উপদেশও একবার দেখা উচিত। আমরা উভয় পথই কিছু কিছু আলোচনা করিতে যাইতেছি।

ভারত যদি একটা নূতন জাতি হইত, ভারতের সভ্যতা যদি না থাকিত, তবে আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা বলিতে শঙ্কিত হইতাম। কিন্তু ভারতের এমন এক সভ্যতা আছে যাহা পৃথিবীর কোন নবীন জাতির সভ্যতা হইতে হীন নহে। আজ ভারতের নবীন যুবক যুবতী ইহা স্বীকার করুন বা না করুন, বিজাতীয় বহু মনীষী ইহা স্বীকার করিয়াছেন, করিতেছেন; আরও দেখিলে আরও স্বীকার করিবেন। সার জন উড্রফ বিলাতের মানুষ হইয়াও "ভারত সভ্য কি না "(Is India civilized) এই সম্বন্ধে জগতের নিকটে যে পুস্তকে আপন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখাইয়া-

ছেন ভারতের সভ্যতা যাহা ছিল এখনও যাহা আছে তাহার কাছে কোন জাতির সভ্যতা এখনও দাঁড়াইতে পারেনা। এই সম্বন্ধে জার্ম্মানীর দার্শনিক সোপন হরের শেষ ইচ্ছার কথাও যুবকেরা জানেন।

ভারতের উৎকৃষ্ট সভ্যতা ছিল; ভারতের প্রাচীন আদর্শ কোনও জাতির আদর্শ অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। এখন ভারতের সুপুত্র ও সুকন্যা কাহারা এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সুপুত্র বা সুকন্যা তাঁহারাই, যাঁহারা পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির যাহা উত্তম ছিল তাহাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া যাইতে পারেন। ইঁহারাই উত্তম পুত্র কন্যা। মধ্যম পুত্র কন্যা তাঁহারাই, যাঁহারা পিতৃপুরুষের যাহা ছিল তাহা রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন। আর অধম পুত্র কন্যা তাঁহারাই, যাঁহারা পিতৃপুরুষের যাহা ছিল তাহা নষ্ট করিয়া যান।

তরুণ সম্প্রদায়ের নেতা যাঁহারা, তাঁহারা আজকালকার শিক্ষিত-শিক্ষিতা যুবক যুবতী সকলকে উপদেশ করিতেছেন, প্রাচীন আদর্শ ভজনা করিয়াই ভারতের এই দুর্গতি। প্রাচীন যাহা আছে তাহা দূর কর, করিয়া নূতন কিছু গ্রহণ কর, তবেই ভারতকে তোমরা তুলিতে পারিবে—ইহাই নবীন সম্প্রদায়ের উপদেশ।

যাঁহারা যুবক সম্প্রদায়ের জন্য নূতন ভারত গড়িতে চান, তাঁহারা যুবক যুবতী দিগকে উপদেশ দিতেছেন, যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারত ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া —ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম করিয়া-বৈরগ্যে বৈরাগ্য করিয়া পরাধীন হইয়া সকল জাতির পদদলিত হইতেছে। সমস্ত পুরাতন শিক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে, জাতিভেদ তুলিয়া দিতে হইবে, বিধবাদিগের বিবাহ দিতে হইবে, ছুঁত মার্গ দূর করিয়া দিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগের পরদা খুলিয়া দিতে হইবে, ঘোমটা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, পিতা মাতা স্বামীর প্রতি লোক দেখান ভক্তিশ্রদ্ধা দূর করিতে হইবে, বিবাহ প্রথা উলটাইয়া দিতে হইবে, যুবক যুবতীর অবাধ মিলন আনিতে হইবে। এই ভাবে ভারতকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

কে বলে সংসার দুঃখময়? প্রাচীন শিক্ষা পদদলিত করিয়া সংসারের সকল বস্তু ভোগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবির কোমসের মত বলিতে হইবে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য পুরুষের উপভোগের জন্য। স্ত্রীলোক ঘোমটা খুলিয়া সৌন্দর্য্য সকল পুরুষকে বিতরণ করিয়া সুখ পাইবে আর পুরুষ সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া দেখিয়া নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য পাইয়া আনন্দ পাইবে। ইহার উপরে

রাজনৈতিক স্বাধীনতাও আনিতে হইবে। সকল দিক দিয়া সমাজকে স্বাধীন করিতে পারিলে পরাধীনতাও পলায়ন করিবে।

একটা নূতন চাই। প্রাচীন ভাঙ্গিয়া ফেলা, আমরা যে নূতন দিতেছি তাহা দিয়া যুবক যুবতী গঠন কর ভারত স্বাধীন হইয়া যাইবে। অনেক দিন প্রাচীন আদর্শ অবলম্বনে ভারত চলিল—কিন্তু "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" ইহাই ত রহিয়া গেল। প্রাচীন আদর্শের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন চাই; আমরা নূতন দিতেছি তাই দিয়া নূতন ভারত গঠন কর। বহুজাতির সংঘর্ষণে সবই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; ভালকরিয়া সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেলি এস—সব একাকার করি এস—ইহাই ভারতের একমাত্র উদ্ধারের পথ।

আমরা ইহার সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নই। কেবল একটা কথা বলিতে চাই, ভারত ঋষিগণের যে শিক্ষা ধরিয়া চলিতেছে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—এই যে নূতন উপদেশ তোমরা দিতেছ আমরা জিজ্ঞাসা করি পুরাতন শিক্ষা কি তোমরা জানিয়াছ? কোন কালে কি জাতিভেদ, সতীত্ব, আহার, আচার, শুদ্ধি, বিবাহ, এই সমস্তের ভিতরের কথা স্থির ধীর ভাবে আলোচনা করিয়াছ? কর নাই। যদি করিতে তবে কথন বলিতেনা জগতের সবই পরিবর্ত্তিত হয়। সাহিত্য, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। যাহা সময়ের উপযোগী সেই মত চলিতে হইবে। মানুষ যদি প্রবৃত্তির তৃপ্তিতে সুখ পায় মানুষের প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপায় আনিয়া দিতে হইবে। চৈতন্য, বুদ্ধ রাম, কৃষ্ণ—এইসবে এখন হইবেনা—আমরা চাই প্রবৃত্তির সুখ-সংযমের কঠোরতা চাই না।

না হয় মানুষের প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপায় করিলে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কয়দিন তুমি সংসার ভোগ করিতে পারিবে? এই যে প্রবৃত্তি ভোগ করিয়া করিয়া জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাও, এই যে নানাবিধ রোগ, জরা, ব্যাধি আসিতেছে, ইহার মূল হইতেছে যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহাতে আসক্ত হওয়া। ঋষিগণ এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের মূলে যে এক আনন্দ-স্বরূপ-জ্ঞান স্বরূপ, অপরিবর্ত্তনীয়, সদা নূতন বস্তু আছে তাহা ধরিয়া সমাজ গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। তুমি বলিতেছ প্রাচীন আদর্শের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে কালধর্ম্মে নরনারী বহুদিন হইতে এই প্রাচীন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আজ ভারতের এই দুর্গতি। প্রাচীন আদর্শ ধরিতে পারে এই ভাবে যুবক যুবতীর হৃদয় গঠন কর, ভিতরে পবিত্র হইয়া যাও—ভগবানকে হৃদয়ে

আনয়ন কর, তোমার সকল শক্তি ফিরিয়া আসিবে। এই বিষয়ই আমরা যুক্তি ও শাস্ত্রি দিয়াই দেখাইতেছি।

(২)

এমন নরনারী কেহ কি দেখিয়াছেন, সংসার যাহাদের চিরদিন সকল সময়ে ভাল লাগে? যখন মানুষ রোগশয্যায় শায়িত হয় তখন কি সংসার ভাল লাগে, না যখন সংসারে যাহাদিগকে অতিপ্রিয় মনে করা যায় তাহাদের বিয়োগেও সংসার ভাল লগে? শেষেরদিনে যখন সকল ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইতে থাকে, যখন নিত্যনূতন ব্যাধি আক্রমণ করিতে থাকে, যখন "স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে" যখন নিজের শরীরটা পর্য্যন্ত—যে শরীর লইয়া নরনারী ধরাকে সরা মত দেখিত—শেষেরদিনে যখন সেই শরীর পর্য্যন্ত যেন আর বহন করা যায় না, তখন—যে দেশের লোকই তুমি হও না কেন—বল দেখি তখন কি তোমার সংসার ভাল লাগে? সকলকেই বলিতে হইবে—লাগেনা।

লোকে যাহা অনুভব করে তাহা দিয়া দেখা গেল সংসার ভাল লাগে না। শাস্ত্রও ইহাই বলিতেছেন। শাস্ত্র অজ্ঞাত-জ্ঞাপক। শাস্ত্র বহু জন্মের কথা জানেন তাই বলিতেছেন—

> নানা যোনি সহস্রাণি দৃষ্টা চৈব ততো ময়া।
> আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতাশ্চ বিবিধাঃ স্তনাঃ॥
> জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃপুনঃ।
> অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
> যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
> একাকী তেন দহ্যামি গতাস্তে ফলভোগিনঃ॥

কত সহস্র সহস্র যোনি দেখিলাম! কুক্কুর—শূকরাদির ভোজ্য কত খাদ্যই খাইলাম! নানা যোনিতে জন্মহেতু কত প্রকার স্তন্যদুগ্ধই পান করিলাম। কতবার জন্মিলাম, কতবার মরিলাম, আমার পুনঃপুনঃ কত জন্মজন্মান্তরই হইল! অহো! আমি দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি, উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতেছি না। প্রতিজন্মে পুত্রকলত্রাদি পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্ম্ম করিলাম। এখন আমি একাই দগ্ধ হইতেছি। যাহাদের জন্য এত

করিলাম, তাহারা ফলভোগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি কর্ত্তা সাজিয়াছিলাম, পাপ হইল আমার। অর্জ্জিত দ্রব্যের ভোক্তার আর কি হইবে ?

আহা মানুষ যদি নিজের অবস্থা ভাল করিয়া দেখে, দেখিয়া শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লয়, মিলাইয়া শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তবে মানুষ বলিতেও পারে "গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসার বর্ম্মসু" মানুষ দৃঢ়ভাবেই বলিতে পারে এই দীর্ঘ সংসার-পথে পুনঃপুনঃ যাওয়া আসা করিতে করিতে আমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি—আর যে পারি না। পুনঃপুনঃ জনম-মরণ—আবার সংসার—ক্ষণিকের জন্য ছট্‌ফট্‌ করা—আহা! আমি পুনঃপুনঃ জরামরণে বড়ই ভীত হইয়াছি—এতদিন বুঝি নাই—এখন সংসার সমস্ত আবরণ খুলিয়া আমায় দেখাইয়া দিতেছে সংসার কত ভয়ানক। এখানে কিছুই ত স্থির থাকে না। ভ্রমর যেমন মধুলোভে পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমিও কতদিন ধরিয়া ভোগের আমোদে অন্ধ হইয়া—ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া কতস্থানে আপাতরমণীয় ক্ষণবিধ্বংসি সুখের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলাম। স্বপ্নবৎ দৃশ্য-নদীতে চিত-কল্লোলধ্বনি শুনিতে শুনিতে যখন অগাধ জলে চক্রাবর্ত্তে আসিয়া পড়িলাম তখন আমার উদ্বেগ কতই বাড়িয়া উঠিল। সংসার সাগরের এই দৃশ্য-কল্লোল—এখন বুঝিতেছি—ইহা কত ভয়ানক—আহা! ইহা আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বৃষ্টি না হইলে চাতক যেমন আকুল হয় আমিও চিত্ত-বিশ্রান্তি না পাইয়া সেইরূপ ব্যাকুল হইতেছি। হায়! ভোগে আবার রমণীয়তা কি আছে ? এই আছে, এই নাই—এমন অসার আর কি আছে ? উন্মত্ত জনের মত আরও কি অসার লইয়া মজিয়া থাকিতে হইবে ?

জীবন-নদী নানাবিধ বিক্ষেপ-কল্লোলে যে সদাই আকুল। যৌবন উল্লাস এই নদীর পঙ্ক, জীবন মরণ ইহার তটভূমি, সুখ-দুঃখ ইহার তরঙ্গ। এই জীবন-নদী জরা-ধবলিমায় ফেনিলা। কত সুখ বুদবুদ্‌ এখানে উঠিতেছে। দ্রুত-আগতা জরারূপিণী বৃহৎ-বকী জীবনরূপ জম্বালে বৃহৎ শফরী ধরিতে মনস্থ করিয়া এই শরীরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। দীপশিখার মত এই জীবন সম্মুখে দেখিতে দেখিতেই নিবিয়া যায়। যায় না কি ? এই দেখি সুস্থ মানুষ পরক্ষণেই রোগ ধরিল—আর কোথায় চলিয়া গেল—আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বৃথা ক্রন্দন—বৃথা হা হুতাশ—কখন কে যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কর্ম্ম ফুরাইলেই মানুষ চলিয়া যাইবে - হৃদয় ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেও এক ক্ষণকালও অপেক্ষা করিবে না। হায়! এই জীবননদীর এই

সমস্ত লোক-ব্যবহার মূর্খদিগের প্রলাপধ্বনিরূপ জল-কলকলরবে সর্ব্বদা আকুল। রাগদ্বেষরূপ মেঘদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া জীবন-নদী ভূতলে দেহ বিস্তার করিয়া উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে। লোভ-মোহরূপ ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত তুলিয়া এই নদী শত উৎপাৎ পূর্ণ হইয়া নিরন্তর ছুটিতেছে। অহো! এই জীবন-নদী তাপত্রয়তপ্তা। কেবল শব্দ শুনিয়া লোকে ভাবে ইহা শীতল। প্রিয় পুত্র-মিত্রের যে মিলন ইহা সংসার-সাগরে জলরাশির একত্র অবস্থানের ন্যায়; এই মিলিতেছে, এই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে! পূর্ব্বপ্রাপ্ত বস্তু চলিয়া যাইতেছে, আবার অপূর্ব্ব কিছু আসিতেছে। কিছু যাক্ বা আসুক শোকে হর্ষে আর আস্থা কি থাকিবে? সকল নদীর জল গিরি মেঘাদি হইতে আইসে—আবার যায় কিন্তু এই জীবন-নদীর জলস্বরূপ এই আয়ু একবার গত হইলে আর আসে না। বিষয় অরি চতুরচোরের মত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। চোর আমাদের বিবেক হরণ করিতেছে। জাগিয়া থাকাই উচিত—ঘুমান উচিত নহে। আহার, পান অনন্ত প্রকার হইল, কত দেশবিদেশ ভ্রমণ করা হইল, অনন্ত সুখদুঃখ ভুগিলাম—আর কি অপূর্ব্ব এখানে করিবার আছে? কত ভাবইত দেখা হইল—সকল ভাবই অনিত্য বুঝিলাম। নিখিল ভোগের বস্তু উপভোগ করিয়াছি—সংসারের সকল বস্তুরই অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—এ সংসারে কোন কিছুতেই ত বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি নাই। কৈ কত স্থানে ত গিয়াছি, নিত্য অকৃত্রিম, চিরস্থায়ী কিছু কি পাইলাম? সর্ব্বত্রই সেই দারুময় বৃক্ষ, সেই মাংসময় জীব, সেই কর্দ্দমময় পৃথিবী, সেই দুঃখ, সেই অনিত্যতা—বল আশস্ত হইবার কি আছে? ধূলিরাশির মত অস্থির জীবপুঞ্জ গিরিকুক্ষি পতিত মেঘগর্ভস্থ জলের ন্যায় আসক্ত হইয়া অন্তঃপুরুষার্থ শূন্য হইয়াই মরণপ্রাপ্ত হইতেছে।

শাস্ত্র ত সংসারের এই রূপ দেখাইতেছেন। এই জগতে সমস্তই অস্থায়ী, এই জন্য অস্থায়ীকে ভোগ করিতে গিয়া বিপদে পড়িতে শাস্ত্র নিষেধ করিতেছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন অস্থায়ী বস্তুসমূহের মূলে যে স্থির, শান্ত, চিরস্থায়ী বস্তু আছে তুমি তাহাই অবলম্বন করিতে চেষ্টা কর তবেই তুমি বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে—শান্তি পাইবে। প্রাচীন যে সমাজ গড়িয়াছিলেন, সাহিত্য গড়িয়াছিলেন, সমস্তই এই চিরস্থায়ী, মহাপুরুষ ধরিয়া—আর তুমি কি ধরিতে ছুটিতেছ? তোমার লক্ষ্য যে মৃগতৃষ্ণিকার মত। তুমি যে অসত্য পথে চলিতেছ—অসত্য ধরিতে ছুটিতেছ, তুমি আপনিও মজিতেছ আর সমাজকেও মজাই-

তেছ। তুমি বলিতেছ, সমাজকে সকলদিকে স্বাধীনতা না দিলে তুমি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। আমরা আগামীবারে ইহা সমালোচনা করিব।

গান।

(বাবাজীর নিকট হইতে)

প্রাণ কাঁদে যার তরে
তারে কিসে পাব দেখা।
কোথা থাকে ধাম জানিনা
নাম শুনেচি প্রেমে মাখা॥
কত ডাকি উত্তর পাইনা
কত কাঁদি দেখা দেয় না
কাছে কাছে থাকে শুনি
স্বভাবটি তার লুকিয়ে থাকা॥
কোন দিন দেখি নাই তারে
দেখ্‌ব দেখ্‌ব ইচ্ছা করে
কাছে কাছে বেড়ায় ঘুরে
ওসে ভালবাসে দেয়না দেখা॥
গোঁসাই বলে অনন্তরে
দেখা পেলে রাখব ধরে
এই নিশানা বলিরে তোরে
ওতার বর্ণ কাল গঠন বাঁকা॥

শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র দাস।
লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ী
কাশীপুর।

শৈবাগম বা ত্রিপুরা রহস্য জ্ঞানখণ্ডে বিজ্ঞান সাধনের কিছু।

জ্ঞান সাধন হইতেছে দেবতার অনুগ্রহ। ভগবান সর্ব্বদা হৃদয়ে আছেন, আর তিনি এবং তাঁহারা, ভাবনা—অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতে ভগবৎ ভাবনা আমার রক্ষা বিধান করিতেছেন ইহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান সাধন। ইহাই সহজ ভক্তি যোগ। বিচার দ্বারাও ইহা হয়। কিন্তু বিচার কঠিন সাধনা। আমি কি এবং জগৎ কি—ইহার নিরূপনই বিচার।

অন্যপরতা ত্যাগ করিয়া হৃদিস্থ দেবতা তৎপর হওয়াই উৎকৃষ্ট সাধনা।

আত্মপরীক্ষা নিপুণ হও। স্বীয় গুণদোষের বিচারে যিনি দক্ষ, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধক।

মদিরা মত্তের যেমন কোন কিছুই মনে থাকেনা, জ্ঞানীর ব্যবহারিক অবস্থাও তাহাই।

রথের সারথি রথ চালায় বটে কিন্তু রথকে শরীর মনে করে না; সেইরূপ জ্ঞানী দেহ চালাইলেও দেহকে আমি মনে করেন না

দেহাত্মতাই জন্ম। কর্ত্তৃত্ব বাসনা হইতেছে কর্ত্তৃত্ব অভিমান। বৈরাগ্যের কারণ হইতেছে দোষ দৃষ্টি। দৃশ্যে দুঃখ বুদ্ধি দোষ দৃষ্টির ফল। দেবতা হইতেছেন ইষ্ট দেবতা, তৎপরতাই ভক্তি।

ত্রিপুরা রহস্যে—বিদ্যা গীতার কতক।

সৃষ্টি অনাদি হইলেও সৃষ্টি প্রারম্ভে ইষ্টই, অনুতনাই প্রথমে গগনাঙ্গনে শব্দরূপী হইয়া উদিত হইলেন।

সর্ব্ব জগদাকার মূর্ত্তি এই পরাচিতিই জগদ্ধাত্রী। অদ্বয় চিন্ময়ীই অনন্ত জগদাকারে স্ফুরিত হইয়াছেন। হইয়াও এই আমি আপনি আপনিই আছেন। সর্ব্বশ্রয়া সর্ব্বগতা হইয়াও ইনি কেবলা পরাচিতি। আমিই জগৎ যাত্রা প্রসারিত করিতেছি।

দুঃখ নাশ ও অভয় প্রাপ্তি এইত প্রার্থনা।

তুমিত পূর্ব্বলব্ধ ছিলেই, চিরদিন আছ, চিরদিন থাকিবে—কিন্তু এতদিন

লক্ষ্য হয় নাই। এখন তোমার কৃপায় লক্ষ্য হইতেছে। আর না ভুল হয় ইহাই তোমার কাছে প্রার্থনা।

বুদ্ধির দোষই মানুষের সর্ব্বনাশ করে।

বুদ্ধির প্রথম দোষ (১) অনাশ্বাস = শাস্ত্রে অবিশ্বাস
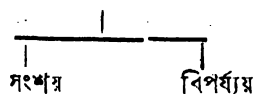
সংশয় (মোক্ষ আছে বা নাই) — বিপর্য্যয় (মোক্ষ নাই)

বুদ্ধির দ্বিতীয় দোষ (২) কাম বাসনা = বিষয়াভিলাষ।

বুদ্ধির তৃতীয় দোষ (৩) জাড্য দোষ—বুদ্ধির জড়তা—ইষ্ট স্ফুরণের অভাব।

বুদ্ধির কামবাসনাকে বৈরাগ্য দ্বারা জয় কর। বৈরাগ্য আসিবে বিষয় দোষ দর্শন দ্বারা। বিষয় দোষ দর্শন তখনই হয় যখন দৃশ্যমাত্রেই দুঃখ বুদ্ধি আইসে। দেবতা তৎপরতা দ্বারাই অন্য পরতাতে দুঃখ বুদ্ধি আসিবেই।

বুদ্ধির জাড্য দোষ আত্মদেবতার অনুগ্রহ ভিন্ন যাইবেনা। আত্ম দেবতাতে তৎপরতাই সাধনা। সর্ব্বদা দেবতা আমার হৃদয়ে আছেন, ইহার সর্ব্বদা স্মরণই সাধনা। ভ্রমর যেমন কমলের মধুপান করে সেইরূপ তুমি আমার হৃদয় কমলে বসিয়া সর্ব্বদা মধুপান করিতেছ।

ত্রিপুরারহস্যে **তত্ত্বজ্ঞান স্থিতির কিঞ্চিৎ—**

জ্ঞানীর ব্যবহারিক কার্য্য চলে কিরূপে?

ব্যবহারে জ্ঞান বাধিত হয় কিরূপে তাহাই বল। জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই ত ব্যবহার চলে। জ্ঞানের উপরেই এই দৃশ্য দর্শন ভাসিয়া কার্য্য করিতেছে। ব্যবহার যাহা তাহা সঙ্কল্প জাত। কিন্তু আত্ম স্বরূপ হইতেছে কল্পনা বর্জ্জিত। জ্ঞানের নিকটে ব্যবহার মৃত। যিনি দেবতা জানেন তাহার নিকটে ব্যবহার ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তির কখন ভ্রান্তি হয় না। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়াও ব্যবহার করা যায়।

আচ্ছা জ্ঞান হইলে ত কর্ম্ম থাকে না। জ্ঞানাগ্নিস্পর্শে কর্ম্ম তুলা থাকে কিরূপে? জ্ঞান হইলেও যে কর্ম্ম থাকে সেটা প্রারব্ধ কর্ম্ম। ভ্রম জানিয়াও যে কর্ম্ম চলে এটা প্রারব্ধ কর্ম্ম। সঞ্চিত ও ক্রিয়মান থাকে না।

জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে কোথাও জগৎ ভাসে, কোথাও ভাসিলেও মিথ্যা বোধ থাকে, কোথাও আদৌ ভাসে না। উত্তম জ্ঞানীর নিকট জগৎ নাই।

মধ্যম জ্ঞানী বা বিচারবানের নিকট জগৎ অনির্ব্বচনীয়—ছাড়িতে না পারিলেও ইহা মিথ্যা। মন্দ জ্ঞানীর জগৎ সত্য।

উত্তম জ্ঞানীর দৃশ্য দর্শন ভাসে না। ইনি যদি কর্ম্ম দেখেন তাহা দগ্ধ বস্ত্রবৎ। উত্তমজ্ঞানীর জগৎদর্শন ও সমাধি এক। কারণ সকল সময়েই ইঁহার জগৎ বিস্মরণ থাকেই। মধ্যম জ্ঞানীর নিকটে জগৎরূপ মশক দংশনে ক্লেশ হইলেও ইনি বিচলিত হন না। মন্দ জ্ঞানীর জগৎমিথ্যাটা সম্যক্ অভ্যাস হয় না, জগৎটা ভ্রমে সত্য বলিয়া বোধ হয়। কাজেই ব্যবহারে সুখ দুঃখ দ্বারা তিনি বিচলিত হয়েন। মন্দজ্ঞানীর কাছে জগৎটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। জগতে সত্যত্ব বাসনাটা যখন অভ্যাস দ্বারা মিথ্যাত্ব বাসনার কাছে পরাস্ত হয় তখন তাঁহার জগৎদর্শন হয় না। এইটি সিদ্ধি অবস্থায় হয়।

পরাচিতি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য শক্তিতে মায়িক জগৎ ভাসান। আপনাকে তিনি দুই ভাগে ভাসান। একভাবে পূর্ণ অহং থাকে অপরভাবে অহং থাকে না। অব্যক্ত যিনি তিনি অহং বর্জ্জিত। ইনি সদাশিব। অহং যুক্ত হইলেই তিনি ঈশ্বর। জগৎ ভাসিতেছে ইহার অর্থ পরাচিতিই ভাসিতেছেন। প্রতিবিম্ব ভাসিলেও তিনি যাহা, প্রতিবিম্ব না ভাসিলেও তিনি তাহাই। ইহাই স্বরূপ

আমির কথা।

তুই হস্‌না কেন, যত দুর্ব্বল
নহিরে দুর্ব্বল আমি।
তোর থাক্‌না কেন
সহস্র পাপ
তবু আমি তোর স্বামী
তোরে যত আসক্তি
রাখুক বেঁধে
তাতেই কিসের ভয়।

আমি একটী পলে
সকল বাঁধা
করে দিতে পারি ক্ষয়॥

তুই আমার পানে
থাক্‌না চেয়ে
নামটী করিয়া সার।

ওরে তোর যা চাই
কিম্বা না চাই
সবই আমার ভার॥

ওরে এমনি করে
ডাক্‌ছি আমি
তবু যাবি তুই সরে।

তুই যেথায় যাবি
যাবরে সাথে
আনবোরে তোকে ধরে॥

তুই ভোগেতে যাস
রোগের বেত্র
মার্‌ব তোর পৃষ্ঠে।

তুই অর্থের আশে
ছুটিস্ যদি
ফেলব অন্ন কষ্টে॥

তুই রমণী চাস্
বাঘিনী কোলে
ফেলে দিব তোরে আমি।

তুই কোথায় যাবি
আমায় ছেড়ে
আমি যে জগৎ স্বামী॥

তোর থাকুক পাপ
থাকুক তাপ
থাকুকনা অহঙ্কার।

তোর ময়লা মাটী
একবারেতে
করব পরিষ্কার ॥
তুই দেখনা চেয়ে
বারেক ফিরে
আছিস কার কোলে।
তুই মায়া রাণীর
বিষম চক্রে
নিজেকে গেছিস ভুলে।
আরে শোন পাগল
দেখছিস যা
সবই যে ইন্দ্রজাল !
ওরে ছিলাম আমি
থাক্‌ব আমি
আছি আমি চিরকাল।
ওরে উর্দ্ধেতে আমি
অধেতে আমি
আমি যেরে বিশ্বময়।
ওরে সবই আমি
সবই আমি
জান্‌লেই মোক্ষ হয় ॥
ওরে নামটী করে
ফেলনা মুছে
সখের কাজল তোর।
ওরে আমার মাঝে
থাক্‌না ডুবে
হইয়ে নেশায় ভোর ॥
ওরে কর্‌রে পান
নাম অমৃত
দিবা নিশি অবিরাম।

তুই কেবল বল
রসনা যোগে
রাম রাম সীতা রাম ॥

গীত।

ইনন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

ভজমন রাম নাম, জপ অবিরাম রাম,
চাহ যদি প্রাণারাম, প্রাণভরা সুখ শান্তি।
ভাব, সদা ঢল ঢল, সেই নব দুর্ব্বাদল—
শ্যামল সুবিমল, ভকত মনোহর কান্তি ॥
চঞ্চল জীবন জল, কত কাল রবে বল,
কর নাম সম্বল, দূরে যাবে দুখ ভ্রান্তি।
বহুপথ একাযাবে, সঙ্গে সাথী নাহি পাবে,
আঁধারে কাঁদিতে হবে, সেথা নাহি পান্থ পান্থী ॥
আঁধারে পাইবে আলো রামনাম হৃদে জ্বাল,
ক্লান্ত হলে কোলে তুলে, তিনি ঘুচাবেন ক্লান্তি।

শ্রীসুদর্শন চট্টোপাধ্যায়।

স্বামীর উপদেশ।

আমি যেই হইনা কেন আমি সর্ব্বদা যার সঙ্গে কথা কহিতে চাই সেই তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, সেই তুমিই আমার দয়িত আমার ঈপ্সিততম আমার স্বামী। তুমি এখন আমার প্রত্যক্ষে নাই। নাই থাক—কিন্তু তোমাকে লইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে ইহা তুমিই ধরাইয়াছ। আমি কথা কহিতে বড় ভালবাসি—দেখনা তোমার সহিত কত কথা কই। কথা কহিয়া কহিয়া আশা মিটে না। কাছে নাই তবুও কথা কই। যখন একান্তে উপাসনায় বসি তখন মন্ত্ররূপী তুমি তোমার সঙ্গে কত কথা কই—কত প্রার্থনা করি। প্রতিমন্ত্র উচ্চারণে মন্ত্রের কাছেই প্রার্থনা করি আমাকে আর বাহিরে ছাড়িয়া দিওনা ভিতরেই রাখ। কথা কহিতে কহিতে যখন আর কথা কওয়া থাকেনা তখন দেখি তোমার রূপে আটকাইয়াছি। আমি অন্য কিছু দেখিলে তোমায় দেখিনা—কিন্তু সব দেখা ছাড়িয়া যখন তোমার দিকে চাই তখন দেখি তুমি আমার দিকেই চাহিয়া আছ। আমি তোমার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া ভিতরে তোমাতেই ডুবিয়া যাই। সর্ব্বদা ত একান্ত পাই না। বাহিরে আসিয়া যখন অন্যের কথা শুনি, যখন অন্যের সঙ্গে কথা কহিতে হয় তখন তোমার আজ্ঞাই আমার মনে পড়ে। যাহার সঙ্গে যা কথা কই তুমি বলিয়াছ —সকলের মধ্যেই আমি আছি—সর্ব্ব হৃদিস্থ আমি—আত্মা কোথায় নাই বল —যখন কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে তখন মনে রাখিও আমার সঙ্গেই কথা কহিতেছ, লোকে যা বলে বলুক—তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ ইহা যখন মনে রাখিতে পারিবে তখন তোমার কথা কওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে—তুমি যে দিকেই চাহিয়া থাকনা কেন দেখিবে—তুমি আমার দিকেই চাহিয়া আছ— দেখিতে দেখিতে ভিতরে আমাকে দেখিতে দেখিতে দেখিতেছ আমি তোমার দিকে চাহিয়া আছি—আর তুমি আমাতেই ডুবিয়া রহিয়াছ। যখন ইহা ভুলিয়া বাহিরের লোক জন দেখি, বৃক্ষ লতা দেখি পাখী আকাশ দেখি, তখন আমার ব্যভিচার হয়। তোমাকে ভুলিয়া কিছু করিলেই ব্যভিচার, তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেই ব্যভিচার। তুমি বলিয়াছ যতদিন সাধনা অবস্থা ততদিন কখন কখন ইহা ভুল হইবে তখন আবার স্মরণ কর—

এই ভাবে স্মরণ অভ্যাস করিতে করিতে যখন একবারও ভুল হইবে না। তখন সিদ্ধাবস্থা।

আহা! তোমার উপদেশ বুঝিতে পারিলে কত মধুর আবার করিতে পারিলে কত মধুরতম। তুমি যে বলিয়াছ যদি কথা কহিতে হয় আমার সঙ্গেই কথা কও, দেখিতে হয় আমাকেই দেখ, কথা শুনিতে হয় আমি ভিতরে থাকিয়া কথা কহিতেছি মনে রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাহিরের লোক জন, বৃক্ষলতা, আকাশ বায়ু ভুলিয়া আমিই আছি আমাকে দেখ আমার সঙ্গে কথা কও, আমি কথা কহিতেছি শ্রবণ কর, কথা শুনিতে শুনিতে কথা ফুরাইয়া আমাকেই দেখ—আবার দেখিতে দেখিতে দেখা শুনা শেষ করিয়া আমার সঙ্গে মিশিয়া আমি হইয়া স্থিতি লাভ কর—ইহাই সিদ্ধি। যতদিন ইহার চেষ্টা করিতেছ ততদিন সাধনা। সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থাকাই আমার সাধনা। আমি চেষ্টা করি—এখনও হইতেছে না কেন বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইতে তুমি নিষেধ করিয়াছ—বলিয়াছ "কর্ম্মণ্যেবাধিকার স্তে মা ফলেষু কদাচন" কর্ম্মেই আমার অধিকার—কর্ম্মফলে নহে—আমি এই মনে করিয়া স্মরণানন্দই অভ্যাস করি, আমার সিদ্ধি তোমার হাতে-তোমার যখন ইচ্ছা হইবে দিও—আমার কর্ম্ম আমার কর্ম্মানন্দ আমাকে দিয়া করাইয়া লইও —আমি কেবল পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াই যাইব।

একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি তুহি এত রহস্য কর কি করে? এক হইয়া আর সাজিয়া একি রঙ্গ তোমার? যা আছ তাই আছ তবু এত সাজই বা কি করে আর কিছুই করনা তবু এত কর কি করে? তা যাই কর আর যাই সাজ তুমি যাহা বলিয়াছ তাই বলিয়া তোমায় নমোনমঃ করায় যে এত সুখ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। সত্যই—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

অগ্নিতে তুমি, জলে তুমি, বিশ্বে তুমি, ত্রিভুবনে তুমিই প্রবেশ করিয়া আছ। ব্রীহি যব—সব ওষধীতে তুমি, অশ্বথ বট—সকল বনস্পতিতে তুমি—তুমিই আমার দেবতা, তোমাকে নমোনমঃ করি। আবার—

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপ স্তৎ প্রজাপতিঃ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো বিশ্বতোমুখঃ।

সবার হইয়া ভিতরে আছ আবার কিন্তু তুমিই অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু, তুমিই চন্দ্রমা, তুমিই শুক্র-ধাতু, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ।

তুমি স্ত্রীলোক, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী; তুমি বৃদ্ধ হইয়া জীর্ণদণ্ড লইয়া চলিতেছ—এটা তোমার বঞ্চনা। বিশ্বতোমুখ তুমি বিশ্বের সকল বস্তুর মুখে তুমিই কথা কও তুমিই হাঁস, তুমিই কাঁদ, তুমি আবার জন্ম ও লইয়াছ। হরি হরি একি রঙ্গ তোমার?

তুমি, তুমি, তুমি—সব তুমি, ভিতরে বাহিরে তুমি। এই তুমি কে শাস্ত্র মুখে, গুরুমুখে শুনিয়া, এই তুমিই আমার আত্মা সবার আত্মা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ কথা কহিয়া কহিয়া সমাধি আনিতে পারে তবেই সিদ্ধি লাভ হয়—ইহার জন্য একনিষ্ঠ হইবার কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিবার চেষ্টাই সাধনা।

চিরদুর্ল্লভ।

আমার কল্পলোকের ছবির মত
ফুটেছ তুমি কোন আকাশে স্বপ্নালোকে মম!
বিচিত্র তোমার রহস্য চিত্রখানি
নিতুই নব লীলায় জাগায় বিস্ময় ঘন।
যতই তোমায় নিকট বলে পাই
ততই দেখি তোমার অন্তনাই—অন্তনাই;
মিছেই চলি আমি তোমারে সন্ধানি,
আমার জনম খুঁজে ও পাওয়ার শেষ নাই।
যত দেখি প্রিয়, তত দেখি সাধি,
একিএ পিয়াসা! পলকপলে বাড়ায় রাগে!
নব জীবনের আলো ফুটায়ে চোখে,
চির বিচিত্র! বিচিত্র সাজিয়ে দাঁড়ালে আগে।
দুঃখ সুখের বিচিত্র বাঁধন দিয়ে,
হেথায় আমায় বৃথা টানে ভুলাতে ছলে,
তোমার মিলনডোরে বেঁধেছ যারে,
হাঁসি কান্নার ঝুটো মতি সে না, আমার বলে॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

দশমস্পন্দন

ওরে তুই নাম কর—

না আমি আর তোমার নাম করবনা, নামকরে যদি পশুত্ব না যায় সে নাম করে ফল কি? নাম কত করলাম তথাপি কৈ মানুষ হ'তে পারলাম না ত, বৈরাগ্য এলনা, ভোগ প্রবণতা গেল না, তবে আর নাম করে কি হবে, নামে কাজ সাধুদের হয়, নামে কাজ জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণের হয়, আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের কিছু হয় না ও তোমার বৃথা স্তোক বাক্য নামে দুঃখ শান্তি হবে, আর কবে হবে, দিন দিন দিন চলে যাচ্ছে এখনও আমি ঠিক তোমার হ'তে পারলাম না। পতিত পাবন, পাতকী তারণ, দীনবন্ধু ও সব নাম গুলি মিথ্যা, তুমি ভক্তের কল্পতরু, পাপীর কেহ নও, যদি পাপীর প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র দয়া থাকৃত তা'হলে তুমি আমার সমস্ত বন্ধন মোচন করে দিয়ে তোমার করে নিতে। তোমার দয়া হ'লনা তাই আজ মা ভাগীরথীর আশ্রয়ে এসেছি, মা যদি অভাগা সন্তানকে দয়া-করে কোলে তুলে নেন। তুমি বড় কঠিন পাষাণ দিয়ে তোমার হৃদয় তৈরী, পাপীর ডাক তোমার হৃদয়স্পর্শ করতে পারে না।

আই নাকি হাঁরে তোর মা ভাগীরথী কে?

ওমা তাওত তোমারই কীর্ত্তি—ও-হরি যেখানে যাই সেখানেই তুমি।

তুই কি নামে বিশ্বাস হারালি?

যাও যাও তোমার সোহাগ করতে হবেনা, তুমি যে কেমন লোক এবার বেশ বুঝে নিয়েছি।

ও তুই কি বলছিস তুই কি নামের প্রতাপ ভুলে গেলি।

নাম্নোহস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥

বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণ

তত পাপ পাপী করতে পারে না যত পাপ আমার নাম কীর্ত্তনে নষ্ট হয়। সদাসর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন কর পাপ বা পাপ প্রবৃত্তি থাকবে, [illegible] মাঝে মাঝে যদি

বিশ্রাম দিস্ সেই রন্ধ্রে ভোগ প্রবৃত্তি প্রবেশ করে তোকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোগে ডুবিয়ে দেবে। সাবধান কিছুতে নাম বন্ধ কর্‌বি না। দেখ কোটি কোটি জন্মের ভোগের সংস্কার তোকে ভোগের দিকে টানছে, তুই যদি প্রবল পুরুষার্থ না করিস্ তা'হলে স্থির হ'তে কি করে পারবি। নাম করে যেমন আনন্দ হয় অমনি নাম ছেড়ে অন্য কথা বলিস্, আবার যখন জ্বালা ধরে রাম রাম করিস্ তা করলে আমায় ধরে রাখ্‌তে পার্‌বি কেন? আমায় যদি বেঁধেরাখ্‌তে চাস্ অবিচ্ছিন্ন ভাবে নাম কর। পাপ আছে তাতেই বা ভয় কি তুই কি শুনিস্ নাই।

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগজংমানস মেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌগোবিন্দ কীর্ত্তনম॥

স্কন্দপুরান—

এমন কোন কর্ম্মজাত, বাগজ অথবা মানস পাপ নাই, যে পাপ এই কলি যুগে নাম কীর্ত্তনের দ্বারা নষ্ট না হয়। তবে তুই কেন ভীত হচ্ছিস্, কেবল নাম কর যাবৎ স্থির হ'তে না পারিস তাবৎ নামকর নিশ্চয়ই স্থির হতে পার্‌বি, নিশ্চয়ই তোর সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হ'বে।

দেখ্ একটি লৌহ পিণ্ডকে আগুণে যতক্ষণ রাখা যায়, তাহা ততক্ষণ আগুণের মত থাকে, তার দাহিকা শক্তি জন্মায় তারপর তাকে আগুণ হ'তে তুলে নিলে কিছুক্ষণ পরে লৌহ পিণ্ডের আর কোন শক্তিই থাকে না, সে যে লৌহ সেই লৌহই হ'য়ে যায়। শত শত জন্মের কর্ম্ম দোষে তোর মন লৌহের মত কঠিন হ'য়ে গেছে, যে টুকু সময় তুই আমার নাম রূপ অগ্নিতে তোর মন রূপ লৌহকে ফেলে রাখ্‌বি ততটুকু সময় সে অগ্নি হয়েই থাক্‌বে তখন তার বিশ্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস কর্‌বার শক্তি আস্‌বে। তারপর তুই যখন নাম ছেড়ে চুপ করে থাক্‌ব অমনি ভোগের বাতাস লেগে তোর মন শীতল হয়ে গিয়ে যে লৌহ সেই লৌহই হয়ে যাবে। তাই বল্‌ছি তোর মনকে আর নাম আগুণ হতে তুলিস্ না, সে আগুণই হয়ে থাক্, এখানকার বাতাস বড় দুষ্ট হয়ে গেছে বুঝ্‌লি।

আচ্ছা কত দিন তোমার নাম আগুণে মনকে ফেলে রাখতে হবে?

তুলে কাজ কি—অথবা যতদিন পর্য্যন্ত মনরূপ লৌহ খাঁটী না হয় ততদিন নামরূপ অগ্নিতে ফেলে রাখতে হবে, যেদিন তার ময়লা অসারাংশ সব দূর হয়ে

সে ধাতু লৌহে পরিণত হবে সেদিন একজন ভাল কামার দিয়ে একখানি তরবারি তৈরি করে নিস্, সেই আত্মধ্যান রূপ তরবারি দিয়ে তোর অহংতা মমতারূপ দুশ্ছেদ্য রজ্জুদুগাছা কেটে ফেলিস্ মুক্ত হয়ে যাবি, তোতে আমাতে চির মিলন হবে বুঝ্লি? নামকর পাপ কতক্ষণ থাকবে।

শ্বাদোঽপি নহি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ।
তাবন্তি যাবতী শক্তির্বিষ্ণো নাম্নোঽশুভক্ষয়ে॥—ইতিহাসোত্তম।

কুকুর ভোজি চণ্ডালও তত পাপ যত্ন করে কর্তে পারে না যত পাপ নাশ কর্বার শক্তি আমার নামের আছে। তুইকি সব ভুলে যাচ্ছিস্? ওকিছু নয় ও বিক্ষেপ "মাশুচ" নাম কর নাম কর সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তি রোগ-শোক কোন দিকে লক্ষ্য করিস্ না কেবল নাম করে যা আমার আজ্ঞা জেনে নাম করে যা পাপ - পাপ, ওরে নাম কর্তে কর্তে তুইই থাক্বিনা তা তোর পাপ; চালাও নাম, উঠ্তে বস্তে খেতে শুতে অবিরাম রাম রাম কর।

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্॥
ন নাম সদৃশ স্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥ — আদি পুরাণ।

বুঝ্লি ত নামের প্রতাপ বুঝলি ত?

বেশত তুমি, কেবল সরে যাবে, দেখ তুমি সরে গেলে আমি কেমন হ'য়ে যাই, আমার যেন সব ফাঁকা হয়ে যায়, তাই কত কথা বলে ফেলি. তুমি যেন রাগ ক'রো না।

আমি খুব রাগ কর্বো তুই যদি নাম করা বন্ধ করিস্।

না না এই নাম করছি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ শান্তি।

ধ্বংসের নিদান ও শাস্ত্রমত।

মনুসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আছে, ঋষিগণ মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্ম মনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥

যথোক্ত স্বধর্ম্ম পালনশীল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কেন মৃত্যুর অধীন হইবেন? উত্তরে ভৃগু বলিলেন।

অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যু র্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

"বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অলস হইলে এবং দূষিত অন্ন ভোজন করিলে—মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণ-জিঘাংসা করিয়া থাকে"।* ইহা বলিয়াই ভৃগু কি কি জিনিস অভক্ষ্য তাহা বিস্তরশঃ বিবৃত করিলেন। অর্থাৎ মৃত্যুর নিদানের সর্ব্বশেষ 'অন্নদোষ' বিষয়েই উপদেশ দিলেন।

আলস্য যে অশেষ দোষের আকর তাহা মোটা কথা—এবং ঐ যে বেদের অনভ্যাস বা আচার বর্জ্জন, ইহারও মূলে অনেক সময় আলস্যকেই দেখা যায়—অবশ্য আলস্য ছাড়াও বেদত্যাগ ও সদাচার পরিত্যাগের অপর অনেক কারণ আছে, যথা 'মোহ'। আচার ও বেদাভ্যাস সম্বন্ধে পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে (প্রথম চারি অধ্যায়ে) যথেষ্ট বলা হইয়াছে।

অপিচ এস্থলে যে প্রশ্ন রহিয়াছে তাহাতেও দেখা যায় 'অন্নদোষ' সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে এস্থলে জিজ্ঞাসা রহিয়াছে। কেননা বলা হইয়াছে—'স্বধর্ম্ম মনু-তিষ্ঠতাং'—যাঁহারা স্বকীয় আচার ধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন—'বেদ শাস্ত্রবিদাং'—যাঁহারা (সম্যক্ অভ্যাস হেতু) বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ

---

* মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় কৃত অনুবাদ (বঙ্গবাসীর প্রকাশিত মনুসংহিতা—১২৯ পৃষ্ঠা)।

তাঁহারাও কেন মৃত্যুবশবর্ত্তী হন্। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রথম দুই কারণ খাটে না—আমার তৃতীয় কারণ (আলস্য) ও তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটেনা—ঐ দুই বিশেষণেই প্রতীত হইতেছে যে তাঁহারা নিরালস্য হইয়াই বেদাধ্যায়ণ ও আচারানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব মহর্ষি এস্থলে চতুর্থ কারণের (অন্নদোষের) কথাই বলিয়াছেন।

পরন্তু আমাদের সম্বন্ধে সকলগুলিই খাটে—আমরা বেদশাস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়াছি—আচার পালনে স্বতঃ পরাঙ্মুখ—অলসতা বশতঃ যাগযজ্ঞাদি তীর্থ ভ্রমণাদি কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিনা—এবং কুশিক্ষা বশতঃ খাদ্যখাদ্য বিচার বিমুখ হইয়া, যাই পাই তাই খাইয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছি।

প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি—অনভ্যাসেন 'বেদানাং' এস্থলে 'বেদ' শব্দ উপলক্ষণ মাত্র—শাস্ত্র মাত্রই এস্থলে উদ্দিষ্ট। কেননা সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই বেদ মূলক। প্রথমতঃ শাস্ত্রাধ্যায়ন করা চাই—শাস্ত্র পড়িয়াই সদাচার ও অসদাচার জানিতে পারা যায়; এবং তাহার জ্ঞান হইলেই অসদাচার পরিহার পূর্ব্বক সদাচার পরিগ্রহ করা সম্ভাব্য হয়। এখন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে শাস্ত্র পড়া কেবল কতিপয় টোলের পড়ুয়া ব্রাহ্মণগণেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আজকালকার শিক্ষিতম্মন্য যাঁহারা তাঁহারা যাহা কিছু লেখাপড়া ইংরেজীতেই শিখেন—বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে সংস্কৃত সামান্য ভাবে যাহা শিখেন তাহাও চর্চ্চার অভাবে ভুলিয়াই যান—যদিবা কিছু চর্চ্চা করেন—তাহাও প্রায়শঃ কাব্যনাটক আলোচনারই পর্য্যবসিত হয়। যদিইবা কদাচিৎ কেহ গবেষণার অনুরোধে বেদসংহিতা পূরাণেতিহাসের আলোচনা করেন—তাহাও স্বীয় গবেষণার বিষয়ের গণ্ডীমধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন—ঈদৃশ লোকের সংখ্যা অতি কম। স্তনে মুখ দিলেও জলৌকা রক্তই টানিয়া নেয়—ও স্তনবতীর ক্লেশোৎপাদন করে—কিন্তু শিশু স্তনে মুখ দিয়া দুগ্ধই আকর্ষণ পূর্ব্বক পান করিয়া তৃপ্ত হয় ও পুষ্টিলাভ করে—তাহাতে জননীও সুখানুভব করেন। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির হাতে পড়িলে শ্রুতি জননীও নাকি ভীতা হইয়া ভাবেন—"মাময়ং প্রহরে দিতি।"

কেন এইরূপ হয়? আবহমান কাল হইতে শাস্ত্রে বিশ্বাস সম্পন্ন হিন্দুদের সন্তানসন্ততি আজ নিজস্ব শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইতেছে! ইহার কারণ আর কিছু নয়—আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল। আমরা অর্থকরী ইংরেজী বিদ্যায় ছেলেটিকে কৃতী করিবার জন্য বাল্যকালেই পাঠাশালায় পাঠাই—যেখানে

ইংরেজীর অনুবাদ বাঙ্গালা পুস্তক পঠিত হয়। কোনও ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না—এই নীতিতে এমন সব পুস্তক পড়ান হয় যাহাতে ছেলেদের পৈতৃক ধর্ম্মের কোনও কথাই থাকেনা। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানী ভাবের পরিপোষক বহু কথা শিখিয়া নেয়—সেগুলি আপাত মনোরম হইলেও সনাতন ধর্ম্ম সমাজ নীতির, প্রতিকূল--যথা সকল মনুষ্যই* সমান—নর-নারীতে কোন ভেদ নাই ইত্যাদি। অথচ আমরা খবর রাখিনা—ছেলে কি শিখিতেছে—ঘরে ছেলেদের ধর্ম্মাচরণের কোন ব্যবস্থা করি না—যাহা করিলে হয়তো বিদ্যালয়ের অপর শিক্ষার প্রতিকার অনেকটা হইত। এমন কি ব্রাহ্মণের ছেলে—সন্ধ্যা করে কিনা সেই খবর হয়তো রাখা হয় না—পাস্ যাতে ভাল করিয়া হয় সেই বিষয়ে অবশ্যই খুব দৃষ্টি রাখা হয়।

তারপর 'আচারস্য বর্জ্জনাৎ'—আমাদের জাতির ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইয়েছে। শাস্ত্রে যখন শ্রদ্ধা নাই—তখন তদ্বিহিত সদাচারের প্রতি শ্রদ্ধা কিরূপে থাকিতে পারে? মূলে জলসেক না হইলে শাখাপল্লবের শ্রীসম্পাদন সুদূর পরাহত। আমাদের চাকরী জীবন বা ছাত্রজীবন এখন যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত তাহাতেও সদাচারানুষ্ঠানের হানি হইতেছে। পূর্ব্বে ছিল প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে টোল মণ্ডবে পাঠ না বলিত, রাজকার্য্যও প্রাতে অপরাহ্ণে পরিচালিত হইত। লোকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া যাইত—ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে যাইত। তথা হইতে আসিয়া স্নান আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক আহার তৃপ্তির সহিত করিয়া একটু বিশ্রাম করিত। তার পর বৈকালে পুনরায় কার্য্যস্থলে বা বিদ্যালয়ে যাইত। এখন সাহেবদের খাইবার সময় ১০টা, তাই সাহেবেরা যথা সময়ে খাইয়া এগারটায় স্বকীয় কার্য্যে হাজির হইতে পারেন—তার পর বেলা ৪টা ৫টায় টিফিন খাইতে হয়—তখন কাজকর্ম্ম সারিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক জলযোগ করেন। তাহাতেই নিয়ম হইয়াছে ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত স্কুল কলেজে কাজ হইবে—এবং ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আপিস আদালতের কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

---

* পরমার্থতঃ এসব ঠিক্ হইতে পারে—কিন্তু নিম্নাধিকারী বালকের এ সকল কথায় ভ্রান্তি জন্মিতে পারে—আচারানুষ্ঠানে অধিকারী ভেদে যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের কোথায়?

ইহাতে ফল হইয়াছে—'নৈকাদিত্যে দ্বিভোজনম্' এই বিধি রদ হইয়াছে ১০টার সময়ে তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া সকলকেই কাজে কর্ম্মে বা বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে। একাধি ক্রমে ৫।৬ ঘণ্টা কাজ করিবার পর ক্ষুধা বোধ হওয়া স্বাভাবিক তাই ৪টা ৫টার সময় আফিসে সকলকেই কিছু আহার করিতে হয়। অতএব দিবাভাগে দুইবার খাইতে বাধ্য হয়। তার পর প্রাতঃসন্ধ্যা নিয়ম মতে করা যায় বটে কিন্তু মধ্যাহ্নকৃত্য ঐ প্রাতঃ সময়েই সারিয়া ফেলিতে হয়। আবার বাজার হাট করার পর পাককার্য্য তাড়াতাড়ি সম্পাদন করিতে হয়—ঐ আধ সিদ্ধ ভাত তরকারি তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিতে হয়—এবং তার পর স্কুল বা কাচারিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে হয়। খাইবার পর বিশ্রামের কথা তো মোটেই অসম্ভব। আহারের পর দ্রুতবেগে পথ চলিলে ফল হয় মৃত্যু—'মৃত্যু র্ধাবতি ধাবতঃ'। যাহা হউক এভাবে আহারাদি করার ফলে ছেলেদের অজীর্ণরোগ জন্মে—সারাজীবন তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

সদাচারের অঙ্গীভূত বারমাসের তের পার্ব্বন, পূজা, ব্রত ইত্যাদি সমস্তই প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে অনুষ্ঠেয়। দশটার মধ্যে উদর পূর্ত্তির অনুরোধে ঐ সকল অনুষ্ঠানের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। স্কুল, কলেজ, আফিস, আদালতে ছত্রিশ জাতি একত্রে গা ঘেসিয়া বসিতেছে—ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে হিন্দু-মোসলমানে সংস্পর্শ ঘটিতেছে। রেলে ষ্টীমারেও তাদৃশ গাত্রসংস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী। আবার লেখা পড়া ও চাকরী ব্যবসায়াদিতে লোকেরা সমাজ ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছে ইহাতে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ—সদাচার মূলক সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান ক্রমশঃ বিরল হইতেছে—ছেলে পিলেরা দেখিয়া শিখিবার সুযোগ সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইতেছে।

এদিকে প্রভুরূপে ইংরেজ আজ জনতার শীর্ষদেশে অবস্থিত—যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তাদবেতরোজনঃ—তাঁহার দেখাদেখি লোকেরা আপন পিতৃ-পিতামহা-চরিত আচার ব্যবহার ছাড়িয়া ফেরঙ্গ ফেসান ধরিতেছে—শিখা রাখিতে লজ্জা বোধ করে—অথচ নানা ছাঁদে গোঁফ ছাটিতে উচ্চাবচ ভাবে কেশ বপনে—সংকোচ বোধ করিতেছে না। এইভাবে আচার বর্জ্জন করিয়া আমরা ফতুর হইতেছি।

আলস্য—আমরা যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হই সে বিষয়ে আলোচনা বাহুল্য মনে করি কেননা ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত বিষয়। সদাচারের ব্যাঘাতও অনেক

সময় আলস্য হইতেই ঘটে। অনলস প্রাতরুত্থায়ী কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি বিদ্যালয় বা আফিস প্রভৃতিতে কাজ করিলেও শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদি যথাসম্ভব সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন। এমনও দেখা যায় সরকারী কলেজে কাজ করেন—এমন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক যথা সময়ে স্বীয় কার্য্যে হাজির হইতে পারেন।

'অন্নাদাৎ ক্ষৎ'—আমরা যে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজকাল যে সকল শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অনধিকারী ধর্ম্মবক্তা সাজিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের সম্পর্ক নাই এরূপ বলেন—তাহাতে যে সমাজের কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা ভূয়োভূয়ঃ নানা প্রবন্ধে বলিয়াছি। ফলতঃ ধর্ম্মের সঙ্গে যখন শরীর ও মনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিয়াছে তখন যাহার দ্বারা শরীর ও মনের গঠন ও পুষ্টি হয় তাহার অর্থাৎ আহারের বৈধাবৈধত্বের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিবে না—ইহা বড়ই বিচিত্র কথা।

আহার শুদ্ধির কথা আর্য্যশাস্ত্রে ভুরিশঃ রহিয়াছে—কিন্তু ঐ যে ধর্ম্মের সঙ্গে আহারের সম্পর্ক নাই কথাটা ইংরেজের মুখেই বোধ হয় প্রথম শুনা গিয়াছে। আর আমাদের যেন দস্তুর ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া ইংরেজের বাক্যই প্রমাণ ভাবিয়া প্রচার করিতেছি—তাহাতে শাস্ত্রকারের উক্তিই মনে পড়ে—

আজন্মনঃ পাঠমৃশিক্ষিতো য
স্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পবাতি সন্ধানমধীয়তে যে
বিদ্যে তি তে সন্তু কিলস্তবাচঃ॥

এমন না হইলে কি আর আমাদের ধ্বংশের পথ প্রশস্ত হয়?

প্রশ্ন হইতে পারে—ইউরোপীয়ান রাজ্যে খাদ্যাখাদ্য মানেনা—উহারা ধ্বংশের দিকে চলিয়াছে কি? উহার উত্তর এই যে সাহেবেরা মুখে যাহাই বলেননা কেন আহারের কাছে বিচার খুবই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যাহা জাতীয় খাদ্য—তাহা ছাড়িয়া বিজাতীয় খাদ্য কখনও গ্রহণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা জাতীয় খাদ্যও এদেশে আসিয়া কিছুটা সংযত ভাবে ব্যবহার

করেন—আমি জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজকে বলিতে শুনিয়াছি, যে তাঁহারা এদেশে থাকা সময়ে 'বীফ' খুব কম ব্যবহার করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহাদের সমনিষ্ঠতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকে নজর খুবই অধিক—-আবার যে সে স্থলে আহার গ্রহণে বিশেষ সাবধানতাও পরিদৃষ্ট হয়। কোনও সাহেব মোফস্বলে এক জমিদার বাড়ীতে আহারার্থ আমন্ত্রিত হইয়া যখন দেখিলেন ঐ স্থানে একটি কালাজ্বরের রোগী রহিয়াছে—তখন একটা ছল করিয়া সেইখানে আহার না করিয়াই চলিয়া আইসেন এই ব্যাপারের আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

আমরা সাহেবদের অসদ্গুণের অনুকরণ করিয়া—অবিচারীত ভাবে তাঁহারা যাহা করেন—না বুঝিয়া তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকি।

কলিকাতা প্রভৃতি সহরে বিশেষতঃ আহার বিষয়ে বহু বিচার উঠিয়া যাওয়াতে, কিরূপ অনিষ্ট ঘঠিতেছে তাহার একটা মস্ত প্রমাণ কলিকাতার ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—উহাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের শরীরেরই যক্ষার বীজাণু পাওয়া গিয়াছে।

যে সে জিনিষ খাইতে নাই—যার তার হাতে খাইতে নাই—যার তার ছোঁয়া খাইতে নাই এসব যাহারা মানে তাঁহাদের শরীরে ঐরূপ রোগ বীজাণু সংক্রামিত না হইবারই কথা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা ঐরূপ বহু বিচার করিয়া চলেন তাঁহাদের শরীরের কর্ম্মপটুতা ও নীরোগতা তাঁহাদের দীর্ঘজীবত্ব লক্ষ্যের বিষয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বেদমূলক শাস্ত্রাধ্যয়নে যে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে—তদনুযায়ী আচরণ অনলস ভাবে করিয়া আহার বিহারে * সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক চলিলে দীর্ঘজীবি হওয়া যায়—বিপরীত আচরণে অকাল মৃত্যুই পরিণাম। ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তি সম্বন্ধে যে কথা সমষ্টি ভাবে জাতি সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোয্য। হিন্দুজাতি "ধ্বংশোন্মুখ" একথা ব্যাপদেশে শাস্ত্রাচার পালনের দিকে বাধ্য না করিয়া যৌবন বিবাহ প্রবর্ত্তন কর—বিধবা বিবাহ

---

* স্ত্রীসহবাস বিষয়ক শাস্ত্রাদেশ অবহেলা করিয়া তদ্বিষয়ে সংযমের অভাবেও ধ্বংশের পথ উন্মুক্ত হয়।

দেও, শুদ্ধি দ্বারা মোসলমানকে হিন্দু কর * ইত্যাদি কথাই সংস্কারগণের জল্পনার বিষয় হইয়াছে। এভাবে লোকসংখ্যা কিঞ্চিৎ বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুজাতি "হিন্দুত্ব" বিহীন হইয়া পড়িলে—কালে হিন্দু নামও বিনষ্ট হইবারই সম্ভাবনা—ইহাতে কালে যদি সকলে একজাতি হয়—তবে তাহা 'হিন্দু' হইবে না। হয়তো মোসলমান হইবারই পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। যদ্বিষেম নশিস্থিতম্।

---

* তোমরা যদি উদার হইয়া ব্রাহ্ম বৌদ্ধ ইহাদিগকে "হিন্দু" বলিতে পার। তবে মোসলমানকে 'মহম্মদপন্থী হিন্দু রোমান্‌কে 'যিশুপন্থী হিন্দু এইরূপ মনে করিলেই শুদ্ধির প্রয়োজনই হয় না। আমার তো বোধ হয় শুদ্ধি দ্বারা মোসলমান ব্রাহ্মণকে হিন্দু করিতে যাইয়া তাহাদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র—উহারা আরো জোরের সহিত হিন্দুকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে হিন্দুর সংখ্যা ভবিষ্যতে আরো কমিবে।

শ্রীনাথ নাথ দেবশর্ম্মণঃ।

গীতার বিষয় নির্ঘণ্ট।

আ

বিষয়	পৃষ্ঠা

"বদরিপথে।"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১ই বৈশাখ শনিবার প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া সন্ধ্যাক্রিয়াদি করিতে আমরা ঝরণার ধারে আসিয়া বসিলাম। বড় ভাল লাগিতেছিল সেই স্নিগ্ধ ঝরণার বারি প্রবাহের মধ্যে খণ্ড খণ্ড প্রস্তরাসনে বসিয়া শান্ত নীরবতায় মগ্ন হইয়া দেহ মনকে ভগবানের শ্রীচরণে একাগ্র করিতে। স্থানের সৌন্দর্য্য সকলের চিত্তকেই বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিল। হিমগিরির মনোহর ক্রোড়ে কত শান্তির আবাস রচিত; কার লক্ষ্যে কতটুকু ভাসে কেইবা কতটুকু উপভোগ করিতে পারে? যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র গ্রহণে প্রকৃতির এত অপূর্ব্ব মোহনসজ্জা—ভাবেরউৎস পরিলক্ষিত হয়, না জানি সে মহান বারিধির মধ্যে অবগাহন করিলে কত রত্নের মনিময় ঝলকে—সৌন্দর্য্য খনির রসের প্রবাহে অন্তর শীতলতায় নিমজ্জিত করিয়া দেয়, যে অসীম ভূমানন্দ পানে আর কোন লাভকেই বেশী বলিয়া মনে হয় না। আমি "ল"—"ম"—তিনজনে যেখানটীতে বসিয়া ছিলাম সে স্থানটীর শোভা বড় সুন্দর। দেহের মধ্যে যেমন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীর অপূর্ব্ব মিলন, অতি সুন্দর সেইরূপ বড় বড় তিনটী বৃক্ষ জড়াজড়ি করিয়া যেন উপরে সহস্রদলকমলের ন্যায় ছত্রাকার হইয়া আচ্ছাদন করিয়া আছে, তার তলে এক একজন এক একটী উপলাসনে আপন আপন কর্ম্ম করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল বুঝি—এইত স্থান সংযোগ সবই সে মিলাইয়া দিয়াছে কিন্তু কই সে কঠোর সংযম তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ? সাধনার সবই আছে কিন্তু কই সে তীব্র অনুরাগ কোথায়? কিরূপে মিলিবে? সেই প্রাণ লইয়া যদি তোমার চরণ দর্শনে আসিতাম তবে কি তুমি তাহার উপায় করিয়া দিতে না, না সে সুযোগের অভাব হইত? বৈরাগ্যের উগ্র দহনে যার অন্তর জ্বলিয়া যায় "অব সব বিষ সম লাগই" বিষয়ের সংযোগ যারে বিষ বোধ করাইয়া সমস্ত বস্তুকে নিরস করাইয়া সব হইতে আকর্ষণ ছিন্ন করাইয়া একমাত্র তোমার মধুর রূপের তৃষ্ণায় নামের আস্বাদনে ভরাইয়া তুলিয়া তোমার মাঝেই নিমগ্ন হইবার প্রয়াস পাওয়ায় তারে তুমি তার প্রাণের তৃপ্তি মিটাইয়া না দিয়া কি থাকিতে পার? আজ যতটুকু তৃষ্ণা বহন করিয়া আনিয়াছি তুমি ততটুকুরই

উপায়—চেষ্টা আনিয়া দিয়াছ, তাহাই তোমার পথে গুরুকৃপা রূপে অজস্র অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া প্রতি পদক্ষেপে হাতে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধনয়নে প্রদীপের শিখা—এ উজ্জ্বলতার আলো কে দেখাইত, যদি তোমার সাড়ায় এ প্রাণকে না জাগাইয়া তুলিত? অভাবের কাতরতা প্রাণকে অধীর করিয়া তুলিলেই কি জানি কাহার করুণার দান অতীত জীবনের তুলনায় কৃতজ্ঞতার আশ্বাসে জাগাইয়া তুলে। কিন্তু শুধু ব্যাকুলতার শূন্যতায় চাওয়ার অভাবে পাওয়া এতই দুর্ল্লভ, যদি তাই হয়? তবে দাওনা, যেমন করিয়া হইলে এ কঠিন প্রাণ দ্রব হইয়া তোমার চরণের সেবায় অনুরক্ত সেবক হইতে পারে, নহিলে এ জীবনের বাঁচিয়া থাকা—সকল অনুষ্ঠানইত বৃথা! কি জানি প্রাণে কি ভাব প্রবাহ খেলিয়া কোন অন্তর রাজ্যের গোপন দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় লুটাইয়া লুটাইয়া সকল নিবেদন করিতেছিল। কর্ম্ম সময় দিতে চায়না, কত কর্ম্ম পশ্চাতে, প্রতিবন্ধরূপে সকল বাধার মূর্ত্তি ধরিয়া পদে পদে তাহার স্বরূপ শক্তি মহামায়ার নিয়তি রূপে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া এমনি দাঁড়ায়, যে সেখানে মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এখানে কৃপা ভিন্ন প্রবল পুরুষার্থ জাগাইবার আরত কোন উপায় দেখি না।

আজ দ্বাদশী, পারণ করিয়া আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইতে হইল, একটু বিশ্রাম করিয়া আবার এখনি বাহির হইতে হইবে। যাক্ আমাদের কল্যকার সংগ্রহ ডুমুরের ডালনা ও খোসাশুদ্ধ মুগের ডাল অন্ন প্রস্তুত হইল। তাহাই ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণে বেলা ২টার সময় আন্দাজ এখান হইতে রওনা হইলাম। এক মাইল পরেই বিজলী চটি। এখানে মিনিট দশ বিশ্রাম করিয়া সেই সূর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্য দিয়াই পুনরায় চলিতে হইল। ৩ মাইল পরে কুণ্ড চটি ছাড়াইয়া আরো তিন মাইল গিয়া বান্দরচটি পাইলাম। এখানেই রাত্রে বিশ্রামের ব্যবস্থা স্থির হইল। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় আমরা চটিতে পৌঁছিলাম। এ পথের সৌন্দর্য্য এতই সুন্দর যে বর্ণনাতীত। ঊর্দ্ধে নীলাম্বর চুম্বি নীলমেঘনিভ পর্ব্বতমালা যেন মহিমাময় জ্ঞানোন্নতশিরে গম্ভীর গাম্ভীর্য্যের ছবি আঁকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরীট ধারণে আপনাতে আপনি স্থির অবিচলিত বিরাট রূপে সজ্জিত হইয়াছেন, আর নিম্নে প্রবাহিত যেন পতিত পাবনী ভক্তি গঙ্গা দ্রব হইয়া পাষাণবক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক প্রেমের নির্ঝর করুণার উৎসরূপে হিমালয়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া কলকল

কণ্ঠে হর হর-ধ্বনি শুনাইয়া অনন্তের উদ্দেশে জীবকে তাহার উৎপত্তি স্থান দেখাইয়া সীমাশূন্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে ছুটিয়াছেন। একি কোমলতার গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, জ্ঞান ভক্তির পবিত্র মিশ্রণ ; এই মহান্ প্রকৃতির উদারতায় বিরাটরূপের অসীমতার মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র দেহের অহং জ্ঞানটুকু এতই অণুর অণু ন্যায় যে তাহার স্ফুরণ অস্তিত্বটুকু কোন্ অনন্ত সত্ত্বার মাঝে বিসর্জ্জিত হইয়া ভূমার দেখায় হারাইয়া ফুরাইয়া যায়।

সেই মহানের তলে আপনাকে লুটাইয়া লুটাইয়া আপনা হইতে বাহির হইল—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

মুহূর্ত্তের মধ্যে মন যেন চিন্তাশূন্য হইল, আপনার মধ্যে সেই প্রশান্ত জ্যোতি মহিমাজলধির অতুল স্নিগ্ধতার মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু লয় হইয়া মগ্নতার মধ্যে ডুবিতে চাহিল, কি যেন এক অপূর্ব্ব দর্শনে বিশ্বভরা অনন্ত রূপের স্মরণে ভাবময়ের অতুল সৌন্দর্য্যে চারিদিকের সব দেখাকে সরস করিয়া তুলিল, যেন জগতে এক রমনীয় সুন্দর প্রিয়দর্শন ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই নামরূপকে ফুটাইয়া সকল নামরূপের অন্তরালে যে সত্ত্বায় জগৎদর্শন সেই অপরিনামী অধিকারী একমাত্র দেহী "ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপ। আমার সর্ব্বস্বচরণে লুণ্ঠিত প্রণাম এ প্রণাম যেন সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রসন্নময়ের প্রসন্ন হাস্যের মত বিকশিত করিয়া সকল দিক্‌কে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। কি এক পুলক ধারায় স্নাত হইয়া দেহের ক্লান্তি শ্রম ভুলাইয়া যেন অন্তরের মধ্যে কাহার স্পর্শ অনুভবে এ ত্রিতাপ তাপিত দেহের জ্বালা জুড়াইয়া দিতেছিল। চটিতে পৌছিলে একটু বিশ্রামের পরই গোবিন্দ এক হাঁড়ি গরমজল আনিয়া এবং সৈন্ধব লবণ একমুষ্টি তাহাতে ফেলিয়া তাহার দ্বারা পদমার্জ্জনা করিয়া— পরে পদ ধৌত করিতে অনুরোধ করিল।

মনে মনে গোবিন্দ স্মরণে নারায়ণের রঙ্গ সেবার আয়োজন দেখিয়া চক্ষে জল, মুখে হাসি আসিল ধন্য খেলা লীলাময়! কত ছলে আপনাকে প্রকাশ করিয়া লুকাইয়া থাকিয়া ধরা দিতে যাও, যদি সাড়া দিয়া পেতেই চাও তবে কেন

প্রকাশ্যেই এস না! এমন করিয়া সবের অন্তরাল হইতে আভাসটুকু জানাইয়া ধরা ছোঁয়া না দিয়া পালাইয়া প্রেম করিতে তোমায় কে বলে! আমি চাহিনা বলিলে নিজে সাধিয়া আসিয়া প্রেম কর, যেন নিকটে এস, আবার ধরিতে গেলে ছুটিয়া পালাও; চিরদিনই তোমার গুপ্তথাকার সাধটুকু—এ অভ্যাস গেল না। হাঁসাইয়া কাঁদাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ের ডাক শুনাইয়া খেলা করিতে বড় ভাল লাগে। এত চতুর না হইলে খেলিবে কে? পদ ধৌত করিতে গিয়া চরণের বেদনা অনুভবে আসিল। কিন্তু সুনজলে পা ধুইয়া ক্রমে ব্যথাটাকে বেদনা শূন্য আরাম করিয়া দিয়া আর থাকে না। একটু জিরাইয়া লইলে খানিকটা নীচে নামিয়া আমরা গঙ্গাতীরে আসিয়া যে যার নিত্য ক্রিয়ায় মনো-যোগ দিলাম। অন্য সকলে উঠিয়া গেলে "ম"—"ল"—"যৌ"—ও আমি আমরা ৪ জনে একটু রাত্র অবধি থাকিয়া শেষে যখন উঠিলাম, দেখিলাম তটের উপর ধুনী জ্বালাইয়া একটী কৌপীনধারী সাধু অনাবৃত স্থানে বালুর চড়ায় একাকী বসিয়া আছেন, রাত্রে গঙ্গার হাওয়ায় বেশ একটু অল্প শীত শীত অনুভব হইতে ছিল, দ্বন্দসহিষ্ণু হইবার জন্য যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহাদের নিকট এ শীত গ্রীষ্ম দুইই অগ্রাহের। আমরা কিন্তু গায়ে কাপড় জড়াইয়া শীতের অনুভবকে আরো বেশী করিয়া জানিয়া লইতে ছিলাম। সাধুবাবার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় হইল, তিনি একরূপ নিঃসম্বলে লোটা ব্যাঘ্রচর্ম্ম চিমটা প্রভৃতি সামান্য আসবাব্ গ্রহণে ভগবানের নাম স্মরণে বদরি দর্শনে চলিয়াছেন! আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া সেখানেই সে রাত্র অবস্থান করিলাম।

কাল ও কালী।

প্রশ্ন—কালের খণ্ড ও গতি আছে কিনা?

উত্তর—কালের ভাগ বা খণ্ডও নাই, গতিও নাই। সকল দেশের সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের মতে কাল অনন্ত। যাহা অনন্ত, তাহার আদি নাই মধ্য নাই ও শেষ বা অন্ত নাই। যাহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই তাহার গতিও হইতে পারেনা। কারণ গতি হইতে গেলে তাহার আরম্ভ চাই, আরম্ভ থাকিলেই তাহার শেষ আছে। যাহার আরম্ভ ও শেষ আছে তাহা সসীম বা খণ্ডিত। অসীমের আরম্ভও নাই শেষও নাই। পাশ্চাত্য মতে গতি একটী energy কিন্তু energy বা গতির উৎপত্তিবিন্দু আছে; যাহার উৎপত্তি আছে তাহার শেষ ও আছে। বিজ্ঞানের কল্পনা ধরিয়া কেহ বলিতে পারেন energy বা গতি resistance বা বাধা না পাইলে অনন্ত বা অসীম হয় কিন্তু যাহা অনন্ত তাহা সর্ব্বব্যাপক; যাহা সর্ব্বব্যাপক তাহার অবরোধ বা বাধা কোথায়? অবরোধ বা বাধা থাকিলে তাহাতে ব্যাপ্তির অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে। ব্যাপ্তির পূর্ণতার অভাবে অনন্তত্ব বা অসীমত্ব থাকে না। বিজ্ঞানের গতি পারিপার্শ্বিক (surrounding) বস্তুর চলনের বা নিশ্চলনের আপেক্ষিকতা ধরিয়া; তাহার অসীমত্ব বা অনন্তত্বের কাল্পনিক সিদ্ধান্ত পারিপার্শ্বিক বস্তুর অবরোধের অবিদ্যমানতার কল্পনায়। কিন্তু অনন্তের পারিপার্শ্বিক কিছু নাই ও থাকিতে পারে না। অনন্তের মধ্যে ডুবিয়া অনেক পদার্থ থাকিতে পারে কিন্তু তাহারা অনন্তের বাধা হইতে পারে না। সীমাবদ্ধের অবরোধ বা বাধা আছে কিন্তু অসীম বা অনন্তের তাহা নাই। অনন্তের ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপকতা এবং যেহেতু কাল সর্ব্বব্যাপক সেইহেতু কাল অনন্ত ও অসীম; অনন্ত বলিয়াই তাহার গতি নাই; কারণ গতির ধর্ম্ম চলন (movement) কিন্তু অনন্তের চলিবার স্থান কোথায়? আপনাতে আপনি পূর্ণ অতএব অনন্তের গতি থাকিতে পারে না। অনন্তের গতি না থাকিলে গতিশীলও কখনও অনন্ত হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের Logical proof (ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র মতে প্রমাণ) নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

No A (infinite) is B (moveable) কোন অসীম গতিশীল নহে	E Proposition.
∴ No B (moveable) is A (infinite) অতএব কোন গতিশীলই অসীম নহে	E Converse.

কাল অখণ্ড ও অনন্ত, ইহার ভাগ বা খণ্ড নাই এবং গতিও নাই। আমাদের পরিমিত জীবনকাল লইয়া আমরা কালকে তিন ভাগে খণ্ড করিয়াছি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। যাহা দেখিতেছি তাহাই বর্ত্তমান, তাহার পূর্ব্ব ও পর আর দুইটী অবস্থা আছে তাহাই যথাক্রমে ভূত ও ভবিষ্যৎ। যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি বা দেখি নাই এবং বর্ত্তমানে নাই তাহা ভূত ও যাহা পরে দেখিব বা দেখিব না কিন্তু ঘটিবে তাহা ভবিষ্যৎ। কালের এই তিনটী খণ্ড বা ভাগ জগতের প্রত্যেক জীবের পক্ষে ব্যক্তিগত বিভাগ অর্থাৎ এই তিনটী ভাগ প্রত্যেক জীবের জীবনকালের সহিত স্বতন্ত্র ভাবে সংসৃষ্ট। বস্তুতঃ এই বিভাগের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই।

আমি যাহা দেখি নাই তাহা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল সুতরাং অপর কাহারও দৃষ্ট ছিল অতএব তাঁহার পক্ষে তখন তাহা বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা অদৃষ্ট অতীত; অতএব একই কাল যাহা একজনের পক্ষে বর্ত্তমান তাহাই আর একজনের পক্ষে অতীত। যাহা আমার জীবনে দৃষ্ট হইবে না তাহা অপর কাহারও দৃষ্ট হইবে অতএব তাহা আমার ভবিষ্যৎ হইলেও অপরের পক্ষে বর্ত্তমান হইবে। সুতরাং এস্থলে একই কাল একবার একজনের ভবিষ্যৎ এবং তাহাই আবার আর একজনের বর্ত্তমান হইতেছে আবার অন্য যাহা বর্ত্তমান দেখিতেছি কল্য তাহা অতীতের গর্ভে ডুবিয়া যাইবে; অপর পক্ষে অন্য যাহা দেখিতে পাইতেছিনা কল্য তাহা ফুটিয়া উঠিবে। এস্থলে একইকাল একবার বর্ত্তমান ও একবার অতীত হইতেছে ও আর একবার ভবিষ্যৎ থাকিয়া পরে বর্ত্তমান হইতেছে। অতএব আমার জীবনকাল বা স্থিতির সহিত কালের এই তিনটী বিভাগ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধ।

এক্ষণে বুঝা যাউক আমার স্থিতি কি? যাহাকে আমি স্থিতি বলি উহা আমার স্থিতি নহে, বস্তুতঃ উহা আমার গতি। জীবন একটী গতি মাত্র, অনন্ত কালের উপর দিয়া চলিতেছে। কালের গতিও নাই খণ্ডও নাই। অনন্ত কাল অনন্তের ক্রোড়ে পড়িয়া আছে, তাহার উপর দিয়া আমি যাইতেছি। যতটুকুর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছি ততটুকু আমার অতীত, যতটুকুর উপর এক্ষণে আছি ততটুকু আমার বর্ত্তমান ও যতটুকুর উপর দিয়া পরে যাইব ততটুকু আমার ভবিষ্যৎ। অতীত ও ভবিষ্যৎ আবার দুই প্রকার, একটী দৃষ্ট আর একটী অদৃষ্ট।

রেলপথ ও রেলগাড়ী যথাক্রমে কাল ও জীবনের পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত। প্রথমে

আমি যে ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম ঐ ষ্টেশন তখন আমার পক্ষে বর্ত্তমান, পরে ঐ ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া অন্য ষ্টেশনে যাইলে প্রথম ষ্টেশন আমার অতীত, দ্বিতীয় আমার বর্ত্তমান এবং তৃতীয় ষ্টেশন যাহাতে আমি যাই নাই তাহা আমার ভবিষ্যৎ। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিল তাহার পক্ষে প্রথম ষ্টেশন যাহাতে আমি গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম তাহা অদৃষ্ট ব্যতীত কিন্তু আমি প্রথম গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম তাহা অদৃষ্ট অতীত, কিন্তু আমি ১ম ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম বলিয়া উহা আমার দৃষ্টঅতীত। আমি তৃতীয় ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইব অতএব চতুর্থ ষ্টেশন আমার ভবিষ্যৎ হইলেও উহা আমার অদৃষ্ট থাকিবে কিন্তু যে যাত্রী ঐ ষ্টেশনে অবতরণ করিবে বা উহা অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার পক্ষে উহা দৃষ্ট হইবে। এই প্রকারে প্রত্যেক জীবের পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই প্রকার,একটা দৃষ্ট অপরটা অদৃষ্ট। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে বিভক্ত দৃষ্টি অনুসারে ভূত, ভবিষ্যং ও বর্ত্তমান এই তিনটী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। অখণ্ডিত দৃষ্টিতে কালের খণ্ডও নাই গতিও নাই।

রেলগাড়ীর আরোহিগণ যেমন স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর টিকিট লইয়া এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যান, তেমনি সকল মানবেরই নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে জন্মান্তরে যাইবার টিকিট হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ টিকিট তাহার গতি ও তদনুযায়ী হয়, অর্থাৎ মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে যাহার যেরূপ কামনা, বাসনা ও কর্ম্মজ সংস্কার হয় তাহার টিকিটও সেই শ্রেণীর হইয়া থাকে। রেলগাড়ীর যাত্রিগণ যেমন ভ্রমে রেলগাড়ীতে ক্ষণস্থিতির বিষয় ভুলিয়া সামান্য সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন কিন্তু গন্তব্য ষ্টেশনে আসিলে গাড়ী হইতে নামিবামাত্রই সকল বিরোধের শেষ হইয়া যায়, তেমনি জীবগণ ক্ষুদ্র দেহ-গাড়ীতে যাইবার সময় পরস্পরের স্বার্থ লইয়া যে বিরোধ করেন তাহা দেহ-গাড়ী হইতে নামিলেই ফুরাইয়া যায়। রেলগাড়ীর আরোহিগণের মধ্যে যাহার যত অধিক Luggage অর্থাৎ পুঁটুলি থাকে তাহাকে যেমন তত অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় ও মাশুল দিতে হয়, সেইরূপ জীবগণেরও জন্মান্তরে যাইবার সময় যাহার যত অধিক কামনা ও বাসনার Luggage বা পুঁটুলি থাকে তাহাকে তত অধিক অসুবিধা বা লাঞ্ছনা ভোগরূপ অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। রেল আরোহিগণের মধ্যে যেমন কেহ কেহ শেষসীমা (Terminus) ষ্টেশনের টিকিট লইয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ মানবগণের মধ্যেও কোন কোন

ভাগ্যবান স্বীয় সাধনার উৎকর্ষ অনুযায়ী শেষ ষ্টেশন শ্রীভগবানের কাছে যাইবার টিকিট সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আবার রেল আরোহীর মধ্যে কেহ২ যেমন Break journery অর্থাৎ গতিভঙ্গ করিয়া কিছু কালের জন্য পথের মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে প্রয়োজন বা ইচ্ছা অনুসারে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য স্থানে যাইয়া থাকেন, সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যেও কেহ কেহ শ্রীভগবানের কাছে যাইবার টিকিট সংগ্রহ করিলেও পূর্ব্বার্জ্জিত কামনা বাসনা বা আসক্তিসৃষ্ট প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য Break journey বা গতিভঙ্গ করার মত অল্পকালের নিমিত্ত জন্মান্তর ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া পরে দেহান্তর লাভে শ্রীভগবানের কাছে পৌছিয়া থাকেন! এই দেহান্তর গতি রেল আরোহীর এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যাওয়ার ন্যায় দেহাশ্রিত আত্মারই হইয়া থাকে। কালের গতি বা চলন নাই কাল ভূপৃষ্ঠাশ্রিত রেল পথের ন্যায় অনন্তের ক্রোড়ে পড়িয়া আছে। রেলপথের উপর গাড়ী চলিলে যেরূপ চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুনিচয় চলিতেছে বলিয়া আরোহিগণের দৃষ্টিভ্রান্তি হয় সেইরূপ দেহ-গাড়ী শৈশব, যৌবন প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতেছে কিন্তু ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমরা দেখিতেছি কাল চলিতেছে প্রকৃত পক্ষে কাল কিছু মাত্র চলিতেছেনা।

তত্ত্বটী আরও পরিস্ফুট করিয়া বুঝিতে গেলে মনে করিতে হইবে যেমন হাওড়া হইতে কালকা পর্য্যন্ত রেল লাইন পড়িয়াই আছে, হাওড়ার লাইন ছুটিয়া বর্দ্ধমান পার হইয়া শেষ কালকা পর্য্যন্ত যেমন যায়না, পরন্তু তাহার উপর দিয়া যাত্রী লইয়া গাড়ীই বহু ষ্টেশণ অতিক্রম করিতে করিতে যায়; তেমনি অনন্ত বিস্তৃত কাল বা তাহার কোন অংশ বর্ত্তমান ষ্টেশন হইতে ছুটিয়া ভূতকাল পার হইয়া ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া যায় না। গাড়ী যখন হাওড়ায় তখন হাওড়ার পর কালকা পর্য্যন্ত সমুদয় লাইনটাই যেমন তাহার সম্মুখে পড়িয়া থাকে তেমনি গতিশীল আমি যখন বর্ত্তমানতখন ভূত ও ভবিষ্যৎ ষ্টেশণ পর্য্যন্ত কালরূপী সমস্ত লাইনটাও আমার সম্মুখে পড়িয়া থাকে। অনন্তকাল চলে না সৃষ্টিরূপিণী প্রকৃতি তাহার উপর দিয়া চলিয়াছেন।

তাই রাম প্রসাদ বলিয়াছেন—

ঈশানী পাষাণীর বেটী, তুই আছিস্ চিরকাল;
তোর রঙ্গ দেখে পদতলে প'ড়ে আছেন মহাকাল।

প্রকৃতি রূপিণী মার এক অঙ্গে প্রসন্নতার ও অপর অঙ্গে অপ্রসন্নতা বা

শাসন সূচক অবিব্যক্তি। এক দিকে তিনি বাম বা অপ্রসন্না আর এক দিকে তিনি প্রসন্না। এই জন্য বামদিকে দুইটী হস্তের একটীতে শাসনরূপী খড়্গ ও অপরটীতে দণ্ডরূপী মুণ্ড; আর দক্ষিণ দিকের এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় ধারণ করিয়া সৃষ্টি পালন, শাসন ও ধ্বংশলীলা সম্পন্ন করিতেছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবপ্রবাহ যে তাঁহার গলদেশে মালার ন্যায় বৃত্তাকারে অনন্তকাল তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া দোদুল্যমান, গলদেশ-বিলম্বিত মুণ্ডমালা তাহারই অভিব্যক্তি। কর বা হস্ত দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় এজন্য নরকর-বেষ্টিত কটিদেশ, সমস্ত কর্ম্ম-শক্তি যে তাঁহা হইতে উদ্ভূত ও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহাই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। এইরূপে অনন্ত মহাকালের উপর মা দাঁড়াইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করিতেছেন। মহাকাল অনন্ত ব্যাপিয়া অনন্ত-রূপে পড়িয়া আছেন।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ।

২৭শে কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল। কৈপুকুর, শিবপুর হাওড়া।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আমরা একদিন সাধুবাবার দর্শনাকাঙ্খায় কৈলাস পাহাড়ে গেলে পর তিনি আমাদের নিকট একটী গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটী এইরূপ :—

একজন খুব বড় সম্রাট্ ছিলেন। একদা তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের যত সুন্দর সুন্দর নানা প্রকারের বিচিত্র সামগ্রী আছে, ইচ্ছা করিলে যাহার যেটী পছন্দ হয়, যাহার যেটী গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা সে গ্রহণ করিতে পারে। সম্রাটের এইরূপ প্রচার করিয়া দেওয়ার ফলে রাজপ্রাসাদে নিত্য নিত্য বহুস্থানের বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং সকলে মহাহৃষ্টান্তঃকরণে যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি সে সেই দ্রব্যটী লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে প্রত্যহই বহুলোক আসিতে লাগিল এবং ইচ্ছানুরূপ সামগ্রী লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। একদিন সম্রাট

লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে একব্যক্তি কিছুই প্রার্থনা না করিয়া কেবল চুপ করিয়া তাঁহাকেই দর্শন করিতেছে। এই বিশাল রাজ প্রাসাদের অসংখ্য উত্তম উত্তম মনোহারী দ্রব্যের মধ্যে তাহার এইরূপ নির্লোভ ভাব দেখিয়া সম্রাট তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ও তাহাকে বলিলেন, "তুমি কিছু লইবে না? আমার এই সুবৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে যে কোন পদার্থে তোমার অভিরুচি হয় তুমি তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পার।" সম্রাটের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তিটী বলিল, "আমি আপনাকেই চাই।" ঐ ব্যক্তিটী যে সম্রাটের কোন একটীসামান্য গৃহ সামগ্রী কিম্বা তাঁহার একটী মূল্যবান আভরণ প্রার্থনা না করিয়া স্বয়ং সম্রাটকেই প্রার্থনা করিয়া বসিল, তাহাতে তাহার বুদ্ধিরই পরিচয় দিল, কারণ সম্রাটই যদি তাহার হইল, তবে আর তাহার কোন্ বস্তুর অভাব রহিল?

এই গল্প বলিয়া সাধুবাবা বলিলেন, এই সম্রাট হইলেন ভগবান এবং তাঁহার গৃহ সামগ্রী হইতেছে তাঁহার সৃষ্ট এই মায়িক জগতের যাবতীয় পদার্থ নিচয়।

এই গল্পটীর উপদেশ এই যে আমরা কায়মনোবাক্যে কেবল মাত্র স্রষ্টাকে না চাহিয়া তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর প্রতিই অনুরক্ত হইয়া পড়ি এবং তাহাই লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হই। তাহাতে লাভ তো কিছুই নাই ই; বরং উহা বিশেষ ক্ষতি কারক, যাহা পাইলে সকল অভাবের পূরণ হয়, সমস্ত লাভই অতি সমান্য অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাকে প্রার্থনা না করিয়া এই মায়িক ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যে আসক্তি, ইহা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়।

সাধুবাবার এই গল্পটী বলিবার মর্ম্ম এই যে আমরা যদি মায়িক অস্থায়ী পদার্থ নিচয়ের প্রতি মনোযোগ দিই অথবা তাহাই লাভ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি, তবে তাহা লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা তাহাতে ভগবান্ হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়ি। যে ব্যক্তি প্রেয়কে গ্রহণ করে সে শ্রেয় হইতে অর্থাৎ পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

সাধুবাবা আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন যে মনোযোগ ব্যতীত রসাস্বাদন হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন যেমন কোন ব্যক্তি কিছু খাইতেছে, তাহাকে যদি হঠাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করে যে উহা খাইতে কিরূপ হইয়াছে? এপ্রশ্নে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারগ হয় না,—সে বলিয়া থাকে, আর একটু খাইয়া দেখি। এতক্ষণ যদিও সে ঐ দ্রব্যই আহার করিতেছিল, কিন্তু ঠিক্ উহার স্বাদের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ না থাকায় উহার স্বাদ ভালরূপ উপলব্ধি হয় নাই। সকল বিষয়েই ঐ নিয়ম! মনোযোগ ব্যতীত কোন কিছুরই ভালরূপ

অনুভূতি হয় না। মনের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য অবস্থায় আনন্দ উপলব্ধি বা ভাল করিয়া কিছুই বোধগম্য হয় না। একাগ্র মনোযোগের সাহায্যে ও মনের নিস্তরঙ্গ অবস্থায় তবে আনন্দ বা অনুভূতিআদি উত্তমরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য নিস্তরঙ্গ চিত্তে একাগ্র মনোযোগের সহিত ধ্যান করা আবশ্যক।

সাধুবাবা বলেন; "মাটী খুঁড়িবার জন্য মোটা অস্ত্র অর্থাৎ যেমন কোদালির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্র সেলাই জন্য খুব ভাল সূক্ষ্ম সূঁচের আবশ্যক হয়।" তেমনি স্থূল মনের দ্বারা ভগবদ্ উপলব্ধি হয় না, অতি সূক্ষ্ম পবিত্র মন নিস্তরঙ্গ অবস্থায় একাগ্রভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে, নচেৎ নহে। বিষয়-রসের স্পর্শে মন অপবিত্র ও স্থূল হয় ও দ্বেষাকাঙ্ক্ষাদি ষড় রিপুর দ্বারা চালিত হইলে মন অপবিত্র, অস্থির ও চঞ্চল হয়। সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তা, জপ-ধ্যান অভ্যাসে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও সূক্ষ্ম হয় এবং ধ্যান অভ্যাসে মন স্থির হয়। মন যতই পবিত্র হয়, ততই সূক্ষ্ম হয় ও ততই তাহার সূক্ষ্মানুভূতির ক্ষমতা জন্মে। মন অতি পবিত্র ও সূক্ষ্ম না হইলে তাহার দ্বারা ভগবদ্ উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর হয় না।

একদিন সাধুবাবার নিকট গেলে পর তিনি 'সময়ের সদ্ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য' বলিয়া সে সম্বন্ধে একটী গল্প বলিয়াছিলেন। ভগবদ্ কৃপায় এই যে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, এমন অবিকৃত দেহ, এরূপ উত্তম সুযোগ সুবিধা, ইহা যেন অবহেলায় বৃথা নষ্ট না হয়। সময়ের অপব্যবহার না করিয়া, ইহার উপযুক্ত রূপ সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এসম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া তিনি এই গল্পটী বলিয়াছিলেন :—

একজন খুব বড় সম্রাট ছিলেন। তিনি রাজ্যময় প্রচার করিয়া দিলেন, যে কোন ব্যক্তি প্রার্থী হইলে তাহাকে তিনি ধন জন সম্পদ পরিপূর্ণ এই রাজত্ব সাত দিন ভোগ করিবার জন্য দান করিয়া দিতে পারেন। সে ব্যক্তি স্বেচ্ছা মত এই সাত দিন রাজত্বে নিজ ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা ও লোকজন শাসন পুরস্কার ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্ব করিবে বটে, কিন্তু সাতদিন পূর্ণ হইয়া গেলে রাজ্য প্রান্তে যে নদী আছে, সেই নদীর পরপারে বহু হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যানীর মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এরূপ প্রতিশ্রুতিতে লোক প্রথমে আতঙ্কিত হইলেও সাতদিন রাজ্য লাভ করিয়া রাজা হইয়া সুখ ভোগের লোভে ও বহুলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার লোভ সম্বরণে অসমর্থ হওয়ায়

অনেক ব্যক্তিই সম্রাটের নিকট রাজ্য প্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। সম্রাট তাঁহার বাক্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের রাজত্ব ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। ঐ সকল রাজ্য প্রার্থী ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যে রাজা হইয়াছে তাহা বিস্মৃত হইয়া ঐ কয়দিন খুব আমোদ প্রমোদ, আহার বিহার, ভোগসুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময় চলিয়া গেলে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজাজ্ঞায় রাজ্যের প্রান্তে নদীর পরপারে বিশাল অরণ্যে হিংস্র জন্তুর মধ্যে নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে অনেক ব্যক্তিরই প্রথমে রাজ্য ভোগ ও পরে বিনাশ ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া একজন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু চিন্তা করিয়া ইহার উপায় স্থির করিল। সে প্রথমে গিয়া সম্রাটের নিকট রাজত্ব প্রার্থনা করিয়া লইল। তখন সেই বিরাট রাজ্য, রাজমন্ত্রী, সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ ও ধনাগারের প্রচুর ধনরত্ন তাহার অধীন হইল। তখন সেই বিবেকী সুচতুর ব্যক্তি মন্ত্রী এবং সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীদের ডাকিয়া আনাইয়া এই আদেশ করিল, "তোমরা সকলে মিলিয়া এই কয়দিনের মধ্যে নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত করাইয়া দাও, তাহার জন্য যত লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ কর, তত লোকই নিযুক্ত করিতে পার এবং বহুলোক নিযুক্ত করিয়া নদীর পরপারের সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেল, এবং ঐ নদীর পরপারে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য বাড়ী ঘর দোকানাদি বসাইয়া নগর স্থাপন কর এবং এই ধনাগার হইতে এই সময়ের মধ্যে যত ধনরত্নাদি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা লইয়া ওপারের ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়া দাও" ঐ ব্যক্তি এই সকল কার্য্যগুলি যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করাইয়া লইবে, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহার ফলে ও অনলস ভাবে সে দিবারাত্রি উঠিয়া পড়িয়া এই কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হওয়ায় এই সাত দিন সময়ের মধ্যে সকল কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হইল। পূর্ব্বে ঐ সকল অবিবেচক ব্যক্তির মত যদি এ ব্যক্তি মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিয়া 'সাতদিন পরে কি অবস্থা ঘটিবে' ইহা ভুলিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে ইহারও ঐ প্রকার বিনাশ সংসাধিত হইত। প্রথমে আমোদ প্রমোদে মত্ত না হইয়া সে যে এই প্রকার তৎপরতার সহিত এইরূপ অহোরাত্র অবিরাম পরিশ্রম করিল, তাহার ফলে সে আজীবন নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে পরমানন্দে বাস করিতে সমর্থ হইল।

এই গল্পটী শেষ করিয়া সাধুবাবা বলিলেন, এই সম্রাট হইতেন ভগবান্

তিনি তাঁহার রাজত্ব মধ্যে আমাদের সকলকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠাইয়াছে।
আমাদের তিনি প্রচুর পরিমাণে বিবেক-বুদ্ধি ও সময় সুযোগ দান করিয়াছেন,
আমরা যদি তাঁহার প্রদত্ত এই নির্দ্দিষ্ট সময় বৃথা অলসতায় বা বিলাসিতায় ব্যয়
না করি এবং সদ্‌বুদ্ধির সাহায্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবে তিনিও
সন্তুষ্ট হন এবং আমরাও অনন্তকালের জন্য আনন্দ লাভে সমর্থ হই।

তাই সাধুবাবার উপদেশ এই যে আমরা যখন দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম, এমন
নিখুঁৎ দেহ ও উত্তম সুযোগ লাভ করিয়াছি তখন এই জীবনের যেন সদ্ব্যবহার
করি, উঠিয়া পড়িয়া পরিশ্রম করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে উচ্চস্থান লাভ হয়,
তাহা এই জীবনেই ব্যবস্থা করি। আমরা যেরূপ কর্ম্ম করিব তাহার ফলও
তদ্রূপ পাইব। তাঁহার প্রদত্ত এই নির্দ্দিষ্ট কাল যদি আমোদ প্রমোদে বা
বিলাসিতায় নষ্ট হয়, তবে অবশেষে ঐ অবিবেকী আমোদ প্রমোদ নিরত
ব্যক্তিদের মত ধ্বংসই নিশ্চিত। সেই জন্য যাহাতে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়
তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

একদিন সাধুবাবা এক ভীল রাজার গল্প বলিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন
যে ভগবান্ কেবল লোকের অন্তঃকরণের ব্যাকুলতাই দেখেন। তিনি বাহিরের
আড়ম্বর কিম্বা শুচিতায় কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন না, কেবল অন্তরের ব্যাকুল
ব্যগ্রতায় তিনি ধরা দেন। ভীল রাজের কাহিনীটি এইরূপ :—

এক দেশে এক ভীল রাজা বাস করিতেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,
'আমি ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিব, কারণ তিনিও রাজা আমিও রাজা।
কেবল পার্থক্য এই যে তিনি বড় দেশের রাজা আর আমি একটী ছোট দেশের
রাজা। তবে বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষে এই এক মহাবিঘ্ন দেখিতেছি, যে কেমন
করিয়া কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব? আমি তো তাঁহার ঠিকানা জানিনা।'
যদিও তিনি ঈশ্বরের ঠিকানা জানেননা, তবুও ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের
জন্য মনের ব্যগ্রতায় একদিন অশ্বারোহণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।
ঈশ্বরের অন্বেষণে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি একদিন গঙ্গাতীরে
দেবালয়ের নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে
পাইলেন গঙ্গাতীরের এক শিব মন্দিরের মধ্য হইতে শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ উত্থিত
হইতেছে ও সেখানে বহু জন-সমাগম হইয়াছে। মন্দির মধ্য হইতে মহাদেবের
স্তব স্তুতির মধুর শব্দ এবং অতি চমৎকার সুগন্ধ এবং পূজার বিশেষ আড়ম্বরাদি
দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যখন এত ধুমধাম করিয়া এঁর পূজা হইতেছে তখন

ইনিই বোধ হয় জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর হইবেন। সেই জন্যই বোধ হয় এত লোক তাঁহার পূজা করিয়া প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করিতেছে। এ সম্বন্ধে দুই এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করায় তাহারাও প্রায় ঐ প্রকারই উত্তর দিল। এত অনুসন্ধান, এত চেষ্টার ফলে অবশেষে তিনি যে ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দের উদয় হইল। একবার অতিশয় স্পৃহা হইল যে তখনই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপনের বাসনা ঈশ্বরের নিকট জানাইয়া আসেন, কিন্তু এত লোক জনের মধ্যে মন্দিরে প্রবেশ বোধ হয় সঙ্গত হইবেনা, কেহ বাধাপ্রদানও করিতে পারে ;—বিশেষতঃ বন্ধুর নিকট রিক্ত হস্তে যাইতে নাই,—কিছু ভেট্ লইয়া যাওয়া উচিত,—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তখন তিনি শিব মন্দিরে প্রবেশ ইচ্ছা দমন করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভীলরাজ বন্ধুকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে ধনুর্ব্বাণ হস্তে শিকার করিতে বাহির হইলেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে একটী শশক বধ করিয়া আনিলেন, এবং রাত্রিতে যখন মন্দিরের চতুস্পার্শ নির্জ্জন হইয়া গেল তখন তিনি ঐ শশক মাংস ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া উহা অঞ্জলি পূরিয়া লইলেন এবং পাত্রাভাবে মুখে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া জগতের কর্ত্তা ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন উদ্দেশে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে মন্দিরদ্বার অর্গল বদ্ধ। তখন পদাঘাতে দ্বার উন্মোচন করিয়া সেই রক্তাপ্লুত শশক মাংস হস্তে ভীলরাজ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও প্রথমে মুখ হইতে গঙ্গাজল মহাদেবের মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। পরে হস্তস্থিত শশক মাংস শিবলিঙ্গোপরি স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মনের ব্যাকুলতা জানাইতে লাগিলেন। তিনি যে মাত্র একটীবার বন্ধুর সহিত দর্শন ও তাঁহার মুখ হইতে দুই চারিটী বাক্য শুনিবার জন্য লালায়িত একথা বহু কাকতি মিনতি করিয়া মহাদেবকে জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু মহাদেব ভীলরাজের এত মিনতিতেও নীরব রহিলেন, কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না বা দর্শন দিলেন না। এদিকে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইবার উপক্রম হইল, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীকুল নানারূপ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কেহ মন্দিরে আসিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া ভীলরাজ বাধ্য হইয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না।

এদিকে, পরদিন প্রাতে মন্দিরের পুরোহিত পূজার জন্য আসিয়া ঐ সকল অশুচি দ্রব্য মহাদেবের মস্তকে দেখিয়া—মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। 'কোন

দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক এইরূপ ঘটিয়াছে' এই বিবেচনা করিয়া ঐ সকল উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং পঞ্চগব্য ও তীর্থোদক দ্বারা অতি উত্তমরূপে মহাদেবকে স্নান করাইলেন এবং তৎপর যথাবিহিত পূজাদি সমাপন করিলেন। সন্ধ্যার সময় ও নিয়মিত সন্ধ্যারাত্রির পর মন্দির দ্বার আবদ্ধ করিয়া পুরোহিত স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

ভীলরাজ সেদিনও পূর্ব্ব রাত্রির মত পুনরায় একটী শশক বধ করিয়া আনিলেন। পূর্ব্ববৎ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন এবং মুখে গঙ্গাজল লইয়া শঙ্করের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। সে দিনও দ্বার রুদ্ধ আছে দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা দ্বার অর্গলমুক্ত করিলেন এবং বন্ধুকে উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এবার কৃপা করিয়া তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন কর, একটীবার দর্শন দাও। বন্ধু!—আমার মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে তোমার সহিত আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করি, তুমি কি আমার সে সাধ, সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিবে?" এইরূপ ভাবে তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক উপরোধ অনুরোধ জানাইলেও তাঁহার প্রতি শঙ্করের কৃপা হইল না। সেদিনও প্রায় রাত্রি প্রভাত হয় দেখিয়া ভীলরাজ ক্ষুন্নমনে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পর দিনও মন্দিরের পুরোহিত আসিয়া ঐ প্রকার ব্যাপার দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং পূর্ব্বদিনের মত উহা পরিষ্কার করিয়া, পঞ্চগব্য তীর্থোদক প্রভৃতি দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইলেন। পূজান্তে একজন প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়া 'পুনরায় যদি কোন দুষ্ট লোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তবে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়, এই বলিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

রাজসাহির জনৈক ভদ্র মহিলা।

অযোধ্যাকাণ্ড রামায়ণ সমালোচনা।

উৎসবের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—

মহাশয়।

"উৎসব" পত্রিকার সম্পাদক স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহাশয়ের প্রণীত "রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড" নামক পুস্তক খানি সমগ্র মনো-নিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া এই পত্র

থানি লিখিতেছি, এবং ইহাকে উৎসব পত্রিকার কোন অংশে স্থান দান করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।

মহর্ষি বাল্মীকির জগতে তুলনা নাই। কি অসাধারণ শক্তি লইয়া তিনি উক্ত মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। যেমন দেহস্থিত আত্মার, দর্শনকারগণের ব্যাখ্যাত নানা বিশ্লেষণ জ্ঞাত হইয়াও আত্মা যে কি পরম পদার্থ তাহা আমরা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা, সেই প্রকার রামায়ণ গ্রন্থ বহুবার পাঠ করিয়াও রামায়ণ মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। যে চিত্রকর রামায়ণে বর্ণিত রঙে, রামায়ণে বর্ণিত সঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত গুণে, রামায়ণে বর্ণিত কর্ম্মাচরণে শ্রীরামচন্দ্রকে সাজাইয়া গিয়াছেন, সেই মালাকারকে, সেই দার্শনিককে, সেই বৈজ্ঞানিককে, সেই সূক্ষ্মদর্শীকে বলিহারী যাই। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর তুলনা সেই ক্ষেত্রেই সম্ভবপর যেখানে উভয়ের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণেও সেই সাদৃশ্য আছে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সমভাবাপন্ন, সমধর্ম্মী আমরা নাকি কল্পনার চক্ষেও কাহাকেও দেখিতে পাই না, তাই আমরা বলিতে বাধ্য হই, যে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রেরই ন্যায়, বাল্মীকি বাল্মীকরই মত। শ্রীরামচন্দ্রের গৃহিনী জনকনন্দিনী সীতাদেবী যেমন সেই ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃত্রয়ও তদনুরূপ, মাতাকৌশল্যাও সেইমত লঙ্কাধিকারি রাবণও সেই প্রকারের রামরাবণের যুদ্ধও তদ্রূপ। এহেন রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে মজুমদার মহাশয় যে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, আমরা তাহাতে তাঁহার প্রতিচ্ছায়াত দেখিতে পাইই, অধিকন্তু বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া উচ্চস্তর হইতে নামাইয়া আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানবগণের হিতার্থে যে দারুণ কষ্ট স্বীকার করিয়া সহজবোধ্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার অসীম কৃপা। ইহাতে যে বর্ত্তমান সমাজের কত হিতসাধন করিয়াছেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বে যেমন এই বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীগণ রামকথা, কৃষ্ণগাঁথা পাঠ করিয়া মনশুদ্ধি করিতেন ও পতিভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, এমন কি পতির মরণে পাগলিনী হইয়া স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিতেন সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে? পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমান যুগে লণ্ডন রহস্যের অনুকরণে যে সকল পুস্তক লিখিত হইতেছে তাহাই পাঠের জন্য গৃহলক্ষ্মীগণ ক্ষিপ্ত হন। আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট!! সেইজন্য মনে হয় "রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড" পড়িবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। তবে এই স্রোত ফিরাইবার চেষ্টা করা অতি কর্ত্তব্য। সেইজন্যই রামদয়াল বাবু আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। কিমধিকমিতি।

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মা (রায় চৌধুরী)

৭৭।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭ই আশ্বিন ১৩৩৫

ধর্ম্মজীবন, পূজনীয় স্যর গুরুদাস, উচ্ছাস পঞ্চক ও শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

বশিষ্ঠ—পূর্ব্বে আমি এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়াছি (৫৪ সর্গ সঙ্কল্প চিকিৎসা)—তাহা বিস্তৃত ভাবে বলি নাই বলিয়া তুমি বুঝিতে পার নাই। সিদ্ধান্ত কালে আবার বলিব। রাঘব! যতদিন না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও ততদিন ইহা তোমার বোধগম্য হইবেনা। কান্তার রসের গীত যুবকেরাই রসের সহিত গ্রহণ করে, নির্ম্মল চিত্ত পুরুষই এইরূপ প্রশ্নের সদুত্তর গ্রহণের উপযুক্ত। অনু-রাগের কথা বালকের নিকটে বৃথা। অল্পবোধশালী পুরুষের নিকটে সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ কথাও নিরর্থক। নাগরঙ্গ পূগ জম্বীরাদি বৃক্ষের ফল হয় শরৎ কালে বসন্তে নহে—অতি সুন্দর তত্ত্বকথা বুঝিবারও কাল আছে। নির্ম্মল বস্ত্রেই রং ধরে, মলিন বস্ত্রে নহে সেইরূপ শুদ্ধবুদ্ধিতে বিজ্ঞানকথা প্রতিফলিত হয়, মলিন বুদ্ধিতে হয় না। আমরা উপদেশ পথের প্রদর্শক মাত্র, তুমি প্রণিধান করিলে আপনিই আত্মাকে বুঝিবে।

জ্ঞানাত্যাত্মানমাত্মৈব কৃত আত্মাত্মনৈব হি।
আত্মৈব সংপ্রসন্নঃ সন্নাত্মানং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৭

যখন তুমি আত্মাকে আত্মারূপেই জানিবে তখনই ইনি প্রসন্ন হইবেন। আর সংসারি-জনগণও আত্মা আছেন ইহা জানে কিন্তু আত্মাকে জানেনা। সেইজন্য আত্মপ্রসাদ নাই। কারণ আত্মা দ্বারাই আত্মা অপ্রসন্ন থাকেন। আত্মা বলিয়া যখন কিন্তু আত্মাকে আত্মা বোধ হয় তখন ইনি প্রসন্ন হইয়া বাস্তব পূর্ণ আত্মাকে প্রতিপাদন করেন। বুঝিতেছ মানুষ আত্মাকে আত্মরূপে জানেনা বলিয়াই সদা অপ্রসন্ন। যাঁহারা কিন্তু সত্য সত্যই সদা প্রসন্ন থাকেন তাঁহারা আত্মারস্বরূপের ভাব কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া মিথ্যা অনাত্মাকে অগ্রাহ্য করিয়াই প্রসন্ন থাকেন।

অখণ্ড ব্রহ্ম ভাব বুঝাইবার জন্যই তোমাকে আত্মা কর্ত্তা না অকর্ত্তা ইহার বিচার দেখাইয়াছি। কিন্তু যাবৎ আত্মার অখণ্ড স্বভাবতা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে না আসিবে তাবৎ বিচার করিলেও বাসনা ক্ষয় হইবে না।

সেইজন্য বাসনা ক্ষয়ের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা ধারণা কর।

বন্ধো হি বাসনা বন্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥১৯

বাসনা দ্বারা বদ্ধ যে, সেই বদ্ধ—বাসনা ক্ষয় হইলেই মোক্ষ। তুমি বাসনা ত্যাগকর এমন কি মোক্ষ-বাসনাও রাখিও না। ইহার স্পষ্টার্থ হইতেছে প্রথমে সংসার বাসনা পরিত্যাগ কর পশ্চাৎ আমি মুক্তি চাই এই বাসনাও রাখিও না।

তামসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্র্যাদিভাবনানাম্নীং গৃহাণামলবাসনাম্ ॥২০
তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃশান্তসমস্তেহো ভব চিন্মাত্র বাসনঃ ॥২১

বাসনা ক্ষয়ের প্রথম পীঠিকা যে বৈরাগ্য তাহা দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—তমঃ প্রধান বাসনা ও রজঃ প্রধান বাসনা প্রথমে ত্যাগ করিতে হইবে। তমঃ প্রধান বাসনা হইতেছে পাপকর্ম্মে ইচ্ছা—শরীর ভোগের ইচ্ছা—ইন্দ্রিয় সুখ পুনঃ পুনঃ ভোগের ইচ্ছা। রজঃ প্রধান বাসনা হইতেছে সকাম কর্ম্মকরা—পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্ম্ম করা। তমঃ প্রধান বাসনার প্রশ্রয় দাও তির্য্যক্ জাতিতে জন্মিবে। রজঃ প্রধান বাসনা লইয়া থাক আবার মানুষ হইবে। এই দুই বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস কর করিয়া নির্ম্মল বাসনা লইয়া থাক। অর্থাৎ যাহা কিছু কর তাহা শ্রীভগবানকে জানাইয়া কর, শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য কর। আমি আর কিছুই চাই না—চাই তোমার প্রসন্নতা। তোমার প্রসন্নতা লাভ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সুখ লাভের জন্য আমি কর্ম্ম করিতে চাই না—আমি জীবন রাখিতেও চাই না। এই ভাবে বাসনাকে নির্ম্মল করিবে, পরে ইহারই পূর্ণত্ব লাভ হইবে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই গুণ চতুষ্টয়ের পুনঃ পুনঃ

অনুশীলন অনুষ্ঠানে। মৈত্রী হইতেছে সর্ব্বভূতে দয়া, করুণা হইতেছে সকল প্রাণীর দুঃখে দুঃখী হওয়া, মুদিতা হইতেছে সকল প্রাণীর সুখে সুখী হওয়া এবং সকল প্রাণীর পাপকর্ম্মে বা দুষ্ট কর্ম্মে উদাসীন থাকাই হইতেছে উপেক্ষা।

দেখিতেছ মলিন বাসনা ত্যাগ করিয়া, তবে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই সমস্ত নির্ম্মল বাসনা গ্রহণ করিতে হইবে। পরে বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহার পরায়ণ হইয়াও কিন্তু তাহাও ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়া একান্তে আমি চেতন পুরুষ, আমি নিঃসঙ্গ এই অভ্যাসে সমুদায় বাহ্য চেষ্টা শূন্য হইয়া চৈতন্য বাসনা দৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু ভিতরে আমার স্বরূপে আমি চিন্মাত্র—ইহা না ধরিতে পারিলে মৈত্রী প্রভৃতিও হইতে পারে না—ইহা দর্শন করিয়া বাহিরে মৈত্রাদি ব্যবহার সময়েও আমি চিন্মাত্র এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসে দৃঢ়ীকৃত বাসনা হও।

তামপ্যথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধি সমন্বিতাম্।
শেষে স্থির সমাধানো যেন ত্যজসি তত্ত্যজ ॥২২

মন ও বুদ্ধি যাহা তুলিতেছে তাহাও ত বাসনা—তাহাও ত চিত্তের বাসনা। তুমি মন বুদ্ধি সমন্বিত চিন্মাত্র বাসনা ত্যাগ কর, করিয়া শুদ্ধ নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রাম লাভ কর। বিষয় সমূহ বাসনা বাসিত, ইন্দ্রিয়গণ ইহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করে, মন ইহাদিগকে মন্থন করিতে করিতে পাগলের মত নৃত্য করে, আর অহংকার অহং অহং মম মম করিয়া আপনার বিচিত্র বন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া হাহা হিহি করে তুমি এই অহং ও মমকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া আকাশের ন্যায় প্রশান্ত মনোবৃত্তি হও—ইহাই স্বরূপে থাকিয়া শুদ্ধ চিন্ময় হওয়া। যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত ভাব ও অভাব দূর করিয়া শান্ত হইতে পারেন তিনিই মুক্ত পরমেশ্বর।

হৃদয়াৎ সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ।
যস্তিষ্টতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥২৫

সমাধিই করুন বা অন্য কার্য্যাদিই করুন—যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই মুক্ত হইয়াছেন। মনে যাঁহার কোন বাসনা আর উঠে না তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না—এবং কর্ম্ম না করিলেও অকরণে প্রত্যবায় ভাগী হন না। এরূপ মহাত্মার সমাধিরও দরকার নাই জপাদিরও আবশ্যক নাই।

ন সমাধান জপাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনংমনঃ ॥২৮

অধ্যাত্ম শাস্ত্র সকল বিশেষরূপে বিচার করিয়া এবং সৎসঙ্গে তাহার আলোচনা করতঃ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করা অপেক্ষা উত্তম পদ প্রাপ্তির সাধনা আর কিছুই নাই। কত লোক দশদিক ভ্রমণ করিয়া করিয়া কত কি দ্রষ্টব্য দর্শন করেন কিন্তু যথাবৎ বস্তু দর্শন করেন কয় জন? লোকে যাহা দেহে তাহা বাস্তবিক নাই। লোকে যাহা দেখে তাহা ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার জন্য চেষ্টা মাত্র। আত্ম দর্শনে কাহার যত্ন আছে? লৌকিক কার্য্য—ঘর বাড়ী বাগান এবং বৈদিক যাগ যজ্ঞ দান হোম পূজা পরোপকার—মানুষ যাহা করে সমস্তই দেহ ভোগ প্রেরণায় করে—ভিতরে আত্মানন্দ প্রাপ্তি জন্য কিছুই করে না। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন লোক অত্যন্ত বিরল যাঁহার ইহা হেয় ইহা উপাদেয় এই অজ্ঞান জাত নিশ্চয় বিগলিত হইয়াছে।

করোতু ভুবনে রাজ্যং বিশত্বম্ভোদমম্বুবা।
নাত্মলাভাদৃতে জন্তুর্বিশ্রান্তিমধিগচ্ছতি ॥৩৪

মানুষ পৃথিবীর রাজা হউক, জলধর মধ্যেই প্রবেশ করুক অথবা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করুক আত্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন কুত্রাপি সে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেনা।

যে মহামতয়ঃ সন্তঃ শূরাশ্চেন্দ্রিয়শত্রুষু।
জন্মজ্বরবিনাশায় ত উপস্যা মহাধিয়ঃ ॥ ৩৫

যে সমস্ত মহাত্মা জন্ম ও জরা বিনাশ জন্য ইন্দ্রিয়রূপ মহাশত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন সেই সমস্ত মহাপুরুষই ধন্য। সর্ব্বত্রই

পঞ্চভূত ষষ্ঠ কিছুই নাই, পাতালে ভূতলে স্বর্গে কোথায় গিয়া মানুষ সুখ পাইবে? যাঁহারা সমস্তই মায়া, একমাত্র আত্মাই সত্য এই বিচার লইয়া সংসারে বিচরণ করেন তাঁহাদের নিকট সংসার গোস্পদ তুল্য কিন্তু বিচারহীনের নিকট সংসার উন্মত্ত মহাসমুদ্র মাত্র। যাহাদের চিত্ত বিস্ফারিত হইয়াছে তাঁহাদের নিকট এই সংসার কদম্ব গোলকের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা ভোগই বা কি করিবেন, দানই বা কি করিবেন? ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষ রাজ্যলাভ জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণবধ করিয়া যে সমরক্রিয়া করে, তাহাদের ঐ কার্য্যকে ও তাহাদিগকে ধিক্। স্বর্গাদি লাভেও আত্মার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয় না, ত্রিজগৎ প্রাপ্তিতে আর কি লাভ হইবে? বিধাতার পদ লাভ করিয়াই বা কি হইবে? যিনি আত্মজ্ঞ তিনি দেখেন আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, যাহা উৎপন্ন মত দেখা যায় তাহা ভ্রান্তিমাত্র। কাজেই জগত্রয়ের প্রাপ্তিতে আত্মার কোন্ বল বৃদ্ধি হইবে যে তাহাতে তিনি অনুরক্ত হইবেন? যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া মহাশয় হইয়াছেন এই জগৎ তাঁহার নিকট কতটুকু যে তিনি তাহাতে তৃপ্ত হইবেন? একদিকে শত শত পর্ব্বত, অন্যদিকে সীমাশূন্য জলরাশি আত্মজ্ঞের প্রয়োজন এখানে কি আছে? ভূতলে পাতালে সুরালয়ে এমন কি আছে যাহা আত্মজ্ঞের করণীয়? একতাপ্রাপ্ত হইয়া যিনি আকাশবৎ সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া স্বস্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট সমস্তই শূন্য। যাবৎ প্রারব্ধ ক্ষয় না হয় তাবৎ অনন্ত অনন্ত শরীর জালে এই সংসার সমুদ্র ধূসর বর্ণ দৃষ্ট হয়—তত্ত্ব এখানে কিছুই লক্ষিত হয় না। সপ্তকুলাচল ব্রহ্মরূপ নির্ম্মল সাগরের ফেনপুঞ্জ; নদী, সাগর চিন্ময় ভাস্করের মরীচিকা; এই সৃষ্টি পরম্পরা আত্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা এবং শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদরূপ জলধরের বৃষ্টিস্বরূপ। চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি সেই চিৎস্বরূপ আত্মার প্রভায় প্রকাশিত। সেই আলোকে এই জগৎশ্রীরূপ মৃগতৃষ্ণা নদী সমুদ্ভূত হইয়া মহা আড়ম্বরে প্রবাহিত। সুরাসুরনরাদি সংসারে প্রতারিত হইয়া কামভোগরূপ

তৃণভোজী মৃগের মত বিচরণ করে মাত্র। এই সংসারারণ্যে কতক-গুলি চামড়ার পুতুল এক একটি পেটরার মধ্যে—দেহপিঞ্জর মধ্যে স্থাপিত। অস্থিখণ্ড ঐ পিঞ্জরের অর্গল। মাথার খুলি তাহার পিধান আচ্ছাদন, স্নায়ুরূপ শৃঙ্খল দ্বারা ঐ পিঞ্জর আবদ্ধ। চর্ম্মপুত্ত-লিকাগুলি সংসার অরণ্যের মুগ্ধ মৃগ-দেহ, বিবেকশূন্য বলিয়া ইহারা মুগ্ধ মোহগ্রস্ত। ধাতা উহাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য ভোগরূপ তৃণ দিয়া উহাদিগকে ভোগ-দেহপুরে সঞ্চরণ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা চর্ম্মপুত্রিকা হইতে স্বতন্ত্র; ভোগ সমুহ ইহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। মন্দবায়ু কি পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে? জ্ঞানী যে সর্ব্বোচ্চ পদে অবস্থান করেন তাহার নিকট চন্দ্রসূর্য্যের সঞ্চরণ দেশ যে বিপুল আকাশ, সেই আকাশও ভূচ্ছিদ্রের মত অতি ক্ষুদ্র। সেই মহাপদে যাঁহারা স্থিত তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কি তৃষ্ণা থাকিবে? আত্মজ্ঞেরা দেখেন যে, ব্যবহার পরায়ণ লোকপালগণও অজ্ঞান সমুদ্রে মগ্ন। তাঁহারাও মূঢ় জনগণের মত শরীরকে আত্মা ভাবিয়া শরীরকে রক্ষা করেন। ভোগবাসনায় দৃঢ়াভ্যস্ত বলিয়াই প্রারব্ধ প্রাবল্যে এইরূপ হয়।

আকাশে মেঘ উঠে কিন্তু নানাবর্ণের মেঘ আকাশকে রঞ্জিত করিতে পারে না। সেইরূপ অভ্যাসবশে জগদ্ভাব মনে উঠিলেও জ্ঞানীকে তাহা রঞ্জিত করিতে পারে না।

ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
মর্কটা ইব নৃত্যন্তো গৌরীলাস্যার্থিনং হরম্॥ ৫৬

এই জগৎশ্রী তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মুখে নৃত্য করিলেও তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে রঞ্জিত হন না। গৌরীর লাস্য (নৃত্য) দর্শনে অভিলাষী মহাদেব কি মর্কটের নৃত্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন? মা কুম্ভের বাহিরে স্থিত রত্নে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা কি কুম্ভরত্ন গত রত্নে পড়িতে পারে? ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল জগদ্বৈভব মূর্খ লোকের দৃষ্টিতে

বজ্ররেখার মত চিরস্থায়ী কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা জলতরঙ্গে চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব মত ক্ষণভঙ্গুর। রাজহংস যেমন কুৎসিত শৈবালজলে অনুরক্ত হয় না সেইরূপ আত্মার আস্বাদ যিনি পাইয়াছেন তিনি এই জল বুদ্‌বুদ সম বিষয়সুখ ভোগে চপল আসক্তি প্রদর্শন করেন না।

স্থিতি ৫৮ সর্গঃ।

পূর্ণপদে স্থিতির দৃষ্টান্ত—কচগাথা।

বশিষ্ঠ—রাম! স্বরূপ বিশ্রান্তি বা আত্মবিশ্রান্তি সম্বন্ধে বৃহস্পতি-পুত্র কচ যে গাথা গান করিয়াছেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সুমেরুর গহন বনে সুরগুরুপুত্র কচ অভ্যাসবশে আত্মবিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানামৃতে বুদ্ধি ডুবিয়া গেল আর তাঁহার রতি পঞ্চভূত দৃশ্য দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। কচ দেখিতেছেন একমাত্র আত্মাই অবস্থিত। যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে কচ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন আজ আমার মধ্যে কল্পনা উঠিয়া যে ত্যাগ গ্রহণ গমন ভোজন সমস্ত করাইতেছিল তাহা একেবারে নিবৃত্ত হইল।

কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥৫

এখন আমার করিবারই বা কি আছে, যাইবারই বা স্থান কোথায়, গ্রহণ ও ত্যাগই বা করিব কি আত্মা দ্বারাই বিশ্ব পরিপূর্ণ দেখিতেছি, কল্পকালে যেন বারিরাশি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকে সেইরূপই দেখিতেছি। সুখও আত্মা, দুঃখও আত্মা, আশাও আত্মা, আকাশও আত্মা, সমস্তই আত্মময়। আমি আজ নষ্টকষ্ট হইয়াছি; বাহ্য অভ্যন্তর ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্তই আত্মা "ইত আত্মা ততশ্চাত্মা নাস্ত্যনাত্মময়ং ক্বচিৎ" শ্রুতিও বলিতেছেন "আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি"।

আমি এখন আত্মাতেই অবস্থিত। আত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুই নাই; চেতন, অচেতন সমস্তই আত্মার রূপান্তর। যেহেতু আমিই সমস্ত, সেই হেতু আমার আর কোন কিছুরই অভাব নাই। আমি পূর্ণ। অনুভবময় এক আমি একার্ণবের ন্যায় বিশ্বব্যাপিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি।

এই চিন্তা করিতে করিতে কচ মহারাজ কনকাচলকুঞ্জে দীর্ঘঘণ্টা নিনাদবৎ ওঁঙ্কার ধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনির বিরামে তিনি তুরীয় পদপ্রাপ্ত হইলেন আর তিনি অন্তরে বাহ্যে পরমপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর কলনা কলঙ্ক নাই, প্রাণবায়ুর বৃত্তিও অন্তর্লীন হইল। আর কোন ভ্রম নাই। তিনি শুদ্ধ নির্ম্মল মেঘবিহীন শরদাকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

স্থিতি ৫৯ সর্গঃ।

বিষয় অসারতা ও ব্রহ্মার কার্য্য।

বশিষ্ঠ অন্নপানাঙ্গনাসঙ্গাদৃতে নাস্তীহ কিঞ্চন।
শুভমস্থিতি সম্বাদি মহান্ কিমিব বাঞ্ছতু ॥১

এই সংসারে অন্ন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়দ্বারা জিহ্বা-উপস্থাদি ইন্দ্রিয়ের যে সঙ্গ তাহাতে কিছু শুভ নাই ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি এই জগতে আর কি বাঞ্ছা করিবেন? অসাধু পুরুষেরা পশুপক্ষ্যাদির মত ক্ষণ ভঙ্গুর ভোগেই আস্থাবান। কিন্তু ভোগ সকল আদি মধ্য অন্ত সকল অবস্থাতেই অতি ক্ষণস্থায়ী। যাহারা এইরূপ ভোগে বিশ্বাস করে তাহারা নিশ্চয়ই নর গর্দ্দভ। এদিকে কেশ, এদিকে রক্ত এইত প্রমদা দেহ। যাহারা ইহাতেই আনন্দ পায় তাহারা সারমেয় (সরমা দেব কুকুরী তৎ সন্তান সারমেয়) কুকুর, মানব নয়। সমুদায় পৃথিবীই মৃত্তিকা, সকল বৃক্ষই কাষ্ঠ, সমুদায় দেহই মাংসময়। নিম্নে ভূমি-

---

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মূল্য হ্রাস।

আমরা গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬।২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১।০ দিয়া আসিতেছি। কিন্তু যাঁহারা ১৩৩৪ সালের গ্রাহক হইয়াছেন এবং পরে হইবেন, তাঁহারা ১।০ স্থলে ১৲ এবং ১৩২৮ সাল হইতে ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৩৲ স্থলে ২৲ পাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্ত ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩৩৫ সাল। [৯ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক।

উৎসব

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৩শ বর্ষ। | পৌষ, ১৩৩৫ সাল। | ৯ম সংখ্যা

গীত।

বুকে ব্যথা না পেলে কি সুখে তারে পাওয়া যায়
দুঃখে না পড়িলে পরে সুখে কেবা ডাকে হায়।
সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়
ওগো সুখের নেশায় মাতাল হলে গুরু ব'লে হায় কেবা ধায়।
কাঁদলে পরে গুরু বলে আর কি গো থাকে ভুলে
অমনি এসে নেয় গো কোলে চোখের জল মুছায়ে লয়।

লক্ষ্মী ৺কাশীধাম

মাধবী বল্লরী।

আজ মানব-জীবনের যে সমস্ত সমস্যা—কঠিন সমস্যা আমাদের সমাজকে ধূমায়িত করিতেছে, ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এই প্রবন্ধে সেই সমস্ত বিষয় আমাদিগকে ব্যথিত করিয়াছিল। কতদিন হইতে এই সমস্ত জীবন-সমস্যা অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করা ঐতিহাসিকগণের কার্য্য। আমরা আমাদের পঠদ্দশায় যাহার অঙ্কুর মাত্র দেখিয়া প্রতিকার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাই পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত দেখিতেছি।

প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে "মাধবী বল্লরী" ৺হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের কর্ণধার পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় টুকটুকে রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—তাহাই সেদিন আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা আমাদের সেকালের লেখা পড়িয়া বুঝিলাম নবকৃষ্ণ বাবু ইহাকে পুনর্মুদ্রিত করিতে বলিতেছেন। সময়ের উপযোগী হইবে বলিয়া—এবং যৌবনের চিন্তা বলিয়াও আমরা ইহা উৎসব পত্রে পুনরায় প্রকাশিত করিলাম। বাল্য-বিবাহ, অবরোধপ্রথা, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, আহারে স্পর্শদোষ,—এক কথায় জাতিকে একাকার পথে আনয়ন করা অথবা ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে আপনা হইতে জাতীয় একাকারিতা সমাজে আসিয়া পড়িলেও এই নবীন সভ্যতার সঙ্গে একবার প্রাচীন আদর্শের তুলনা না করিয়া প্রাচীন আদর্শকে চিরবিদায় দেওয়া—ইহা কোন বুদ্ধিমান নবীন যুবক বা নবীনা যুবতীর পক্ষে বুদ্ধিমত্তার কার্য্য হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি। বঙ্গদেশের মহোজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ স্যার জগদীশ বসু বিজ্ঞান দিয়া দেখাইতেছেন ভারতকে ভারত রাখাই ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। সেইজন্য ভারতের প্রাচীন আদর্শ ত্যাগ করিয়া সমাজ-গঠনে চেষ্টা করা আর বৃদ্ধা জননীকে সংহার করা—একই কথা। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আফ্রিকা, ইয়ুরোপ এবং ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন—ভারতের প্রাচীন আদর্শই শুধু ভারতকে নহে, আধুনিক জগতকেও উন্নত করিতে সমর্থ। সেদিন ৺কাশীধামে যে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী হইয়া গেল

তাহাতেও আসমুদ্রহিমাচলাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন আদর্শ রক্ষার জন্যই সমবেত হইয়াছিলেন।

আমরা আজ ত্রয়োবিংশ বর্ষ ধরিয়া সমাজের অভাব ও তৎপ্রতিকারের জন্য ভারতের ধর্ম্মভাব—ধর্ম্মজীবন ও সাধনার কথাই বলিয়া আসিতেছি। প্রবুদ্ধ-ভারত, বেদান্ত-কেশরী—এই দুই সুচিন্তিত ইংরাজী মাসিকেও প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে ইহার আলোচনাও দেখিতে পাই। সেদিন পাটনা সহরে শুনিয়া আসিলাম সেখানকার শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ মহিলা কংগ্রেস করিয়া প্রাচীন আদর্শ জাগরিত করিবার আয়োজন করিতেছেন।

বহুপ্রকারের স্রোত সমাজে চলিতেছে। আমরা আধুনিক যুবকযুবতী সম্প্রদায়কে একদেশ মাত্র দেখিয়া সামাজিক পরিবর্ত্তন না আনিয়া আমাদের যাহা ছিল তাহার মধ্যে উত্তম বস্তু গুলি রক্ষার জন্য ও প্রাচীন আদর্শের আলোচনা করিয়া যাহার চিরবিদায় প্রার্থনীয় তাহাই সংহার করিতে বলি।

"মাধবী বল্লরী" শ্রীমতী সরোজমোহিনী দেবীর লেখা। তিনি এখন কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন তাহা আমাদের জানা নাই। তাঁহার এই অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা ও তাহাতে আমাদের মন্তব্য—ইহার উভয়ই রক্ষার জন্য আমরা ইহা পুনরায় মুদ্রিত করিলাম।

আমরা আগামীতে এই উৎসব পত্রে এই সমস্ত নবীন পথের সম্বন্ধে প্রাচীন পথের যাহা যাহা জ্ঞাতব্য তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যুবক ও যুবতীগণ, নবীন ও প্রাচীন উভয়েই জানুন, জানিয়া যাহার সমর্থন ও প্রচলন সমাজের জীবন রক্ষা করিবে তাহারই অনুসরণ করুন—এই দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোনরূপ বিবাদবিসম্বাদ এই সঙ্কট সময়ে আনয়ন করাও যাহা—আর সমাজকে ধ্বংস পথে ধাক্কা দেওয়াও তাহাই। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রেরণা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।
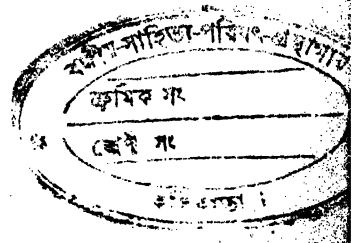
মাধবী বল্লরী।

(প্রবন্ধের কোন পরিবর্ত্তন করা হইল না।)

প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইল, "সংস্কৃত চন্দ্রিকা" নামক সংস্কৃত পত্রিকাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি জাতীয় সর্ব্বোচ্চ ভাবে স্বর্গীয় ভাষায় গীত। কবিতাটি স্ত্রীলোকের লেখা। বাঙ্গালার অনেক পুরুষ কবির এত উচ্চ—এত মধুর কবিতা পাঠ করি নাই। কবিতার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া সেই সময়ে আমার মন্তব্য লিখিয়া রাখি। মনে করিয়াছিলাম, কোন জ্ঞানী সমালোচক ইহার সুন্দর সমালোচনা করিবেন। তখন আমারও অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে।

দেশের দুর্ভাগ্য, কেহ আজও রত্ন আদর করিতে শিক্ষা করে নাই। আজ কাল যাঁহারা কবি নামে পরিচিত তাঁহাদের অনেকেই সমালোচক মহাশয়-দিগকে ঘুষ দিয়া "কবি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। বঙ্গ সাহিত্যে এই গাছড়াগুলির দৌরাত্ম্যে সুন্দর ফুলের চারা বড় একটা উঠিতে পায় না।

যে কারণেই হউক, কেহ সমালোচনা করিলেন না দেখিয়া আমরা অপারগ হইয়াও যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাই আজ "কর্ণধারের" পাঠক পাঠিকা দিগকে উপহার দিলাম।

কবিতাটি এই :—

মাধবী বল্লরী। *

১। নূতন বাসন্ত্যস্থ সুহাস্যে,
কুড্ডল ফুল্লে শ্যামল পত্রে
কিন্তুভিধেয়ং তে সুলতে হি
শান্তিময়ি! ত্বং মাং কথয়েদম্।

---

* শ্রীমতী সরোজমোহিনী দেবী,
কাশীপুর।

২। সৌরভপূর্ণে মন্দ সমীরৈ
ঘূর্ণিতদেহে শীর্ণসুকায়ে
মাধবি কস্মাৎ এষি সুসাধ্বি !
শান্তময়ি ! ত্বং মাং কথয়েদম্।

৩। ফুল্লপ্রসূনৈর্নিত্যামুষসি
শোভিনি ! কস্মৈ পূজয়সি ত্বম্
শুভ্রতুষারৈ সাশ্রুসুনেত্রা
শান্তিময়ি ! ত্বং মাং কথয়েদম্।

৪। বল্লরি ! কিং মেত্বিন্দ্রিয়চিত্তম্
সুন্দরি ! প্রাপ্স্যত্যুত্তমরূপম্
সুস্মিতবক্ত্রে দেবি সুসীমে
শান্তিময়ি ত্বং মাং কথয়েদম্।

৫। ইহ মর্ত্ত্যতলে সুঘনে সুঘনে
সলিলে বলিসদ্মঋভুসদনে
শিশিরাক্ত সুচন্দ্রমসঃ কিরণে—
চপলা সুতড়িত্যনলে পবনে

৬। ক্ষিতিভৃৎশিখরে তটিনীপুলিনে
মরুভূমিতপোবনপদ্মবনে
অতলে জলধৌ গহনে বিজনে
নবনীলময়ে বিমলে গগনে।

৭। দীপ্তিবিহীনং, মূর্ত্তিবিহীনম্
চিত্তবিহীনং নামবিহীনম্
পারবিহীনং সম্বিততীতম্
কুত্র লতে প্রাপ্স্যামি তমীশম্ !

৮। তং পরমাত্মানং পরমেশম্
মোহিতচিত্তে জ্ঞানপ্রদীপম্
নাথমনন্তং ভাস্করনেত্রম্
সুন্দরি ! কিং প্রাপ্স্যামি তমীশং।

৯। তদিতু ভুবনে বৈ তৎসমা চারুশীলা—
কুহকদুরিতপূর্ণে নাস্তি প্রেমামৃমত্তা

সকলসমকপ্রাণোনির্ব্বিকল্পস্য তস্য
বর কুসুম সুকেশি! তং হি ধন্যা ধরণ্যাম।"

ভাব ও ভাষা লইয়াই কবিতা। জড়জগতে শক্তি (force) যে ভাবে কার্য্য করে, অন্তর্জগতে কবিতাও সেই ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সুন্দর ভাব সুন্দর ভাষায় পরিস্ফুটিত হইলে জড় বস্তুও জীবিত পদার্থের শক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই জীবন্ত ভাবে মনুষ্যের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। সুন্দর ভাব অন্তরে অনুভব করিয়া কবি দেখিতে পান, জড় ও অন্তর্জগৎ রূপ দুই শাখা বিস্তার করিয়া ভগবান বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

যেরূপ একটি বৃক্ষের সহিত তাহার অতি ক্ষুদ্র পত্রেরও সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ এই বিশাল শরীরী ব্রহ্মাণ্ডের সহিত প্রতি পদার্থের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই সমস্ত দেখিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন,—

"তব নিশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ
বিশ্বভূতানি তে পাদঃ শীর্ষোদ্দোঃ সমবর্ত্তত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতি,
চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্য স্তব প্রভো॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব
ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥"

এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে কবির ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে প্রণয় নাম দিতে হয়। মণিমালাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে যেমন সূত্র, অনন্ত জীব জন্তু পরিপুরিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড একত্রিত রাখিয়াছে সেই রূপ প্রণয়। কবিত্ব এই সম্বন্ধ দেখাইবার শক্তি (Power of interpretation)।

"মাধবী বল্লরী"র ভাব ও ভাষা সমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভাষার কথা আমরা বলিব না। ভাব লইয়া আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। হৃম্মর্ম্মে প্রবেশ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এক জাতির সহিত আর এক জাতির যতই কেন সাদৃশ্য থাকুক না, নানা কারণে এক এক জাতির এক একটি বৃত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অন্য কোন জাতির দুই এক জনের এই রূপ বৃত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই পরিপুষ্ট ভাব অন্য কোন জাতির আপামর সাধারণের এত প্রিয় হয় না।

এই যে আজ এই ঘোর অরাজকতার দিনে আমাদের জাতীয় সুচিহ্নিত ভাব ধীরে ধীরে জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, বিজাতীয় রাজার আধিপত্যে বিজাতীয় ভাব সমূহ অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া জাতীয় ভাবকে মলিন করিতেছে, রাজার কৌশল অধিক, শাসন দুরূহ,—এজন্য বিজাতীয় চিন্তা স্বভাবের বিরোধী হইয়াও সমস্ত জাতিকে বিষণ্ন করিয়া তুলিতেছে, যেন আমরা কি এক মহামূল্য রত্ন হারাইতেছি, অথচ ভাল করিয়া বুঝিতেছি না, আমাদের কি অপহৃত হইতেছে;—এই ঘোর বিপ্লবের দিনে যদি কাহারও মুখ হইতে আমাদের পিতৃপিতামহাগত সেই জাতীয় ভাবের কথা শুনিতে পাই, যদি কোন ক্ষমতাবান অথবা ক্ষমতাবতী কবিকে সেই জাতীয় ভাব মধুর ভাষায় ধ্বনিত করিতে শুনি, তখন আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়?—

কিরূপ হয়, মুখে তাহা বলা যায় না, ভাষায় তাহা সঙ্কুলন হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের সহিত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ প্রাণে প্রাণে জড়িত। যদি এই স্থূল জগৎ ভেদ করিয়া অন্তর্জগতের অন্তস্তলে আমরা প্রবেশ করিতে পারি, সেখানে দেখিতে পাই—সৌন্দর্য্য। স্থূল জগৎ সৌন্দর্য্যের আবরণ মাত্র। সৌন্দর্য্য-জগৎ জগদান্তরে বিরাজিত। কিন্তু সৃষ্টির এমনি কৌশল, যেন বাহ্যজগতে শত শত দ্বার এই সৌন্দর্য্য জগতের জন্য উন্মুক্ত। এই উন্মুক্ত পথে নিরন্তর মধুর ধ্বনি উঠিতেছে। কে যেন কোন কালে সেই স্থূলজগতের মূলে দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজাইয়া গিয়াছে। যেন সে বংশী এখনও অনন্ত রন্ধ্রে অনন্ত জীবের নাম লইয়া অনন্ত জীবকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। ভক্ত বলেন, পরমাত্মা এমনি করিয়াই জীবাত্মাকে ডাকিতেছেন।

এক সময়ে বৃন্দাবনে এই মুরলী শ্রুত হইয়াছিল। ষষ্ঠীসহস্র আত্মা এই বংশীধ্বনি শুনিয়া আত্মহারা হইত। ষষ্ঠী সহস্র গোপিনী উন্মত্তা হইয়া বলিত, "হায়, কাহার বাঁশী, এত মধুর রবে কেন আমায় ডাকিতেছে?" এ স্থূল গৃহ তাহার ভাল লাগিত না, এ সংসারে তাহার মন বসিত না, সে সংসারে কাজ করিত ভোলা মনে; সুতরাং কাজ আর ভাল হইত না। সে কাজ করিতে করিতে সব ফেলিয়া দিয়া শুনিত, বুঝি বাঁশী আবার ডাকিতেছে। কোকিলের রব শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিত, রজনীর নিস্তব্ধতায় সে অস্থির হইত, সে অস্থির আত্মা কেবল সময়ের অপেক্ষা করে; যখন সংসার

সুপ্ত, তখন অতি ধীরে, অতি সংগোপনে, অতি নীরবে সংসার ফেলিয়া বাহির হইত। যখন বুঝিত, কেহ দেখিল না, তখন কাতর পদে সেই বাঁশরী পানে ছুটিত। হায়, যে একবার সেখানে গিয়াছে, যে একবার একাধারে সেই অনন্ত রূপ—অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, যে একবার দেখিয়াছে, কোথা হইতে সেই মধুর বংশী অনন্ত জীবের নাম লইয়া অনন্ত ভাবে বাজিতেছে, যে একবার সেই ত্রিভুবন সন্তাপহারী, ত্রিভঙ্গ মুরারী বংশীধারীর হস্তে ত্রিভুবন মোহন বংশী দেখিয়াছে, হায়! আর কি তাহার সংসার ভাল লাগে? আর কি সে সে সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায়? ইচ্ছা—তাঁর চরণের নূপুর হইয়া নিরন্তর সে বাঁশরী শুনিতে পায়।

একদিন গোপবধূ সেই বংশীধ্বনি শুনিয়াছিল, এক দিন রাধা (প্রধান ভক্ত) সেই উন্মুক্ত পথে ছুটিয়াছিল। এখনও সেই সকলই আছে,—সেই বৃন্দাবন আছে, সেই তমাল আছে, সেই গোপবধূ আছে, সেই মুরলী আছে; অনন্ত রন্ধ্রে অনন্ত নাম লইয়া নিরন্তর সেই ভাবে ডাকিতেছে। কিন্তু হায়, গোপবধূ (জীবাত্মা) আর সে বংশীধ্বনী শুনেনা,—হায়! আজ সমস্ত জাতির অন্তর মরুভূমির মত পড়িয়া রহিয়াছে। আর এ হৃদয় ভক্তিপ্রেমে মজিয়া উঠে না, আর এ জাতি জগৎ ভরিয়া বিশ্বনাথের মোহনমূর্ত্তি দেখিতে পায় না। ভারত ভরিয়া আজ হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র অশান্তি, সর্ব্বত্র অরাজকতা। এক সময়ে কত সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিতাম; ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ ছিল। এখন ইহাদের বিরহ অনুভব করিতেছি। এক সময়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ দেখিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।—

"নমে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং
স্পৃহাবতী বস্তুষুকেষু মাগধী।"

পড়িয়া মনে বড় আমোদ হইত। এখন আর তাহা নাই। এক সময় স্বামী স্ত্রীকে দেবী সম্বোধন করিতেন, স্ত্রী স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলিয়া ডাকিতেন; স্বামী গৃহে আসিলে স্ত্রী উপচারাঞ্জলি ক্ষিপ্রহস্তা, পরিপ্লবনেত্রা হইয়াও সম্ভাষণ করিতেন; তখন মনে বিশুদ্ধ আনন্দ হইত। এখন দেশ ভরিয়া কোথাও ইহা দেখিতে পাই না। আজ আদর্শের অভাব হইয়াছে। যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, যাহা পবিত্র—তাহার অভাব। শুদ্ধ অভাব

নয়—বিরহ। পূর্ব্বে আমাদের ছিল, এখন গিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা গৃহে গৃহে অর্জ্জুনের কথা শুনিতাম। তিনি এক বৎসর ধরিয়া উত্তরাকে শিক্ষা দিয়াছেন। বালিকা হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছে; কিন্তু অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে উত্তরাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেছেন। অগ্রজ অনুরোধ করিতেছেন—উত্তর আগ্রহ জানাইতেছেন, রাজা উপযাচক হইয়াছেন,—কিন্তু যাহাকে শিক্ষা দিয়াছি, সে যে কন্যা। তাহাকে বিবাহ করিব কিরূপে? হায়, এ প্রবৃত্তির উপর অধিকার আর ত দেখিতে পাই না। যাহাকে উর্ব্বশী স্বর্গীয়া অপ্সরা হইয়াও প্রলোভন দেখাইতেছে, হাসিতে হাসিতে সে উত্তর দিতেছে—

"কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রানী,
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে জানি।

* * *

কুলের জননি! ক্ষমা করিবে আমারে।"

হায়, এ শিক্ষা এখন কোথায়?

এইরূপে যে দিকে দেখি, সেই দিকেই বিকার। এক সময়ে সকলি ছিল, স্বামী স্ত্রী, শিক্ষক ছাত্র, অগ্রজ কনিষ্ঠ, পিতা, পুত্র, ইহাদের পরস্পর দেবতা মনুষ্য সম্পর্ক ছিল। এখন ইহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশে দেশে ধনধান্য ছিল, সুখসম্পদ ছিল; এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এক সময়ে উচ্চভাবে কবি গান গাহিতেন, গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখিতেন; শিক্ষক শিক্ষা দিতেন, এখন তাহার বিরহ। এক সময়ে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে নিঃস্বার্থভাব ছিল, অতিথি পুত্রাপেক্ষা আদৃত হইত, এখন আর তাহা নাই। এক সময়ে লোকের উচ্চ প্রবৃত্তি সতেজ ছিল, হৃদয় বর্ষাকালের নদীর মত সৎপদার্থে পূর্ণ ছিল। এখন তাহার বিরহ। তাই যদি কেহ কাঁদে, "কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুঃখভার" তখনি হৃদয় বড় কাঁদিয়া উঠে। অমনি প্রকৃত কথা স্মরণ হয়। এখন যে আর চাঁদ চকোরে কেলি করে না, ভ্রমর কমলে মিলিত হয় না, তড়িৎ মেঘে খেলা করে না। স্মরণ হয়, আর যে বিধবা ঈশ্বরে মিলিত হয় না, আর যে সধবা স্বামীর জন্য আত্মহারা হয় না, আর যে কবি প্রকৃতির জন্য উন্মত্ত হয় না, আর যে হৃদয়ে মুখে সমতুল হয় না, আর যে ধর্ম্মে মানুষে দেখা হয় না। হায়, এখন ভারতবাসী প্রকৃতই বুঝি ইহাদের বিরহ অনুভব করি-

তেছে। এইজন্য দেশ মলিন স্ফূর্ত্তিবিহীন। দেশ শ্মশান হইতেছে, দিন দিন অল্পে অল্পে সোণার ভারত পুড়িতেছে। চারিদিকে আগুন লাগিয়াছে, কেহ উপকারার্থ আসিতেছে না। কেহ সাহায্য করিতে পারিতেছে না। যাহারা আসিতেছে, তাহারা দুর্ব্বল। জ্বলন্ত চিতা হইতে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহাদের নাই। মাথার উপরে গৃহ পুড়িতেছে—স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আজ সকলেই গৃহে আবদ্ধ। গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে দগ্ধ গৃহ হইতে অগ্নিখণ্ড গাত্রে পড়িতেছে,—স্ত্রী পুত্র সহ ভারতবাসী হাহাকার করিয়া উঠিতেছে ;—হায়! এ যাতনা সহ্য হয় না। আজ যে ইহারা অসহায়, অতি নিরুপায়—নানা অভাবে চক্ষের উপর স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কুলত্যাগ করিতেছে—আর ত ইহা দেখিতে পারি না। চারিদিকে হাহাকার সকল গৃহেই একেবারে আগুন লাগিয়াছে—আজ যে আগুন দিয়াছে, বিপন্ন ভারত তাহার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে,—হায়, তাহারাই যে শত্রু।

তাই বলিতেছিলাম, জীবন ত গিয়াছে। কতকগুলা দেহ, গলিত ঘৃণিত কৃমি কীট পরিব্যাপ্ত প্রবৃত্তি লইয়া স্বার্থে ডুবিয়া রহিয়াছে।—'চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। হায় মা! এ সময়ে—এই গভীর দুর্যোগে শব সাধন করিয়া কে আর তোমার উদ্ধার করিবে?"

কিন্তু কি বলিতেছিলাম—সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য আর কেহ দেখে না। যাঁহারাও দেখেন, তাঁহাদের সংখ্যা দুই একটি। এই দুই একটির মধ্যে "মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী একজন।

দেখিয়াছিলেন, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, দেখিয়াছেন, "মাধবীবল্লরী রচয়িত্রী। বঙ্গসাহিত্যে দুই এক জন যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সমুদ্রতীরে কত শঙ্খ পড়িয়া থাকে, শঙ্খ তুলিয়া কর্ণের নিকট ধর, শুনিবে সেই গভীর সমুদ্র গর্জ্জন শঙ্খের প্রাণে প্রাণে জড়িত। এক সময়ে সেই বিশাল সমুদ্র নিনাদ শঙ্খের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ শঙ্খ সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে। তুমি ভক্ত, একবার ভক্তির কাণ পাতিয়া শুন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে সেই গভীর সচ্চিদানন্দ ধ্বনি শুনিতে পাইবে, —শুনিতে পাইবে "সোহং"। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ তাহাই শুনিয়া ছিলেন,— তাই বলিলেন, "Such a shell is this universe to a ear of faith." মাধবীবল্লরীর কথা পরে বলিব।

তাই বলিতেছিলাম, যদি কেহ সেই সৌন্দর্য্য দেখে, আর যাহা দেখিয়াছে, তাহাই দেখাইতে চায়, তখন মনের অবস্থা কিরূপ হয় ?

ঠিক করিয়া বলা যায় না—কিরূপ হয়।

যাহা জগতে সুন্দর দেখিয়াছি, যেন একসঙ্গে সকল ভাব ফুটিয়া উঠিতে চায়। সে ভাব ব্যক্ত হয় না—যদি বলি সুযোষিত বল্লকী নিপুণ যন্ত্রীর কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে যেমন নাচিয়া উঠে, মধুমাতল শত শত মধুকরের এককালীন ঝঙ্কারের ন্যায় যেমন ঝঙ্কার দিয়া উঠে আমাদের আত্মাও সেইরূপ উন্মত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় ঝঙ্কার করিতে থাকে তবুও যেন সব বলা হইল না এইরূপ বোধ হয়। যদি বলি নিদাঘে রজনীশেষে গঙ্গা সৈকতশায়ী, প্রভুতবলশালী উন্মত্ত মাতঙ্গ সমীপে তৎপ্রবোধনার্থ মদপটু রাজহংস সমূহের মধুর গীতি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে যেমন হয়—যদি বলি সেই সমুদ্রতটে গোকর্ণ নিকেতন দেবাদিদেব মহাদেবের সমীপে বল্লকী হস্তে অপ্সরাগ্রথিত পারিজাত পুষ্পখচিত দিব্যমাল্য সহিত, ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত দেবর্ষি নারদকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিলে যেমন হয়, তবুও যেন সব বলা হইল না বোধ হয়।

"মাধবীবল্লরী"রচয়িত্রী সেই জাতীয় ভাব স্পর্শ করিয়াছেন,—আর্য্যঋষিদিগের যাহা বড় সাধনার ধন, বড় আগ্রহের সামগ্রী, যাহা প্রচারের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, যাহা সমগ্র জাতির চরিত্র গঠিত করিয়াছিল, সেই জাতীয় চরিত্র কি ? সমস্ত হিন্দু জাতির পৈতৃক সম্পত্তি এই "সাত্ত্বিক ভাব।" —যাহার জন্য নারদ উন্মত্ত, চৈতন্য পাগল ; যাহার জন্য মহাদেব বর্ষণোন্মুখ জলপূরিত অথচ নিস্তব্ধ মেঘের ন্যায়, কোটি কোটি জীবজন্তু লুক্কায়িত অথচ অচঞ্চল তড়াগের ন্যায় ধ্যানস্তিমিত ; যাহার জন্য আর্য্যঋষি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, এ সেই সাত্ত্বিক ভাব। কবি সেই জাতীয় চরিত্রে ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণা মুগ্ধা মুনিকন্যার মত মাধবীবল্লরী দেখিয়া আলাপ করিতেছেন ! তোমার আমার চক্ষে কত মাধবীবল্লরী পড়িয়াছে, কত মাধবী ফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু মাধবীবল্লরী আমাদের আছে সেই লতিকা মাত্র, সেই সুখদুঃখ বিরহিতা, মনুষ্যপ্রণয়প্রত্যর্পণ-অসমর্থা সামান্যা লতা। কারণ আমরা দেখিতে জানি না, হৃদয় হইতে সেই মসৃণ, সেই কি-জানি-কি পদার্থ তুলিয়া লতিকাকে স্নাত করাইয়া সুখদুঃখ গ্রাহী করাইতে জানি না, নিজের প্রাণ দিয়া তাহাকে সজীব করিতে পারি না, তাই সে

আমাদের চক্ষে শুধু লতিকা। শুধু ফুল ফোটে, শুধু গন্ধ ছোটে, এই মাত্র জানি। এইজন্য আমাদের দর্শন সুখ বা আঘ্রাণ সুখ ক্ষণিক। কিন্তু "মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী দেখিতে জানেন। প্রথম বসন্তাগমে মাধবী অল্পে অল্পে ফুল ফুটাই-তেছে, শ্যামলপত্র পরিয়াছে, মধুর হাস্য করিতেছে। কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সুলতে, শান্তিময়ি! তোমার নাম কি?"

প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা। তোমার আমার কাছে এটা এক অসম্ভব কথা। মাধবীলতা একটা অচেতন পদার্থ—ইহার নাম জিজ্ঞাসা বাতুলতা। কালিদাসের যক্ষ বুঝি এই বাতুলতা করিতেছিল।—রামগিরির আশ্রমে পবিত্র সরোবর—তাহার তীরে স্নিগ্ধচ্ছায় তরুতলে বসিয়া কত কি ভাবিতে ছিল,—দিন যায় মাস যায়, ভাবনা ফুরায় না—ভাবিতে ভাবিতে শরীর অবসন্ন হইল—হস্তস্থিত বলয় খসিয়া পড়িল—হঠাৎ এক দিন যক্ষ দেখিতে পাইল পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর একখানা মেঘ আসিয়া যেন ক্রীড়া করিতেছে অন্তর্বাষ্প সেই যক্ষ মেঘাগমে অস্থির হইল—মনে করিল, ইহার নিকট সংবাদ পাইব—তখন তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল।—জিজ্ঞাসা করিল, ভালয় ভালয় আসিয়াছ ত? পাছে লোকে বাতুলতা মনে করে, এই ভাবিয়া কালিদাস সন্দেহ মিটাইতে বসিলেন—তোমার আমার মনের কথা আমাদিগকে মুখে প্রকাশ করিতে না দিয়া বলিলেন, "ধূম জ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্কমেঘঃ সন্দেশার্থাঃ ক্কপটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়া ইতৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে কামার্ত্তা হি প্রকৃতিক্বপণা শ্চেতনা চেতনেষু।" কালিদাস দেখাই লেন, প্রণয় উত্তেজিত অন্তঃকরণ চেতনাচেতন বিচার করে না। একটু ঘুরাইয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, যখন "কো জানে কাহে কাহে লাগি আকি-সিঞ্চই" এই বলিতে বলিতে হৃদয় কাতর হয়, যখন সংসারের আদর্শের বিকার দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, যখন সংসারের গর্হিত আচরণ দেখিয়া পবিত্র উন্নত হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ হয়, সমস্ত সৎবৃত্তি স্ফুরিত হইয়া হৃদয়ভূমি অতিক্রম করিয়া উছলিয়া পড়ে, তখন ত কেহ অচেতন' থাকে না; সেই আবেগ জলে সমস্তই স্নাত হইয়াছে, যাহা দেখি—তাহাই সজীবতা লাভ করিয়াছে, সকলেই আমার হৃদয় লইয়া আমি যাহা দেখিতে চাই, তাহাই দেখাইতেছে। তখন আমার হৃদয় শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমারই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। আমি যাহা চাই, সংসারে তাহাত পাই না;—পাইনা বলিয়াই হৃদয় ব্যাকুল—ব্যাকুল বলিয়াই হৃদয় সুন্দর বস্তু দেখিলেই তাহাকে সজীব করিয়া লয়—তাহাকে তাহার মনের

কথা জিজ্ঞাসা করে। "মাধবী-বল্লরী" রচয়িত্রী তাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তোমার নাম কি?"

এইখানে কবিদিগের একটু শক্তির কথা বলা আবশ্যক। তুমি যদি কখন কবির অবস্থায় পড়, তবে তুমিও তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে পারিবে।

"মাধবী-বল্লরী" রচয়িত্রী নবম শ্লোকে "সংসারের" একটি মাত্র বিশেষণ দিয়াছেন। কবি সংসারকে বলিতেছেন—"কুহুক দুরিতপূর্ণ।" সংসার কুহুক দুরিতপূর্ণ। আইস পাঠক, একবার অনুভব করিয়া বল, সংসার কুহুক দুরিত-পূর্ণ। তাহা হইলে তুমিও মাধবীর সহিত কথা কহিতে পারিবে, তুমিও আত্ম-হারা হইতে পারিবে। আত্মবিস্মৃতিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যে মুহূর্ত্তে হৃদয় হইতে "কুহুক দুরিতপূর্ণ" কথা আপনা আপনি বাহির হইবে, সেই মুহূর্ত্তে দেখিবে, তোমার আত্মা উন্নত হইয়াছে। তোমার আত্মা সংসার-সংকল্প ছেদন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তুমি সংসারে ডুবিয়া থাকিলে কিরূপে বুঝিতে, সংসার ভাল কি মন্দ? পশু নিজের পশুত্ব বুঝিতে পারে না। পশু হইতে উন্নত মানব তাহা বুঝিতে পারে। তবে মনুষ্য নিজের মনুষ্যত্ব বুঝিবে কিরূপে? যখন মানুষ নিজের নিজত্ব বিস্মৃত হয়, নিজের ক্ষুদ্র জগৎ ভুলিয়া উপরে উঠে, সেই উচ্চস্থান হইতে মানুষ দেখিতে পায় পূর্ব্বে কি ক্ষুদ্র ছিল। এই আত্মবিস্মৃতি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই আত্মহারাই বুঝি জগতে প্রকৃত সুখ।

এই শক্তি আছে (Thought contranscent) এই জন্যই মনুষ্য Spiritual, যখন এই উচ্চ জগতে যাইবে, তখন দেখিতে পাইবে, সংসার কুহুক দুরিতপূর্ণ।

যদি ইহা অনুভব করিতে পার, তবে আইস, একসঙ্গে বলি, একটি বিশেষণে অন্তরের কতখানি ব্যাকুলতা কতখানি উচ্চতা প্রকাশ পাইয়াছে।

সংসার মায়া ও পাপে পূর্ণ! আমি ইহাতে ডুবিয়া থাকিতে চাইনা। আমার হৃদয় চায়, সরলতা—পবিত্রতা। ইহা কোথাও দেখিতে পাই না, যাহাদিগকে পবিত্র মনে করি, যাহাদিগকে সরল মনে করি, যাহাদিগকে উন্নত ভাবি, কৈ ব্যবহারে ত তাহা দেখিতে পাই না। শতবার ভাবিলাম, শতবার প্রতারিত হইলাম। আবার আশা—হয়ত আবার দেখিতে পাইব। আবার ভাবি, আবার প্রতারিত হই। কি অশান্তি! জুড়াইবার স্থান নাই। দেখি সংসার কি এক স্বার্থে ডুবিয়া রহিয়াছে। নীচতা, কপটতা ক্ষুদ্রত্বের উপর সারল্যের

একটা আবরণ দিয়া লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসার প্রবৃত্তির পূজা করিতেছে। ইহাতে ত অন্তর তৃপ্ত হয় না।

সংসারের সকল কার্য্যেই যখন হৃদয়ে এইরূপ অশান্তি, তখন কিন্তু কবির চক্ষে সংসার কি সুন্দর! প্রাণ যাহা চায়, তাহা পায়। এখানে একটি মাধবী বল্লরী পড়িয়া আছে। তাহা দেখিতেছি,—প্রাণ ভরিয়া হাস্য—সারল্যের প্রতিকৃতি—শান্তির আধার—ইহাকে কেন জিজ্ঞাসা করি না? এত শান্তি, এত হাসি, এত সরলতাত এ সংসারে আর নাই, কবি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই অশান্তির রাজ্যে তুমি "শান্তিময়ি! তুমি বাসন্তি, সুলতে, হাস্যময়ি,—কিন্ত্বভিধেয়ং।" কি সুন্দর—কি মধুর—কি প্রাণারাম সম্বোধন?

প্রথমে নাম, পরে ধাম। "সুসাধ্বি! শান্তিময়ি মাধবি! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সুমন্দ সমীরণে তোমার দেহযষ্টি ঈষৎ হেলিতেছে, তোমার পবিত্র শরীরের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে, তুমি কি এই পৃথিবীর? সাধ্বি!—এই কপট ব্যভিচার সঙ্কুল পৃথিবীতে তুমি আসিলে কোথা হইতে, তাহা কি আমায় বলিবে না?

কি জিজ্ঞাসা! বুঝি এই অপবিত্র রাজ্যের পরে আর একটি রাজ্য আছে—বুঝি সে রাজ্যে তোমার মত সকলেই সুসাধ্বী। যেমন দূরাগত একটী সংগীত শুনিয়া কিম্বা অপরিচিত একটি পথিক দেখিয়া কি এক স্বপ্নরাজ্যের কথা মনে পড়ে, যেন কখন সেখানে ছিলাম, যেন ইহাদের মত সেখানে কিছু দেখিয়াছি, মনে এইরূপ কত কথা জাগিয়া উঠে—তাই মন আগ্রহের সহিত জানিতে চায়, বলিয়া উঠে "কস্মাৎ এষি।"

প্রথমে নাম, পরে ধাম, পরে কার্য্য। শোভিনি! তুমি কি এক অপূর্ব্ব ক্রিয়ায় নিযুক্ত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নব নব ফুল ফোটাইয়া, তুমি কাহাকে পূজা, করিতেছ? তোমায় চক্ষে এ শুভ্র তুষারাশ্রু কেন? শোভিনি! অশ্রুপূর্ণলোচনে কুসুমরাশি লইয়া কাহার পদে অর্ঘ্য দিতেছ, আমায় কি বলিবে না? আর সংসারের লোক কি ক্রিয়ায় ব্যস্ত!

ইহার নাম তন্ময়ত্ব কি? যে ভাবে ভক্ত বলিয়া উঠেন, "আত্মানমাত্মন্যব লোকয়ন্তং" সে ভাব ভক্তের হৃদয়ে বুঝি অধিকক্ষণ থাকে না। Caird সাহেব বলেন, Religion is the elevation of the finite spirit in to the communion with the infinite, জলবিন্দু অনন্ত সমুদ্র অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াও

দেখিতে পায়, নিজে কত ক্ষুদ্র ছিল। সেই Communion অবস্থায় পড়িয়াও পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করে। যে মনের কোন বিকৃতি হয় নাই, সেই মন যখন উচ্চ ভাব ধারণ করিয়া উন্নত জগতে চলিয়া যায়—যত অল্পসময় সেখানেই থাক না কেন—আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন পূর্ব্বস্মৃতি আসিতে থাকে। এই পূর্ব্ব অবস্থার সহিত আধুনিক অবস্থার তুলনা হৃদয়ের ক্রিয়া নহে—ইহা জ্ঞানের ক্রিয়া। জ্ঞানের ক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, আত্মা তখন আর সেই তন্ময় ভাবে থাকিতে পারেন না।

কবি দেখিতেছেন, কৈ মাধবীর মত তাঁহার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ত সুন্দর হয় নাই। কবি তখন স্মরণ করিতেছেন, মানবাত্মা অসীম—দেখিতেছেন, মাধবী সসীম। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সসীমে! শান্তিময়ি! সুস্মিত বক্ত্রে! তোমার মত সুন্দর চিত্ত ও ইন্দ্রিয় কি আমার হইবে? সুন্দরি! তুমি আমায় এই কথা বল।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য বলিতে পারে, আমি কি ক্ষুদ্র—যে মুহূর্ত্তে বলিতে পারে, আমার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সুন্দর নহে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার আত্মা উন্নত ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত ভাব প্রাপ্ত না হইলে কখনও নিজের নীচত্ব অনুভব হয় না।

যে মুহূর্ত্তে কবি নিজ চিত্তেন্দ্রিয়ের সুন্দর রূপ চাহিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি উন্নত। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া কি এক সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতেছেন। পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্লোকে কবিতার পূর্ণতা। ইহাই কবি হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস।

এখন আর সম্মুখে মাধবী নাই। মাধবী যাহাকে পূজা করিতেছিল, যেন লতিকা কবিকে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে—কবি-চক্ষে চরাচর ব্যাপী কি এক অবর্ণনীয় পদার্থ প্রতিভাত হইতেছে। বলিতেছেন,—

"ইহ মর্ত্ত্যতলে সুঘনে সুঘনে
সলিলে বলিসদ্মঋভুসদনে
শিশিরাশ্রু সুচন্দ্রমসঃ কিরণে
চপলা সুতড়িত্বনলে পবনে
ক্ষিতিভৃৎ শিখরে তটিনী পুলিনে
মরুভূমি তপোবন পদ্মবনে

অতলে জলধৌ গহনে বিজনে
নবনীলময়ে বিমলে গগনে।"

কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ ছড়াইয়া পড়িয়াছে,ইহার নাম ত কবি দিতে পারেন না। ভাষা দিয়া ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। লোকে যাহাকে দীপ্তি বলে, কৈ, এ ত তাহা নহে—ইহার মূর্ত্তি নাই, চিত্ত নাই, নাম নাই, পার নাই,—কৈ ইনি যে জ্ঞানাতীত;—কবি-হৃদয় ইহাকে কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইতেছে না। যখন মন ইহা খুঁজিতেছে, তখন ইহা জ্ঞানের ক্রিয়া। সেই চঞ্চল তন্ময় ভাব দেখা দিয়া বিদ্যুতের মত চলিয়া গিয়াছে, প্রকাশ করিবার চেষ্টা মাত্র তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে।

যখন একবার তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, তখন কি অপার আনন্দ। দেখিতে দেখিতে সে ত চলিয়া গিয়াছে, অন্তর অতিশয় ব্যাকুল। কবি আবার সম্মুখে দেখিলেন, সেই হাস্যময়ী লতিকা—তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, লতিকে, এই মাত্র যাহাকে তুমি আমায় দেখাইলে, আমি কি তাহাকে পাইব? সেই অতিন্দ্রিয়, সেই সর্ব্বব্যাপী, সেই অজ্ঞান হৃদয়ের জ্ঞান প্রদীপ, সেই পরমেশ্বর, সেই অনন্ত ভাস্কর-নেত্র জগন্নাথ—বল সুন্দরি, আমি তাঁহাকে কিরূপে পাইব? কবি এইরূপে দেখিতেছেন, এইরূপে আলাপ করিতেছেন, কি সুন্দর ভাব! কি বিমল আনন্দ!

দার্শনিকেরা আনন্দের উত্তম অধম বাছিয়া থাকেন। যিনি হিন্দুজাতির এই সাত্বিক আনন্দ একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান—ইহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ঐ যে বলিতেছিলাম, অন্য জাতির মধ্যে দুই এক জন কবি আছেন—তাঁহারাও এইরূপ সাত্বিক ভাবপূর্ণ। আমাদের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা মনে পড়ে। যিনি এইরূপ মাধবীবল্লরী দেখিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিতেন। যিনি লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, প্রান্তরে কান্তারে, কাহার যেন সাক্ষাৎ পাইতেন। যিনি সেই অস্তমিত সূর্য্যালোকে, উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সলিলে, জীবিত পবনে, মানব-মনে কাহার বাস-ভবন দেখিতেন, কাহার গতি, কাহার শক্তি, যেন প্রতি পদার্থের মধ্যে দেখিতে পাইতেন; চিন্তাযোগ্য প্রতি বস্তুর মধ্যে কার্য্য করিতে তিনি যেন কাহাকেও দেখিতেন। আমাদের কবি হিন্দু রমণী। এই ঘোর বিপ্লবের দিনে, পরমুখাপেক্ষী সেই উন্নত আর্য্য-জাতির এই অবনতির দিনে, সেই জাতীয় সাত্বিক ভাবে গীতি গাহিয়াছেন।

হেগেল, হিরাক্লিটসের একটি পূর্ণগর্ভ পদ গ্রহণ করিয়া তাহাতে নব সমাজের শত সহস্র ঝঙ্কার তুলিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই কবি যদি অন্য কিছু নাও লিখিয়া যাইতেন,—তাঁহার একটি মাত্র কবিতা পাঠে হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া ঘোষণা করিবেন সন্দেহ নাই। * * *

মাধবীবল্লরীর ভাব নূতন না হইতে পারে, কিন্তু ইহাই কবিত্ব। নূতন ভাবের জন্য দর্শন আছে। কবি চিত্রকর। তাঁহার নিকট নূতন ভাবের প্রত্যাশা করিও না, নূতন ভাব সৃষ্টি কবির কার্য্য নহে। কবির কার্য্য নূতন হৃদয়গ্রাহী চিত্র অঙ্কন—"Interpretation of Nature"। পুরাতন ভাব লইয়া অন্তর্নিহিত কি-জানি-কি পদার্থ মাখাইয়া তিনি অতি সুন্দর—অতি মনোহর আলেখ্য আঁকিবেন। তুমি কবির সহিত একবার তাহা তেমনি করিয়া দেখ, তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে কবির ঝঙ্কার শব্দিত হইবে। তুমি দুঃখের সময়ে—বিষাদের সময়ে একবার হৃদয় নাড়িয়া দেখিও, দেখিবে সেই নিভৃত স্থানে কবির সেই আলেখ্য। কবির নিকট আর কি প্রার্থনা করা যায়? সুন্দর দেখিবেন, সুন্দর আঁকিবেন, ইহাই তাঁহার কার্য্য;—মাধবী বল্লরী রচয়িত্রী কবি, সুন্দর দেখিয়াছেন, সুন্দর দেখাইয়াছেন। যিনি মাধবীবল্লরীকে বলিয়াছেন,—

"তদিতু ভুবনে বৈ তৎসমা চারুশীলা
কুহুকদুরিতপূর্ণে নাস্তি প্রেম্নানুমত্তা
সকলসমকপ্রাণোনির্ব্বিকল্পস্য তস্য
বর কুসুমসুকেশি! তং হি ধন্যা ধরণ্যাম্।"

এই কথা তাঁহার পক্ষেও সর্ব্বোতোভাবে প্রযোজ্য। ধরণীতে এইরূপ স্ত্রীলোকই ধন্য।

আর তুমি হিন্দুজাতি! ঘৃণিত পদদলিত জগতের চক্ষে অসভ্য হিন্দু! অধম বঙ্গবাসি!—ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জাতীয় মর্য্যাদা! যে জাতির মধ্যে এইরূপ স্ত্রীলোক আছেন—যে জাতির স্ত্রীলোক এই সংস্কৃত দেব-ভাষায় এই গীত গাহিয়াছেন! সেই সভ্যতাকে ধিক্—যে সভ্যতা এই ভাবের বিরোধী।—ধিক্ সেই স্ত্রীশিক্ষা, যে শিক্ষা এই সাত্ত্বিক ভাব ভুলাইয়া

রাজসিক ও তামসিক রূপ লাবণ্যের জন্য ক্ষণস্থায়ী শরীরের জন্য, কেবল ব্যবস্থা করিতেছে—বেশভূষার যত্ন বাড়াইতেছে,—হৃদয়ের পবিত্রতা ভুলাইয়া, পবিত্রতা বিনাশকরিয়াও জীবন ধারণের পরামর্শ দিতেছে! স্ত্রীশিক্ষা দিতে ইচ্ছা হয়, এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা দাও। স্বজাতীয় মহৎ ভাবের গাত্রে আঘাত করিও না। রাজসিক তামসিক ভাব প্রবল করিয়া সাত্ত্বিক ভাবের অনাদর করিও না।

যদি দেখিতে পাও, বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, এই সাত্ত্বিক ভাবের পরিপোষক, এই পবিত্রতা রক্ষার অনুকূল, তবে ইহা বিনাশের চেষ্টা পাইয়া পাপ সঞ্চয় করিও না। সভ্য ইউরোপ তোমায় অসভ্য বলে বলুক। সাত্ত্বিক ভাব হারাইয়া, জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবে গৌরবান্বিত হওয়া অপেক্ষা জাতীয় বিধান পালন লক্ষ গুণে ভাল ও শ্রেয়স্কর।

উপসংহারে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে পারি, "মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী যদি সমস্ত জীবন ধরিয়া একটি স্ত্রীলোককেও নিজের মত শিক্ষা দিতে পারেন, যদি একটি মাত্র রমণী তাঁহার মত সাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হয়, তবে তিনি ধন্য। তাঁহার কবিত্ব শিক্ষা ধন্য! আজিকার দিনে এইরূপ শিক্ষার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা।

তোমাকে আমি গ্রহণ করিবার পশ্চাতে তুমি আমায় অনুগ্রহ কর—পশ্চাৎ গ্রহণ কর—অনুগ্রহ কর ইহার ভিতরে এই অর্থ ভরা রহিয়াছে। তুমি যাহা করিতে বলিয়াছ শাস্ত্রে যাহা ধরাইয়া দিতেছ, গুরুমুখে যাহার অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছ—সেই তোমার আজ্ঞা পালনে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলে তবে তোমার অনুগ্রহ পাওয়া যায়। এইরূপ করিয়া তবে প্রার্থনা করিতে হয়। নতুবা তোমার আজ্ঞা পালনে তোমাকে গ্রহণ করা হইল না, তোমার অনুগ্রহ পাইবার কিছু করা হইল না—শুধু প্রার্থনায় তোমার অনুগ্রহ পাওয়া যাইবে কিরূপে?

আমি কি প্রার্থনা করিব? আহা! তুমি যে আমার হৃদয় ভরিয়া থাকিতে ভালবাস, তোমার এই হৃদয়ে থাকার অনুভবটি আমি প্রার্থনা করি। তুমিই মাত্র আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা থাক আর কিছুই যেন আমার হৃদয়ে না থাকে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। তুমি ত আছই—আমি যেন ইহা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করি, করিয়া তাহারই অনুভবের জন্য তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ যত্ন করি। তবে কি আর আমি কিছু করিব না? না—তা কেন—আমি ব্যথিতের ব্যথা দূর করিবার জন্য যাহা বাক্-সাহায্য করিতে হয়—বা কার্য্য সাহায্য করিতে হয় বা অন্য সাহায্য করিতে হয় তাহা করিব কিন্তু তথাপি ঐ সব ভাবনা আমার কিছুই থাকিবে না, হৃদয়ে থাকিবে শুধু তুমি। আমি পীড়িতের সেবার জন্য, দরিদ্রের দুঃখ হরণের জন্য, কাঙ্গালের মনঃতৃপ্তির জন্য, সংসারের সেবার জন্য—যাহা করিতে হয় করিব—আর মনে ভাবিব তুমি এই কর্ম্মে—এই রূপে তোমার আজ্ঞাপালনে—তুমি আমার উপর প্রসন্ন হইবে এই মনে করিয়া করিব—কিন্তু হৃদয়ে সর্ব্বদা থাকিবে তুমি—অন্য কোন কিছুকেই আমি হৃদয়ে স্থান দিব না—ক্ষণকালের জন্যও না—তুমি স্থান দিতে দিও না। অন্যে যে আমার কাণে চাটু-চটুল-চারু বাক্য বলে তাহা আমার হৃদয় অধিকার করিবার জন্য—আমি তোমার আদর ভাবিয়া তাহা সঙ্গে সঙ্গেই ভুলিয়া যাইব। তুমি এমন করিয়া আমার হৃদয় জুড়িয়া থাকিবে—তোমার কথা এমন করিয়া আমার হৃদয় ছাইয়া রাখিবে যে অন্যের প্রশংসাবাদ এক বিন্দুও আমার কর্ণে স্থান পাইবে না—হৃদয়ে স্থান লাভ ত অনেক দূরের কথা।

আহা! মানুষ ত তোমাকে দেখেনা—দেখিয়াও দেখেনা; পুরুষকার আর উন্মত্ত চেষ্টা উভয়রূপেই তুমি নিরন্তর মানুষে মানুষে বিরাজ কর। মানুষ যে দিকে চেষ্টা করে সেই দিকেই তোমার সাহায্য পায়। তুমি যাহা করিতে বলিতেছ সেইদিকে যখন মানুষ চেষ্টা করে তাহাই পুরুষকার; কিন্তু যাহা তুমি নিষেধ করিয়াছ সেইদিকে যখন চেষ্টা করে তখনও ঐ পাপকার্য্য বা দুষ্ট কার্য্য করিবার শক্তি পায়। অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোক যে বলে ভগবান্ করান বলিয়াই আমি করি—নতুবা মানুষের কি নিজের কোন কিছু করিবার ক্ষমতা আছে? এই যে নিজের দোষটা ভগবানের উপর চড়াইয়া দিয়া পাপী দুর্জ্জন মানুষ শান্ত থাকিতে চেষ্টা করে আহা! ইহাই ত মানুষের বিষম ভ্রম। ভগবান্ বলিয়াছেন চুরি করিও না—মিথ্যা কথা কহিও না—পরস্ত্রীতে আসক্তি রাখিওনা—মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা—নির্ব্বোধ লোকে বলে ভগবান্ যাহা করান

তাহাই ত করি—আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয়—মূর্খ জনের এই সব যুক্তি একেবারে বিচার শূন্য। ভগবান্ পাপ করিতে নিষেধ করিতেছেন, ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী হইতে বলিতেছেন—তুমি যদি বল ভগবান্ করাইতেছেন, তবে বল দেখি তুমি যাহাকে ভগবান্ বলিতেছ তাহা কি ভগবান্, না তোমার ভোগ-লিপ্সার সমষ্টিস্বরূপ কোন শয়তান। নতুবা ভগবান্ যাহা করিতে নিষেধ করিতেছেন তাহাই আবার যদি করান তবে ত ভগবান্ একটা পাগল—একটা ভারি খামখেয়ালী দুর্জ্জন।

এই ভ্রম ত্যাগ করা উচিত। ভগবান্ মঙ্গলময়, তিনি জীবকে কুপথে কখন লইয়া যান না, বরং কুপথে যখন মানুষ প্রকৃতির বশে চলে তখন মঙ্গলময় ভগবান্ তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিয়াই তাহার মঙ্গল করেন। মানুষ আত্ম-প্রতারণা করে বলিয়াই তাঁহার অনুগ্রহ পায় না—নতুবা তিনি সর্ব্বদা মঙ্গল করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াই আছেন। তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা কর, দেখ তোমার চেষ্টা সফল করিবার জন্য তিনি তোমার কত নিকটে আগমন করেন। ভগবান্ মানুষকে পাপ করান না, মানুষের প্রকৃতিই মানুষকে পাপে লিপ্ত করে। এই প্রকৃতি হইতেছে অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার, লোকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই বলে প্রকৃতিও তিনি। না, প্রকৃতি তিনি নহেন। প্রকৃতি হইতে আত্মা যে পৃথক্ ইহা জানাই না জ্ঞান? প্রকৃতি হইতেছে মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা—সমস্ত দোষের আকর। দোষের আকর হইলেও প্রকৃতি আবার উদ্ধারও করেন। প্রকৃতির রজস্তমঃ অংশই মানুষকে ভোগেচ্ছা করায়, সংসার পটু করায়, অহংকারে মগ্ন করিয়া মানুষকে বুঝাইয়া দেয় যে সে যাহা বুঝে তাহাই ঠিক এবং শাস্ত্র ও গুরু তাহার কথা বুঝেনা। অর্জ্জুন যখন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ" পুরুষ কাহা-দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? ভগবান্ তখন বলিলেন "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ" এই কাম, এই ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়—ইহারাই মানুষকে পাপ করায়। ইহাদের হস্ত হইতেই ত মানুষকে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহার জন্যই বলা হইয়াছে "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং আত্মাকে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মনঃ দ্বারা উদ্ধার করিতে হইবে। প্রথমে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিয়া রজস্তমকে পরাস্ত কর, পরে সত্ত্বগুণের প্রকাশ অবলম্বনে সেই প্রকাশ স্বরূপ দ্রষ্টা এবং সাক্ষী পুরুষকে দেখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। মায়ার যে রজস্তমোময়ী মূর্ত্তি তাহাই জীবকে সংসার মোহে আচ্ছন্ন করে আবার মায়ার

শুদ্ধ সত্ত্বময়ী যে অংশ তাহাই জীবকে মুক্তি প্রদান করেন। পূর্ব্বেরটি অবরণীয় ভর্গ আর মুক্তিদায়িনী যিনি তিনিই বরণীয় ভর্গ, তিনিই গায়ত্রী, তিনিই উপাস্যা। নামীর নামই অবলম্বনের বস্তু। যিনি উপাস্য বা উপাস্যা তিনিই পরম নামী। বলিতে হয় বল সাধারণ নামী আপেক্ষিক সত্য—আর তুমি পরম নামী—পরম সত্য। নামী সত্য বলিয়া নামও সত্য। বহু মিথ্যা—একই সত্য! বহু সেই একেরই অঙ্গে ভাসে আবার মিলাইয়া যায়। বহু—বহু ভাবে যখন "দৃশ্যতে, শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" হইয়া মনের মধ্যে ভাসে তখন কিন্তু ভ্রষ্ট অবস্থা। রজস্তমঃ যখন মনে বিলাস করে তখন স্পন্দশক্তি মোহ উৎপাদন করে। যখন রজস্তমঃ ডুবাইয়া সত্ত্ব জাগেন তখন দ্রষ্টা দেখেন সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক কার্য্য। এই সাত্ত্বিক কার্য্যের দ্রষ্টা যিনি তিনি যখন এই সাত্ত্বিক "কার্য্যের অর্থ চিন্তা করেন তখন অখণ্ডের ভিতরে খণ্ডের দেখা পাইয়া আনন্দে নিজ-শক্তি উমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি" হইয়া যায়। নিজশক্তি দেখিতে হইলে —"দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" যখন মনে ভাসিবে তখনই ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া নাম-নামী লইয়া থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে। এই অভ্যাস পাকা হইলেই তুমি নামীতে ভরিত হইয়া থাকিবে। আর তোমার পতন হইবে না—যদি তুমি নাম ছাড়িয়া আর কোন কিছুতে নাম না ভুল।

ভগবানের স্বরূপ জান, ভগবতীর স্বভাব জান। জানিয়া ধ্যান কর তবেই বুঝিবে একমাত্র সত্যবস্তুই ভগবান্ আর যা কিছু তাহা মিথ্যা। মিথ্যাকে সর্ব্বদা অগ্রাহ্য করাটা অভ্যাস করিয়া ফেল তবে সত্য বস্তু পাইবে। সেইজন্য বলা হইতেছিল প্রথমে তাঁহার আজ্ঞা পালনের অভ্যাস কর তবেই তাঁহার গ্রহণ হইল—শেষে তাঁহার অনুগ্রহ যে পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
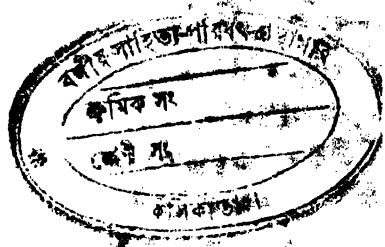
দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্রতত্ত্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বক্তা—শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় ও রমা।

দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য?

জিজ্ঞাসু নন্দকিশোর—বাবা! পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, 'দুর্গে! মা তুমি কে?' আপনার মুখ হইতে এই প্রশ্নের সমাধান শুনিয়া আমার আশাতীত লাভ হইয়াছে, আমার বহু সংশয় বিনিবৃত্ত হইয়াছে, আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এখন 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য?' শ্রীমুখ হইতে এই প্রশ্নের সমাধান শুনিবার জন্য চিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে উপদেশ শুনিবার পূর্ব্বে আমার আর একটি প্রশ্নের সমাধান প্রার্থিত হইয়াছে, অনুমতি হইলে, নিবেদন করি; প্রাগুক্ত প্রশ্নের সমাধান করিবার সময়ে ইহারও সমাধান করিয়া দিবেন।

বক্তা—তাহা কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

জিঃ নন্দকিশোর—'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য? এইরূপ প্রশ্ন লোকের মনে উদিত হয় কেন?

বক্তা—এইরূপ প্রশ্ন উদয়ের কারণ কি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। বেদ কি বস্তু, আজকাল অল্প ব্যক্তিই তাহা জ্ঞাত আছেন, মা দুর্গা কে, তাহাও তাঁহারা যথার্থভাবে বিদিত নহেন এবং এই নিমিত্ত মা দুর্গার পূজাতত্ত্বের স্বরূপও তাঁহারা উপলব্ধি করিতে অপারগ। আজকাল বেদ বলিতে লোকে যাহাই বুঝুন, বস্তুতঃ তাঁহারা 'বেদ' বলিতে কয়েকখানি মানুষরচিত গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছু বুঝেন না।

জিঃ নন্দকিশোর—এই ভ্রান্ত ধারণার যাহাতে নিরসন হয়, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে প্রথমে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন, আমি বুঝিতে পারি এরূপভাবে বেদের স্বরূপ বিবৃত করুন।

বক্তা—বেদ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য আছে, কিন্তু এখন তাহা বলিবার অবসর নহে। এখন যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন।

'বেদ' শব্দ 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিদ্' ধাতু জ্ঞান, প্রাপ্তি, সত্তা, বিচার ইত্যাদি অর্থের বাচক। 'জ্ঞান', 'যদ্দ্বারা জানা যায়'—'যাহা জ্ঞানসাধন', 'যাহা জানা যায়'—যাহা জ্ঞেয়, যিনি জ্ঞাতা, যদ্দ্বারা পাওয়া যায়, যিনি প্রাপ্তব্য, যিনি সৎ, যাঁহাতে অখিল বস্তু বিদ্যমান, যদ্দ্বারা বিচার করা যায়, যিনি বিচার্য্য—বিচার বিষয়, তিনি বা তাহা 'বেদ', 'বেদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই সকল অর্থ নিষ্কাসিত হয়। 'ব্রহ্ম', 'পুরুষ' বা 'আত্মা' চতুষ্পাৎ। শ্রুতি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান—এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ, অতীতকালিক সমুদায় জগৎ, এবং অনাগত—ভাবিকালিক সমুদয় জগৎ সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষের—পরমাত্মার অবয়বস্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালাত্মক জগৎ পরমপুরুষের মহিমা—তাঁহার মায়িকরূপমাত্র, ত্রৈকালিকভূতসমুদয়াত্মক জগৎ পরমপুরুষের একপাদমাত্র। পরমাত্মার আরও তিনটি পাদ আছে; উক্ত পাদত্রয় অমৃতস্বরূপ। 'বেদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে, অপিচ বেদাদি শাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, 'বেদ' ও 'ব্রহ্ম' এক পদার্থ; অতএব বলিতে পারি, ভূর্লোক, ভুবলোক ও স্বর্লোক, অথবা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ জগৎ বেদের অবয়বস্বরূপ, বেদের একপাদমাত্র; বেদের অপর পাদত্রয় গুহানিহিত, সাধারণ জ্ঞানের অজ্ঞেয়, স্থূলদৃষ্টির অদৃশ্য। ঐতরেয় আরণ্যক এইকথা বুঝাইবার নিমিত্তই বলিয়াছেন, 'ভূর্লোক', 'ভুবলোক' ও স্বর্লোক, ইহারা যথাক্রমে ঋগাদি বেদত্রয়। ব্রহ্ম বা আত্মার সগুণ ও নিগুর্ণ ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা, অতএব বেদেরও দ্বিবিধ অবস্থা। সগুণ ব্রহ্ম বা জগৎ 'সগুণ বেদ', এবং নিগুর্ণব্রহ্ম 'নিগুর্ণ বেদ।'। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম, বেদ ও ধর্ম্ম সমান পদার্থ; অতএব যাহা সত্য', তাহা 'বেদ'। সত্য পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভেদে দ্বিবিধ; বেদও সুতরাং পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভেদে দ্বিবিধ। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, তদ্রূপের যদি ব্যভিচার না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলা যায়', সত্যের এই লক্ষণানুসারেও প্রবাহরূপে নিত্য জগতের আপেক্ষিক সত্যত্ব সিদ্ধ হয়। সগুণব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মক; অতএব ব্যাবহারিক সত্য ত্রিগুণাত্মক, অতএব ব্যাবহারিক বা সগুণবেদও ত্রিগুণাত্মক। শ্রীভগবান্ এইজন্য বলিয়াছেন, 'হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়। যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় সম্বন্ধীয়, তাহা 'ত্রৈগুণ্য'। ত্রৈগুণ্য হইয়াছে—ত্রিগুণময় সংসার হইয়াছে, বিষয় যাহার, তাহা 'ত্রৈগুণ্য বিষয়'। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও।*

* "ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।"—গীতা।

ত্রিগুণাতীত হইতে না পারিলে, মুক্তিলাভ অসম্ভব। অতএব বুঝা গেল ভগবান্ 'বেদ' বলিতে এস্থলে ত্রিগুণাত্মক বেদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

বেদকে যাঁহারা বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ স্বদেশীয়, বিদেশীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, বাগ্‌বিদ্ প্রভৃতি পুরুষবৃন্দের উপদেশানুসারে, অপিচ স্ব স্ব প্রতিভার প্রেরণায় ঈষৎসভ্য মনুষ্যগণ বিরচিত, যুক্তিহীন, বালকোচিত ভাবপূর্ণ 'কাব্য' বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ভূতত্ত্বানুসন্ধাননিরত পণ্ডিতদিগের সমীপে একখানি পুরাতন পাষাণময় কুঠারের যে কারণে আদর হইয়া থাকে, পুরাতন পাষাণময় কুঠার দ্বারা ভূতত্ত্বানুসন্ধাননিরত পণ্ডিতদিগের যাদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, মানবজাতির প্রাচীনাবস্থাজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের বেদদ্বারা তাদৃশ প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে, বেদের যাঁহারা এতাবন্মাত্র প্রয়োজন অনুভব করিতে পারগ হইয়াছেন,* বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক যাঁহারা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য প্রভৃতি কল্পিত দেবতাগণের স্তুতি ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না, তাঁহারা যে, বেদকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া বুঝিতে, বেদকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে, বেদকে হিরণ্যগর্ভরূপে সমবস্থিত পরমাত্মার জগৎ সৃষ্টিমার্গোপদেশক বলিয়া বিশ্বাস করিতে, বেদকে বেদজ্ঞ-ঋষিদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে, কোনরূপেই পারগ হইবেন না, তাহা স্থির। তথাপি প্রাচীন ঋষি ও আর্য্যেরা বেদকে যে তাদৃশদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহার কারণ কি, আমরা যে বেদকে অনায়াসেই অসার বা স্বল্পসার পদার্থ বলিয়া অবধারণ করিতে সমর্থ, ঋষি ও আর্য্যেরা সে বেদকে সারাৎসাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দেখিয়াছিলেন, বেদ ভিন্ন মানুষের পরমপুরুষার্থসিদ্ধির অন্য উপায় নাই বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহার হেতু কি; বাদরায়ণ, কপিল, জৈমিনি, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও বেদের অসারত্ব, বেদের বালকোচিত ভাবপূর্ণত্ব, অতএব বেদের অকিঞ্চিৎকরত্ব পতিত হয় নাই

---

* পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন—"My object in qutiong these passages is simply to show the lowest level of Vedic thought. In no other literature do we find a record of the world's real childhood to be compared with that of the Veda. It is easy to call these utterances childish and absurd. * * *"

—The Physical Religion, P. 102.

কেন, বেদের কুহকে তাঁহারাও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন কেন, বেদকে ঈশ্বরবৎ মান্য করিয়াছিলেন কেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তাহা অবশ্য চিন্তনীয়, ক্রমবিকাশবাদের সমর্থক আধুনিক সুধীকুলের এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সচেষ্ট হওয়া অবশ্য উচিত।

'বিজ্ঞান (Science) পরমেশ্বরের ভূত-ভৌতিক পদার্থ এবং মনের উপরি কর্ত্তৃত্বের ইতিহাস', বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিচ্‌কক্‌কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণানুসারে আমি বেদকেই প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, এবং চিন্ময় পুরুষ এই দুইটী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে, বিজ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞান যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথা প্রয়োজন স্তুতিপূর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ভূততন্ত্র (Physics), রসায়নতন্ত্র (Chemistry), জ্যোতিষ (Astronomy), শরীর বিজ্ঞান (Anatomy and Physiology) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখাসমূহ যে সকল সত্য বা ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা ত্রিগুণাত্মক জগতের ইন্দ্রিয়-গম্য সত্য বা ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সগুণবেদে বিজ্ঞানবর্ণিত সত্যসমূহের বিশুদ্ধভাবে বর্ণন আছে। অতএব 'বেদ' বিশুদ্ধবিজ্ঞান'। জড়বিজ্ঞান যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মানব কৃতকৃত্য হইতে পারেন না, যাহা না জানিলে, মানবের জ্ঞান জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ হয় না, যাহাকে না পাইলে, মানবের ঈপ্সিততম সমাধিগত হয় না, বেদ ভিন্ন আর কেহ তৎপদার্থের সন্ধান দিতে পারেন না ; অনুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র সমূহের অদৃশ্য পদার্থ-সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্র এইজন্য বলিয়াছেন, বেদ ভিন্ন আর কেহ প্রকৃত ধর্ম্মাভিধায়ক নহেন, মুমুক্ষু মানবের বেদ ভিন্ন অন্য আশ্রয়নীয় পদার্থ নাই। 'বেদ' যখন বিষয়াকারে পরি-ণত হয়েন, তখন তিনি 'জগৎ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'বেদ' বিষয়ী এবং বেদ বিষয় (Subject and object)। জগৎ শক্তির পরিণাম ; শক্তির ধ্বংস বা নাশ হয় না ; শক্তিসমূহ সংস্কারানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, এই সকল সত্য যাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টিতে যথার্থভাবে পতিত হইয়াছে, তাঁহারা যথোক্তলক্ষণ বেদকে নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। প্রকৃতি হইতেই যে আমরা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম অবগত হইয়া থাকি, প্রকৃতি স্বয়ংই

যে, নিজরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা স্বীকার্য্য। তবে এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, 'প্রকৃতি' বলিতে আমরা এখানে কেবল জড়শক্তিকে লক্ষ্য করি নাই, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে, মা দুর্গাকে লক্ষ্য করিয়াছি, শিব হইতে অভিন্ন শিবাকে গ্রহণ করিয়াছি। যথোক্ত প্রকৃতি ও বেদ এক পদার্থ; অতএব বেদ হইতেই বিশ্ব-বিজ্ঞান প্রসূত হইয়াছে, বেদ নিখিলবিদ্যাপ্রসূতি, এই কথা সার্থক, ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা নহে। 'প্রকৃতি নিত্যা' সৃষ্টির এই আদি নহে, প্রলয় কালেও জীবসমূহ ভিন্ন, ভিন্ন সংস্কারাবচ্ছিন্ন লিঙ্গদেহে বিদ্যমান থাকে, এই সকল সত্য যাঁহাদের সমীপে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, তাঁহারা বেদকে নিত্য বলিয়া বুঝিতে পারগ হইবেন; বেদ অতিন্দ্রিয়দর্শি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকেন ইত্যাদি বেদোপদেশকে তাঁহারা শিরোধার্য্য করিবেন; নবীন ক্রমবিকাশবাদের বিকলাঙ্গ তাঁহাদের এই সত্যকে দেখিবার দৃষ্টির অবরোধক হইবে না। 'বেদ বিশ্বজগতের নিত্য বিজ্ঞান' 'বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অথর্ব্ববেদ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, তপস্বী বা যোগীরাই পূর্ণ পুরাণবিৎ, পূর্ব্বকল্পে যেখানে যাহা ছিল, যেখানে, যখন যাহা ঘটিয়াছে, তপস্বীরা তাহা সম্যগ রূপে অবগত আছেন।

"যেত আসীদ্ ভূমিঃ পূর্ব্বামদ্ধাতয় ইদং বিদুঃ।
যো বৈ তাং বিদ্যান্নামথা স মন্যেত পুরাণবিৎ॥"

অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১১।১০।৭।

অর্থাৎ, এই পুরোবর্ত্তিনী ভূমির পূর্ব্বভাবিনী অতীত কল্পস্থা যে ভূমি বিদ্যমান ছিল, তপঃপ্রভাব দ্বারা সমাসাদিত-সার্ব্বজ্ঞ্য (তপঃ প্রভাব দ্বারা যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন) অতীত ও অনাগতজ্ঞ মহর্ষিরাই তাহা জানেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারেন না। অতীতকল্পস্থা ভূমি এবং ঐ ভূমিতে অতীত কল্পে যে যে নামে যে যে বস্তু বিদ্যমান ছিল, তপঃপ্রভাবে মহর্ষিরা তাহা জানেন, ইহাঁদিগকেই বস্তুতঃ পুরাণবিৎ—পুরাণ অর্থের বেদিতা বলা যায়, ইহাঁদিগকেই বিদ্বান্ বলিয়া মনে করা উচিত। ইদানীন্তন সর্ব্ব ভূমিকেও তাঁহারা জানিতে সমর্থ। ঋগ্বেদ-সংহিতাও বলিয়াছেন, 'ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবগণকর্ত্তৃক কৃত, অব্যাকৃত বা প্রকৃতিতে লীন কর্ম্ম-সমূহকে, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালদর্শি যোগিগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক, সমাধিনেত্র দ্বারা সম্যগ রূপে জানিতে পারেন ("কামস্তদগ্রে

সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীসা॥"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।১১।১২৯)। সমাধিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়। সমাধি হইতে চিত্তের নির্ম্মলতা হইলে, যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য; যাহা সত্যকে ধারণ করে, তাহা 'ঋতম্ভরা'। যে প্রজ্ঞাতে বিপর্য্যাস্ বা মিথ্যার লেশ নাই, তাহাই 'ঋতম্ভরা' নামে লক্ষিত হয় (ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা" পাং দং)। যোগিগণ নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা পদার্থ সকল প্রত্যক্ষপূর্ব্বক পরোপকারার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অব্যভিচারি-সত্যজ্ঞানার্জ্জনের উপায় কি? এই প্রশ্নের বেদ-শাস্ত্রসম্মত উত্তর **'সমাধি'**। জিজ্ঞাসু হইবে, প্রত্যক্ষ বা সন্দর্শন ও পরীক্ষা যাঁহাদের মতে সত্যজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়, তাঁহারা কি, স্বীকার করিবেন, 'সমাধিই অব্যভিচারি সত্যজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়? 'সমাধি' কাহাকে বলে, সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ কি, সন্দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে সত্যজ্ঞান অর্জ্জিত হয়, যাঁহারা তাহা যথার্থভাবে বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'সমাধিই, অব্যভিচারি সত্যজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়,এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যোগসূত্রকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এবং যোগসূত্রভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস নির্ব্বিতর্ক সমাধিকে পরপ্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। তপস্যা দ্বারা যাহার চিত্ত নির্দ্দগ্ধ-দোষ—সর্ব্বথা বিধৌতমল হইয়াছে, যাঁহার প্রকাশের আবরণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়াছে; যাঁহার চিত্ত উপদ্রবরহিত হইয়াছে, অতীত ও অনাগতও তাঁহার বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে ("আবির্ভূত প্রকাশানামনুপদ্রুত চেতসাম্। অতীতানাগতজ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥ "বাক্যপদীয়)।

যে প্রত্যক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানের ন্যায় পরিগৃহীত হয়, যে প্রত্যক্ষে ভ্রান্তিলেশ থাকে না, তাহা পর বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ। যে সত্য দেশ-কালাদি দ্বারা বাধিত হয় না, যে সত্য অব্যভিচারী, কেহ জানিতে না পারিলেও, সে সত্য অসত্য (অসৎ) হয় না। পারমার্থিক সত্য চিরদিনই পরমার্থতঃ সৎ। বেদ পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই দ্বিবিধ সত্যের বাচক।

জিজ্ঞাসু—বেদ যে, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দ্বিবিধ সত্যের বাচক, তাহা বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু 'বেদ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দ্বিবিধ সত্যের বাচক, বেদ সগুণব্রহ্ম, এবং বেদই নির্গুণব্রহ্ম, বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস, অনাদিনিধনা বিদ্যারূপা দিব্যা

বাণী স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে প্রবর্ত্তিতা হইয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদময়ী দিব্যাবাণী বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহা হইতেই সমুদয় বৃত্তান্ত, অখিল জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, মহর্ষিগণ যুগান্তে অন্তর্হিত সেতিহাস (ইতিহাসের সহিত বিদ্যমান) বেদকে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত (উপদিষ্ট) হইয়া তপস্যাদ্বারা লাভ করিয়াছিলেন।' * আমি আজিও বেদের স্বরূপ নিরূপক এই সকল অতিমাত্র গম্ভীরার্থক বচনসমূহের প্রকৃত আশয় কি, পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই, কেমন করে সমর্থ হইব? বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কার বিহীনের এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিবার সামর্থ্য হইতে পারে কি?

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, বেদের স্বরূপ নিরূপক শ্রুতি-শাস্ত্রের উপদেশ সমূহের যথাযথভাবে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ বৈদিক সংস্কার বিশিষ্ট পুরুষ ভিন্ন অন্যের পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না। 'বেদ' বলিতে যাঁহারা মানুষ-রচিত গ্রন্থ বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা কি শ্রুতি-শাস্ত্র বর্ণিত বেদের রূপকে চিত্তে ধারণ করিতে পারেন? আমি তোমাকে পরে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, যাঁহারা পরমাণু (Atom) হইতে, জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এই কথা বলেন, যাঁহারা ভূত ও ভৌতিক শক্তিকেই বিশ্বের কারণরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে 'পরমাণু' কোন্ পদার্থ, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, পরমাণু হইতে জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইল তাহা তাঁহারাও (মুখে যাহাই বলুন, আমরা বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছি

---

* "বাগ্নে বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যং।"

—ঋগ্বেদ।

"শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ। ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত॥"— বাক্যপদীয়।

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

বলিয়া যতই গর্ব্ব করুন,) বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যকে বুঝাইতে পারেন না। 'পরমাণু হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে,' যাঁহারা এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথার্থভাবে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা 'শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে' এই সারগর্ভ পরমোপাদেয় কথাকে কল্পনার বিজৃম্ভণ বলিয়া উপহাস করিবেন না। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি প্রতিপাদন করিয়াছেন, 'শব্দই ভেদ-সংসর্গবৃত্তি অণু' ("অণবঃ সর্বশক্তিত্বাদ্ভেদসংসর্গ-বৃত্তয়ঃ।"--বাক্যপদীয়)। অতএব শব্দকে ভেদ-সংসর্গবৃত্তি শক্তি বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করিতে পারিবেন,তাঁহারা 'শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে,' এই কথা শুনিয়া, ইহাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন কি? যে শব্দ হইতে বিশ্বজগতের পরিণাম হইয়াছে, সে শব্দ যে, সাধারণতঃ পরিচিত শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধ্বনি নহে, তাহা বোধ হয় বালকও বুঝিতে পারে। যে শব্দ হইতে বিশ্বজগতের পরিণাম হইয়াছে, তাহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি, তাহা বেদময়ী সীতা, তাহা সর্ব্ববিদ্যাময়ী দুর্গা। 'ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে হইয়াছে', যাঁহারা এই কথা বলিয়াছেন, * সেই খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট ও পি, জি, টেট্ (B. Stewart and P. G. Tait) যথোক্ত লক্ষণ শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগতের পরিণাম হইয়াছে, বাক্ বা শব্দই বিশ্বজগতের প্রসূতি, এই শ্রুতিবচনকে অজ্ঞোচিত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

বেদ বা শব্দ হইতে কিরূপে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, আমি যথাস্থানে যথাশক্তি তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যতপ্রকার কল্পনা করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন, তৎসমুদায় 'বিশ্বজগৎ বেদ বা শব্দের পরিণাম', এই বিমল সত্যোপদেশেরই প্রতিধ্বনি, তৎসমুদায় প্রতিবিম্বন্যায়ে সংক্রান্তা বুদ্ধিস্থ বেদ বা শব্দভাবনারই বিজৃম্ভণ। পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment)

---

* "Finally our argument has led us to regard the production of the visible universe as brought about by an intelligent agency residing in the universe."

—Unseen Universe, P 218.

শব্দভাবনা বিনা হইতে পারে না। লক্ষ-কোটির মধ্যে দুই চারিজন পুরুষ মাত্র যে, অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হন, সন্দর্শন ও পরীক্ষা যে, ব্যক্তিমাত্রকেই ঋষি বা সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তু ধর্ম্মা করিতে পারে না, সন্দর্শন ও পরীক্ষা যে প্রতীচ্য দেশের সকলকেই নিউটন্ ষ্টিফেন্-সন্, করিতে পারে নাই, তাহার কি কোন কারণ নাই? কাঁহার অনুগ্রহে, কাঁহার আন্তর প্রেরণাবশতঃ নব প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কারকদিগের প্রাকৃতিক তথ্য সমূহের আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাদের আবিষ্কার করিবার পথ নিরর্গল হয়, তাঁহাদের আবিষ্কার করিবার প্রতিভার উন্মেষ হয়, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? যথার্থভাবে তাহা চিন্তা করিলে, মা দুর্গা, সীতা দেবী বা বেদের কৃপায় অনুভব করিতে পারিবে, সন্দর্শন ও পরীক্ষা বুদ্ধিস্থ বেদ বা শব্দভাবনামূলক। শব্দ হইতে কিরূপে বিশ্বজগতের পরিণাম হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, শব্দের পরা পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে, আন্তর ক্রিয়া—আন্তর স্পন্দন, কিরূপে বাহ্যাকৃতি ধারণ করে, তাহা বুঝিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, কি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ, কি আন্তর জগৎ, উভয়ই স্পন্দন বা গতির মূর্ত্তি, উভয়েই কর্ম্মের রূপ, বুঝিতে হইবে, জগৎ, আন্তর কর্ম্ম ও মন এক পদার্থ, বুঝিতে হইবে, আন্তর কর্ম্মই বাহ্য জগদাকার ধারণ করে। বিশ্বজগৎ বেদ বা শব্দের পরিণাম বিশুদ্ধভাবে, পূর্ণরূপে এই পরম সত্যের রূপ নিরূপণ করিতে হইলে, 'পঞ্চষষ্টি বর্ণই ত্রয়ীলক্ষণ ব্রহ্ম (বেদ) রাশি, ইহারাই আনুপূর্ব্ব ব্যবস্থিত হইয়া, ঋক্, যজুঃ ও সাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে, লৌকিক শব্দ সমূহেরও ইহারাই আত্মা', তবে লোকে অনিয়ত দেশ-কাল শব্দ সকলের ব্যবহার হইয়া থাকে, বৈদিক ও লৌকিক এই দ্বিবিধ শব্দের মধ্যে ইহাই পার্থক্য ("এতে পঞ্চ-ষষ্ঠিবর্ণা ব্রহ্মরাশিরাত্মবাচঃ।" "যৎ কিঞ্চিদ্বাঙ্ময়ং লোকে সর্বমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।" —শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্য), মহর্ষি কাত্যায়নের এই সকল কথার অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে হইবে। পূজ্যপাদ পাণিনদেব শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমে "অ, ই, উণ। ঋ, ৯ক্" ইত্যাদি চতুর্দ্দশটী প্রত্যাহার সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিদেব ব্যাকরণশাস্ত্রের উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমে বর্ণ বা অক্ষর সমূহের উপদেশ করিলেন কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়া-ছেন, বর্ণজ্ঞান শাস্ত্রই (বর্ণ বা অক্ষর সকল জ্ঞাত হওয়া যায় যদ্দ্বারা, তাহার

নাম 'বর্ণজ্ঞানশাস্ত্র') বাক্ বা শব্দের বিষয়, বর্ণজ্ঞানোপদেশক শাস্ত্র হইতেই বাক্ বা শব্দের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বর্ণজ্ঞান শাস্ত্র হইতে যে বাক্ বা শব্দের জ্ঞান লাভ হয়, তাহার স্বরূপ কি? যাহাতে ব্রহ্ম—বেদ এবং পুরাণাদি বিদ্যমান * বেদ ও পুরাণাদি যদাশ্রিত—যদাত্মক, সেই বাক্। বাক্ বা শব্দ অক্ষরসমন্বায়, বর্ণসংহতি—বর্ণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে, বাক্ বা শব্দকে বিশ্লেষ করিলে, বর্ণ বা অক্ষর ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না, অতএব বর্ণসমাহারই বাক্য বা শব্দের উপাদান কারণ। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যেও বর্ণসমাম্নায়কেই শব্দ বা বাক্যের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে ("বর্ণপৃক্তঃ শব্দোবাচ উৎপত্তিঃ।") সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে, থাকিবেও অনন্তকালের জন্য, যে চন্দ্র, সূর্য্য এখন দেখিতেছি, ইহারা পূর্ব্বেও ছিল, এবং পরেও থাকিবে, সকলেই প্রবাহরূপে নিত্য, বেদের স্বরূপ নিরূপণার্থ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চন্দ্র তারকাবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্-সমাম্নায়ই বেদ বা 'ব্রহ্ম'; বিশ্ব-জগৎ শব্দব্রহ্মেরই বিবিধ পরিণাম, অনাদিনিধন শব্দব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। † শাস্ত্রে'বেদ'বুঝাইতে 'শব্দ' এই পদের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও ভগবান্ বাদরায়ণের উত্তর-মীমাংসা. শারীরিক-সূত্র বা বেদান্তদর্শনে বেদ বুঝাইতে 'শব্দ' কথাটীর অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 'বেদ' কোন্ পদার্থ, পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের সহিত বেদের কি সম্বন্ধ, বেদ হইতেই বিবিধ বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, বিশ্বজগৎ বেদ হইতে সৃষ্ট, দেবতারাও বেদপ্রসূত' এই সকল শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথার্থভাবে তাহা জানিতে হইলে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই অতিমাত্র সারগর্ভ কথা সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইবে। 'বেদ' কোন্ পদার্থ বেদ হইতে সর্ব্ববিদ্যার, নিখিল শিল্পকলার আবির্ভাব হইয়াছে, বেদ হইতে বিশ্বজগৎ

---

* "সা বাগ্ যত্র ব্রহ্ম বর্ত্ততে চাৎ পুরাণাদীত্যর্থঃ।"—মহাভাষ্যোদ্যোত।

† "অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন
প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥"—বাক্যপদীয়।

"চন্দ্রতারকবদিতি। অনাদিত্বান্নিত্যত্বং বাগ্ব্যবহারস্য সূচয়তি।" কৈয়ট।

"ব্রহ্মরাশিরিতি। ব্রহ্মতত্ত্বমেব শব্দরূপতয়া প্রতিভাতীত্যর্থঃ॥"—কৈয়ট।

সৃষ্ট হইয়াছে, এতদ্বাক্যের যথার্থ আশয় কি, তাহা জানিতে হইলে, বর্ণ বা অক্ষরের স্বরূপ কি, বর্ণ সকলের মধ্যে শ্রুতিবৈশেষ্যের কারণ কি. কি কারণে একস্থান হইতে উৎপন্ন হইলেও, বর্ণ সকলের শ্রুতি ভিন্ন হয়, ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য শিক্ষানামক বেদাঙ্গে, ঐতরেয় আরণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে বর্ণ সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ আছে, সেই সমস্ত উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইবে। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, 'অনুপ্রদান, সংসর্গ, স্থান; কারণ ও পরিমাণ ইহারাই বর্ণ-বৈশেষ্যের কারণ। একটী বর্ণশ্রুতি যে অন্য একটী বর্ণশ্রুতি হইতে বিশিষ্ট হয়, তাহার অনুপ্রদানাদিই তাহার কারণ' ("অনুপ্রদানাৎ সংসর্গাৎ স্থানাৎ করণবিন্যয়াৎ। জায়তে বর্ণবৈশেষ্যং পরিমাণাচ্চ পঞ্চমাং ইতি।" —তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য ২৩।২। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, 'অকারই সর্ব্বাবাক্, অকারই সর্ব্ববর্ণ, পদ ও বাক্যের মূল কারণ, অকারই স্পর্শ ও উষ্ম দ্বারা অভিব্যজ্যমান হইয়া বহু হয়, নানারূপ ধারণ করে' ("অকারো বৈ সর্ব্বাবাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি—ঐতরেয় আরণ্যক) বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, 'বেদ হইতে বিশ্বজগতের পরিণাম হইয়াছে, বেদ হইতে সর্ব্ববিদ্যার, নিখিল শিল্পকলার আবির্ভাব হইয়াছে,হইতেছে এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতির 'অকারই সর্ব্ববাক্'' অকারই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে, এতদ্বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা বিদিত হইতে হইবে। ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে "নিখিল শব্দজাত যাহাতে ওতপ্রোত হইয়া থাকে, অকারোকার ও মকার লক্ষণ মাত্রাত্রয় উপশান্ত হইলেও, যাহা অবশিষ্ট থাকেন, সেই শব্দ সামান্যের নাম 'পরম ব্যোম'; সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, অখিল শাস্ত্রবেদস্তত অখিল দেবতাগণ এই পরমব্যোম বা প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে যে জানে না, তাহার বেদপাঠ অনর্থক" ("ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ যস্তন্নবেদকিমৃচাকরিষ্যতি)। প্রণব হইতেই যে সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যার অভিব্যক্তি হইয়াছে; প্রণবই যে সর্ব্বলোক-বিধাতা, ভর্তৃহরি স্বপ্রণীত বাক্যপদীয় নামক উপাদেয় গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।

"বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ।
বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়স্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ॥"। বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সর্ব্বলোকবিধাতা প্রণব-বা-বেদ হইতে অঙ্গোপাঙ্গ নিবন্ধন, জ্ঞান-সংস্কার-হেতু নিখিল বিদ্যার বিস্তার হইয়াছে। বেদাখ্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের অঙ্গ হইতে জ্যোতিষাদি এবং উপাঙ্গ হইতে চিকিৎসাদি বিদ্যাভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রণব নির্ণয়ে, প্রণব বাদে প্রণব হইতেই যে সর্ব্ব বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, প্রণবই যে, বিশ্বপ্রসূতি বিশদভাবে বিস্তারপূর্ব্বক তাহা উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, 'প্রলয়কালে পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিত গৌরী—গৌরবর্ণা শব্দ ব্রহ্মাত্মিকা বাগ্দেবী পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সকল সৃষ্টি করিয়া শব্দ করিয়াছিলেন, বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অন্তর্য্যামিনীরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই নিখিল শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছে। শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী কিরূপে বিবিধ আকারে আপনাকে আকারিত করিয়াছেন, শাস্ত্রবিকাশের ক্রম কি? ঋগ্বেদ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এতদুত্তরে বলিয়াছেন,বাগ্‌দেবী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রণবাত্মাতে একপদী হইয়া, প্রথমে আবির্ভূতা হন। বাগ্‌দেবী প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রণবাত্মাতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাকে প্রণবের ঋষি বলা হয়। তৎপরে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপে তিনি দ্বিপদী হন। তদনন্তর বেদচতুষ্টয়রূপে চতুষ্পদী হন; তাহার পর ষট্ বেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা অষ্টপদী, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদ দ্বারা নবপদী এবং তদনন্তর অনন্তবাক্‌সন্দর্ভ দ্বারা অনন্তরূপে প্রবর্ত্তিতা হন (গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদীসা চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্।"—ঋগ্বেদসংহিতা, ২।৩।২২।১৬৪ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৪।৬) বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, বেদ হইতে সর্ব্ববিদ্যার নিখিল শিল্প-কলার অভিব্যক্তি হইয়াছে, এতদ্বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, যথাযথভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, বিশুদ্ধভাবে, পূর্ণরূপে তাহা অনুভব করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে, অবৈদিক, অব্রাহ্মণোচিত সংস্কার সমূহকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাদৃশ সংস্কার বশতঃ সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব, ত্রিকালদর্শী ঋষিপূজিত বেদকে অসভ্য কৃষকের গান বলিবার শক্তি দেয়, সেই সর্ব্বনাশকর সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত করিতে হইবে, মনুর সন্তান হইতে হইবে, বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যোগশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যোগাভ্যাস করিতে হইবে, এক কথায় শিব-শিবার বা সীতা-রামের যথার্থভাবে পূজা

করিতে হইবে, দুর্গে! মা তুমি কে, নিরন্তর নির্ভয়ে যাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যথার্থ শিষ্য হইতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, ঠিক সরল হইতে হইবে, অকৃতজ্ঞতাকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। বেদ কি, বেদ হইতে সর্ব্ববিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির অনুশীলন করেন, তাঁহাদিগকে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান শাখা কি বলিয়াছেন, কি বলিতেছেন, তাহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অত্যন্ত পুরুষার্থসিদ্ধির প্রয়োজন বোধ না হইলে, কেহ এই সকল করিতে পারিবেন না, যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরই হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'ব্রাহ্মণের শরীর ধর্ম্মের—প্রকৃষ্টগতির সনাতন মূর্ত্তি। ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র' ("উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী। স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" মনুসংহিতা)। 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য ?' এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি, তাহা জানিতে হইলে, মা দুর্গার স্বরূপ, বেদের স্বরূপ, পুরাণ-তন্ত্রাদির স্বরূপ, এবং পূজার স্বরূপ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। আমি এই নিমিত্ত বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 'পূজা' কাহাকে বলে, তাহাও শুনিয়াছ, এখন চিন্তা কর, 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি, বেদবাহ্য ?' এই প্রশ্নের উত্তর কি দিবে ?

'যিনি দুর্গা, তিনিই বেদ', যদি এই কথার হৃদয়কে দেখিয়া থাক, পুরাণ ও তন্ত্র বেদমূলক, পুরাণ ও তন্ত্র বেদভিন্ন নহে, যদি এতদ্বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের মনে হইবে না কি, 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য' এইরূপ প্রশ্ন অল্পজ্ঞদিগের হৃদয়েই উঠিয়া থাকে যাহারা মা দুর্গার স্বরূপ কি, তাহা জানেন না, যাহারা বেদ কোন্ পদার্থ, তাহা বিদিত নহেন, যাহারা কখনও স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর মাতৃকার স্বরূপের চিন্তা করেন নাই, স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পূজার তত্ত্ব যাহারা অবগত হন নাই, মা দুর্গা উপাসকদিগের উপকারার্থ কত প্রকার রূপ কল্পনা করেন, তাহা যাহারা কখন ভাবেন নাই, মা দুর্গা যত প্রকার রূপ ধারণ করেন তৎসমুদায় বেদমূলক, বেদই যে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন, পুরাণ ও তন্ত্রে মা দুর্গার যে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা যে পুরাণ ও তন্ত্রবীজ বেদেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান

করে, যাহারা এই সূক্ষ্ম বাক্য বিদিত নহেন, এক অবর্ণ যে যে কারণবশতঃ নানারূপ হন, এক দেবীমূর্ত্তি যে, সেই সেই কারণেই বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন, যাহারা এই সত্যের রূপ দেখেন নাই, 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য' তাঁহাদেরই এই প্রকার প্রশ্নের সমাধান করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেবীভাগবত, সূতসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে 'বৈদিক পূজা' ও তান্ত্রিক পূজার পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে কেন? ইহার পরে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, এই সঙ্গে দেবতাদিগের পুংস্ত্ব-স্ত্রীত্ব কল্পনা ত্রিনয়ন-চতুর্ভুজত্বাদি অঙ্গকল্পনা, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রকল্পনা ও শক্তি-সেনা কল্পনার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। * এক দেবতারই মূর্ত্তিভেদের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, † দেশভেদে মা দুর্গার প্রতিমা ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত হয়। বেদে মা

---

* শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে—চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী ব্রহ্মের উপাসকগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থই রূপকল্পনা হইয়া থাকে এবং রূপস্থ দেবতাগণের পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ এবং অস্ত্রাদির কল্পনা হইয়া থাকে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যঙ্গাস্ত্রাদিকল্পনা। দ্বিচত্বারিষড়ষ্টাসাং দশদ্বাদশষোড়শ॥
অষ্টাদশামী কথিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিভির্যুতাঃ। সহস্রান্তাস্তথা তাসাং বর্ণবাহনকল্পনা॥
শক্তিসেনা কল্পনা চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা। কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাধিকল্পনা"॥
—শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ।

† কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, দেবীর মূলমূর্ত্তি এক হইলেও তিনি বিভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। এক বিষ্ণুই যেমন নিত্য বলিয়া 'সনাতন' নামে উক্ত হইয়া থাকেন, এবং জনগণকে অর্দ্দন করেন বলিয়া জনার্দ্দন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, একই পুরুষ যেমন ছত্রধারণকালে 'ছত্রী' এবং স্নানকালে 'স্নাপক' এই আখ্যায় আখ্যাত হ'ন সেইরূপ এক মহামায়াই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

মূলমূর্ত্তির্মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী॥
* * * *
অন্যা যা মূর্ত্তয়ঃ প্রোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদয়োঽপরাঃ
তস্যা এব বিভাগাস্তাস্তচ্ছরীরবিনির্গতাঃ
নিঃসরন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিম্বান্মরীচয়ঃ
* * * *

দুর্গার কিরূপ মূর্ত্তির পূজা উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা যথার্থভাবে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা'পুরাণ বা তন্ত্রবর্ণিত মা দুর্গার পূজা কি বেদসম্মত নহে?' এইরূপ প্রশ্নকে অল্পজ্ঞোচিত বলিবেন, সন্দেহ নাই। যে-কোন মূর্ত্তিই হোক্, তাহা যখন শব্দাখ্য পরমাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়, শব্দাখ্য পরমাণুই যখন পুরাণ ও তন্ত্রের প্রসূতি, পুরাণ ও তন্ত্র শব্দাখ্য পরমাণু হইতে যখন ভিন্ন নহে, তখন পুরাণ বা তন্ত্রবর্ণিত দুর্গা মূর্ত্তি বস্তুতঃ বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে কি? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই বিশ্বের মূল কারণ, যাঁহারা ইহা স্বীকার করেন, ইহা জানিলেও প্রত্যেক জাগতিক পদার্থের আকৃতিগত ভেদ হয় কেন যাঁহারা তাহা চিন্তা করিয়াছেন,* তাহা চিন্তা করিয়া যাহারা ইহার প্রকৃত উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা কখন বেদবর্ণিত দেবীমূর্ত্তির সহিত পুরাণ ও তন্ত্রবর্ণিত দেবীমূর্ত্তির পার্থক্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। পুরাণ ও তন্ত্র বেদেরই ব্যাখ্যা, পুরাণ ও তন্ত্র বেদ ভিন্ন নহে।

তোমাকে আকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়, তাহাদিগকে শ্রবণ করিয়া তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বল, শুনি।

জিজ্ঞাসু নন্দকিশোর—আকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনি আমাকে অনেক বহুমূল্য উপদেশসকল প্রদান করিয়াছেন; যৎকালে আমি তাহাদিগকে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎকালে, পূর্ণরূপে তাহাদের ধারণা করিতে না পারিলেও আমি আপনাকে কৃতার্থ এবং বিশেষতঃ ভগবান্ জ্ঞান করিয়াছিলাম। যেটুকু

---

* "একৈব তু মহামায়া কার্য্যার্থং ভিন্নতাং গতা
কামাখ্যা তু মহামায়া মূলমূর্ত্তিঃ প্রগীয়তে

* * *

এক এব যথা বিষ্ণুর্নিত্যত্বাদ্ধি সনাতনঃ
জনানামর্দ্দনাৎ সোঽপি জনার্দ্দন ইত শ্রুতঃ

* * *

যথা হি পুরুষঃ কোঽপি ছত্রী ছত্রগ্রহাদ্ভবেৎ
স্নাপক স্নানকালে বৈ কামাখ্যাপি তথাহ্বয়া॥"

—কালিকা পুরাণ, ৬০ অধ্যায়।

ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম এবং যতটুকু মনে আছে, তাহাই সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। আপনি এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন :—শব্দ বা প্রণবাত্মক বেদ হইতেই বিশ্বজগৎ প্রসূত হইয়াছে। প্রণবের স্পন্দনই মূল স্পন্দন। গতি বা motionই আকৃতির মূল। নামরূপবিহীন অব্যাকৃত অবস্থা হইতে জগৎ কিরূপে ব্যাকৃত বা ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এক অবিভাগাপন্ন অবস্থা হইতে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আকারিত হয়, এক অবিশেষ বা সামান্য ভাব কিরূপে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, বেদশাস্ত্র দ্বারা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্তসমূহের সাহায্যে আপনি আমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকগণের উক্তিসকলেরও উল্লেখ করিয়া বিষয়টি যথাসম্ভব সরল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আপনি বলিয়াছিলেন :—মনে কর, কোন তরুতলে তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে; প্রথমে যে ধূম নির্গত হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। দেখ, ধূম প্রথমে সরলরেখাক্রমে ঊর্দ্ধ দিকে প্রসারিত হইতেছে। ভূমি হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এইরূপে সরলরেখাক্রমে উত্থিত হইল; তাহার পর বাধাপ্রাপ্ত হইল, তরুর শাখাপ্রশাখা ও পত্রগণদ্বারা ইহার সরল গতি বাধিত হইল। তদবধি ইহার বক্রগতি অনুভূত হইতে লাগিল এবং বাধাপ্রাপক শক্তির দিক্ ও পরিমাণানুসারে এতাবৎ সরলরেখাক্রমে উদীয়মান ধূমশিখা এখন নানা আকারে আকারিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তরুর অসংখ্য পত্রপল্লবাদি দ্বারা বাধিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ আকারে আকারিত হইল। এ দৃষ্টান্ত প্রায় সকলেরই নয়নে পতিত হইয়া থাকে। ইহার তত্ত্ব চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে (কোন বস্তুর) আকার ধারণের প্রতি দুইটী শক্তির পরস্পর পরস্পরের প্রতিক্রিয়াই কারণ। জগতে যাহা কিছু পরিণাম দৃষ্ট হয় সকলই গতির মূর্ত্তি। শক্তির তত্ত্ব চিন্তা করিতে যাইলেই দুইটী শক্তির রূপ নয়নে পড়িবে, একটি প্রবর্ত্তক বা প্রবৃত্তিশক্তি (Accelerating Force), অন্যটি বাধাপ্রদ বা সংস্ত্যানশক্তি (Resisting Force) প্রবৃত্তিশক্তি (Acceleration) বিরুদ্ধ বা সংস্ত্যানশক্তি (Resistance) দ্বারা বাধিত হইলেই আকারের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং এই শক্তিদ্বয়ের দিক্ ও বল পরিমাণানুসারে আকৃতি সকলের ভেদ হইয়া থাকে। জ্যামিতিজ্ঞ যত আকৃতি (Geometrical Figures) সব এই নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। যেস্থলে প্রবৃত্তিশক্তির (Acceleration) বল অধিক এবং সংস্ত্যানশক্তির (Resistance) বল অল্প,

সেস্থলে বস্তুটির আকৃতির দৈর্ঘ্য অধিক এবং প্রসার অল্প হইয়া থাকে, এবং যেস্থলে প্রবৃত্তিশক্তির বল অল্প এবং বাধাপ্রদশক্তির বল অধিক, তথায় বস্তুটীর আকৃতির প্রসার অধিক এবং দৈর্ঘ্য অল্প হইয়া থাকে। আকৃতিবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিবার সময়ে আপনি সুশ্রুতসংহিতা ও 'গীকি'র 'জিয়োলজী' হইতে অনেক উপাদেয় কথা শুনাইয়াছিলেন। এই সময়ে আপনি নরশরীরের বিভিন্ন যন্ত্র সকলের উৎপত্তি ও তাহাদের আকৃতির ভেদের কারণও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কোন কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে শক্তিপ্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে; শক্তি যন্ত্র বিনা ক্রিয়া করিতে পারে না; বিভিন্ন কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মানবশরীরে (পোষণাদি) একাধিক বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, অতএব মানবশরীর বিভিন্ন যন্ত্রের সমষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভিন্ন ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে বলিয়া যন্ত্র সকল ভিন্ন ভিন্নরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছে। নরশরীরের সকল অস্থি সমান আকারের নহে। ইহাদিগ দ্বারা সাধ্য ক্রিয়া অনুসারে ইহাদের মধ্যে কোনটী দৈর্ঘ্যে এবং কোনটি প্রসারে অধিক (Long বা flat bone) হইয়াছে। কোন অস্থি কেন long বা Flat হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব কথিত উক্তি সকলের চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আপনার প্রাগুক্ত উপদেশ গুলি পূর্ব্বে শ্রুত থাকাতে দেবতার আকৃতিভেদ কেন হয় আমার তাহা বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (শ্রীরামতাপনীয়োনিষদের এবং আপনার শ্রীরামাবতার কথাধৃত অগস্ত্যসংহিতার বচন স্মরণ করিতেছি) যে, বিভিন্ন কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ এক, অদ্বিতীয়, নিষ্ফল, অশরীরী, নিরাকৃতি পরমাত্মা বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ত্তির নিমিত্তই ব্রহ্মের রূপকল্পনা হইয়া থাকে, অশরীরী পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার কার্য্য বা লীলা করিতে হয়, অতএব তাঁহার রূপের বা আকৃতির যে অসংখ্য প্রকার ভেদ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কালিকাপুরাণেও এ কথা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। মা দুর্গার মূলমূর্ত্তির এবং তাহা হইতে বিভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন মূর্ত্তিধারণের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেবীর তান্ত্রিকী পৌরাণিকী প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আপনি উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাকে শাস্ত্রের অন্যান্য তত্ত্বও বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। সরল ও বক্রগতিতত্ত্ব হইতে আমি, আপনার অপার কৃপায়, প্রকৃত ধর্ম্ম ও

ধার্ম্মিকের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি, আমি আপনার প্রসাদে বুঝিয়াছি, প্রেতি—প্রকৃষ্ট গতি বা সরলগতি যে কর্ম্মের স্বরূপ তাহাই যজ্ঞ বা ধর্ম্মনামক পদার্থ, এবং যিনি প্রকৃষ্টতম গতি—যিনি কেন্দ্রের সন্নিকৃষ্টতম, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। দৃষ্টান্তের বৃক্ষমূলোত্থিত ধূমশিখার ন্যায় মানব প্রথমে সরলরেখাক্রমেই নিজগতি প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘকাল সরলগতিতে চলিতে পারেনা, যে উদ্দেশ্য লইয়া (অর্থাৎ পরমকারণ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার চরণে উপনীত হইবার নিমিত্ত) যাত্রা করিয়াছিল, কিয়দ্দূর গিয়া সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়, ভগবানের চরণরূপ লক্ষ্যকে (যাহা ইতিপূর্ব্বে তাহার গতির প্রান্তবিন্দু ছিল তাহাকে) ত্যাগ করে, লৌকিক মান, যশঃ বা ইন্দ্রিয়সেবার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইহাদের অন্যতমকেই লক্ষ্য বলিয়া স্থির করে, সুতরাং গতির দিক্ পরিবর্ত্তন করে, অতএব তাহার গতি বক্র হইয়া যায়, তাহার গতি আর প্রেতি বা প্রকৃষ্ট গতি থাকেনা, অতএব অধর্ম্মে গিয়া নিপতিত হয়। এইরূপে মানব দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিত্য নূতন নূতন বিষয়কে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করে এবং বক্রগতিতে বা ভবঘোরে ঘুরিতে থাকে। যে ভাগ্যবান্ নিজ লক্ষ্য একবারও ত্যাগ করেন না, যিনি নিজ উদ্দেশ্য একবারও ভুলেন না, তিনিই সরলগতিতে অগ্রসর হইয়া অল্পকালেই গন্তব্যস্থলে উপনীত হন, অন্যে বক্রগতিতে চলেন বলিয়া তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয়, বহু জন্ম কাটিয়া যায়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যে, সমাসতঃ ইহাই ভেদ।* শ্রীমুখ হইতে আকৃতিবিজ্ঞান

---

* জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে সরল (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear), গতিকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে গতি সরলরেখাক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে সরলগতি এবং যাহা বক্ররেখাক্রমে প্রধাবিত হয়, তাহাকে বক্রগতি বলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্, সরল ও বক্র এই রেখা-দ্বয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—যে রেখার মুখ পদে পদে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম বক্র রেখা, এবং যাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার নাম 'সরলরেখা' A curved line is merely a line whose direction changes from point to point, while a straight line is one whose direction does not change."—

Recent Advances in phygical science.

সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, আমি তাহা পূর্ণতঃ বা যথাযথভাবে বিবৃত করিতে পারি নাই, এ সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইব।

বক্তা—আমার বর্ত্তমান শরীরের অবস্থায় আমি অধিক কথা বলিতে পারিব না। যদি ভগবানের ইচ্ছায় আর কিছু দিন শরীর থাকে, তাহা হইলে তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব; এখন প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য? এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইবার আর একটা কারণ হইতেছে পুরাণ-তন্ত্রে দুর্গার যে রূপ, যে আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, বেদে দুর্গার সেই রূপ সেই আকৃতির বর্ণনা আছে কি না, লোকের এই বিষয়ে সংশয়। ঋগ্বেদাদিতে মা দুর্গার স্বরূপাভিধায়ক যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার যথার্থ অর্থ কি। তাহার তত্ত্বচিন্তা কিরূপে কর্ত্তব্য, আজ-কাল লোকে সাধারণতঃ তাহা বিদিত নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা মার বেদবর্ণিত রূপ ও পুরাণ তন্ত্রাদিবর্ণিত রূপের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাদের ঐক্য অনুভব করিতে পারেন না। বেদে যে রূপ বা যে আকৃতির কথা নাই সে রূপ বা সে আকৃতির কল্পনা হইতে পারে না। অকৃতিতত্ত্ব ভাল করিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে, কল্পনার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলে উপলব্ধি হইবে, পরমাণু যদি মূর্ত্তি বা আকৃতির উপাদান কারণ হয়, তাহা হইলে পরমাণুতে এই সকল বিভিন্নরূপে উপলভ্যমান আকৃতি সকল বীজভাবে না থাকিলে পরমাণু হইতে ইহাদের কখনও স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইতে পারিত না। বেদ বা শব্দ হইতেই (পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পরমাণু বাদিগণের এই স্থলে শব্দকে পরমাণুস্থানীয় জ্ঞান করিতে বাধা বোধ হইবে না) বিশ্বজগৎ প্রসূত হইয়াছে। বেদে সকল ভাবের মূল ভাব আছে, সকল ব্যক্ত ভাবের বীজ ভাব আছে। বেদে ইহা নাই উহা নাই, এইরূপ উক্তি অল্পজ্ঞগণই করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের স্বরূপ যথাযথভাবে জ্ঞাত না থাকার জন্যই 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য?' লোকের মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ।

আচার্য্য] হস্তদ্বয় চরণদ্বয় ও মুখমণ্ডল ভালরূপে প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র-স্থানে আসনে হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে উপবেশন করিবে। অনন্তর কুশহস্তে 'ওঁ বিষ্ণুঃ' এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ-মূল-রূপ ব্রাহ্মতীর্থে একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল লইয়া উহা তিনবার পান করিবে।

তৎপর অঙ্গুষ্ঠ-মূল দ্বারা লোমযুক্ত কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর দুইবার মার্জ্জন করিবে। অনন্তর জলদ্বারা চরণদ্বয় বামহস্ত ও মস্তক সেচন করিবে। তৎপর জলার্দ্র তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি মিলিত করিয়া তদ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে। এইরূপ জলার্দ্র অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী সহযোগে নাসারন্ধ্রদ্বয়, মিলিত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণদ্বয় দুইবার এবং মিলিত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাদ্বারা নাভিস্পর্শ করিবে। তৎপর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া করতল দ্বারা হৃদয়দেশ, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক, (ব্রহ্মরন্ধ্র) এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে।

আচমন প্রসঙ্গে সামগাচার্য্য গোভিল বলিয়াছেন—গমন করিতে করিতে আচমন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া আচমন করিবে না। হাসিতে হাসিতে আচমন করিবে না। ইতস্ততঃ অবলোকন করত আচমন করা নিষিদ্ধ। মস্তক অপ্রণত রাখিয়া আচমন করা অবিধেয়। অঙ্গুলিদ্বারা জলক্ষেপণ পূর্ব্বক আচমন করিবে না। বিহিত ব্রাহ্মাদি তীর্থ ভিন্ন অপর তীর্থে আচমন করা উচিত নহে। জলপান কালে শব্দ না হয়, এরূপভাবে আচমন করিবে। আচমন কালে যাহা ভালরূপ দেখা হয় নাই, এরূপ জলে আচমন করিবে না। রাত্রিতে এই নিয়ম অনুসরণীয় নহে (রাত্রাবনীক্ষিতেনাপি শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।) জানুদ্বয়ের বাহিরে অংস (স্কন্ধ) রাখিয়া আচমন করিবে না। পরিধেয় বস্ত্রের একদেশ উত্তরীয় করিয়া আচমন করিবে না। উষ্ণজলে আচমন করিবে না। রুগ্ন অবস্থায় উষ্ণ জলেও আচমন করিবেন; যথা—উদকেনাতুরাণাঞ্চ তথোষ্ণেনোষ্ণপায়িনাম্ ফেনযুক্ত জল দ্বারা আচমন করা নিষিদ্ধ। উপানহ (চর্ম্মপাদুকা) ধারণ করিয়া কখনও আচমন করিবে না। শিরোবেষ্টন করিয়া বদ্ধ-পরিকর হইয়া কিংবা অঙ্গাবরণাদি যুক্ত হইয়া আচমন করা নিষিদ্ধ। উত্তরীয় বস্ত্র গলদেশে লম্বিত করিয়া আচমন করিবে না। (যজ্ঞোপবীত যেমন বাম স্কন্ধের উপর দিয়া ডান হাতের নীচে লম্বিত থাকে, সেইরূপ ভাবে উত্তরীয় ধারণ

করা শাস্ত্র বিহিত,এই ভাবে উত্তরীয় ধারণ করিয়া শাস্ত্র বিহিত আচমনাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে।) চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া আচমন করিবে না। আচমনের পরে হস্তদ্বারা জলস্পর্শ করিলে শুচি হইয়া থাকে। যে পরিমাণ জল পান করিলে পীত জল হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, আচমন কালে সেই পরিমাণ জল পান করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আচমন না করিলে আচমনকারী উচ্ছিষ্টই থাকেন। যে যে কারণে দ্বিতীয়বার আচমন করিতে হয় তাহা বলা যাইতেছে —নিদ্রা, ভোজন, হাঁচি, স্নান, জলপান, বস্ত্র পরিধান, পথে গমনাগমন ও শ্মশানে গমন করিলে দ্বিতীয়বার আচমন করিবে। কিন্তু আচমন করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিবার পরে যদি হাঁচি, থুথু ফেলা, নিদ্রা, বস্ত্রপরিধান ও অশ্রুপাতন ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ শ্রবণ (বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সদা তিষ্ঠতি জাহ্নবী, এই বচন অনুসারে শ্রীগঙ্গাস্মরণ পূর্ব্বক) স্পর্শ করিবে। যথা স্মৃতিবাক্য—ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব পরিধানেঽশ্রুপাতনে। কর্ম্মস্থ এষুনাচামেৎ দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥ ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে। পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আচমন কাহাকে বলে? সকল কর্ম্মের আরম্ভেই আচমন করিতে হয় কেন?

আচার্য্য] বৎস, ব্রাহ্মতীর্থে (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মূল দেশে) এক বিন্দু জল লইয়া (শ্রীবিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক) উহা বিষ্ণুস্বরূপে আহুতি দিবার জন্য তিনবার পান করাকেই আচমন বলে। আহারের পর তোমার মুখ উচ্ছিষ্ট হইলে উহা যেমন অপবিত্র হয়, এই অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য যেমন আচমন করিতে হয়, এবং আচমন করিলে যেমন ব্যাবহারিক কর্ম্মের অযোগ্যতা দূরীভূত হয়, সেইরূপ ব্যাবহারিক জগতের বিষয়রাশি আহরণ করিবার পর চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ উচ্ছিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন বিনা পবিত্রতায় এই উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা পারমার্থিক কার্য্য হয় না এই জন্য সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্মের আরম্ভে আচমন করা শাস্ত্রবিহিত। এইজন্য এই পরিমাণ জল তিনবারে পান করা আবশ্যক, যাহা হৃদয় পর্য্যন্ত * পৌঁছিয়া হৃদয়স্থিত মনকে স্বীয় পাবন

---

* হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ মনু-২।৬২

আচমনীয় জল হৃদয়গত হইলে ব্রাহ্মণ, কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয়, পানমাত্রে বৈশ্য, ওষ্ঠ স্পর্শন মাত্রে শূদ্র পবিত্র হইয়া থাকেন।

স্পর্শে পবিত্র করিতে পারে। তারপর জলার্দ্র হস্তে ইন্দ্রিয়-দ্বারগুলি স্পর্শ করিবারও ফল ইহাই। চক্ষু বাহ্য জগতের রূপরাশি দর্শন করিয়া উচ্ছিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কর্ণ বাহ্য জগতের কোলাহলে পড়িয়া অপবিত্র হইয়াছে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও স্ব স্ব বিষয় আহার করিয়া শাস্ত্রীয় কার্য্যে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহারা অপবিত্রতা-সুলভ দুর্ব্বলতা মোহের আবরণে আবৃত করিয়া বাহ্য বিষয় লইয়া নৃত্য করিতেছে, ইহাদিগকে জলার্দ্র হস্তে প্রক্ষালন কর, দেখিবে—এই প্রক্ষালন বা আচমনের ফলে ইহারা আপ্যায়িত মনে করিবে, তখন ইহাদের আভ্যন্তরীণ-রাজ্যে যাইবার আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আসিবে।

এই জল পানের সঙ্গে সঙ্গে 'ওঁ বিষ্ণুঃ' উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্য—লক্ষ্য-স্মরণ। আচমন করিবার পরে যখন ইহাদের বাহ্য-বিষয়াহার-জনিত আবেশ কাটিয়া যাইবে, ইহারা আভ্যন্তর রাজ্যে যাইবার যোগ্য হইবে, তখন কোথায় যাইতে হইবে, সর্ব্বদা আহার করাই যাহাদের কার্য্য, তাহারা কি আহার করিয়া আপ্যায়িত হইবে; তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, এই জন্যই ইহাদের সম্মুখে ধরা হইতেছে ওঁ বিষ্ণু। পূর্ব্বেই হৃদয় গত জলবিন্দু মনকে আচমন করাইয়া পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, তখন মন নিজ সহচরী ভাবনা লইয়া শ্রীবিষ্ণু দেহের অঙ্গরাগ করিতে লাগিয়া যাইবে। সেই ভুবনমোহন রূপরাশি সেই লোভনীয় রসের সাগর, সেই স্পৃহণীয় অঙ্গগন্ধ, সেই আহ্লাদকর তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শ, সেই মনোমোহন তাঁহার আহ্বান শব্দ—বিষয়-ভাবনায় যাহা যাহা ভুল হইয়াছিল, ভাবনার অনুরাগে সকলই যেন নূতনবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে।

বহুদিন ধরিয়া বিশ্বস্ত—লুব্ধ হৃদয় লইয়া ইহাদিগকে আচমন করাইতে থাক, একবার যদি ইহারা আবেশমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, এই অনাদিকাল পিপাসিত দৃষ্টি একবার যদি সেইরূপের ধারা পান করিতে পারে, এই চির-উপবাসী কর্ণ একবার যদি তাঁহার আহ্বান ধরিতে পারে তবে চির-কালের জন্য ইহারা বিষয়-মাধুকরী পরিত্যাগ করিবে। ঐ দেখ শাস্ত্র তোমার জন্য কেমন সুন্দর করিয়া শ্রীবিষ্ণুর এই রূপরাশি অঙ্কিত করিয়াছেন—

প্রসন্ন বদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
লসৎপঙ্কজ-কিঞ্জল্ক-পীতকৌষেয়-বাসসম্।

শ্রীবৎস-বক্ষসং ভ্রাজৎ-কৌস্তুভামুক্ত-কন্ধরম্॥
মত্ত-দ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্দ্ধ্য-হার-বলয়-কিরীটাঙ্গদ-নূপুরম্॥
কাঞ্চীগুণোল্লসচ্ছ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজ-বিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়ন-বর্দ্ধনম্॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোক-নমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহ-কাতরম্॥
কীর্ত্তন্য-তীর্থ-যশসং পুণ্যশ্লোক-যশস্করম্।
ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ॥
স্থিতং ব্রজন্ত মাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধ-ভাবেন চেতসা॥ ভাগবত ৩।২৮।১৩-১৯

একবার ভাল করিয়া এই চিত্র হৃদয়ে আঁকিয়া লও। শাস্ত্রের ছাঁচে বিশ্বাস-দ্রবীভূত-হৃদয় ঢালিয়া দাও—দেখিবে সুন্দর রূপরাশি লইয়া তোমার হৃদয় আনন্দে আত্মহারা হইবে। কি সুন্দর সে রূপের বর্ণনা! সেই সুখপ্রসন্ন বদন কমল, সেই পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণাভ দৃষ্টি, সেই নীলোৎপল দলের ন্যায় অঙ্গকান্তি! ভাল করিয়া দেখ কি সুন্দর এই ভুবনমোহন দৃশ্য। তাঁহার হস্তে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজিত, পরিধানে পদ্মকেশরের ন্যায় সুন্দর পীতবর্ণ বস্ত্র, বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন, গলদেশে দেদীপ্যমান কৌস্তুভমণি। কণ্ঠ-লম্বিত বনমালার সৌরভে লুব্ধ-ভ্রমরশ্রেণী পদ্মবীজ রচিত মালার মত বিরাজ করিতেছে! বহুমুল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুর যথা স্থানে বিন্যস্ত। কটিদেশে সুন্দর কাঞ্চীদাম, তোমার হৃদয়-কমলে তোমার নয়ন মন আপ্যায়িত করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দেখ তোমার মত দাসজনের জন্য করুণা-ভরিত এই দৃষ্টি কত মধুর। ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে—ইহাঁর প্রতি অঙ্গে ভাগবত লীলা গ্রথিত। ইহাঁর চরণ কমলে দৃষ্টি কর কত শত ভক্তোদ্ধারের স্মৃতি ইহাঁর সহিত অনুস্যূত, কেমন করিয়া তোমার মত ত্রিতাপ-দগ্ধ জনের অবনত মস্তকে এই কমলা-লালিত চন্দ্রকোটি সুশীতল-চরণ-কমল ধীরে ধীরে স্থাপন করেন—স্মরণ কর—হৃদয় আপনা

আপনি তাঁহার যশোগান করিতে থাকিবে। এইরূপে প্রতি অঙ্গদর্শনে তাঁহার পাবনী লীলাস্মৃতি তোমার হৃদয় প্লাবিত করিয়া তোমার পাপ সংস্কার প্রক্ষালন করিয়া ফেলিবে। যে পর্য্যন্ত না মন বিরত হয়, তাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এই মূর্ত্তি লইয়া ধ্যান করিবে। কখন দেখিবে—শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী স্মেরানন সরোরুহ এই শ্রীমূর্ত্তি তোমার হৃদয়-কমলে দাঁড়াইয়া আছেন, কখন দেখিবে—তোমার হৃদয়রাজ রাজপথে বিচরণ করিতেছেন, কখনও দেখিবে যেন কুসুম-সুকুমার সেই চরণ কমল বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত—তিনি উপবেশন করিয়া আছেন, কখনও বা এই হৃদয়-গুহাশায়ী পুরুষোত্তম তাঁহার সুঅঙ্গ স্পর্শে তোমাকে পুলকিত করিয়া তোমার হৃদয়-শয্যায়-শয়ন করিয়া আছেন। যখন যে অবস্থায়ই থাকুন, তুমি সেবক ভাবে সেবার উপকরণ লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। তাহার প্রত্যেক—আকার ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য করিবে—করিয়া করিয়া দাসজনের মত তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে।

তিনি তোমার সংকল্পরচিত হৃদয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন—তোমার হৃদয়-পর্য্যঙ্কে সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, নূপুর-শোভিত স্বভাব-রঞ্জিত শ্রীচরণ কমল প্রসারিত হইল তুমি পূর্ব্ব হইতেই এই সুখের অবসর-প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। অবসর মিলিল, অমনি শ্রীচরণ সেবায় লাগিয়া গেলে। এইরূপ যখনই কোন সেবার প্রয়োজন, তখনই তুমি সেখানে উপস্থিত হইও। দেখিবে প্রতি সেবায় তোমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম—'ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক আচমন করিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—লক্ষ্য স্মরণ।

কোন অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য তুমি এই সন্ধ্যা পূজা জপ হোম ইত্যাদি করিতে যাইতেছ; পারমার্থিক পবিত্রতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ্যস্থান এই পরম রমণীয় শ্রীবিষ্ণু পদ স্মরণ করিয়া লও। ইহাতে একদিকে কর্ম্ম-সাধনে তোমার যেমন আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা আসিবে, পক্ষান্তরে অতি সরসভাবে তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। তোমার হৃদয় যখন এই মধুময় শ্রীবিষ্ণু-স্মৃতিতে ভরিয়া যাইবে,তখন আর কর্ম্ম-রূপ বন্ধন বা ফল-বন্ধন আপন বন্ধনীতে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। এই জন্যই শ্রুতি পরবর্ত্তি মন্ত্রে এই বিষ্ণু স্থানের বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন।

সত্যসংকল্প।

দয়াময় জগদীশ, মায়াময় মায়াধীশ
সংকল্প মাত্রে সৃজিলে বিশ্ব।
ওহে শান্ত প্রেমময়, তুমি বিভু বিশ্বময়,
তবু আমি অতি দীন নিস্ব !!
রূপের মাঝে অরূপ, উজ্জ্বল জ্যোতি স্বরূপ,
তুমি যে চিন্ময় সপ্রকাশ।
দুর্দ্দান্ত কামনা শ্রান্ত, মোহমদিরায় ভ্রান্ত !
কেমনে বুঝি তব বিকাশ !!
আমি চির দীন, আসিবে কি সে সুদিন ?
মঙ্গলময় হে ভগবান,
ঘোর দৈন্য দুঃখ শোকে, পশিবে আমার বুকে
বিষাদের সকরুণ বান।
বিঁধিবে বক্ষ ভেদিয়া, নিমিষে ফেলি ছিঁড়িয়া,
ক্ষুদ্র হিয়ার বাঁধন সব,
ফাঁকে ফাঁকে পড়িবে ছড়ায়ে, বুকে বুকে ধরিবে জড়ায়ে
এ বিশ্বের সকল বৈভব।
তাপিত সে বক্ষ রক্ত, করি তপ্ত অশ্রুসিক্ত
করিব তোমারই তর্পণ,
আমার যা কিছু আছে, ধরিয়া তোমার কাছে,
করিব তোমারেই অর্পণ।
বিষয় বাসনা রহিত ফলকামনা বর্জ্জিত,
সত্যসংকল্পে কর মোরে দীক্ষা,
শরণাগত হীন জনে, এই অধম কৃপণে,
সাধনার পথে দাও শিক্ষা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার রায়

ভারতের সুপুত্র ও সুকন্যা কাহারা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

(১)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল "সমাজকে সকল দিকে স্বাধীনতা না দিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না।" আমরা ইহার আলোচনা করিতে যাইতেছি।

স্বাধীনতা ভিতরের বস্তু। বাহিরে বাহির হইয়া যেমন ইচ্ছা আহার বিহার করিব, কোন নিয়মের অধীন হইব না। সমাজের কল্যাণকর যাহা কিছু তাহাও খুঁজিবনা, অন্য জাতির মূর্খ লোকেরা যাহা করে এবং সেই জাতির ভাল লোকে যাহার নিন্দা করে তাহাই অনুকরণ করিতে ছুটিব ইহাই কি স্বাধীনতা? যে স্বাধীনতা তোমরা সমাজকে দিতে চাও সেটা ত ভোগের স্বাধীনতা। ইহাতে কি ভিতরের স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিবে? যাহা ভাল তাহা গ্রহণ কর, যাহা মন্দ তাহা ত্যাগ কর তবে ত তুমি স্বাধীন হইবে।

ভিতরের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে চরিত্রবান হইতে হইবে, চরিত্রবতী হইতে হইবে। যাহাদের চরিত্র নাই তাহাদিগকে কি কখন স্বাধীন হইতে দেখিয়াছ?

স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শক্তি। পৃথিবীতে যত প্রকার বল আছে ভিতরের স্বাধীনতার বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পুরুষের যদি চরিত্রের বল না থাকে, স্ত্রীলোকের যদি সতীত্বের বল না থাকে, মানব মন যদি একাগ্র হইবার শক্তি উপার্জ্জন করিতে না পারে তবে কি ভিতরে এই মহারত্ন কখন দেখিতে পায়? হুজুগে কি স্বাধীনতা লাভ হয়?

তখনও ভারতের দুর্গতি! কিন্তু পূর্ব্বগৌরব তখনও ভারত ভুলিতে পারে নাই। তাই ভারত তখনও যাহা দেখাইয়া গেল তাহা জগতের চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছিল! আমরা "জহর ব্রতে" সতীত্বের কথা বলিতেছি। কাম লালসায় অন্ধ হইয়া বিদেশী জেতা ভারত ললনার সতীত্বে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিল। ভারত ললনা দলবদ্ধ হইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিল—পুরুষেরা স্ত্রীজনের সতীত্ব

রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিল। স্ত্রীলোকেরা যখন দেখিল আর জীবন রক্ষা হয় না তখন অগ্নিতে জীবন আহুতি দিল তথাপি সম্রাটের লাম্পট্যে আত্মদান করিল না। এই ত ভিতরের শক্তি। যাহা ভাল তাহার রক্ষার জন্য প্রাণও তুচ্ছ। সমাজের মধ্যে ভাল কোন কিছু কি পাইয়াছ? এই জ্ঞানীর রাজ্যে এমন ভাল কোন কিছু কি দৃষ্টিতে পড়িয়াছে যাহা রক্ষার জন্য তুমি তোমার প্রাণকে হাসিতে হাসিতে বিসর্জ্জন দিতে পার? পার নাই। যদি পারিতে ভিতরে রাজরাজেশ্বরী হইয়া কাহারও অনুকরণ করিতে কি ছুটিতে পারিতে?

চরিত্রবান্ ও চরিত্রবতী যে হইবে তাহা কি দুই চারিটা হিনহিনে'পিনপিনে' নীতি বাক্য বলিতে পারিলেই হয়? নীতি বাক্যের রাজা যিনি, সকল মহত্বের মূল যিনি, সকল শক্তির আধার যিনি সকল সাধুতার সমষ্টি যে ঈশ্বর তাঁহাকে হৃদয়ে বসাইতে না পারিলে কি স্বাধীন হওয়া যায়? পশু বলের স্বাধীনতা দুদিনের জন্য, বুদ্ধি কৌশলের স্বাধীনতা চারিদিনের জন্য—এ স্বাধীনতা থাকিবে না—সমাজকে ধ্বংস করিয়া এই স্বাধীনতা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ঈশ্বরকে ধরিতে চেষ্টা কর, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে চেষ্টাবান চেষ্টাবতী হও, ভিতরের স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিবে। তখন তোমাকে অধীন করিয়া রাখিবে কে?

ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা আনয়ন কর—কাম ভোগের স্বাধীনতা কি আবার স্বাধীনতা? সংযমী হও, স্বাধীন হইতে পারিবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি—এই সমস্ত ধর্ম্মের অঙ্গ। এইগুলি উপার্জ্জন কর। স্বাধীন হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যে যে স্বাধীনতা তাহাতে তোমাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে উহা কি বিচার করিয়া দেখিবে না?

ধর্ম্মে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত কি তোমার দেশে নাই? সে দিন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার যখন ভারত অধিকার করিতে আসিয়াছিলেন—তখন তিনি এক ব্রাহ্মণকে বলিয়া ছিলেন—আমি যাহা বলি তোমাকে তাহাই করিতে হইবে, আমার কথা যদি না গ্রহণ কর, দিগ্বিজয়ী সম্রাট আমি, আমি এক্ষণেই তোমার মুণ্ডচ্ছেদন করিব—সম্রাটের হস্তে অসি ঝলসিয়া উঠিল। কিন্তু ভয় পাইবে কে? সকল সম্রাটের সম্রাট যিনি, সে ব্রাহ্মণ সেই রাজার প্রজা, তিনি কি কখন মুণ্ডচ্ছেদের ভয় করেন? ব্রাহ্মণ স্ফীতবক্ষে উত্তর দিলেন—"সম্রাট তুমি কাহাকে ভয় দেখাইতেছ? তুমি আমার দেহটা বিনাশ করিতে পার,কিন্তু আমি দেহ নই, আমি চেতন, আমাকে বিনাশ করা তোমার সাধ্যাতীত—যাহা পার কর—এই আমি দেহটা তোমাকে ছাড়িতে দিতেছি।" আলেকজান্দার ব্রাহ্মণের পদানত

হইলেন। ইহা কি তোমরা ইতিহাসে পাঠ কর নাই? প্রকৃত স্বাধীনতা ইহাই। এই স্বাধীনতা লাভের কোন চেষ্টা কি করিতেছ? ঈশ্বরের আজ্ঞা কোথায় পাওয়া যায় তাহার সন্ধান কি রাখিয়াছ? সে আজ্ঞা পালনের জন্য প্রাণপণ করিতে কি ইচ্ছা যায়? তোমার খামখেয়ালী মনে যাহা উঠিবে তাহাকেই ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া যদি গ্রহণ কর তবে তোমার বুদ্ধি কোন পথে ছুটিতেছে তাহা তুমিই বিচার কর! আজ বিচার না করিলেও সর্ব্ব-নিয়ন্তা যিনি তিনি তোমায় বুঝাইয়া দিবেন—যাঁহাদের বয়স হইয়াছে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—ঠিক উত্তর পাইবে। বৃদ্ধকে অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে? যাঁহারা সংসারে বহু দেখিয়াছেন, বহুবার ঠকিয়াছেন, তাঁহাদের পরামর্শ লও, সুপথ পাইবে; নতুবা অধঃপাতের পথ পরিষ্কার কি লাভ করিবে?

তোমরা দেখ ভারত ডুবিয়া যাইতেছে—আমরা দেখি এমন কতবার হইল—ভারত কিন্তু ডুবিল না, ব্রাহ্মাণ্ড হইতে ভারতের নাম মুছিয়া গেল না—কত জাতি উঠিল পড়িল—ভারত এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। ভারত যাহার উপরে দাঁড়াইয়া ভারত, আজ যে তোমরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছ? এ কর্ম্ম করিওনা। সৎ যাহা তাহা দেখ—তাহা অনুসরণ কর—অসৎ অনুসরণে ছুটিও না।

ভারত আজ দগ্ধ-পক্ষ মহাকায় সম্পাতির মত পড়িয়া আছে মাত্র। সম্পাতি মরে নাই। এই জলধির তীরে কেহ আসিবে—তাহারা সম্পাতির নিকটে কাহারও আগমন সংবাদ দিবে। সেই কথা শুনিলেই সম্পাতি বলিয়া উঠিবেন "পশ্যস্ব পক্ষৌ মে জাতৌ নূতনাবতিকোমলৌ"—দেখ দেখ আমার নূতন পক্ষ জন্মিল—অতি কোমল পক্ষ দেখিতেছ? ইহা আসিবেই—আর এই ভারত সম্পাতি গগন ভেদ করিয়া তোমার পৃথিবীতে চমক আনিয়া—উর্দ্ধে আবার উঠিবে। তোমরা ভারতের সন্তান সন্ততি, তোমরা স্বেচ্ছাচারের পথে যাইওনা—পুরুষ হও—চরিত্র গঠন কর, স্ত্রীলোক হও—সতীত্বের তেজ হৃদয়ে জ্বালাও। পুরুষ স্ত্রীলোক যেই হও—মনকে ঈশ্বর কেন্দ্রে একাগ্র করিবার জন্য প্রাণপণ কর—ইহাই সর্ব্বত্র শিক্ষা দাও। আহারে স্বাধীনতা ইহাত জিহ্বা লাম্পট্য। সুবিষয় আচরণ করিয়া স্বাধীন হও। কুবিষয় অনুকরণ করিয়া ভারত মাতার ক্লেশের কারণ হইও না।

(২)

পূর্ব্বে যাহা লেখা হইল তাহাই অন্য ভাবে আর একবার বলিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে পিতৃপুরুষের যাহা উত্তম তাহা যাঁহারা বর্দ্ধিত করিয়া যাইতে পারেন তাঁহারা উত্তম পুত্র কন্যা, যাঁহারা তাহা রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন তাঁহারা মধ্যম পুত্র কন্যা, যাঁহারা পিতৃপিতামহের উত্তম যাহা তাহা নষ্ট করিয়া যান তাঁহারা অধম। আরও এক শ্রেণীর কথা বলা যাইতে পারে ইঁহারা অধমাধম। ইঁহারা পিতৃপিতামহের উত্তম যাহা কিছু ছিল তাহা মানিতেই চাননা—যদি কেহ উত্তমের কথা উত্থাপন করেন তাঁহারা তাহার শত শত দোষ দেখাইয়া বলেন—ইহারা বর্ব্বর অসভ্য—ইহাদের মধ্যে ভাল কি থাকিতে পারে?' আমরা শেষোক্ত অধমাধমের কথা বলিব না—প্রথম তিন প্রকার পুত্র কন্যার কথাই আলোচনা করিতেছি।

আমরা আজকালকার শিক্ষিত শিক্ষিতা যুবক যুবতীগণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি ভারতের কোন কিছুকে উত্তম বলিতে প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন তবে তাঁহারা দেখাইয়া দিন ভারতের উত্তম বস্তু কি কি? তার পরে জিজ্ঞাসা করি—যাহা উত্তম বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন তাহা কোন প্রমাণে উত্তম তাহা কি তাঁহারা দেখাইতে পারেন? প্রবন্ধের এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া তাঁহারা যেন চিন্তা করেন ভারতের উত্তম বস্তু কি কি—এবং কেন তাহা উত্তম। এই সম্বন্ধে যদি তাঁহারা তাঁহাদের মত আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিব এবং আমাদিগকে তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন তাহা পালন করিতে করিতে আমরা তাঁহাদের সকল কার্য্যে যোগ দিতে পারি।

আমাদের দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই—স্বীকার করিয়া লইলাম ভারতের উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ—এই সমস্ত শাস্ত্র উত্তম—এই সমস্ত শাস্ত্রের যাহা আদর্শ তাহাও উত্তম—কিন্তু এই সমস্ত আদর্শ ত এখনও আছে তবে আজ ভারত এত পদদলিত কেন?

আমরা ইহার উত্তরে বলি সুরাসুরেরও অলঙ্ঘ্য যে নিয়মে দিনের আলোক রাত্রির অন্ধকারে গ্রাস করে সেই নিয়মে এক এক জাতি উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া আবার পতিত হয়। এই নিয়তির বশে রোমরাজ্য ঐরূপ উন্নত হইয়াও পতিত হইয়াছিল। গ্রীশের, ইজিপ্টের, ব্যাবিলনেরও তাহাই হইয়াছিল। আমাদের জাতির উন্নতি ও অবনতির যে ইতিহাস দেওয়া আছে তাহা এক এক কল্পের ইতিহাস। এক এক কল্পে ৭১ মহাযুগ। এক এক যুগে সত্য

ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগ। সত্য যুগে ধর্ম্ম চারিপাদে পূর্ণ,ত্রেতায় এক পাদ অধর্ম্ম আর তিনপাদ ধর্ম্ম। দ্বাপরে দুই পাদ অধর্ম্ম এবং দুই পাদ ধর্ম্ম। আর কলিতে তিন পাদ অধর্ম্ম এক পাদ মাত্র ধর্ম্ম। তবে এই জাতির পতন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ? এই অধর্ম্মের পরে আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে। এখন কথা হইতেছে কলিতে অধর্ম্মই ত অধিক। অধিক বলিয়া কি অধর্ম্মের দিকে ছুটিতে হইবে না শত কষ্ট সহ্য করিয়া ধর্ম্ম ধরিয়াই থাকিতে হইবে ? এখনকার যুবক যুবতী অধর্ম্মের দিকে যদি চলেন তবেত ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য পাপেরই বৃদ্ধি হইবে। এই যে লোকের ব্যভিচারে প্রশ্রয় দেখা যায় ইহার মূল কোথায় ? প্রাচীন আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যে চেষ্টা সেই চেষ্টার বিপরীত দিকে চলিলেই ত বিপত্তি আসিবে। সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম যাঁহারা ভারতের সুপুত্র ও সুকন্যা তাঁহারা প্রাচীন আদর্শের মত জীবন গঠনের চেষ্টা লইয়া চলিবেন। এখনকার চেষ্টা কোন পথে চলিতেছে ? এই সমস্তই কি উন্মত্ত চেষ্টা নহে ? নিজ নিজ জীবনে এই উন্মত্ত চেষ্টার প্রতিকূলে যাওয়াই পুরুষার্থ। কিরূপে এই উন্মত্ত চেষ্টার প্রতিকূলে যাওয়া যাইবে তাহার ব্যবস্থা ত শাস্ত্রই দেখাইয়া দিয়াছেন। তোমারা যে বল সময়েই উপযোগী চেষ্টা করা উচিত। সে কালে যাহা চলিত একালে তাহা কি চলে ? যদি ঋষিগণ একালে কি হইবে ইহা না জানিতেন তবে না হয় বলিতাম ঋষিদিগের কথা শুনিয়া একালে চলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা জ্ঞান দৃষ্টিতে একালের অবস্থাও দেখিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য একালে নষ্টবুদ্ধি মানুষের কর্ত্তব্য কি তাহাও ত দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে আমরা আপদ্ ধর্ম্মের কর্ত্তব্যও ত দেখি।

সেই জন্য বলিতেছিলাম শাস্ত্র মত চলিতে চেষ্টা করাই সকলের কর্ত্তব্য। এই যে আজকালকার যুবক যুবতীর শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিয়াছে ইহাতে শিক্ষার দোষই দেখা যায়। যাঁহারা আজ সমাজ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা প্রথম হইতেই শিক্ষা পাইতেছেন, শাস্ত্রের শিক্ষা কুশিক্ষা। সেদিন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার ক্রফ্‌ট্ মহোদয় তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন "যুবক যুবতীগণ যে সমাজ মানিতে পারে না তাহার কারণ হইতেছে ইহারা স্কুল ও কলেজে যে আদর্শের শিক্ষা পায় তাহা ইহারা সমাজে বা শাস্ত্রে কোথাও পায় না। সেই জন্য ইহারা পিতা মাতাকে মানিতে পারে না।" ক্রফট্ মহোদয়ের এই সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা একটু বিচার করিলেই সকলে বুঝিতে পারেন। ফলে এ দেশের আদর্শ যে সর্ব্বজাতির আদর্শ হইতে উৎকৃষ্ট তাহা যাঁহারা শাস্ত্র

পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। রামায়ণে যে আদর্শ রাজা, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতার কথা আছে অন্য দেশে তাহা আছে কি? আছে সব কিন্তু শাস্ত্রনিন্দা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রদিগের মন এতদূর সংশয়-পূর্ণ হইয়া থাকে যে তাঁহারা শাস্ত্রের নাম ও শুনিতে পারেন না। আর শাস্ত্রে থাকিলেই বা কি হইবে? যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে শাস্ত্র শিক্ষার মত জীবন গঠন হইতে পারে, আমরা শিক্ষিত যুবক যুবতীদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সে অনুষ্ঠান মত চলিবার অবসর কি ছাত্র বা ছাত্রী জীবনে পাইয়াছেন, অথবা পঠদ্দশা শেষ করিয়া কখন কি তাহা জানিয়াছেন? না কখন জানিয়া সে অনুষ্ঠান মত নিজে চলিয়াছেন? কখন হয় নাই। যদি হইত তবে আজ শিক্ষিত ও শিক্ষিতাগণের এরূপ নষ্টবুদ্ধি হইত না।

এ সম্বন্ধে আর কি লেখা যাইবে? আমরা পরের প্রবন্ধে এক এক খানি শাস্ত্র ধরিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে শাস্ত্র মানব জীবনের কোন কঠিন সমস্যা কিরূপভাবে সমাধান করিয়া নর নারীর প্রকৃত উন্নতির জন্য দাঁড়াইয়া আছেন এবং চিরদিনের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিবেন। ক্ষণধ্বংসী সংসারের ভিতরে যে চিরস্থায়ী বস্তু আছেন, তাহা লইয়া আছেন বলিয়া ঋষিগণের শাস্ত্র ক্ষণধ্বংসী নহে।

শ্রীশ্রী হংস মহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতেও ভীলরাজের অত মিনতি স্বত্বেও যখন মহাদেব নির্ব্বাক ছিলেন তখন ভীলরাজ অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সঙ্কল্পচ্যুত হওয়া দূরের কথা, বরং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তিনি অধিকতর আগ্রহবান্ হইয়া উঠিতেছিলেন। তিমি যেমন করিয়াই হউক ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেনই করিবেম। তাই তিনি তৃতীয়

দিন রাত্রিতেও ঐ সকল উপহারাদি লইয়া বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। তারপর অত্যন্ত কাতরভাবে দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। যখন বহু প্রার্থনা ও মিনতি করিয়া শঙ্করের দর্শন লাভ কিম্বা তাঁহার সহিত কোন বাক্যালাপের সম্ভাবনা বুঝিলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন "আমায় প্রদত্ত সামান্য উপহার পাইয়া বন্ধুবর নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হন নাই। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি নীরব হইয়া আছেন এবং আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। তবে আমার যাহা শ্রেষ্ঠ-ধন চক্ষুরত্ন, আজ তাহাই বন্ধুকে উপহার দিই" এই ভাবিয়া ভীলরাজ তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহা শিবলিঙ্গের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, "হে ঈশ্বর! হে বিশ্বের রাজা! এইবার তবে কথা কও, বন্ধু! আমি তোমাকে তো আমার শ্রেষ্ঠধনই আজ দিয়াছি, তবুও কেন আজ আমায় দর্শন দিতেছ না, প্রভো! তবুও কেন নীরব রহিয়া অযথা আমার প্রাণে এত ব্যথা দিতেছ, বন্ধু!" এত চেষ্টা করিয়াও যখন ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হইল না, তখন তিনি ভাবিলেন, "একটি চক্ষু পাইয়া বোধহয় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন নাই," এই মনে করিয়া ঈশ্বরের প্রীতি লাভাকাঙ্খায় ভীলরাজ যেমন ধনুর্ব্বাণ দ্বারা অপর চক্ষুটীও উৎপাটন করিবার উপক্রম করিয়াছেন, তখন ভগবানের আসন টলিল, ভক্ত বৎসল তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মহাদেব তখন নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া ভীলরাজের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই যে আমি আসিয়াছি, বন্ধু!" এত সাধনার ধনকে সম্মুখে পাইয়া ভীলরাজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন প্রাণ খুলিয়া অনেক সুখ দুঃখের কথা বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন। মহাদেবের বরে তাঁহার নষ্ট চক্ষু পুনরায় লাভ হইল। মহাদেব ভীলরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! তোমার আর কিছু প্রয়োজন আছে কি?" ভীলরাজের হৃদয় তখন মহাদেবের দর্শন লাভে পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন,—"আর আমার কিছুই প্রয়োজন নাই, বন্ধু! তবে তোমার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে যখনই আমি তোমাকে ডাকিব, তখনই তুমি আমাকে দর্শন দিবে।" মহাদেব হাসিয়া প্রতিশ্রুতি জানাইলেন এবং বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

এদিকে, পুরোহিতের নিযুক্ত পাহারাদার এই সব কাণ্ড দেখিয়া তো একেবারে অবাক্। সে পুরোহিতের নিকট সংবাদ দিবার জন্য দ্রুত বেগে

প্রস্থান করিল। পুরোহিত আবার সেই দিন অতি প্রত্যূষে অন্যান্য লোক জন সঙ্গে করিয়া 'দুষ্টলোকের, অনুসন্ধানে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে পাহারাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার মুখে ভীলরাজের এই সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। সঙ্গের লোকজনও ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত ও একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

তাই, সাধুবাবা বলিতেছিলেন, "এই যে পুরোহিতের নিয়মিত পূজা কিম্বা মহাদেবকে শুচি করিয়া লইবার জন্য এত বাহ্যাড়াম্বর—তাহাতে ঈশ্বর তৃপ্ত হন না। তিনি ভীলরাজের মত সরল এবং পবিত্র মনের আন্তরিক আগ্রহ ও প্রাণের তীব্র ব্যাকুলতাই চাহেন। তিনি ভাবগ্রাহী তাই ভক্তের যেরূপভাব ও মনোভিলাষ সেই অনুসারে যাহার যেরূপ মনোবাঞ্ছা তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। বাহ্যিক অনুষ্ঠান কিম্বা বাহ্যিক শুচিতে তাঁহার কোনরূপ তৃপ্তি বা আকর্ষণ হয় না, কিম্বা তাহাতে তিনি ভুলেনও না। ঈশ্বর জীবের অন্তরদর্শী। যাহার যেরূপ প্রাণের টান—তাহার প্রতি তিনি তেমনি কৃপাই প্রকাশ করেন। চাই অনন্য ভক্তি—গভীর বিশ্বাস,—প্রাণের আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকে পাইবার জন্য ঐকান্তিক সাধনা।

রাজসাহীর জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা।

ক্রমশঃ—

পরলোক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আহার দ্বারা সাত্ত্বিক ভাব আইসে, শ্রাদ্ধ কর্ত্তাকে তাহা পালন ও গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহাদের সাত্ত্বিক ভাব অপেক্ষাকৃত প্রবল, তাঁহাদের জন্য অল্প সময়, এবং যাহাদের সাত্ত্বিকভাব অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ তাহাদের জন্য বেশী সময় ঐ সকল আচার পালনের বিধি আছে। সত্ত্ব প্রধান ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির পক্ষে সাত্ত্বিক বৃত্তির তারতম্যানুসারে অশৌচের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে।

ইহা ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতার পরিচায়ক নহে। শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ও অটুটভাবে রক্ষা করিতে হইবে। শুদ্ধাচারে না থাকিলে মন উদ্বিগ্ন হয় এবং মন্ত্রশক্তি সঞ্চালন করিতে পাবে না।

অশৌচাচারের দুইটী উদ্দেশ্য ;—

(১) শোকাপনোদন পূর্ব্বক মনের স্থিরতা সম্পাদন।

(২) মনের শক্তি সম্পাদন।

শিরঃমুণ্ডন করিয়া পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া পিতৃগণকে আবাহন করিতে হয় এবং শক্তি সঞ্চালন জন্য কুশ, তিল, তুলসী, শ্বেতপুষ্প প্রভৃতি কতকগুলি উপকরণ গ্রহণ করার বিধি আছে।

মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহের প্রায়শঃ মূর্চ্ছাভাব উপস্থিত হয়। তখন জীব "আকাশস্থো নিরালম্ব বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" এই ভাবে থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধে এই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। পুণ্যবান ও সুকৃতিবান জীবের এই মূর্চ্ছা হয় না; তাঁহারা সজ্ঞানে এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। "যাঁহারা মিথ্যা কথা বলেনা, সুহৃদ্‌ভেদ ঘটায়না, আস্তিক এবং ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদিগের মৃত্যু সুখে হয়। কাম, ক্রোধ অথবা দ্বেষ বশতঃ যদি ধর্ম্ম ত্যাগ না করে, আর যথোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও ক্ষমবান্ হয়, তবে সে সুখে মৃত্যুলাভ করে। যাহারা অপরকে মোহজ্ঞান প্রদান করে, তাহারা মৃত্যুকালে অজ্ঞান হইয়া থাকে। যাহারা কূট সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস ঘাতক, আর যাহারা বেদনিন্দুক, তাহারা মৃত্যুকালে জ্ঞানহীন হয়।"

গরুড় পুঃ উঃ খণ্ড ২য় অঃ ৪৮।৪৯।৫০

আদ্যশ্রাদ্ধ ও দশপূরক পিণ্ডদ্বারা দুইটী কার্য্য সাধিত হয় ;—

(১) আতিবাহিক দেহের মূর্চ্ছার অপনোদন ও চৈতন্য সম্পাদন।

(২) প্রেতদেহের সংগঠন।

মৃত্যুর পর দশদিনে যে দশপিণ্ড দেওয়ার বিধি আছে, তাহাকে পূরক পিণ্ড কহে। জীবাত্মা স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়াই বায়বীয় আতিবাহিক দেহ গ্রহণ করে। পুত্রাদি দশপিণ্ড দান করিলে, তাহার ফলে একটী পিণ্ডজ দেহ জন্মে। তাহা বায়বীয় দেহের সহিত মিলিত হইয়া একটী দেহ হয়।

"পিণ্ডজেন দেহেন বায়ুজশ্চেকতাং ব্রজেৎ।
পিণ্ডজো যদি নৈবস্যাদ্বায়ুজো ইতি যাতনাম্॥

গরুড় উঃ খঃ ১১ অঃ ৮২

দশপিণ্ড দানের জন্য যে দেহ উৎপন্ন হয়, উহা বায়বীয় দেহের সহিত মিলিত হয়। পিণ্ডজ দেহ উৎপন্ন না হইলে বায়বীয় দেহই যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। নয় দিবা রাত্রে ঐ দেহ পূর্ণাবয়ব হয়। প্রথম পিণ্ডে মস্তক; দ্বিতীয়ে কর্ণ, অক্ষি ও নাসিকা; তৃতীয়ে গলা স্কন্দ, ভুজদ্বয় ও বক্ষঃ; চতুর্থে নাভি, লিঙ্গ ও গুহ্য; পঞ্চমে জানু, জঙ্ঘা ও পাদদ্বয়; ষষ্ঠে সমস্ত মর্ম্মস্থান; সপ্তমে নাড়ী সমূহ; অষ্টমে দন্ত ও লোম; নবমে বীর্য্য; দশমে পূর্ণতা, তৃপ্ততা ও ক্ষুধাভাব জন্মিয়া থাকে। দশম পিণ্ড অশৌচান্ত দিনে দিতে হয়।

জীবস্য দশভিঃ পিণ্ডৈ দে'হ নিষ্পাদ্যতে ধ্রুবম্।
বৃদ্ধিশ্চ দশভি মা'সৈর্গ গর্ভস্থস্য যথাভবেৎ॥

গরুড় উঃ খণ্ডঃ ৩৫ অঃ ৪৪

যেরূপ দশমাসে গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ দশ পিণ্ডের দ্বারা জীবের দেহ গঠিত হয়।

যাঁহারা সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন, তাঁহাদের মূর্চ্ছা না হইলেও সেই সকল ক্রিয়া দ্বারা প্রেতলোকের উপযোগী দেহ ধারণের বিশেষ সাহায্য হয়। আদ্য শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ ও দান ক্রিয়ার দ্বারা প্রেতের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে;—বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া যাহার অনুষ্ঠিত না হয়, সে সপুত্র হইলেও প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। বৃষোৎসর্গ দ্বারা যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যজ্ঞদানাদি দ্বারাও সেইরূপ গতি লাভ হয় না। পীড়িত ব্যক্তি মৃত্যুকালে দান করিলেও পরকালে সদ্গতি লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই; দান ধর্ম্মাদি দ্বারা মানুষের শুভ বাসনা ও সাত্ত্বিক বৃত্তি জাগিয়া উঠে। কাজেই জীব পুণ্য দেহ ধারণ করিয়া পুণ্যলোকে গতি করে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন;—

(ক্রমশঃ)

রায়বাহাদুর শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত।

কৃষক—কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র। চাষের বিষয় জানিবার শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

উদ্দেশ্য :—সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিযন্ত্র ও কৃষিগ্রন্থাদি সরবরাহ করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ করা হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই সুপরিক্ষিত। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে।

শীতকালের সব্জী ও ফুল বীজ—উৎকৃষ্ট বাঁধা, ফুল ও ওলকপি, সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১৷৹ প্রতি প্যাকেট ।৹ আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভার্বিনা, ডায়াস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা বাক্স একত্রে ১৷৹ প্রতি প্যাকেট ।৹ আনা। মটর, মূলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, টমাটো ও কপি প্রভৃতি শস্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেম্বরের নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ লইয়া সময় নষ্ট করিবেন না।

কোন্ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সময় নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম ।৹ আনা মাত্র। সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনা মাশুলে একখানা পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণ্যমান্য লোক ইহার সভ্য আছেন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, টেলিগ্রাম "কৃষক" কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষার গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্‌ক [তৃতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪৷৷০

২। " দ্বিতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷০

৩। " তৃতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷০

৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৷৵০ আবাঁধা ১৷০।

৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২৷৷০ টাকা।

৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ৷৷০ আট আনা

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ আনা৷৷

৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৷৵০ আবাঁধা ১৷০

৯। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১৷০

১০। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২৷৷০ আবাঁধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ৩৲

১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ৷৷০

১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ৷৷০ আবাঁধা ।০

১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড ১৲

পার্ব্বতী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ লিখিত। মহাভাগবত এবং কালিকা পুরাণ অবলম্বনে শ্রীহরপার্ব্বতীর লীলা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয়ের গৃহে শ্রীজগদম্বার জন্ম, শ্রীমহাদেবের সহিত বিবাহ ইত্যাদি বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহু পণ্ডিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদ্বারা বিশেষ ভাবে সমাদৃত। ২১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বাঁধাই মূল্য ১৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ২৻ দুই টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা। নমুনার জন্য ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৻, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৻ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৻ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৩শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল। [১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
[illegible]
[illegible]

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

শ্রীচন্দ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৩শ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল। { ১১শ সংখ্যা

গান।

(মিশ্র কানাড়া)

বিশ্ব আসন বিছায়ে বসেছ, শ্রীগুরু আমার করুণাময়।
আনন্দ মূরতি অগতির গতি দুহাতে বিলায়ে বর অভয়।
মুছাতে দীনের নয়নের বিন্দু তুমি আছ দেব হয়ে কৃপাসিন্ধু
তুমি বিনা কেবা আছে দীনের বন্ধু শ্রীগুরু আমার চির দয়াময়।
পতিত জনেরে করিতে উদ্ধার পতিতপাবন তুমি সারাৎসার
শ্রীগুরুচরণ করেছে যে সার ঘুচে গেছে তার শমনের ভয়।
দুর্ব্বলের বল শ্রীগুরু আমার সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমূলাধার
গুরুবিনা কেবা ভবকর্ণধার, ভবের কাণ্ডারী আর কেবা হয়।
চির ক্ষমাময় প্রসন্ন আনন চারিযুগ ছেয়ে পেতেছ আসন
ব্যাপিয়া রয়েছ জীবন মরণ, কে ঘুচাতে পারে তব পদাশ্রয়।
শুদ্ধ বুদ্ধ গুরু সত্য সনাতন চির জ্যোতির্ম্ময় নিত্যনিরঞ্জন
শ্রীগুরু আমার পরম কারণ গুরুদেব আমার মঙ্গলময়।

৺কাশীধাম উ

আজ্ঞাপালনে সাধ্যমত চেষ্টা

এবং

কাতরপ্রাণের যথার্থ বিশ্বাস।

প্রথমেই নিশ্চয় কর তুমি কি চাও—কি হইলে তোমার হয়। সকল মানুষের "চাওয়া" একরূপ হয় না। স্বভাব অনুসারে "চাওয়ার"ও পার্থক্য হয়। যাঁহারা সংসারের রূপ দেখিয়া—ক্রমাগত ঠকিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে সংসারের সমস্ত সুখই ক্ষণিক—যাঁহারা বিশেষরূপে জানিয়াছেন ভগবানকে লইয়া না থাকা পর্য্যন্ত—সর্ব্বদা ভগবানের জন্য জীবিত না থাকা পর্য্যন্ত জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ইহা ভিন্ন প্রারব্ধ ক্ষয়ের আর অন্য উপায় নাই—ইঁহা ভিন্ন ক্ষণস্থায়ী প্রতারণার হস্ত হইতে পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় নাই—এইরূপ মানুষের "চাওয়ার" কথাই আমরা বলিব। সংসার ভয়ে ভীত যাঁহারা, তাঁহারা অনিত্য কোন কিছুই চান না—তাঁহারা চান নিত্য আনন্দময় জ্ঞানময় শ্রীভগবান্ লইয়া থাকিতে।

ভগবান সর্ব্বদা তোমাকে লইয়া আছেন, সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছেন, তোমার ভিতরে রাজা হইয়া আছেন, আর বাহিরে ও সকলের ভিতরে, সকলের সঙ্গে তিনি আছেন, তিনি ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা আছেন—শুধু একটু আবরণের মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া আছেন—প্রথমেই এই বিশ্বাসটি দৃঢ় করিয়া লও। এই বিশ্বাস প্রবল করিতে হইলে ভাল লোকের সঙ্গ করা চাই এবং সৎশাস্ত্রের সাগায্য চাই। যথার্থ ভাল লোক তাঁহারাই যাঁহারা শাস্ত্রানুমোদিত আচারবান্। যাঁহারা আচারবান্ নহেন তাঁহাদের সঙ্গ কিছুতেই করিও না। আমি কত ক্লেশ পাইলাম, এখনও কত পাইতেছি, উপদ্রবে আমার মন সর্ব্বদা অসচ্ছন্দ—এইটি যিনি ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র প্রভাবে ইহা নিশ্চয় করিতে পারেন যে ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে না। এই ভগবান্ কিন্তু আমার সঙ্গেই সর্ব্বদা আছেন, ভিতরে বাহিরে ইনি আছেন। এই ভগবান্ আমার সমস্ত দুঃখ দুর করিতে পারেন, দুঃখ দুর করিবার শক্তি তাঁহারই আছে। তিনি করুণাময়, তিনি ক্ষমাসার, তিনি কোন পাপীতাপীকেও উপেক্ষা করেন না, শতবার ঘৃণিত কার্য্য যে করিয়া ফেলিয়াছে

তাহাকেও তিনি ত্যাগ করেন না—ইহাই তাঁহার স্বভাব, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই গুরুরূপে আগমন করেন—ইহার অনুগ্রহ শক্তিই শাস্ত্ররূপে আমার সহায়, এই বিশ্বাস যিনি করিতে পারেন, যাঁহার কাতর প্রাণে এই বিশ্বাস স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তিনি আর কাহার ভয়ে ভীত হইবেন? যাঁহার সহায় এই সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাময় জগদীশ্বর, যিনি এই জগদীশ্বরকে কাতর প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি আর কাহার ভ্রূকুটি ভঙ্গে বিচলিত হইবেন?

মানুষ ভগবানের নাম জপ করে। যে ভগবান এইরূপ করুণাসাগর তাঁহার নাম করি তবে আমার ভয় কেন থাকিবে? উপদ্রব আসুক, দুঃখ আসুক, দৈন্য আসুক তিনি ত ইহা জানিতেছেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন কিছুই আমার উপর পতিত হয় না; দুঃখ সহ্য করিয়া, দুঃখকে মোহের বিদ্রূপ জানিয়া তাঁহার নাম করি, আমার অপরাধের ফোঁড়া তিনি অস্ত্র করিয়া দিতেছেন এই মনে করিয়া আমি নাম করি, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সুস্থ করিয়া দিবেন এই বিশ্বাস প্রবল করা চাই। যখন যে অবস্থায় পড়িনা কেন তুমিত আমার সঙ্গে আছ, কাজেই সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তোমাকে ডাকাই আমার কর্ত্তব্য।

বিশ্বাসের কথা কিছু বলা হইল। এখন এই বিশ্বাস মত কার্য্য করাই আমার একমাত্র প্রয়োজন ইহাই বলিতে যাইতেছি। আজ্ঞাপালনের কথা বলিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসের পরীক্ষা করিবার কিছু সঙ্কেত করা আবশ্যক। ভগবান যে তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার জন্য কিছু করিয়া থাকেন ইহা কি কখন অনুভব করিয়াছ? যাঁহারা একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে জানেন তাঁহারা জীবনে বহুবার অনুভব করিয়া থাকিবেন ভগবান তাঁহাদের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন। যাঁহারা ইহা অনুভব করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে আমরা যাহাতে ইহা অনুভব করা যায় তাহার জন্য কিছু চেষ্টা করিতে বলি। কি করিতে হইবে বলিতেছি।

মনে করা হউক কোন একটি প্রয়োজনীয় বস্তু তুমি কোথায় রাখিয়াছ তাহা তোমার মনে পড়িতেছে না। তুমি অনেক স্থান খুঁজিলে, কিন্তু পাইলে না। বস্তুটি পাইবার জন্য তুমি ব্যাকুল। তোমার মনে কোথায় রাখিয়াছি এই প্রশ্নই উঠিতেছে, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন তুমি একস্থানে গিয়া দেখিলে হারান বস্তুটি রহিয়াছে। ৺তারকেশ্বরে হত্যা দিয়াও বহুলোক ঔষধ পায়—ইহাও যে ক্রমে হয়

হারান বস্তু ফিরিয়া পাওয়ার ক্রমও সেইরূপ। এই ক্রমই আলোচনা করিতে যাইতেছি।

সকল মানুষের মন একটি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া আছে,—ইহা সর্ব্বব্যাপীর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ হইয়াই বহু ভাবনা তুলিয়া ছটফট করিতেছে; যাহার মত যত ক্ষুদ্র সে তত ছটফট করে। ক্ষুদ্র আপনার ক্ষুদ্রত্বই দেখে কিন্তু ক্ষুদ্র যে বৃহতের অংশ তাহা দেখে না। মনের মধ্যে যে প্রশ্ন উঠিয়া মনকে অতিশয় চঞ্চল করে—যখন নিদ্রাতে বা অন্য উপায়ে মনকে ঘুম পাড়ান যায় তখন মন যাঁহার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে—তাঁহার নিকটে ঐ কাতর প্রাণের প্রশ্ন পৌঁছায়। তিনি ত সর্ব্বব্যাপী তিনি ত সবই দেখিতেছেন। কাজেই তিনি জানেন কোথায় হারান বস্তুটি আছে। ঘুমের সময় মন ত তাঁহার ক্রোড়েই ছিল। কাজেই ঘুম হইতে উঠিবামাত্র সেই অখণ্ডবস্তুর ভাবে ভাবিত হইয়া মন আপনার প্রার্থিত বস্তুর নিকটেই যায় এবং হারান বস্তু পায়। তবেই দেখা যাইতেছে যাহার মন বহু চিন্তায় আকুল, তাহার মন আপনাকে আপনি ভুলিয়া সেই একে ডুবিতে পারে না। বহু চিন্তায় মন ব্যাকুল বলিয়া অথবা একটি চিন্তা প্রবল ভাবে মনে জাগে না বলিয়া নিদ্রা হইতে উঠিলেই মনটা ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া আপনার বহু চিন্তায় ছুটাছুটি করে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সম্বন্ধে তাঁহার জীবন চরিতকার লেখেন যে যুদ্ধের অতিশয় সঙ্কটাবস্থার সময়ে—যখন নিশ্চয় হইতেছে না কোনদিকে সৈন্য চালনা করিতে হইবে তখন বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষ যখন নেপোলিয়ানকে খুজিতেছেন তখন তাঁহারা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, সেই সঙ্কট সময়ে নেপোলিয়ান নিদ্রা গিয়াছেন। দুই তিন মিনিট পরেই নেপোলিয়ান নিদ্রা হইতে উঠিয়াই আজ্ঞা দিলেন এইদিকে সৈন্য চালনা কর—তিনি কাহারও পরামর্শ শুনিলেন না, সকলেই বিস্মিত হইল—কিন্তু নেপোলিয়ানের জয় হইল। এই সব ব্যক্তি আপন গুহা নিহিত অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞের পরামর্শ বা নিশ্চিত বুদ্ধি যখন প্রাপ্ত হয়েন তখন আর তাঁহারা কি খণ্ড বুদ্ধির বিচার গ্রাহ্য করিতে পারেন? সর্ব্বজনের প্রার্থনীয় এক গভীর সত্য ইহাতে নিহিত আছে। নিদ্রা নেপোলিয়ানের আয়ত্বাধীনে ছিল। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বশে নেপোলিয়ানের এই শক্তি জন্মিয়াছিল। এই জন্যই তিনি বড়লোক ছিলেন। আর নেপোলিয়ান অপেক্ষা কোটিগুণে বড় ছিলেন ভারতের ঋষিগণ। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তাঁহারা জাগ্রত কালেই ক্ষুদ্র মনকে অখণ্ড বস্তুতে ডুবাইতে পারিতেন।

প্রশ্ন শুনিয়াই তাঁহারা ধ্যানস্থ হইতেন—অর্থাৎ মনের অগ্রে প্রশ্ন যখন স্থাপিত হইল তখন তাঁহারা ঐ প্রশ্ন ছাড়িয়া মনকে ভগবানে একাগ্র করিলেন। করিবামাত্র যখন জাগিলেন তখন সর্ব্বশক্তিমান যিনি তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি দেখিলেন তোমার বিপত্তির মীমাংসা কোথায়? তিনি ধ্যানস্থ হইয়া যাহা বলিলেন তাহাতেই তোমার বিঘ্নের প্রতীকার হইয়া গেল। মানুষের মধ্যে যখন ভগবান আছেন, তখন তাঁহার আশ্রয় লইলে তিনিও তোমার সবই করিয়া দিতে পারেন। এই সর্ব্বশক্তি যখন তোমার ভিতরে সর্ব্বদা আছেন তখন তাঁহার কাছে গেলেই তুমি নির্ভাবনা হইতে পার। সাধারণ মানুষ তাহার খণ্ডবুদ্ধির বিচার লইয়া আর কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারে? এই শক্তিকে পাইবার জন্যই ত মনকে সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য করিয়া ভগবানের ধ্যানে ডুবাইতে হয়। ধ্যান এইজন্য সাধকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই ধ্যান হয় তখন যখন মন একে একাগ্র হয়। সেই এক হইতেছে সেই অখণ্ড শক্তি। যদি বল চৈতন্য না ধরিয়া শক্তি ধরিলে কি হইবে? শক্তি ও প্রকৃতি একই বস্তু। আর চৈতন্যই পুরুষ। তোমার মনটি অখণ্ড শক্তির উপরে ক্ষুদ্র অংশরূপে ভাসিয়া বহু চিন্তায় আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পূর্ণকে নিরন্তর হারাইতেছে। প্রথমে মনকে বহু চিন্তায় প্রেরণ না করিয়া এক চিন্তায় আন। আনিয়া ধ্যান দ্বারা সেই এক চিন্তাও ছাড়। তখন তুমি অখণ্ড শক্তির দেখা পাইলে। অখণ্ডশক্তি সর্ব্বদা অখণ্ড চৈতন্যের দিকেই চাহিয়া আছেন। এই সময়ে শক্তি ও শক্তিমান এক। শক্তি পুরুষের দিকে উন্মুখী হইলে শক্তিই পুরুষ হইয়া যান। প্রয়োগসার তন্ত্রে পাওয়া যায় "শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্মৃতা ইতি"। বহু চিন্তা করিয়া করিয়া মন শক্তিশূন্য হইয়া যায়। তাই বলা হইতেছিল ধ্যান করিতে শিক্ষা কর—মনকে তাঁহাতে ডুবান ধ্যান দ্বারাই হয়। নাম জপ করিতে করিতে সাধক যখন বাহিরের সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যান তখন তিনি তাঁহাতে ডুবিয়া যান। মন সেই সময়ে নিজের নিজত্ব ছাড়িয়া সেই পূর্ণে মিশিয়া থাকে, তাই ধ্যানের পরেই তোমার বিঘ্নের প্রতীকার হয়। এ সম্বন্ধে আর লেখা গেল না।

এখন আমরা আজ্ঞাপালনে চেষ্টার কথা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতেছি।

যে কর্ম্মই করনা কেন তাহার জন্য যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া কর তবে তাহা উন্মত্ত চেষ্টা হইয়া যাইবে- খণ্ড বুদ্ধির বিচার দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহা মৃত্যুসংসার মুখেই মানুষকে প্রধাবিত করে। কিন্তু যখন কর্ম্মটি

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে করিতে করা হয় তখন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় মানুষের কর্ম্মের দোষ যাহা আছে তাহা দূর করিয়া দেন। অশুভ কর্ম্ম তিনি করিতেই দেননা, অশুভকে শুভেই তিনি পরিণত করেন। কর্ম্মফল হইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কর্ম্ম যখন ঈশ্বর স্মরণে—ঈশ্বর সমর্পণে কৃত হয়, তখন কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া যায়। গীতা এই নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বহু স্থানে উপদেশ করিয়াছেন। অশুদ্ধ মনে কল্পনা জল্পনা উঠে গীতা মোক্ষ শাস্ত্র কি না? কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে পারিলেই তাহা যে মোক্ষপথে জীবকে প্রধাবিত করে ইহা নষ্ট বুদ্ধির মানুষ ব্যতীত সকলেই বুঝিতে পারে। কারণ নৈষ্কর্ম্ম্যই জ্ঞান। জ্ঞানে কোন কর্ম্ম নাই বলিয়া জ্ঞান লাভকেই মোক্ষ বলে।

মানুষ যে আজ্ঞাপালনের চেষ্টা করিবে সে আজ্ঞা মানুষ পাইবে কোথায়? ঈশ্বরের ইচ্ছা তিনি আপ নই যেখানে প্রকাশ করিয়াছেন সেইখানেই পাইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় শুদ্ধ হৃদয়ে, রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত মনে, ধ্যানাভ্যস্ত সাধুর অন্তরে। এইরূপ হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রকটিত হয়—ইহা স্মরণ করিয়া ঋষিগণ শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন। বৃহন্নীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—বেদই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—পার্ব্বতি ইহাই তুমি—

> বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি।
> স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদস্তৎ কর্ত্তা নাস্তি সুন্দরি॥
> স্বয়ম্ভুবে ভগবতা বেদো গীতস্তথা পুরা।
> শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ॥

বেদই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, পার্ব্বতি ইহাই তুমি জানিও। বেদ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত—হে সুন্দরি। বেদের কর্ত্তা কেহ নাই। পুরাকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার হৃদযে ভগবান বেদ প্রকটিত করেন। স্বয়ং শিব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই বেদের স্মরণকর্ত্তা, রচয়িতা নহেন।

আজকাল অশুদ্ধ হৃদয় কোন কোন ব্যক্তি জাগতিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া লোকমধ্যে প্রচার করেন যে ঈশ্বরের বাণী মানুষ শুনিতে পায়। ইহা ভ্রান্ত-কথা। প্রকৃত কথা হইতেছে যে সাধনা দ্বারা যাঁহাদের হৃদয় শুদ্ধ না হইয়াছে, রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত না হইয়াছে, যাঁহারা নিজের ক্ষুদ্র মনকে অখণ্ড চৈতন্যে ডুবাইবার সাধনা আয়ত্ব না করিরাছেন, যাঁহারা চরিত্র লম্পট, জিহ্বা লম্পট, বাক্ লম্পট, আচার লম্পট তাঁহারা যাহাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিঘোষিত করেন

তাঁহাদের শিক্ষাকে ঈশ্বরের বলায় মত ভ্রম আর নাই। সেইজন্য শাস্ত্রই ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশক। কোন কোন স্থানে শাস্ত্রে নষ্ট বুদ্ধি মানুষের বাক্য প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা সাধক যাঁহারা সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন কোনটি ঈশ্বরের বাণী আর কোথায় বা নষ্টবুদ্ধি মানুষের সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

এখন দেখা যাউক মানুষের কর্ম্ম কি? মানুষকে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ কর্ম্ম করিতে হয়। আমরা লৌকিক কর্ম্ম সমুদায় কিরূপে ঈশ্বর স্মরণে করিতে হয় তাহার কথা এখানে আলোচনা করিবনা। আমরা বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলিব।

কর্ম্মযোগ বল, ভক্তিযোগ বল, জ্ঞানযোগ বল ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন ইহার কোনটিই সাধন করা যায় না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আইসে তাঁহার উপরে যিনি ঈশ্বরকে প্রথমে গ্রহণ করেন। অনুগ্রহ শব্দের অর্থও হইতেছে পশ্চাৎ গ্রহণ। তুমি প্রথমে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন চেষ্টায় ঈশ্বরকে গ্রহণ কর, পরে বুঝিবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কিরূপে আইসে।

যাঁহাকে আমরা জানি না, তাঁহাকে ভালবাসিতেও পারি না—ভালবাসা না হইলেও ঠিক ঠিক আজ্ঞা পালনেও অনুরাগ লাগে না। এক্ষেত্রে যিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, যিনি শাস্ত্রে ঈশ্বর আজ্ঞা প্রচারিত ইহা বিশ্বাস করেন —এই বিশ্বাসেও আজ্ঞা পালন হয়। এইভাবে আজ্ঞা পালন করিতে করিতে অনুরাগ আসিবেই। এইজন্য যেমন শাস্ত্র আবশ্যক, সেইরূপ শাস্ত্রবিশ্বাসী, শাস্ত্রজ্ঞ, আচারবান গুরুরও আবশ্যক। মনগুরু যাঁহাদের তাঁহারা কোথাও শাস্ত্র মানে না, কোথাও শাস্ত্র মানিলেও শাস্ত্রকে মন-গুরুর প্রলুব্ধ বাক্যে কলুষিত করিয়া সুবিধাবাদী হইয়া উঠেন। ইহারা আপনারাও পাপে মজেন আর শিষ্যগণকেও বিশেষরূপে মজাইয়া তুলেন।

মানুষকে প্রথমেই কর্ম্মযোগ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। "তপঃস্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি" ক্রিয়াযোগঃ।

শাস্ত্রবিহিত উপবাসাদি তপস্যা, মোক্ষশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও মন্ত্রজপ ও মন্ত্রার্থ ভাবনারূপ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কার্য্য করা রূপ ঈশ্বর প্রণিধান—এই সমস্ত প্রথমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। আজ কাল যোগের উপর অনেকের অনুরাগ দেখা যায় কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ

যে যম, নিয়ম, আসনাদি ইহার অনুষ্ঠান না করিয়া শুধু প্রাণায়াম লইয়া থাকিলে সম্যক ফল কিছুতেই লাভ হইবে না। প্রাণায়ামে কিছু লাভ হইবে সত্য কিন্তু ইহার ফল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। যেমন সন্ধ্যা সম্পূর্ণভাবে না করিয়া শুধু গায়ত্রী জপ করিলে—গায়ত্রী জননীর অঙ্গ ভঙ্গ করা হয় সেইরূপ যম নিয়ম আসনাদির অনুষ্ঠান না করিয়া শুধু প্রাণায়াম লইয়া থাকিতে গেলে স্থায়ীভাবে চিত্তশুদ্ধি হয় না।

ক্রিয়াযোগে আজ্ঞা পালনে সাধ্যমত যত্ন করিতে করিতে ভক্তিযোগে পৌঁছান যায়। ভক্তিযোগে পৌঁছিতে পারিলে জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মে।

কর্ম্ম ভিন্ন যেমন ভক্তি হয় না সেইরূপ ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই শিক্ষা পাওয়া যায়। যোগিনীতন্ত্রে পাওয়া যায়।

কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যাজ্ঞানমুপাপ্নুভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তি মহাদেবি! সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥
জ্ঞানাভাবে সমুৎপন্নে সম্প্রাপ্য জ্ঞান-কামিনীম্।
তদা যোগী বিমুক্তঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম মহামায়ে সর্ব্বদা সমুপাচরেৎ॥
বৈদিকং তান্ত্রিকং বাপি যদি ভাগ্যেন লভ্যতে।
ন বৃথা গময়েৎ কালং দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়েদ্দেবতাপূজা—জপ—যজ্ঞ—স্তবাদিনা॥
দ্বিবিধঞ্চৈব তৎকর্ম্ম বাহ্যান্তর বিভেদতঃ।
বাহ্যঞ্চ নিয়মাসক্তং মানসং ন তথা পুনঃ॥
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যত্র কুত্রস্থলেঽপিবা।
গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি যদ্বা তদ্বা বরাননে॥
কুর্য্যাচ্চ মানসং ধর্ম্মং ন দোষো মানসে ক্বচিৎ॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মনাং শ্রেষ্ঠো জপযজ্ঞো মহেশ্বরী।
জপযজ্ঞো মহেশানি মৎস্বরূপে ন সংশয়ঃ॥
জপযজ্ঞেহি তিষ্ঠেদ্ যো বাহ্যে বা চান্তরেঽপিবা।
সর্ব্বদা পরমেশানি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

রামায়ণে পাওয়া যায়—

ত্বদ্ভক্তামৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেঽপি নোভবেৎ ॥

আবার—মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষস্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥

পুনশ্চ—তথা শুদ্ধির্ন দুষ্টানাং দানাধ্যয়নকর্ম্মণি।

শুদ্ধাত্মতা তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা॥

পুনঃ—অতস্ত্বৎ পাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োঽধিকা।

ভক্তিমেবাভিবাঞ্ছন্তি ত্বদ্ভক্তাঃ সারবেদিনঃ ॥

অতস্ত্বৎপাদকমলে ভক্তিরেব সদাস্তু মে।

সংসারময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে ॥

পুনঃ—তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।

ন মুক্তি শঙ্কা বিজ্ঞানশঙ্কা নৈব সুখং তথা ॥

শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞানের এই ক্রম পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন জন্য গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শাস্ত্রমত আচারবান্ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবন চালাইতে হয়; ইহা ভিন্ন শুভ হইবে না।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

ভারতের সুপুত্র ও সুকন্যা কাহারা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাধি বৈশ্যের যে মোহ আসিয়াছিল সুরথ রাজারও সেই মোহ। সমস্ত ক্ষিতি মণ্ডলে একাধিপত্য করিতেন এই সুরথ রাজা। তিনি প্রজাগণকে ঔরস পুত্রবৎ পালন করিতেন। এই সময়ে কোলাবিধ্বংসী ভূপতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজা ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাজা পরাস্ত হইলেন। রাজা নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখানেও

প্রধান শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তৎপরে রাজার বলবান্ অমাত্যেরা রাজার সৈন্য ও সঞ্চিত ধনাদি আত্মসাৎ করিল। সব গেল, রাজা তখন মৃগয়া ব্যাপদেশে "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্" একাকী অশ্বারোহণে নিবিড়বনে গমন করিলেন। বনমধ্যে ভগবান মেধস মুনির আশ্রম। আশ্রমের চারি-ধারে হিংস্রজন্তু—ইহারা কিন্তু শান্ত। মুনি রাজাকে সমাদর করিলেন। রাজা মুনির আশ্রমেই বাস করিতেন আর ইতস্ততঃ বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। নির্জ্জন সেই বনভূমিতে রাজা মমতাকৃষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতেন—আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের রাজত্ব এখন আমার মন্দস্বভাব ভৃত্যবর্গের হস্তগত। ইহারা কি ধর্ম্মানুসারে আমার পরিত্যক্তা পুরী রক্ষণাবেক্ষণ করে? আমার সতত মদমত্ত শূরহস্তী কি পূর্ব্বের মত আহার পাইতেছে? আমার অন্নে পালিত আমার ভৃত্যগণ এখন অন্য রাজার সেবা করিতেছে। আমার দুষ্ট অমাত্যগণ আমার অতি পরিশ্রম সঞ্চিত ধন ক্ষয় করিতেছে।

রাজা এইভাবে চিন্তা করেন। কিছুদিন পরে রাজা মুনির আশ্রম সমীপে সমাধি বৈশ্যকে দেখিলেন। বিমনায়মান বৈশ্যের মুখে রাজা তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। আমার অসৎ পুত্র ও আমার স্ত্রী ধনলোভে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাই আমি দুঃখিত হইয়া বনে আসিয়াছি। তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল আমি কিছুই জানি না, এইজন্য আমি চিন্তিত। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সমাধি বলিলেন:—

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্ব প্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥

উভয়ের দুঃখ এক প্রকারের কারণ উভয়েই মোহাক্রান্ত। আজ নবীন-প্রাচীন সকল সমাজে নর-নারীর এই মোহ, এই দুঃখ। মানুষ মন হইতে এই ভাবনা দূর করিতে পারে না। এই ভাবনা হৃদয় হইতে সরাইতে না পারিলেও মন ভগবানে ডুবিতে পারে না। যে কৌশল অবলম্বন করিলে মনকে মোহশূন্য করিতে পারা যায়—শ্রীশ্রীচণ্ডী তাহাই দেখাইতেছেন।

সংসারে থাকিতে হয় থাক কিন্তু মোহশূন্য হইয়া থাক, মোহশূন্য হইয়া সংসারের কার্য্য কর। এই জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যকতা। চণ্ডী কিরূপে এই কথা আনিয়াছেন আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব,শেষে চণ্ডী প্রদর্শিত উপায়টি বিশেষ করিয়া বলিব।

রাজা ও বৈশ্য ঋষির নিকট গিয়াছেন। রাজা বলিতে লাগিলেন

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্বতৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা॥
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ;
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনি সত্তম॥
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দ্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যপি॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা।

ভগবন্ আপনাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি আপনি তাহা আমাকে বলুন। আমার মনের এই যে দুঃখ তাহা আমি আমার চিত্তকে আয়ত্ব করিতে পারিতেছিনা বলিয়া। জানিয়া শুনিয়াও আমার রাজ্যের উপর এবং নিখিল রাজ্যাঙ্গের উপর মূর্খের ন্যায় এই যে মমত্ব বোধ—আমার আমার বোধ—হে মুনি সত্তম! ইহা কি? এই বৈশ্যও স্ত্রী পুত্রগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত এবং ভৃত্য ও ভার্য্যা কর্ত্তৃক বহিস্কৃত এবং স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি এইরূপ অনুরক্ত কেন? এইরূপে ইনিও আমিও—আমরা উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা বিষয়ের দোষ দর্শন করি তথাপি আমাদের মন আমার আমার করিয়া বিষয়ে আকৃষ্ট হয় কেন? হে মহাত্মন্ আমি এবং ইনি —আমাদের উভয়ের বিষয় দোষ দর্শন জ্ঞান থাকিলেও আমরা কি জন্য মোহাচ্ছন্ন হইতেছি? বিবেকান্ধের যে মূঢ়তা তাহা ইহার ও আমার উভয়েরই হইতেছে—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই একপ্রকার মোহ কেন হয়?

ইহাই ত জীবনের সমস্যা—দুই চারি জন্য ভিন্ন সমস্ত নরনারীর প্রশ্নই ইহা। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী। অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার জন্য যেমন

গীতা, রাজা পরীক্ষিতের মোহ দূর করিবার জন্য যেমন ভাগবত, বদ্ধজীব মাত্রেরই—যাহারা আপনাদিগকে বদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তাহাদের অজ্ঞান বা মোহ দূর করিবার জন্য যেমন যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ সেইরূপ সংসার মোহ দূর করিবার জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী।

যেরূপে এই মোহ দূর হইবে তাহা আমরা শ্রীচণ্ডীর ঋষির মুখে এখন শুনিব পরে চণ্ডীপাঠে কিরূপে এই মোহ দূর হয় তাহা বলিব।

ঋষি তখন উত্তর করিলেন—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয় গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈব পৃথক্ পৃথক্॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যানাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎতথোভয়োঃ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাব চঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতানপ্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি॥
তথাপি মমতাগর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময় কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সং মোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞাননামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

সমস্ত জন্তুর—প্রাণিমাত্রেরই ইন্দ্রিয়াদি সমীপাগত বিষয়ের জ্ঞান আছে। আবার বিষয়ও—হে মহাভাগ—পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কোন কোন প্রাণী দিনে অন্ধ—দর্শনজ্ঞান শূন্য—অপর কোন কোন প্রাণী রাত্রিতে দেখিতে পায়না। কোন কোন প্রাণী দিন ও রাত্রিতে তুল্য দৃষ্টি। মনুষ্যেরা জ্ঞানী সত্য, কিন্তু কেবল যে ইহারাই জ্ঞানী তাহা নহে। যেহেতু পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানী, সেইজন্য মৃগপক্ষী প্রভৃতির জ্ঞান যেরূপ মনুষ্যগণের জ্ঞানও সেই প্রকার। মনুষ্যগণের জ্ঞান যেরূপ ইহাদেরও সেইরূপ। অন্য যে জ্ঞান—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান তাহা সাধারণ মনুষ্য ও পশু পক্ষী উভয়েরই একরূপ। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ইহাদের কাহারও নাই। দেখ, জ্ঞান থাকিলেও এই সমস্ত পক্ষী ক্ষুধায় পীড়মান হইয়াও, শাবকচঞ্চুতে মোহবশতঃ তণ্ডুলকণা আদরে প্রদান করিয়া থাকে। হে মনুজব্যাঘ্র! মানুষ কিন্তু প্রত্যুপকারের লোভবশতঃ পুত্রগণের প্রতি অনুরাগী কিন্তু পুত্রগণ সেরূপ হয়না ইহা কি দেখিতে পাওনা? তথাপি মানুষ মমতারূপ আবর্ত্ত বিশিষ্ট মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া মহামায়া প্রভাবে সংসার স্থিতির হেতু হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে—জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রারূপা এই মহামায়া দ্বারা জগৎ সম্যকরূপে মোহ প্রাপ্ত। দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীগণেরও চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করেন; এই বরদা মহামায়া প্রসন্না হইয়া মানুষের মুক্তির হেতু হন। এই সনাতনী পরমাবিদ্যারূপিণী মুক্তির হেতুভূতা এবং সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী—সংসার বন্ধনেরও হেতু।

প্রশ্নোত্তরে চণ্ডীর শিক্ষা আলোচনা করা আবশ্যক। রাজার প্রশ্ন হইতেছে আমি ও এই বৈশ্য আমরা উভয়েই বিষয়ের দোষ দেখিয়াছি তথাপি আমাদের মন—আমার আমার করারূপ মমতাতে এত আকৃষ্ট কেন? আমাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিবেকান্ধ ব্যক্তির মত এই মোহ কিরূপে আসিতেছে?

ঋষি—তোমরা যে জ্ঞানের কথা কহিতেছ তাহা রূপরসাদি বিষয়ের জ্ঞান। এই জ্ঞান পশু-পক্ষীরও আছে। পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ইহাদেরও আছে। এই জ্ঞানে কিন্তু মোহ দূর হয় না। স্বরূপের জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মোহ থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান সাধারণ মানুষেরও নাই পশু পক্ষী মৃগাদিরও নাই। বিষয় জ্ঞানেরও কত পার্থক্য দেখ। দিবালোকেও পেচকাদি দর্শনজ্ঞান হীন; কাকাদি রাত্রিকালে দেখিতে পায়না আবার কিঞ্চুলুকাদি কি দিন কি রাত্রি

কোন সময়েই দেখিতে পায়না। এই যে বিষয় সম্পর্কে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান ইহা তোমাদেরও যেমন পশুদেরও সেইরূপ। এই জ্ঞানে মোহের কার্য্য দেখ। পক্ষী আপনার ক্ষুধা অগ্রাহ্য করিয়া শাবককে আহার প্রদান করে। মানুষও প্রত্যুপকারের লোভে সন্তানদিগকে পালন করে, কিন্তু ইহাও জানে যে সন্তান অকৃতজ্ঞ হয়। ইহাই ত মোহের কার্য্য। এই মোহের কার্য্যেই কিন্তু সংসার স্থিতি। এই স্থিতি মহামায়ার প্রভাবেই হইতেছে। যখন শ্রীহরির এই মায়া শ্রীহরিকেও বাদ দেন না—তখন ইনিই যে জগৎ মোহিত করিবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি। জ্ঞানীদিগের চিত্তকেও এই মহামায়া বলপূর্ব্বক মোহে আচ্ছন্ন করেন। জগতের সৃষ্টিকারিণী ইনিই। ইঁহাকে যদি প্রসন্ন করিতে পার তবে ইনি সংসার হইতে মুক্তিও দিয়া থাকেন। এই মহামায়া মুক্তিও দেন আবার বন্ধও করেন।

রাজা— ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যা ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ ॥
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥

ভগবন্ সেই দেবী কে, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কি প্রকারে উৎপন্না হয়েন, হে দ্বিজ ইঁহার কর্ম্মই বা কি? সেই দেবীর স্বভাবটি কিরূপ? তাঁহার স্বরূপই বা কি? কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়? হে ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

ক্রমশঃ

অপেক্ষার সাধা।

ঐ আসে আসেরে তার চরণের ধ্বনি বাজে
তোরা কি শুনিবি, শোন, আমার হিয়ার মাঝে।
কমলে কমলে মিশি কমলে ফুটায় ফুটি.
গুঞ্জরিত মধুব্রত কমলে চুমিছে লুটি।
শোণিতের দ্রুততালে ব্যাকুল স্পন্দনে তার
কণ্টকিত দেহমন চমকিত বার বার।
চকিত শ্রবণে ভাসে বাঁশরীর মৃদুতান,
আকুল পিয়াসা ভরা ব্যাকুলতা সাধা নাম।
আমি সাধি তারি সাধা ব্যথাভরা বাসনার,
সে ডাকে 'আমার' বলি সহে না বিলম্ব আর
কত জন্ম যাবে রচি কল্পনার ছেঁড়া তার,
কর্ম্মগুটি জাল বুনি এ সঞ্চিত বারেবার।
মিলনের কর্ম্মবাধা অসতে ফেলাও মুছি।
বিম্বে প্রতিবিম্ব মিশি স্বপ্নবাধা যাক্ ঘুচি॥

মৃঃ —

সিদ্ধ সাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উপদেশ।

১০৯। এই পর্য্যন্ত থাকিলেও বরং ভাল ছিল, ইহার উপর আরও দুঃখ আছে—তুমি যদি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আপন দুঃখ ভুলিয়া যাও, তবেই সংক্রামক রোগে ধরিল; তোমার ধর্ম্মসাধনের দুঃখ তাহার সংসার সাধনার দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল, সংসর্গের দোষে সাধন ধর্ম্ম ভুলিয়া তুমি সংসারধর্ম্মে সংক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলে।

১১০। তুমি যে পথে যাত্রা করিয়াছ, তাহা লোকরাজ্যের অপরিচিত ও অতীত; সেই পথে বাধা পাইলে তোমার কিছু ভাল লাগিবে না, তাই বলিয়া অন্যপথে গেলে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে না; অধিকন্তু পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া পশ্চিমদিকের পথশ্রান্তি অথবা সে পথ হইতে পুনরাবৃত্তি, কঠিন অপেক্ষাও কঠিন হইয়া উঠিবে।

১১১। বিজন বনে বেড়াইতে যাইও, সেও বরং ভাল; সংক্রামক বায়ুরোগে দেহ মন দূষিত হইবে না, তথাপি বাসনা-বিষ-জর্জ্জরিত স্বজনবর্গ-পরিবেষ্টিত এ সজন-সংসারে বিচরণ করিও না।

১১২। নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত কান্তার প্রান্তর শ্মশানক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ মহাপীঠে, তুমি যাঁহার, অথবা যিনি তোমার, তাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া একাকী বিচরণ করিও, প্রাণে পরম শান্তি পাইবে।

১১৩। বাহিরেও যদি যাইতে না পার, নিজের বাসস্থলে দিনান্তে একবার তরুতলে বসিও, অথবা সুদূর গগনকক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কি দিবা কি রাত্রিতে অসীম শূন্যকক্ষে নিজের মনঃপ্রাণ ছড়াইয়া দিও, অথবা নিজের মনে প্রাণে গগনাঙ্গনের সে অসীমতা ধ্যানে সন্নিবেশিত করিও! যাহাকে তুমি ধ্যান করিবে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিকট হইয়া আসিবে।

১১৪। পূর্ণিমার চন্দ্রমা দেখিয়া জ্যোৎস্নায় যেমন শান্তি পাও, ইহা অপেক্ষা সমধিক শান্তি তুমি অন্ধকারে যে দিন পাইবে সেইদিন জানিও—বাহিরের অন্ধকারের সাহায্যে তোমার প্রাণের অন্ধকার জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে।

১১৫। সাংসারিক লোক যে সময়ে বেড়াইতে যায়, সাধক! তোমার যত জ্বালা যন্ত্রণাই হউক না কেন, সে সময়ে তুমি কদাচ আপন স্থানের বাহিরে যাইও না! তুমি বেড়াইতে যাইও সেই সময়ে যে সময়ে একা তুমিই কেবল বেড়াইবে।

১১৬। অন্ধকার লোকের দৃষ্টি রোধ করিয়া অন্ধ করে, এই জন্য অন্ধকারের নাম অন্ধকার; বস্তুতঃ দৃষ্টিশক্তির অভাবে লোকে অন্ধকারে অন্ধ হয় না, অন্ধ হয়—দৃশ্যপদার্থ কিছু দেখিতে না পাইয়া, সাধারণতঃ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অন্ধকারে ও যেমন থাকে আলোকেও তেমনি থাকে; বরং আলোক অপেক্ষা অন্ধকারে সে শক্তি আরও তীব্র হয়; তবুও যে অন্ধকারের নাম অন্ধকার, সে কেবল অন্ধকার দৃশ্য বস্তুসমুহের আবরণ করে বলিয়া।

১১৭। অন্ধকার তাহাকেই আবরণ করিতে সমর্থ, যাহা আলোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা আলোক অন্ধকার উভয়ের অতীত, অন্ধকার তাহাকে কি আবরণ করিবে? সে সমুজ্জ্বল নিত্যজ্যোতিঃ অন্ধকার হইয়াও আলোকে, আলোক হইয়াও অন্ধকার। অন্ধকার সে জ্যোতির আবরক নহে; বরং সেই জ্যোতিই অন্ধকারের আবরক, অথাপি অন্ধকার সে জ্যোতিঃ—প্রকাশের উত্থাপন ও সাহায্য করে—কেবল সংসারিক নিখিল দৃশ্যবস্তুর আবরণ করিয়া, অন্ধকারের এই অনন্তশান্তি অগাধগাম্ভীর্য্য, অসীম মহিমা ও বিশালবিস্তৃতি, এ চরাচর ত্রিভুবনে অতুলনীয় শতকোটী চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল কোটি কোটি কর প্রসারণেও তাহা আনিয়া দিতে পারেন না, আপনার অন্ধকারগর্ত্তে এই সমগ্র বিশ্বমণ্ডল ডুবিয়া গেলে তখন যাহা হয়।

১১৮। অন্ধকারের এই মহত্ত্ব অনুভব করা আলোকান্ধ সাংসারিক পুরুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আলোক সামান্য পথে যাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন, আলোকের সাহায্য ব্যতীত এ পরমতত্ত্ব—সন্দর্শন কেবল তাঁহাদিগের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

১১৯। এই জন্যই অন্ধকার জগতের পক্ষে অন্ধকার হইলেও সাধক! তোমার পক্ষে অন্ধকার নহে, আলোককে অন্ধকার করিয়া তুমি অন্ধকারকে আলোক করিয়া লইবে, লোকে আলোকে যাহা দেখিতে না পায়, তুমি তাহা অন্ধকারে দেখিবে, লোকের যাহা দিন হইবে তোমার তাহাই রাত্রি হইবে, লোকের যাহা রাত্রি হইবে, তোমার তাহাই দিন হইবে; লোকে যে

সময়ে জাগিয়া থাকিবে, তুমি সেই সময়ে ঘুমাইবে, লোকে যে সময়ে ঘুমাইবে তুমি সেই সময় জাগিয়া থাকিবে, এই জন্যই বলিতেছি—সাধক। তুমি অন্ধকারেই বেড়াইও!

১২০। সমান পাও সঙ্গে লইবে, না পাও একাকী যাইবে, লোকরাজ্যের অপরিচিত অতীতত্ব অন্ধকারের প্রসাদে তোমার অনেক আয়ও হইবে।

১২১। বিহার করিতে হয়, তবে এই তিমির বিহারই করিও; যদি তাহাতে নিতান্তই অসমর্থ হও, তবে নিজ স্থানে বসিয়া অন্তর্ব্বিহারে ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইও, তথাপি কাহারও সঙ্গে কোথায়ও বহির্ব্বিহারে যাইও না।

১২২। শাস্ত্রের আদেশ—"আজরামরবৎপ্রাজ্ঞো বিদ্যা মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ।" বুদ্ধিমান যিনি হইবেন, তিনি বিদ্যা ও অর্থ চিন্তার সময়ে আপনাকে অজর অমরের ন্যায় জ্ঞান করিবেন আর ধর্ম্মসাধন সময়ে মৃত্যু আসিয়া কেশাকর্ষন করিয়া ধরিয়াছে, ইহাই ভাবিবেন।

১২৩। ধর্ম্মানুষ্ঠানের ইচ্ছা থাকিলে "আজ না হয় কা'ল্ করিব, কা'ল না হয় পরশ্বঃ" এই রোগটি সর্ব্বাগ্রে ছাড়। আজকার দিন গেলে তবে কা'ল্কার দিন, কা'লকার দিন গেলে তবে পরশ্বঃ দিন। কিন্তু আজকার এদিন শেষ হইতে না হইতে হয়ত তোমার দিন শেষ হইয়া যাইতে পারে।

১২৪। সুবিধা হইলে ধর্ম্ম করিব, ইহারই উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "সমুদ্রে শ্রান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ," সমুদ্রের তরঙ্গ শেষ হইলে তবে তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নান করিব, এ বুদ্ধি কেবল বর্ব্বরদিগেরই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ সমুদ্রেরও তরঙ্গের শেষ হইবে না, তোমারও স্নানের সময় হইবে না। তদ্রূপ সংসারে স্বচ্ছলতা বা সুবিধা হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব, এ বুদ্ধি যদি করিয়া থাক, তবে জানিও—সংসারে কখনও স্বচ্ছলতা ও সুবিধা হইবে না; তোমারও ধর্ম্মকর্ম্মের সময় ঘটিয়া উঠিবে না।

১২৫। সংসারের যতই উন্নতি হইবে, ততই তাহার অভাব বাড়িবে। স্নান যদি করিতে চাও, তবে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া ভয় করিও না, ঐ তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়াই ডুব দিয়া উঠ! সংসারে থাকিয়া যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে চাও, তবে সুবিধা অসুবিধা ভাবিও না, শত সহস্র অভাব থাকিলেও তাহার মধ্য হইতেই যাহা করিতে চাও তাহা করিয়া লও।

১২৬। যদি ভাবিয়া থাক—ভ্রাতা বা পুত্র শিক্ষিত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইলে তখন সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিব, তাহা হইলে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবে কি সংসার হইতে চির অবসর গ্রহণ করিবে, তাহাও একবার ভাবিও।

১২৭। তিন কাল সংসারের সেবা করিয়া– শেষ কালে যে, কেবল চোক্ বুঁজিয়া ধ্যান-ধারণা করিবে, সে আশা ছাড়িয়া দাও। **যাহা যাহার চিরকালের অভ্যাস, সে চোক্ বুঁজিলে কেবল তাহাই দেখে।**

১২৮। জীবনসত্ত্বে চোক্ বুজিয়া তাহা এড়াইবে, সে কথা ত দূরে থাক্, অভ্যাসের এমনি গুণ যে,—**যে দিন একেবারে চোক্ বুঁজিবে, সে দিনও তখন তাহাই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।**

১২৯। আজকালকার লোক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিলে মানসিক অনুষ্ঠানটাই কিছু বেশী বুঝে। কারণ ঐ টাই আজকাল কিছু নির্ব্বিবাদ ও নিষ্কণ্টক, অর্থাৎ দেহ আছেন, তিনি চাকরী করেন আর সংসারিক সুখ-সম্ভোগ করেন; মুখ আছেন তিনি বিবাদ বিতর্ক সমালোচনা করেন; আর মন আছেন নিষ্কর্ম্মা, তিনিই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

১৩০। দেহ যাহা করেন, তাহাও লোকে জানে; বাক্য যাহা করেন, তাহাও লোকে জানে; লোকে জানে না কেবল তাহাই—মন যাহা করিয়া থাকেন! আর কেহ না জানিলেও তোমার মন যাহা করেন, তুমি ত ভাই, তাহা জান!

১৩১। ভাবিয়াছ—দেহের মত দেহ আছেন, বাক্যের মত বাক্য আছেন, মনের মত মন আছেন; সকলেই যার যার তার তার মত আছেন; কিন্তু জানিও—সেটা ভুল! দেহ বাক্য মন, এ তিনের মধ্যে কেহই স্বাধীন স্বতন্ত্র নহেন, সকলই পরস্পর সাহায্যের দাস।

১৩২। ব্যথায় যাতনায় দেহ অস্থির হইলে মনেও তখন ভাল ভাব আসেনা মুখেও ভাল কথা থাকে না।

১৩৩। মর্ম্মাঘাতে মন যখন আহত হয়, দেহও তখন সুস্থ থাকে না, বাক্য, দেহ মন উভয়েরই সমান দাস; তাহাও তখন স্থির থাকে না, রোগেও লোকে প্রলাপ বলে, শোকেও লোকে প্রলাপ বলে।

১৩৪। মানুষ হইয়া তুমি যত কেন জ্ঞানের অহঙ্কার না কর, স্থূল-কথায় জানিও—তোমার জ্ঞানের আধার মন; মনের আধার দেহ। যে ক'দিন এই দেহ স্থির আছে, সেই ক'দিনই তোমার তোমার; মনের অহঙ্কার আর জ্ঞানের দম্ভ; দেহ যখন ভগ্ন হইয়া আসিবে, মনও তখন রুগ্ন হইয়া পড়িবে, জ্ঞানের অহঙ্কারও তখন চুর্ণ হইয়া যাইবে! ভূমিকম্পে দালান ভাঙ্গিলে ঝাড় লণ্টনও চুর্ণ হইবে আলোকগুলিও নিবিয়া যাইবে।

১৩৫। দেহের যাহা বল বিক্রম, তাহা যদি সংসারের সেবাতেই ক্ষয় হইল, বাল্য যৌবন প্রৌঢ়দশা সংসারেই যদি কাটিয়া গেল, তখন আর বুড়ো বলদ হালে যুড়িয়া কোন্ শস্যের আশা কর?

১৩৬। দেহ মনঃ বাক্য, তিনই যদি তোমার, তবে তাহার মধ্যে মনটিই কেবল ধর্ম্মের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে, ইহাই বা কোন্ আইনে লেখা আছে?

১৩৭। যে নিজের দেহ, ধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিতে না পারে, সে যে ধর্ম্মের জন্য মনের ব্যয় করিবে, স্বপ্নেও কখন ইহা বিশ্বাস করিও না!

১৩৮। মনকে যদি ধর্ম্মে সমর্পণ করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে দেহকে ধর্ম্ম-কার্য্যে নিযুক্ত কর।

১৩৯। দেহ যাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনভ্যস্ত বা কাতর, জানিও—তাহার মন কখনও ধর্ম্মের নামগন্ধ সহিতে পারে না, তবুও যদি সে মনে মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে জানিও—তাহা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে।

১৪০। এই জন্য যাহার এখনও যতটুকু সময় আছে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম-কার্য্যে দেহের ততটুকু নিয়োগই মানবজীবনের লাভ; যে যত সেই সময় ছাড়িয়া দিল, জানিও—সে তত লাভে মূলে বঞ্চিত হইল।

১৪১। শাস্ত্র বলেন—শীতান্তে বসন, দিনান্তে অশন, নিশান্তে বিহার, যৌবনান্তে বিবাহ, আর দেহান্তে ভগবচ্চরণ সেবার চেষ্টা এ সবই জানিও এক—আপন আপন সময় চলিয়া গেলে ইহার সবই তখন জানিবে বিফল।

১৪২। যৌবনে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্ত, তাহাদিগের যে বৃদ্ধকালে ধর্ম্মানুরাগ, জানিও—উহা অনুরাগ নহে, তদনুপায় বিশেষ।

১৪৩। এই অনুপায়ের দশা দেখিয়াই সাধক বলিয়াছেন—"ইদানীং ভীতোঽহং মহিষগলঘণ্টা-ঘনরবাৎ। নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণং॥" মা! চিরকাল সংসারের সেবা করিয়া—এখন যে তোমায় মা বলিয়া ডাকিতেছি—ইহা তোমার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া নহে; দ্রুতবেগে আমার যম আসিতেছেন মহিষে চড়িয়া, সেই যমবাহনের গলঘণ্টার ঘন রবে, মা! আমার সংসারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই আজ ভয় পাইয়া তোমায় ডাকিতেছি, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি যাহাদিগকে এ সংসারে আমার অবলম্বন বলিয়া জানিয়াছিলাম, মা! একে একে তাহারা সকলেই ছাড়িয়া গেল, আজ আমি নিরালম্ব; কিন্তু মা! তুমি ত জগতেরই মা, বিশেষতঃ লম্বোদর-জননি, গণেশ তোমার অনন্যশরণ অনুপায় শিশুসন্তান, তাই গণেশকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ; কিন্তু মা! অনুপায়ের দৃষ্টিতে গণেশ অপেক্ষাও শিশু আমি, তাই মা! তুমি মা থাকিতে আমি আর কাহার শরণাগত হইব?

১৪৪। সেই ডাকাই যদি ডাকিতে হইল, তবে ভাই! অভয়া মায়ের ছেলে হইয়া সভয়ে মাকে ডাক কেন? এতকাল ভাব নাই, তাই না—আজ এ ভয় বিভীষিকা?

১৪৫। ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিকেও লোকে তখন ডাকিতে পারে না; ডাকিতে যদি সাধ থাকে, ভয় ভাবনার আগে তবে অভয়া মাকে ডাকিয়া লও!

১৪৬। একেইত জানি না, কর্ম্মসূত্র কত দীর্ঘ, কতকালে মা এই সূত্র ছেদন করিবেন? দোহাই ভাই! দোহাই তোমার, তাহার উপরে আলস্য করিয়া এ সূত্র আর দীর্ঘ করিও না!

১৪৭। এ সূত্র যে কত দীর্ঘ, চতুরশীতিলক্ষ জন্মে তাহার পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে, আর বিলম্ব করিও না ভাই! এ সূত্রের সূত্রধারিণী, সেই জগৎ পুত্রপ্রসবিনী; তাঁহার চরণ-প্রান্তে না পৌছিলে এ সূত্রের শেষ জগতে কখন কাহারও হয় না।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

অদ্য আপনাকে এবং তাঁহাকে আহার যোগাইবার পালা আমার এবং আমার ভ্রাতার। সেই জন্য আমরা কোন্ ভ্রাতা কাহার নিকট উপস্থিত হইব এবং আমাদের বৃদ্ধ পিতার আমাদের উভয়ের অভাব হইলে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে এই চিন্তায় আমরা যারপর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সকল কারণে আপনার নিকট অদ্য উপস্থিত হইতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে, সে অপরাধ আপনি নিজ গুণে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করুন।" সিংহ যখন শুনিল এই অরণ্যে তাহার আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইয়াছে তখন সে আরও ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে অরণ্য কম্পিত করিয়া তুলিল এবং সে সিংহ কত দূরে কোথায় রহিয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তদুত্তরে অতিশয় বিনীত ভাবে শশক বলিল যে, ' আপনি যদি দয়া করিয়া আমার সহিত গমন করেন তবে আমি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারি, কারণ তিনি এই অল্প দূরেই অবস্থান করিতেছেন।" শশকের বাক্যে সিংহ সম্মত হইল এবং শশকের পশ্চাদানুসরণ করিয়া কিছু দূর গমন করিল। শশক তখন অদূরস্থিত একটী কূপের সন্নিকটে সমুপস্থিত হইয়া সিংহকে বলিল, "ঐ স্থানে তিনি আছে।" সিংহ লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক ঐ স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্র কূপ সলিলে তাহার স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল এবং তদ্দর্শনে অপর সিংহ বলিয়া তাহার প্রতীতি হইল। তখন সে ভয়ানক কুপিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কূপ মধ্য হইতেও ঐ গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। সেই প্রতিধ্বনি শ্রবণে অপর সিংহের গর্জ্জন মনে করিয়া সিংহ আরও অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত করতঃ ঐ অপর সিংহকে বধার্থে কূপ মধ্যে ঝম্ফ প্রদান করিল এবং তাহাতেই তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল। উহা যে তাহারই প্রতিকৃতি তাহা সে বুঝিতে সক্ষম হইল না।

তাহাই সাধু বাবা বলিতেছিলেন, যে দ্বৈত বুদ্ধিই যত দুঃখের কারণ। সবই এক। এক ভগবানই প্রত্যেক ঘটে ঘটে সর্ব্বত্র বিরাজমান। ভেদ বুদ্ধি হইতেই যত আমাদের সন্তাপের সৃষ্টি হয়। গুরু-উপদেশ মত চলা ব্যতীত এই ভেদ বুদ্ধি হইতে কিছুতেই আর উদ্ধারের উপায় নাই। সিংহ যেরূপ নিজ

রূপ কূপ মধ্যে দর্শন করিয়া দ্বৈত বুদ্ধি বশতঃ অন্য সিংহ মনে করিয়া কূপে পড়িয়া মারা গেল, সেইরূপ আমরাও দ্বৈত বুদ্ধি দ্বারা অপর ব্যক্তিকে শত্রু ভাবিয়া ক্রোধ করি, কিন্তু যখন গুরুর সাহায্যে দ্বৈত বুদ্ধি লোপ পাইয়া যাইবে তখন প্রত্যেক ঘটে ঘটে সর্ব্ব ব্যাপক এক পরমাত্মাকেই দেখিতে পাইব। কাহাকেও আর তখন শত্রু বলিয়া মনে হইবে না। গুরু-উপদেশ মত চলিয়া যখন দ্বৈত-জ্ঞান লোপ পাইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইবে তখন আর পুনঃ পুনঃ এ জন্ম মৃত্যুর কূপেও পড়িতে হইবে না। সাধুবাবা সেদিন আমাদের আরও একটী গল্প বলিয়া শুনাইয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, "দুষ্টের ক্ষণমাত্র সঙ্গ হইতেও মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। এমন কি উহা হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি সে দিন যে গল্পটী বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ঃ—

একদা এক ব্যাধ অরণ্যে অরণ্যে বহুক্ষণ বেড়াইয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে একটী বৃক্ষ নিম্নে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিতেছিল। এমন সময় তাহার চক্ষু নিদ্রাজড়িত হইয়া আসায় ঐ বৃক্ষ নিম্নেই সে শয়ন করিল এবং তৎক্ষাণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। সেই সময় ঐ বৃক্ষ শাখায় একটী হংস বসিয়াছিল। সতের স্বভাব এই যে তাহারা সর্ব্বদা অপরের উপকারার্থে চেষ্টিত হয়। গগন মণ্ডলে সূর্য্যদেব যখন হেলিয়া পড়িবেন তখন বৃক্ষের ছায়া সরিয়া যাওয়ায় ঐ ব্যাধের মুখমণ্ডলে রৌদ্র আসিয়া লাগায় হংস উহা নিবারণের জন্য স্বীয় বৃহৎ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ঐ শাখায় বসিয়া রহিল। উহাতে সূর্য্যরশ্মি নিবারণ হওয়ায় ব্যাধ আরও অধিক আরামে নিদ্রামগ্ন রহিল। গভীর নিদ্রা ঘোরে ব্যাধের ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেই সময় হঠাৎ একটী কাক উড়িয়া আসিয়া ঐ বৃক্ষোপরি উপবেশন করিল এবং যে স্থানে ব্যাধ গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল, ঠিক তাহার উপরে বসিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করায় উহা গিয়া ব্যাধের মুখ বিবরে পতিত হইল। ঐ কার্য্য করিয়া চঞ্চল কাক স্বীয় ইচ্ছানুসারে অন্যত্র উড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু উচ্চস্থান হইতে ঐরূপ কাকবিষ্ঠা পতনে ব্যাধের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কে এইরূপ দুষ্কার্য্য করিল অনুসন্ধানের জন্য সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কাক উড়িয়া অন্যত্র যাওয়ায় ঐ বৃক্ষোপরি মাত্র এক হংসকেই দেখিতে পাইল। উহাকে দেখিয়া ব্যাধ অনুমান করিল যে এই হংস দ্বারাই এরূপ গর্হিত কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। উহা মনে উদয় হওয়ামাত্র

ব্যাধ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তূণ হইতে তীর গ্রহণ করিয়া হংসকে লক্ষ্য করিয়া উহা নিক্ষেপ করিল। সেই ব্যাধের উপকারী হংস বৃক্ষ হইতে পতন কালে ব্যাধকে বলিল "কেন তুমি আমাকে অনর্থক হত্যা করিলে?" হংস মুখে ব্যাধ যখন শুনিতে পাইল যে দুষ্ট কাক দ্বারা এই অন্যায় কার্য্য সাধিত হইয়াছে হংস বরং উহার মুখে রৌদ্র পতিত হওয়ায় উহা নিবারণকল্পে স্বীয় পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক নিজে রৌদ্রতাপ গ্রহণ করিয়া উহার মুখের রৌদ্র তাপ নিবারণ করিতেছিল, তখন ব্যাধের মনে সাতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে হংস ব্যাধকে এক উপদেশ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল যে কখনই অসতের সঙ্গ গ্রহণ করিও না। অসতের সঙ্গ কিরূপ বিপদজনক তাহার উদাহরণ দেখাইয়া বলিল যে দেখ ক্ষণমাত্র এই দুষ্ট কাকের সঙ্গ গ্রহণের ফলে আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল।

সাধুবাবা আর একটী কথা আমাদের নিকট বলিতেছিলেন যে, এই সংসারে পামর, বিষয়ী, মুমুক্ষ অর্থাৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই চার প্রকার ব্যক্তি আছে। পামর ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম ও পুণ্যের দিক দিয়া যায় না। তাহারা অনবরত ক্রমে ক্রমে কেবল পাপ হইতে পাপান্তরে দিন দিনই নিমগ্ন হইয়া যায়। আর বিষয়ী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রানুসারে সকল সৎকর্ম্মাদি সাধন করে এবং সাধ্যপক্ষে তাহারা অন্যের দ্রব্যে লোভ করে না। তাহারা যদৃচ্ছা বিষয় ভোগ করে এবং তাহাদের সকল কর্ম্মই সকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা সাধ্যপক্ষে কোনরূপ পাপাচরণ করে না, বরং সকাম সদনুষ্ঠানে রত থাকে। তাহারা সঙ্গত ভাবে কি প্রকারে নিজের সুখ সুবিধা সমৃদ্ধি হইবে কেবল সেই চেষ্টায় চেষ্টীত রহে এবং কিরূপ কর্ম্ম করিলে পরলোকে গিয়া স্বর্গভোগ হইবে সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সতত সকাম ভাবে কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। আর যাহারা তত্ত্ব জিজ্ঞাসু বা মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহারা অনিত্য ক্ষণিক স্বল্প সুখ কামনা করেন না। তাঁহার কি শুভ কি অশুভ, কি স্থায়ী কি ক্ষণিক তাহা সততই বিচার পূর্ব্বক ছিলেন। তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী বিষয়ানন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিত্যসুখ আত্মানন্দ চাহিয়া থাকেন। ইহাই হইল মুমুক্ষু বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর অবস্থা আর যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনা শূন্য। নিজের কোন প্রকার সুখ কিম্বা দুঃখে তাঁহার স্পৃহা নাই। নিজের কোন বিপদ আসিলে তিনি কাতর হন না কিম্বা সম্পদেও তিনি উল্লসিত হন না। সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি বিকার রহিত। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষ। তাঁহার নির্ম্মল সুপবিত্র চিত্তে

মলিন স্বার্থ বাসনাদি আদৌ উদয় হয় না। তিনি মাত্র বহুজন হিতকর ব্রহ্ম কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম ধ্যানে সতত নিযুক্ত থাকেন।

সাধুবাবার নিকট বসিয়া যখন তাঁহার মুখ নিঃসৃত এইরূপ বহু উপদেশ এবং শিক্ষাপূর্ণবাক্যাবলী শ্রবণে আমরা আনন্দিত হই তখন অনেক সময় দেখিতে পাই বহুদূর হইতে কত শীর্ণ রুগ্ন ব্যক্তি বাবার নিকট ঔষধ গ্রহণ মানসে কৈলাস পাহাড়ে উপস্থিত হইতেছে এবং বাবা প্রসন্ন চিত্তে তাহাদের নিকট তাহাদের ব্যাধির অবস্থা শুনিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত ঔষধগুলি কত যত্নের সহিত বিতরণ ও কোমল বাক্যে উহাদের ব্যবস্থা এবং উপদেশ দিতেছেন। সাধুবাবার ঐরূপ কার্য্য দর্শনে এবং উহাদের প্রতি ঐরূপ সদয় ব্যবহারে বিশ্ব বিশ্রুত স্বামীজী বিবেকানন্দের সেই মহান্ বাণী আমাদের মনে পড়ে—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনঃ প্রাণ শরীর অর্পণ কর সবে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সাধুবাবা এই প্রকারে জীবে প্রেম এবং জীব সেবা করিয়া থাকেন।

জনৈক ভদ্র মহিলা (রাজসাহী)

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজায়।

(১)

খাও-দাও বেশ ত নিদ্রা যাও, তোমার কাতরতা কি এই? কিসের জন্য তুমি কাতর তাই বল—নিজের, পরিবারের, সমাজের ও জগতের কোথাও ত দুঃখের অভাব নাই, কিন্তু তোমার প্রাণ কি কোন কিছুর জন্য সত্য সত্য কাতর হইয়াছে? যে কাতরতায় প্রাণ জ্বলে, যে কাতরতায় রাত্রে নিদ্রা হয় না, যে কাতরতায় কাহারও সহিত হাহা হিহি ভাল লাগে না, যে কাতরতায় লোকসঙ্গ বিষবৎ বোধ হয়, সে কাতরতা কি তোমার আসিয়াছে? যে কাতরতায়

অস্থির হইয়া মানুষ লুটাইয়া লুটাইয়া ভগবানের চরণমাত্র আশ্রয় করে, যে কাতরতার প্রতীকার করিতে মানুষ পারে না, যে প্রাণের হাহাকার শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সে কাতরতা কি তোমার আসিয়াছে? তুমি কি আর্ত্ত হইয়া আর্ত্তত্রাণপরায়ণের আশ্রয়ে আসিয়াছ? একটুতেই তুমি কাতর আর পরক্ষণে একটুতেই নিবৃত্তি, ইহা কি কাতরতা? প্রাণ যদি স্থায়ী কোন কিছু জুড়াইবার বস্তু না পাইয়া শান্ত হয়, তবে তোমার কাতরতার মূল্য কি? শোকতাপ ত অনেক পাইলে, পাপ অপরাধ ত অনেক হইয়া গেল, প্রাণ জ্বলিল কি? জ্বলিত-মস্তিষ্ক-পুরুষ জল দেখিলে যেমন আর নিমজ্জনের বিলম্ব করিতে পারে না, তুমিও সেইরূপ ঈশ্বর দর্শনে, গুরুদর্শনে, প্রাণ জুড়াইবার জন্য ছুটিলে কি? তোমার পাপাগ্নি তোমাকে এমন করিয়া দগ্ধ করিল কি—যাহাতে তুমি একক্ষণের জন্যও তোমার পবিত্রতার নাম ছাড়িতে পারিলেনা—এমন কি তোমার হইল? জগতের হাহাকার কি তোমার প্রাণকে নিরন্তর এমনভাবে পোড়াইতে লাগিল, যাহাতে তুমি সব ছাড়িয়া সেই করুণা-বরুণালয়ের আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুঃখ দূর করিবার উপায় পাইয়া প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইলে? কোন প্রকারের স্থায়ী দুঃখ তোমার আসিয়াছে কি? আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—ইহার মধ্যে তুমি কোন্ প্রকারের তাহা কি নিশ্চয় করিয়াছ? যদি দুঃখ প্রতীকারের তীব্র ইচ্ছা না জাগে, তবে কি প্রার্থনায় কিছু হয়, না ধর্ম্ম উপদেশে কিছু হয়? তোমার যেমন হিনহিনে ফিনফিনে ইচ্ছা, তোমার প্রার্থনাও সেইরূপ, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানও সেইরূপ, তোমার পূজাও সেইরূপ হইবেই। সকলেই তোমার জন্য আছে, শুধু কাতরতা জাগে নাই বলিয়া ঈশ্বর আসেন না—ঈশ্বর তোমার কথা শুনেন না। কাতরতা না জাগিলে সেই সর্ব্ব-শক্তিমানের কোন শক্তিই স্থায়িভাবে তোমাতে স্ফুরিত হইবে না।

(২)

কাতর হইয়া যে আজ্ঞা পালন করে, তাহার জন্যই ভগবান, তাহার প্রার্থনাই তিনি শুনেন, তাহার কাছে তিনি সদা জাগ্রত। লোকে যে ধর্ম্ম লইয়া স্বার্থ স্বার্থ করে, লোক প্রতারণা করে, তাহার মূলে থাকে কপটতা, কুটিলতা, কাম। আপনাকে আপনি বিচার করিয়া নিজের দোষ ধরিতে যদি পার, তাহার জন্যও যদি কাতর হও, তবে তোমার জন্য গুরু আছেন, শাস্ত্রও আছেন—ঈশ্বরই গুরুরূপে শাস্ত্ররূপে তোমার সহায়।

(৩)

সম্মুখে সরস্বতী পূজা। এই সরস্বতী চিরদিনই ছিলেন, চিরদিনই থাকিবেন। তুমি মানিতে না পার, তোমার দুর্ভাগ্য। ইনি বাগ্‌বাদিনী—এই যে তুমি কত বাক্য উচ্চারণ কর, কখন কি দেখিয়াছ, কাহার সহায়তায় বাক্য উচ্চারিত হয়? জগতের এই যে শব্দরাশি নিরন্তর উঠিতেছে—কে কোন্ প্রকারে স্ফুট অস্ফুট সমুদায় ধ্বনি আনিতেছেন? পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী—এই চারি প্রকারে সরস্বতী আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। ভগবতী সরস্বতীকে যদি দেখিতে চাও, তবে তাঁহাকে একটু জানিতে হইবে। যাঁহাকে জান না, তাঁহাকে ভালবাসিবে কিরূপে? যাঁহাকে জান না, যাঁহাকে ভালবাস না, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে কিরূপে? তাঁহাকে পাইবেই বা কোথায়?

প্রথমেই কিছু জান, তার পরে ধ্যান কর, তখন তিনি শক্তি দিয়া দিবেন—তোমার সকল বাসনা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

(৪)

বেদ হইতেছেন সকল জানার প্রসূতি। জ্ঞানের ভাণ্ডার তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। সর্ব্বশক্তি তোমার মধ্যে রহিয়াছে। ইনিই সরস্বতী। ইনি বিদ্যা, ইনি অবিদ্যাও। অবিদ্যা তোমার ক্ষুদ্র মন। এই মনের জল্পনা কল্পনা বন্ধ কর, পূর্ণশক্তি তোমার সমস্তই করিয়া দিবেন।

ভারতের সাধনা হইতেছে মনের জল্পনা কল্পনা ত্যাগ। প্রথমেই ইচ্ছাশক্তি জাগাও। বল যে, আমি মনকে অন্য কোন চিন্তা করিতে দিব না। সেই জন্য সর্ব্বদা নাম করার ব্যবস্থা। সর্ব্বদা নাম করা—ত্রিসন্ধ্যা করা—স্বাধ্যায় করা—এই সমস্তই শুভেচ্ছাশক্তি প্রবল করিবার জন্য। যাঁহারা যথার্থ পথে ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে চান, তাঁহাদের জন্যই ধর্ম্মজীবন নিতান্ত আবশ্যক। আর যাঁহারা স্বেচ্ছাচারে মনকে ছাড়িয়া দেন—ধর্ম্মাচরণ করেন না, তাঁহারা স্বভাব চরিত্র কতদূর রক্ষা করিতে পারেন, তাহা তাঁহারাই বিচার করিবেন। এখন আমরা এই বাগ্‌বাদিনী, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননীর সম্বন্ধে বেদ যাহা বলিতে-ছেন, তাহাই বলিব।

(৫)

মহাসরস্বতী সৃষ্টিশক্তিরূপিণী। যাঁহার উপাসনা করিলে স্বরূপজ্ঞানে—তত্ত্বজ্ঞানে মানুষ স্থিতি লাভ করিয়া চিরতরে জুড়াইয়া যাইতে পারে, তিনিই এই সরস্বতী। স্বরূপে স্থিতি লাভ জন্য এস এই মনোহরাঙ্গী বাণী দেবীকে বাক্ ও

মন মিলাইয়া প্রণাম করি, এস। বেদান্ত প্রতিপাদ্য "তৎ" ইহাঁর ভাব—এই মায়ের স্বরূপ। সকলেরই স্বরূপ ইহা। এই সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ চলন রহিত সর্ব্বব্যাপী ভাবের দীপ্তিতে এই অনন্তকোটি জগৎ যাঁহার অঙ্গে ভাসে—যিনি নাম রূপের সাহায্যে অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন, এস এস —কাতর প্রাণে বল "নামরূপাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী"—বল—মা সরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা কর। মা তুমি দানাদিযুক্তা বলিয়া দেবী—ইহা তোমার স্বভাব—তোমাকে কাতর প্রাণে পূজা করিয়া ডাকিলেই তুমি অন্নাদিও দান কর। আরও তোমার স্বভাব হইতেছে এই যে, যাঁহারা তোমার উপাসনা করেন, তুমি তাঁহাদিগকে সব দিয়া রক্ষা কর।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত বেদ চতুষ্টয়ে একমাত্র তুমিই গীত—"অদ্বৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ" ব্রহ্মের অদ্বৈতা শক্তি তুমি—এস এই মাকে—মা বলিয়া জানিয়া প্রার্থনা করি—মা আমাদিগকে রক্ষা কর।

সাম্, ঋক্, যজু ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ। বেদের অঙ্গ হইতেছে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদের উপাঙ্গ হইতেছে গন্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ এবং শিল্প বিদ্যা। মা! তুমি ব্রহ্মের সেই চিন্মণির প্রভা, তুমি মহামায়া, তুমিই আবার চৈতন্যরূপিণী ব্রহ্ম। "শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতা" ইতি প্রয়োগসাগরে। জগন্মুখী যখন তুমি, তখন তুমি মোহকারিণী স্পন্দশক্তি, আবার যখন তুমি ব্রহ্মমুখী তখন সেই সচ্চিদানন্দ স্পর্শে শান্ত হইয়া মোহোৎপাদন ছাড়িয়া ব্রহ্মরূপিণী চিন্ময়ী। তখন তোমাতে ও চৈতন্যে কোন ভেদ নাই। তখন তুমি স্ত্রীমূর্ত্তি নও, তখন তুমি পুংরূপিণী। মা তুমি মধ্যমা বাক্। আমরা তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি। তুমি সেই দ্যোতমান দ্যুলোক হইতে আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। মা জগজ্জননি! তুমি আবার জনতৃপ্তিকর মহৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেও আগমন কর—এই জন্য তোমাকে মধ্যমিকা বাক্—বেদ বলেন।

মা তুমি বর্ণ, পদ, বাক্য, এবং অর্থ—এই সবরূপে বিশ্বরূপধারিণী, আবার তুমি অনাদি নিধনা—তুমি অনন্ত, অনন্ত কাল ধরিয়া আপন স্বরূপে আপনি অবস্থিতি করিতেছ তোমার সীমা কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সরস রাখিয়াছ তুমিই, তুমি সকল ধন দান করিতেছ এবং অন্ন দান করিতেছ। ঈশ্বরের জন্য যে যাহা করে তাহার সম্পাদয়িত্রী মা তুমিই। তুমি প্রভামণ্ডিত চিন্মণি। তুমি সর্ব্বদা আপন নির্গুণ স্বরূপে থাকিয়াও সগুণা। মা

তুমি সকল দেবতার ঈশ্বরী। তুমিই বলিয়া দাও, প্রতিদেহে আত্মরূপে তুমিই আছ। মানুষ যে সত্য বাক্য বলে—প্রিয় বাক্য বলে, তাহার প্রেরণা পায় কোথা হইতে? মানুষ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহা জানাইয়া দাও তুমি। সর্ব্বত্র অন্তর্যামিনীরূপে তুমিই ত্রৈলোক্য নিয়মিত কর। রুদ্র, আদিত্যাদি দেবগণ তে মাতে আবিষ্ট, সকল দেবতা তোমারই ধ্যান করেন, মা তুমিই সর্ব্বময়ী, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমিই দেবতারূপে বিগ্রহবতী ও নদীরূপিণী, তুমি নদীরূপিণী হইয়া তরুলতা কান্তার ভূধর সকলকে সরস রাখ আবার দেবরূপে বিশ্ববাসী অনুষ্ঠাতৃ জনগণের প্রজ্ঞাকে উদ্দীপিত কর।

বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে দর্শন করিতে পারিলে ঐ জীব চৈতন্য দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া তুমিই অনুভবসীমায় আইস—তুমিই সর্ব্বব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপা দেবী। বাঙ্ময়ী দেবী সরস্বতীর চারি পর্ব্ব। শব্দরাশির পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থা। প্রথম তিনপাদ গুহা নিহিত, কেবল তোমার বৈখরী পাদই মনুষ্য লোকে পরিচিত। জগতে যে সমস্ত শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়—তাহাই বৈখরী বাক্। একবার স্থির হইয়া ভাব দেখি, ব্রহ্মাণ্ডে কতশব্দ নিরন্তর উঠিতেছে। বৈখরী বাক্ই বিশ্বরূপ। বিবিধ বস্তু যাহাতে বিরাজ করে, তিনিই বিরাট পুরুষ। নির্গুণ ব্রহ্মই আত্মমায়া দ্বারা বিরাট দেহ ধারণ করেন। এই হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম—ইনিই ঈশ্বর। বাঙ্ময়ী সরস্বতী দেবী, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিরাজ করেন। প্রতি জীবেই ইনি অবস্থিত। মানুষের মধ্যে যাহা আছে, তাহাই উপাধিযোগে খণ্ড বোধ হইলেও সমস্তই কিন্তু অখণ্ডেরই অংশ। মানুষের খণ্ড মনকে অখণ্ডে ডুবানই সাধনা! মানুষের ক্ষুদ্র মন বাহিরের বিষয় লইয়া নিরন্তর নাচিতেছে। যাঁহার উপরে মন নাচিতেছে, তাহা কিন্তু সর্ব্বব্যাপী। ঘটের মধ্যে যে আকাশ—সে যেমন আপনার পূর্ণভাব সেই সর্ব্বব্যাপী মহাকাশকে চিন্তা করিয়া আপন স্বরূপ মহাকাশরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ মানুষের ক্ষুদ্র মন আপনার সঙ্কল্প, ভাবনা ছাড়িতে পারিলেই সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধারে যখন অবস্থান করেন, তখন ইনি পরা। ইনি নাভিচক্রে উঠিয়া যোগিগণের দর্শন পথে আইসেন বলিয়া ইনি পশ্যন্তী। হৃদয়ে উঠিয়া ইনি মধ্যমা। ইনিই মুখমণ্ডলে আসিয়া তালু ওষ্ঠাদির সাহায্যে বাহিরে যখন আসেন, তখনই ইনি বৈখরী। এই জন্যই সরস্বতীর নাম বাক্বাদিনী। ইনি স্বয়ং আপনি আপনি

নির্ব্বিকল্পস্বরূপিণী, তখন ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। আবার যখন সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন, তখন ইনি নাম জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধ রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। এই দীপ্তিময়ী আনন্দময়ী দেবী মধ্যমাবস্থায় অচেতন জড়সমূহকে জানাইয়া দেন। ইনিই বিশ্বরূপিণী, আবার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ইনিই দেব নরমধ্যে পূজিতা। মা! সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় তোমারই যশোগান করেন। তুমি কামধেনু স্বরূপিণী—তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

বেদ এইভাবে সরস্বতী দেবীকে জানাইয়া দিতেছেন। তুমি যাঁহার নাম জপ কর, তিনি যেমন সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার, সেইরূপ এই দেবী সরস্বতীও নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে। কেবল নামরূপেই দেবতারা ভিন্ন—কিন্তু স্বরূপে, বিশ্বরূপে, আত্মভাবে সকল দেবতা সেই একই। বেদ বহু ঈশ্বরের উপাসনা কোথাও বলিতেছেন না একেকেই বহু নাম রূপে উপাসনা করিতে বলিতেছেন। নির্গুণ ও সগুণ ভাবে তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের সাধ্যাতীত বলিয়া, তিনি যে নামরূপ ধারণ করেন তাহাই মানুষ ধ্যান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করে।

যে মূর্ত্তির পূজা এখনও চলিতেছে, তাহা অবলম্বনে তাঁহার স্বরূপ ও বিশ্বরূপের ধ্যান করিতে হয়। স্বরূপ ও বিশ্বরূপ সেই আত্মচৈতন্যরূপিণী তুমিই।

এই মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার স্বভাবটি যখন পুনঃ পুনঃ মনের মধ্যে উদিত হইতে থাকে, তখন অনুভব করিতে পারা যায়, তুমি ভবসন্তাপনির্ব্বাপণী সুধানদী কিরূপে। মাকে মা বলিয়া যিনি অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার আর কি কোন দুঃখ থাকে, না ভয় থাকে? মাকে মা বলিয়া অনুভব করিয়া সন্তান যেমন মায়ের কোলে উঠিয়া মাতৃস্তন্য পান করিয়া জুড়াইয়া যায়, সেইরূপ যিনি করিতে পারেন তিনিই ধন্য। তাঁহার জন্যই পূজা। পূজা করিয়া মায়ের প্রসন্নতায় হৃদয় ভরিত করিয়া মায়ের নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই মা প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কাহারও উপাসনা করে না। যে জ্ঞান লাভে বা আত্মজ্ঞান লাভে মৃত্যুসংসার-সাগর অতিক্রম করা যায়, তার প্রয়োজন বুঝি বিরল হইয়া আসিল। তাই বুঝি পূজারও এই আধুনিক অবস্থা হইয়া যাইতেছে। যখন প্রয়োজন ছিল, তখন পূজা ও উপাসনা ঠিক মত হইত। ভগবান্ সনৎ

ব্রহ্মাকে আত্মজ্ঞান কিরূপে লাভ হয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা মা সরস্বতীকে প্রসন্ন করিয়া উপদেশ করেন। বসুন্ধরা অনন্তদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ভগবান্ কশ্যপের আজ্ঞামত সরস্বতী দেবীকে স্তব করিয়া বসুন্ধরার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। ভগবান ব্যাসদেব বাল্মীকি ভগবানকে পুরাণ সূত্র জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বাল্মীকি দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিয়াই উত্তর দিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনা যে হইয়াছিল তাহাও ব্রহ্মার বরে এই দেবীর প্রসাদে। পার্ব্বতী মহাদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবাদিদেব এই দেবীকেই চিন্তা করিয়া উপদেশ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র, ভগবান্ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সরস্বতীদেবীকে পুষ্করে সহস্র বৎসর ধ্যান করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করেন। এই প্রয়োজন কি আমাদের আবার হইবে?

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

মা ৺সরস্বতী।

মা, তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, অন্য সকলকে প্রকাশ করে। তুমি জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরাশি দূর কর মা। অজ্ঞানে বস্তুতত্ত্ব ঠিক ঠিক মত না দেখাইয়া বস্তুতত্ত্ব আবৃত করিয়া রাখে, অথবা অন্যমত দেখায়। তোমাকে ভুলিয়া—মা, তুমি আমার আত্মস্বরূপটি, তোমাকে বিস্মৃত হইয়া, মায়ার আবরণে পড়িয়া, সংসারের লয় ও বিক্ষেপে জন্মিতেছি মরিতেছি, কতদুঃখ পাইয়াছি, কত দুঃখ পাইতেছি। সন্তানকে ত মা ত্যাগ করে না। তুমি আছ সঙ্গে সঙ্গে; কিন্তু, আমার দুষ্কৃতির ফলে তোমাকে দেখি না। যেখানে তুমি নাই এমন স্থান নাই, এমন কাল নাই। তোমার প্রকাশে সমস্ত প্রকাশ লাভ করে। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং" হইয়া জ্ঞানাত্মা তুরীয় স্বরূপ তুমি আপনি আপনি নির্গুণ ভাবে থাক। তখন ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত, তুমিও মা ব্রহ্মময়ী। আবার যখন প্রকৃতি লীন জীবের কর্ম্মফল বৃত্তি লাভ করে, তখনও মা, তুমি তাহাদিগকে প্রকাশিত না করিলে তমঃ তমঃদ্বারাই গূঢ় থাকিয়া যায়,—অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, প্রসুপ্ত মত থাকিয়া যায়। অনন্ত দিক্‌প্রসারি, অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশক তোমার তেজ বিশ্ব প্রপঞ্চের

অনন্ত জীবের কর্ম্মরাশিকে, সৃষ্টিতত্বরাজিকে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে, স্থূলতরে যখন ব্যঞ্জনা দিল তখন না তাহারা এই বিশ্বমূর্ত্তিতে ফুটিতে—প্রকাশিত হইতে পারিল। "তৎসৃষ্ট্বা ত দেবানুপ্রাবিশৎ"—তুমিই পরমাত্মা। হিরণ্যগর্ভ, আদি জীব ব্রহ্মা—তোমারই ভর্গের সৃষ্টি। তুমিই ঐরূপে প্রথমে প্রকাশিত হইয়া জগতের আদি পুরুষ স্বরূপ হইলে। তাঁহারই হৃদয়-কন্দরে প্রণবরূপে, ব্যাহৃতি-রূপে, সাবিত্রীরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া যথাপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্য ব্যক্ত করিলে; বেদমাতা তুমি, বেদরাশিরূপে নিজকে প্রকাশ করিলে। ব্রহ্মাও 'যথাপূর্ব্বম-কল্পয়ৎ'। শব্দব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশ লাভ করিল সূক্ষ্ম মন্ত্ররাশিই স্থূল জগৎ-রূপে বিবর্ত্তিত হইল।

সবিতার অয়নগতির ফলে, ঋতুচক্রের পরিবর্ত্তনে, শীতের জড়তায় মানব পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির শক্তিগুলি যখন জাড্যতা প্রাপ্ত হয় তখন বসন্ত ঋতুর শ্রীপঞ্চমীতে মা তুমি আগমন করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীফুটাইয়া তোল। পত্রেপুষ্পে বৃক্ষলতা সুন্দর হইয়া উঠে, সর্ব্বত্র শক্তিগুলি কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে।

আবার, সূর্য্যদেবের দৈনন্দিন উদয়ের কালে, ঊষার নবীনরাগের পূর্ব্বাভাসে নিশার নিঃশেষতমঃ অপসারিত হয়। অন্তরাত্মারূপী তোমার প্রকাশে, সুষুপ্তিলীন জীবশক্তি ও সংস্কাররাশি উদ্বোধন প্রাপ্ত হইয়া দৈনন্দিন কর্ম্ম-প্রবাহের অনুচিন্তন করিয়া, কর্ম্মদায়ী সূর্য্যদেবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেখানেও ঐ সিসৃক্ষার বিকাশ। তমঃনাশ করিয়া—জড়তা অপসারণ করিয়া—সেখানেও মা, তুমিই জীবকে কর্ম্ম করিতে সক্ষম করিয়া দাও। মা, সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেও তুমিই জীবকে অনুগৃহীত কর। সিসৃক্ষাবান্—কামকলাত্মক—অজ্ঞানধ্বংসকারী শ্রীগুরুরূপী তোমার ধ্যান ধারণা মানসপূজা জপাদির সময়ও প্রধানতঃ তখনই। মা, অজ্ঞানান্ধ আমরা, অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত নানাপ্রকারের অসংখ্য দুঃখে নিয়ত প্রপীড়িত। মা, তুমি আগমন কর। তুমি ত আমাদের মধ্যে আছই—প্রকাশিত হও। সন্তান আমরা মা, তোমাকে বলি তুমি আমাদের কাছে থাক। আমাদিগকে—মঙ্গলময়ী তুমি, সর্ব্বমঙ্গলা তুমি, মহাবিদ্যা তুমি—তুমি বর দেও তাই আমরা বলি,—

'যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সং তিষ্ঠেত্তথাভব বরপ্রদা॥

যেমন পিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে ক্ষণকালও ছাড়িয়া থাকেন না তুমি আমাদের কাছে তেমন সর্ব্বদা থাক। মা তোমায় কাছে সর্ব্বদা থাকিলে আর ভয় নাই। আমরা সর্ব্বপ্রকারে অভয় প্রাপ্ত হইয়া যাই। আর তুমি আসিয়া তোমার—

"লক্ষ্মী মের্ধা স্বধা পুষ্টি র্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ

তোমার এই অষ্টতনুর বিকাশে আমাদিগকে পালন কর।

এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি।"

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

'মাভৈঃ।'

১৩৩৫ সাল পৌষ মাসের উৎসব পত্রিকায় 'মাধবী বল্লরী' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে এখনও যে মাধবী বল্লরী লেখিকার মত মহিলা জন্মগ্রহণ করেন, ইহা অতি আশাপ্রদ। ভগবানের বিচিত্র বিধানে পার্থিব বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিগুলি কতকটা সাফল্য লাভ করায় হিন্দুসমাজের অধিকাংশ নরনারী তাহাদের সভ্যতার অবিকল নকল করিবার জন্য বিষম ব্যগ্র হইয়াছে। ইহাঁদের বিশ্বাস সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন রীতি নীতি এবং শাস্ত্র একেবারে বিসর্জ্জন না দিলে দেশের কখনও মঙ্গল হইবে না। দেশ স্বাধীন করিতে হইলে বর্ত্তমান স্বাধীন জাতিগণ যাহা যাহা করেন তাহাই করিতে হইবে। জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, বাল্য-বিবাহ এবং এইপ্রকার হিন্দু শাস্ত্রের অন্যান্য অনুশাসন এই মুহূর্ত্তে উঠাইয়া না দিলে এদেশ রক্ষা পাইবে না। এই মত এখন সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতেছে, এবং জনসাধারণও ইহার পোষকতা করিতেছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সমাজের বর্ত্তমান ভিত্তির উপর কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। জন-সাধারণের এরূপ মত হওয়ার আর একটী প্রধান কারণ এই যে পাশ্চাত্য রীতি নীতির সমস্তই আপাতমধুর। পরিণামে উহারা কিরূপ বিষ উদ্গীরণ করে তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিতে প্রস্তুত নয়। প্রাচীন ভারতে স্বামী স্ত্রীর,

পিতা পুত্রের, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের এমন কি প্রতিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কি আদর্শ ছিল তাহা এখানে বিস্তারিত ভাবে লিখিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই চলিবে যে নানাপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও সে সময় পরম শান্তি বিরাজ করিত। সাধারণতঃ মানব উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিত। অতি দীন দরিদ্রও নিজ পরিবারে ধার্ম্মিক সংযমী এবং বিনয়ী পোষ্যবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদাই আনন্দ লাভ করিত। পাশ্চাত্য সভ্য জাতির কোনও পরিবার সে শান্তি কল্পনায়ও আনিতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম ভাগে এখন প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা সত্বেও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের পরিণত অবস্থায় দেখা যায় যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আর সে ভাব নাই। পুত্র-কন্যা পুত্রবধূ কনিষ্ঠ ইত্যাদি সকলেই অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী এবং স্বার্থপর। পরিবারের কর্ত্তা অন্য উপায় নাই বলিয়াই সংসারে থাকেন এবং সংসার করেন, এবং সর্ব্বদা বিষম জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করেন। পাশ্চাত্য আদর্শে হিন্দু সমাজের এই পরিণতি অত্যন্ত ভীষণ। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর বংশীয়া কুলবধূরা সাধারণের সম্মুখে নৃত্য করিবেন এবং আইনের সাহায্যে পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবেন—ইহা চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শে ভক্তিমান ও বিশ্বাসী অনেকে সমাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও সন্তপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে যদি সনাতন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিসর্জ্জন দিতে হয় এবং পুণ্যভূমি ভারত পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যের লীলাক্ষেত্র হয়, তবে সে স্বাধীনতাকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। কিন্তু এরূপ মতবাদী লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপুল স্রোত অতি প্রবল বেগে ভারতে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক ভয়ের কি কোন বিশেষ কারণ আছে? এই পুণ্যভূমিতে ভগবান্ রামচন্দ্রের সশরীরে অবস্থান কালে রাবণ জগন্মাতা সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এই পুণ্যভূমিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানকালে অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর কংসরাজ ইত্যাদি সমাজের প্রতি এবং ভগবানের

প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে ত্রুটী করে নাই। কংসরাজ, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অনুকূল দেবতাগণকে নিষ্প্রভ করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত গো এবং ব্রাহ্মণ-কুল বধ করিয়া যজ্ঞ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মধুকৈটভ বৃত্রাসুর হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বিপ্লবকারীদিগের প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব মহিমায় সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র ভারত ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইলেও যদি সনাতনধর্ম্মাশ্রিত একটী মহাপুরুষ হিমালয়ের গহ্বরে বাস করিয়া ইহার আদর্শ রক্ষা করেন তাহা হইলে এই ধর্ম্মলোপের কোন আশঙ্কা নাই। আমরা বিশ্বাস করি এইরূপ মহাপুরুষ এখনও ভারতে অতি বিরল নহেন। তাঁহারাই যে কোনও অবস্থা হইতে সনাতন আদর্শকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন এবং এই পুণ্যভূমিকে আবার প্রাচীন মহিমায় মহিমান্বিত করিবেন। তবে ভয়ের কারণ কি আছে? রাক্ষস এবং অসুরগণের প্রাদুর্ভাব কি ভগবানের বিনা ইচ্ছায় হইয়াছিল? তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্যই তিনি দানবাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই লীলারই পুনরভিনয় হইতেছে। দানবগণও তাঁহারই অংশ এবং তাঁহারই সন্তান। তাহারাও তাঁহারই ইচ্ছানুসারে চলিতেছে। আনন্দময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আমরা সকলেই শায়িত হইয়া তাঁহার বক্ষস্থিত অমৃতধারা পান করিতেছি। পান করিতে করিতে কেহ বা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছি, কেহ বা তাঁহার ক্রোড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছি এবং স্তনবৃন্তে দন্তাঘাত করিয়া রুধিরধারা নির্গত করিতেছি। তিনি সকলকেই দেখিয়া হাসিতেছেন, এবং সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেছেন। তবুও কি ভয়ের কোনও কারণ আছে? দেহধারী আমাদের দেশ, সমাজ ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্কস্বল্প কয়েক বৎসর মাত্র। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্ত্রী অনন্তকালের জন্য অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সুচারু ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং মাভৈঃ। ভগবানেরই শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়াছে—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্ম্মা মুন্সী বি, এল্ এড্ভোকেট্ পেগু (ব্রহ্মদেশ)

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যুধিষ্ঠির কহিলেন "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ; অতএব শূদ্র বংশ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে ; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।"

এই কথা গুলি প্রশংসা বাদক মাত্র। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে ব্রাহ্মণ এই জন্মেই শূদ্র এবং শূদ্র এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে মহাভারতের অন্যান্য অংশের সহিত বিরোধ হয়।

ইহার পরের অধ্যায়ে মহাভারতকার সর্পরূপী নহুষ দ্বারা বলাইয়াছেন "রাজন্! মানব জাতির স্বকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট গতি তিন প্রকার—মানবজন্ম প্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ও তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্তি।" "দেহাভিমানী আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহ যোগ জনিত ফল ভোগ করে।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত উমা মহেশ্বর সংবাদে এক জাতীয় লোক কিরূপে কর্ম্ম বশে জন্মান্তরে উচ্চ বা নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করে তাহা মহাভারতকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বিদ্যা তপস্যা সত্যাদি সদ্গুণ না থাকিলে পরজন্মে অধোগতি বা ব্রাহ্মণত্বের হানি হইবে কিন্তু ইহজন্মেই যে তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র জাতিতে পরিণত হইবেন বা কোন নিকৃষ্ট জাতি স্বীয় সৎকার্য্য প্রভাবে এই জন্মেই উচ্চ জাতিতে উন্নীত হইবেন ইহা হিন্দু শাস্ত্র নহে। ব্রাহ্মণের বিদ্যা তপস্যা সত্যাদি সদ্গুণ না থাকিলে পরজন্মে তিনি অধোগতি লাভ করিবেন কিন্তু ইহজন্মে ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র জাতিতে পরিণত হইবেন না। অবশ্য অগম্যাগমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি গর্হিত কার্য্যের দরুণ—যে কোন জাতীয় লোক পতিত ও সমাজ ভ্রষ্ট হইতে পারে;

ব্রাহ্মণাদি জাতি ভেদ জন্মগত না হইয়া ইহজন্মের কর্ম্ম ও গুণ গত হইলে ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র ও শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই এবং

এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ও ইহ জীবনের উগ্র কঠোর মহাতপস্যার অপূর্ব্ব সংমিশ্রনের ফল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে মহা তপস্যা করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ছিলেন, ইহ জীবনের উগ্রকঠোর তপস্যার গুনেই জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্র ভিন্ন আর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণ চরুতে জন্মলাভও ব্রাহ্মণত্ব* লাভের পক্ষে আর একটী প্রকৃষ্ট কারণ। গাধিরাজের কন্যাকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। সত্যবতী ও তাঁহার ক্ষত্রিয় মাতা পুত্র কামনা করিয়া মহর্ষি ঋচীককে যজ্ঞ করিতে বলেন। সেই যজ্ঞে সত্যবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ ও তাঁহার মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয় পুত্র লাভের জন্য যথা ক্রমে ব্রাহ্ম মন্ত্রে ও ক্ষত্রিয় মন্ত্রে চরু প্রস্তুত হয়। কিন্তু চরু বিপর্য্যয় করিয়া একের চরু অপরে ভক্ষণ করেন। ঋষি চরু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—জানিতে পারিয়া সত্যবতীকে কহিলেন দুই গর্ভে দুই বিপরীত সন্তান জন্মিবে। সত্যবতীর অনুনয়ে ঋচীক কহিলেন তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইবে না তোমার পৌত্র রুদ্র ভাবাপন্ন হইবে। সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি এবং তাহার ক্ষত্রিয়মাতার গর্ভে ব্রহ্ম চরু হইতে বিশ্বমিত্রের জন্ম লাভ ঘটিয়াছিল। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম রুদ্রভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

যাহারা এইক্ষণ উচ্চজাতির পদবী ও অশৌচ গ্রহণ করিয়া মনে করিতেছেন যে তাঁহারা উচ্চ জাতি হইতেছেন তাহারা নিশ্চয়ই ভগবানের কথিত আসুরী সম্পদ লাভ করিয়াছেন ইহা আত্মোন্নতির কারণ না হইয়া অধোগতির কারণ হইয়াছে। (১) এজন্য ভগবান্ ১৮শ অধ্যায়ে অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিয়া আত্মোন্নতির উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা এক্ষণ মিথ্যা আত্মাভিমান ও অহঙ্কার রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য সাজিতেছি? কেহই আর স্বধর্ম্মে সন্তুষ্ট নহে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণের স্বভাব জাত শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা প্রভৃতি গুণ লাভ করিবার চেষ্টা সকল জাতিই করিতে পারে। ইহাতে অন্য জাতি লাভের অভিমান করার কোন আবশ্যক হয় না।

---

(১) অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
গীতা ১৬।১৮

অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত ও অসূয়াকারী অসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণেঽব্রবীন্মনু॥

মনু ১০।৬৩

অহিংসা, সত্য ব্যবহার, অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণের প্রবৃত্তিরাহিত্য, শুচিত্ব (বাহ্য ও অন্তর), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই কয়টী ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম।

এখন সাধন ভজন, ভক্ষ্যাভক্ষের বিচার, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অর্জ্জনের স্পৃহা উঠিয়া গিয়াছে—আছে অহঙ্কার ও অভিমান। ইহা দ্বারা আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিবর্ত্তে আমাদের মরণের পথ সুপ্রশস্ত হইতেছে। একটি অশিষ্ট অবিনীত দল সৃষ্টি ও একতার পরিবর্ত্তে গৃহে গৃহে বিরোধবহ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে। সৃষ্ট জগত মাত্রই মুক্তি লাভের অধিকারী সন্দেহ নাই কিন্তু লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উচ্চাধিকার লাভ করার ব্যবস্থা কোন হিন্দু শাস্ত্রে নাই। হিন্দুর ইহাই বৈশিষ্ট্য, সে জন্যই হিন্দুর মধ্যে প্রকৃতিগত বর্ণ ভেদ থাকিলেও ঈর্ষা দ্বেষ ছিল না। সামাজিক সামঞ্জস্যই হিন্দুর বিশেষত্ব। এখন এই যে ঈর্ষা দ্বেষের আবির্ভাব ও দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে তজ্জন্য আমাদের কুশিক্ষাই দায়ী।

দেবী ভাগবত সকলের প্রতি আশ্বাস বাণী দিতেছেন

মানুষেষু মহারাজ! ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্তত:।
ন তথান্যেষু ভূতেষু মনুষ্যরহিতেম্বিহ॥
উপভোগৈরপি ত্যক্তং নাত্মানং মাদয়েন্নরঃ।
চণ্ডালত্বেঽপি মানুষ্যং সর্ব্বথা তাত শোভনম্॥
ইয়ং হি যোনিঃ প্রথমা যাং প্রাপ্য জগতী পতে।
আত্মা বৈ শক্যতে ত্রাতুং কর্ম্মভিঃ শুভ লক্ষণৈঃ॥

মনুষ্যের যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মের ঠিক ঠিক প্রবৃত্তি হয়, মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণীতে তেমন হয় না। অত্যন্ত দীন হইলেও মনুষ্যের অবসাদগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ চণ্ডাল হইলেও মনুষ্য যোনি অপর যোনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাই প্রথম যোনি যাহা প্রাপ্ত হইয়া শুভ কর্ম্ম করিতে করিতে মুক্তি পদ লাভ করিতে সমর্থ।

নিজ নিজ বর্ণোচিত স্বধর্ম্মে থাকিয়া চিত্ত-শুদ্ধি ও চরিত্রের উৎকর্ষতা লাভ করাই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়। এজন্যই ভগবান্ স্বধর্ম্মে থাকিবায় ব্যবস্থা দিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

গীতা ৩ অঃ ৩৫ শ্লোক

স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ, এজন্য স্বধর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক প্রকৃতি নির্ম্মল করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কেননা স্বকর্ত্তব্য পালন জন্য স্বর্গাদি লাভ হয়। পরধর্ম্ম উত্তম হইলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধতা বশতঃ তাহা শুভ ফলদায়ী হইবে না। যে ঔষধটী একজন রোগীর ধাতু বিশেষের পক্ষে উপযোগী তাহা অন্য ধাতু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে অহিত কারক। স্থানান্তরে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোক ভগবান্ এই কথারই আবৃত্তি করিয়াছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূত সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর সচরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম্ম দ্বারা (স্বকর্ম্মণা) তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের দ্বারা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। পরধর্ম্ম আশ্রয় করিলে হইবে না। এজন্য পরের শ্লোকে বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥

মনুষ্যের যাহা স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম তাহা যদি জাতির কর্ম্মাপেক্ষা নীচও হয় তথাপি তাহার পক্ষে তদপেক্ষায় উহাই শ্রেয়স্কর জানিবে, কেননা স্বভাবজ কর্ম্ম সাধন করিলে মানুষকে পাপ ভাগী হইতে হয় না।

অন্য জাতির দৃষ্টান্তে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উধাও হইবার প্রচেষ্টা অতি অর্ব্বাচীন মূর্খের কার্য্য। এখন কথা উঠিয়াছে নূতন পদবী গ্রহণ করিয়া ও অশৌচ কমাইয়া নূতন জাতিতে পরিণত না হইলে আমরা পিছাইয়া পড়িব।

এই ভাবে জাতীয় উন্নতি লাভ করা যায় না। শিক্ষা বিস্তার করুন, বরপণ রহিত করুন, জাতীয় প্রেম বিস্তার পূর্ব্বক দুঃস্থজনের সেবা ও সাহায্য করুন, দেশের জল নিকাশের পথ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পাদন করুন, বালক ও যুবকদিগের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রবর্ত্তন করুন, বালকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টতা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করুন, স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পালন করিবার পক্ষে সৎশিক্ষা প্রদান করুন দেখিবেন জাতীয় উন্নতি আমাদের করতলগত হইবে ও আমরা অন্য জাতির সম্মানার্হ হইব। বাহ্যিক চাকচিক্যে আত্মোন্নতি হয় না— চিত্তশুদ্ধিই আত্মোন্নতির একমাত্র সোপান। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা" হইয়া পর ধর্ম্মের বাহিরে খোলস গ্রহণ করিলে আমাদিগকে পতিত হইতে হইবে। স্বধর্ম্মে নিরত থাকাই চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা।

যাহারা জাতিভেদ মানেন না এবং তাহা উঠাইয়া দিতে চাহেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এ প্রবন্ধে সে বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয় নাই।

যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রমোশনের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং নিজ নিজ কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন তাহাদের নিকট কয়েকটী কথা উপস্থাপিত করা হইল। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকগণ স্বধর্ম্মে ও কুলাচারে থাকিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

রায় শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত বাহাদুর গৌহাটী।

সাধু সঙ্গে আমি কে, সংসারাড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হয় সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তায় রত থাকেন। সৎসঙ্গে এইরূপ বিচারে তাঁহারা আর অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না এবং কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হন না। তাঁহারা দৃঢ় নিশ্চয় করেন সংসারে যাহা প্রিয় কিছু আছে, সমস্ত প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ময়ূর যেমন মেঘের অনুগামী হয় সেইরূপ ক্ষণ-স্থায়ী সমস্তই ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সৎসঙ্গ ও সাধুর অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। অহংকার, বাহ্যদেহ ও পুত্রমিত্রাদি ত্যাগ করিয়া সত্য স্বরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তু দর্শনে নিমগ্ন হওয়াই উচিত। অনিত্য দেহের ভাবনা ত্যাগ করিয়া নিত্য চিৎ যিনি তাঁহার ভাবনাই শ্রেয়ঃ। সূত্রে যেমন মুক্তা গ্রথিত থাকে সেইরূপ এক চিৎবস্তুতে এই ত্রিভুবন গ্রথিত।

যৈব চিৎ ভুবনাভোগে ভূষণে ব্যোম্নি ভাস্করে।
ধরাবিবরকোশস্থে সৈব চিৎ কীটকোদরে ॥ ১৮ ॥

যে চিৎ এই বিশাল ভুবনে, আকাশে, সূর্য্যে, ধরাবিবরকোশে অর্থাৎ পাতালে সেই চিৎ অতি ক্ষুদ্র কীটে বিদ্যমান।

কুম্ভব্যোম্নাং ন ভেদোস্তি যথেহ পরমার্থতঃ।
চিতো শরীরসংস্থানাং ন ভেদোস্তি তথানঘ ॥ ১৯

ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের সঙ্গে মহাকাশের যেমন কোন ভেদ নাই সেইরূপ জীবশরীরাবচ্ছিন্ন চিত্তের সঙ্গে পূর্ণ অনবচ্ছিন্ন চিত্তের কোন ভেদ নাই। একই চিৎ সর্ব্বশরীরে ও শরীরের বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তিক্ত কটু কষায়—এ সমস্ত রসের পার্থক্য থাকিলেও সকল জীবের অনুভব যেমন একরূপ সেইরূপ দেহ সমূহ ভিন্ন হইলেও চিৎ বা চৈতন্য একই বস্তু। যখন একমাত্র সত্য চৈতন্য সর্ব্বত্র অবস্থিত তখন ইহা জন্মিল ইহা মরিল এবম্প্রকার বুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র। যাহা উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয় তাহা বস্তু নহে। যাহা দেখিতেছ তাহা সৎ বস্তুতে অসতের প্রতিবিম্ব, তাহা সৎও নহে অসৎও নহে—তাহা মায়িক, তাহা অনির্ব্বাচ্য। যতদিন জ্ঞান না হইতেছে ততদিন অপ্রশান্ত চিত্ত জগৎটাকে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিতেছে। বস্তুতঃ ইহা

সৎ বা বিদ্যমান। কিন্তু মোহ না থাকিলে অর্থাৎ জ্ঞান হইলে সর্প যেমন রজ্জুতে লয় হইয়া যায়—রজ্জুই থাকে সর্প থাকেই না সেইরূপ যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্মরণ করা যায় সমস্তই অসৎ —অবিদ্যমান। মোহজাল নিতান্ত অসৎ একেবারে নাই। যাহা নাইই তাহার আবার জ্ঞানের দ্বারা নিরাস কি হইবে? অতএব দৃশ্য সমূহ মোহেরই কারণ। জগৎ যখন অসৎ—নাইই তখন আবার মোহ কি? মোহের কারণ ত দেখা যায় না। রাম! তুমি জনন মরণ স্থিতি সমস্তই মায়িক জানিয়া আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা শান্তভাবে অবস্থান কর। ভিতরে শান্ত থাকিয়াও বাহিরে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হওয়া যায়।

স্থিতি ৬২ সর্গঃ।

মোক্ষোপায় বর্ণন।

বশিষ্ঠদেব—যাঁহারা ধীর—বাহিরের ও ভিতরের দ্বন্দ্ব সহ্য করিবার শক্তি যাঁহাদের জন্মিয়াছে, যাঁহারা বিচারবান্—যাঁহারা আমি কি এবং জগৎ কি এই বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা প্রথমেই বুদ্ধিবলে "শাস্ত্রেণ বিদুষা শাস্ত্রং সুজনেন বিচারয়েৎ" শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সুজনের সহিত—অর্থাৎ যাঁহারা শিষ্যের অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন এমন গুরুর সহিত শাস্ত্রাবলম্বনে শাস্ত্রের অর্থ বিচার করিবেন। বিষয় তৃষ্ণাশূন্য মহাপণ্ডিত সুজনের সহিত বিচার করিয়া মনোনাশ করিতে পারিলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষদাদি শাস্ত্রের অর্থ, সৎকর্ম্ম সদাচার সম্পন্ন সুজন গুরুর সঙ্গে সৎসঙ্গ করিতে করিতে নিরন্তর বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইতে পারিলেই পুরুষ, তোমার মত হে রাম! আপনাকে আপনি জানিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন। রাম! তুমি উদার, পবিত্র আচার সম্পন্ন, ধীর সমস্ত সৎগুণের আকর তোমার আর সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনরূপ মনোমল নাই এজন্য তোমার কোন দুঃখও নাই। তুমি এখন মেঘশূন্য

শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছ। তোমার এখন কোন প্রকার সংসার ভাবনা নাই, তুমি উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার মন সমস্ত বাহ্যার্থ চিন্তা ত্যাগ করিয়াছে, এবং অন্তরে পরমাত্মার সহিত ক্ষীরোদকবৎ একীভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মাকারে পরিণত হইয়া মুক্ত পুরুষের অনুভব সিদ্ধ কল্পনায় স্থিত বলিয়া—তোমার মন যে মুক্তই হইয়াছে এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। মানুষ সকল এখন তোমার দৃষ্টান্তে রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া তোমার চেষ্টারই অনুসরণ করিবে।

বহির্লোকোচিতাচারা বিহরিষ্যন্তি যে জনাঃ।
ভবার্ণবং তরিষ্যন্তি ধীমন্তঃ পোতকান্বিতাঃ॥ ৮

ইঁহারা বাহিরে লৌকিকব্যবহারপরায়ণ হইয়া বিচরণ করিলেও সংসার তরণের উপায় স্বরূপ আত্মজ্ঞানরূপ পোতে আরোহণ করিয়া ভবসমুদ্র পার হইয়া যান। তোমার তুল্য মতি যাহার হয়, তোমার মত যিনি সুজন ও সমদর্শী, তিনিই, আমার নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান দৃষ্টিলাভের যোগ্য।

দেহ যতদিন থাকিবে ততদিন তুমি রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া বাহিরে লোকাচার পরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে যেন এষণাত্রয় না থাকে অর্থাৎ ধনৈষণা, পুত্রৈষণা এবং লোকৈষণা না থাকে। তুমি গুণশালী মহাপুরুষের শান্তি লাভ কর; শৃগালধর্ম্মী অর্থাৎ স্বার্থসাধনতৎপর পরবঞ্চক হইও না; শিশুধর্ম্মী অর্থাৎ যথেষ্টচারী মূঢ় হইও না, ইহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার বিচার করিওনা—ইহারা উপেক্ষার পাত্র। শুদ্ধ সাত্ত্বিক জন্মা জীবন্মুক্ত পুরুষের যে স্বভাব অর্থাৎ শমদমাদি গুণ তাহা অর্জ্জন করিতে পারিলে সাধারণ পুরুষও ক্রমে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরম জীবন্মুক্ত শরীর প্রাপ্ত হইতে পারে। জীব এই জন্মে যে জাতিগুণ সম্পন্ন হয় পরজন্মে ঐ সমস্ত জাতিগুণ তাহার মধ্যে ক্ষণকাল মধ্যে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতিগুণ সেবনে উৎকৃষ্ট জাতিতে জন্ম হয় নিকৃষ্ট জাতিগুণ সেবনে নিকৃষ্ট জন্ম হয়। মানুষ আপন আপন কর্ম্মবশেই প্রাজ্ঞ ভাব সমূহ প্রাপ্ত হয়। নিকৃষ্ট জাতিতে

জন্মিলেও মোক্ষলাভের জন্য পুরুষকার অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নীতিশাস্ত্রানুসারি পৌরুষ বলেই প্রবল পরাক্রমশালী রাজাকে পরাজয় করা যায়। যে জাতিতে জন্ম হউক না কেন একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বনে বুদ্ধিকে পঙ্কমগ্ন গাভীর ন্যায় উদ্ধার করিবে ধৈর্য্য সহকারে বিষয় ভোগ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। অতএব হে রাঘব স্বচ্ছ চিত্তমণিতে—চিত্তস্ফটিকে যে অবস্থান তাহাতেই তন্ময়ত্ব বৈভব এবং ইহাই উত্তম পৌরুষ। যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা পুরুষকার বলেই সাত্বিক শুভজাতিত্ব লাভ করিতে পারেন।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা ক্বচিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যন্নাপ্নোতি গুণান্বিতঃ ॥১৮

এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে বা দেবগণের নিকটে এইরূপ দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই যাহা গুণান্বিত মনুষ্য পৌরুষ প্রযত্নে লাভ করিতে না পারেন। ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, প্রবল বৈরাগ্য এবং যুক্তিযুক্ত পৌরুষ —এই সমস্ত না হইলে কখনও নিজের ইষ্ট যে আত্মতত্ত্ব তাহা লাভ করা যায় না।

সকল লোকের আত্যন্তিক দুঃখোপশম অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তিরূপ মঙ্গলময় যে আত্মতত্ত্ব তাহা তুমি মহাসত্ত্বগুণান্বিত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া পুরুষকার অবলম্বনে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বীতশোক হও, এবং তোমার অনুসরণে অপরেও ক্রমে বিগতশোক হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে। হে রামভদ্র তুমি বিবেকের মহামহিম সাত্বিকপদ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হও। তোমার শমদমাদি গুণগ্রাম পল্লবিত হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ সাত্বিক জন্মও তুমি লাভ করিয়াছ। এখন নিত্যসত্ত্বস্থ জীবন্মুক্ত জনগণের কর্ম্মে অর্থাৎ সপ্তজ্ঞান ভূমিকা পদে আরোহণ কর ভবসঙ্গরূপ মোহচিন্তা অর্থাৎ সংসার আসক্তিরূপ মোহচিন্তা তোমাতে যেন স্থান না পায়।

স্থিতি প্রকরণ সমাপ্ত।

২৩শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৪ সাল।

জাবাল দর্শনোপনিষদ্

বা

অষ্টাঙ্গ যোগ।

জাবাল দর্শনঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং
মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ—
নিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য
উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ও॥

দত্তাত্রেয়ো মহাযোগী ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
চতুর্ভুজো মহাবিষ্ণুর্যোগসাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ॥১
তস্যশিষ্যো মুনিবরঃ সাঙ্কৃতির্নাম ভক্তিমান্।
পপ্রচ্ছগুরু মেকান্তে প্রাঞ্জলির্বিনয়ান্বিতঃ॥২
ভগবন্ ব্রূহি মে যোগং সাষ্টাঙ্গং সপ্রপঞ্চকম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবাম্যহম্॥৩
সাঙ্কৃতে শৃণু বক্ষ্যামি যোগং সাষ্টাঙ্গদর্শনম্।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব তথৈবাসনমেব চ॥৪
প্রাণায়ামস্তথা ব্রহ্মন্ প্রত্যাহারস্ততঃ পরম্।
ধারণা চ তথা ধ্যানং সমাধিশ্চাষ্টমং মুনে॥৫
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চৈব যমাদশ॥৬
বেদোক্তেন প্রকারেণ বিনা সত্যং তপোধন।
কায়েন মনসা বাচা হিংসাহিংসা ন চান্যথা॥৭
আত্মাসর্ব্বগতোঽচ্ছেদ্যো ন গ্রাহ্য ইতি মে মতিঃ।
[illegible] চাহিংসা বরা প্রোক্তা মুনে বেদান্তবাদিভিঃ॥৮

চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈর্দৃষ্টং শ্রুতং ঘ্রাতং মুনীশ্বর।
তস্যৈবোক্তির্ভবেৎ সত্যং বিপ্র তন্নান্যথা ভবেৎ ॥৯
সর্ব্বং সত্যং পরং ব্রহ্ম ন চান্যদিতি যা মতিঃ।
তচ্চ সত্যং বরং প্রোক্তং বেদান্তজ্ঞানপারগৈঃ ॥১০
অন্যদীয়ে তৃণে রত্নে কাঞ্চনে মৌক্তিকেঽপি চ।
মনসা বিনিবৃত্তির্যা তদস্তেয়ং বিদুর্বুধাঃ ॥১১
আত্মন্যনাত্মভাবেন ব্যবহারবিবর্জ্জিতম্।
যত্তদস্তেয়মিত্যুক্তমাত্মবিদ্ভি র্মহামতে ॥১২
কায়েন বাচা মনসা স্ত্রীণাং পরিবিবর্জ্জনং।
ঋতৌ ভার্য্যাং তদা স্বস্য ব্রহ্মচর্য্যং তদুচ্যতে ॥১৩
ব্রহ্মভাবে মনশ্চারং ব্রহ্মচর্য্যং পরন্তপ ॥১৪
স্বাত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা।
অনুজ্ঞা যা দয়া সৈব প্রোক্তা বেদান্তবেদিভিঃ ॥১৫
পুত্রে মিত্রে কলত্রে চ রিপৌ স্বাত্মনি সন্ততম্।
একরূপং মুনে যত্তদার্জ্জবং প্রোচতে ময়া ॥১৬
কায়েন মনসা বাচা শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে।
বুদ্ধিক্ষোভনিবৃত্তির্যা ক্ষমা সা মুনিপুঙ্গব ॥১৭
বেদাদেব বিনির্মোক্ষঃ সংসারস্য ন চান্যথা।
ইতিবিজ্ঞাননিষ্পত্তির্ধৃতিঃ প্রোক্তা হি বৈদিকৈঃ।
অহমাত্মা ন চান্যোঽস্মীত্যেবমপ্রচ্যুতা মতিঃ ॥১৮
অল্পমৃষ্টাশনাভ্যাং চ চতুর্থাংশাবশেষকম্।
তস্মাদ্ যোগানুগুণ্যেন ভোজনং মিতভোজনম্ ॥১৯
স্বদেহমলনির্মোক্ষো মৃজ্জলাভ্যাং মহামুনে।
যত্তচ্ছৌচং ভবেৎ বাহ্যং মানসং মননং বিদুঃ।
অহং শুদ্ধ ইতি জ্ঞানং শৌচমাহর্মনীষিণঃ ॥২০
অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥২১
জ্ঞানশৌচং পরিত্যজ্য বাহ্যে যো রমতে নরঃ।

সি, সরকার

বি, সরকারের পুত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
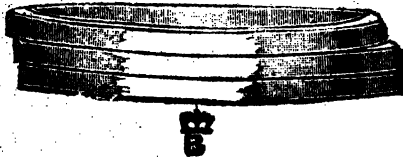
একমাত্র গিনি সোনার গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বালা ও নেকলেস ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের গহনার পান মরা হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন।

শ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে।

মুল্য ১৲ একটাকা।

"উৎসবে" ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, স্থিতি প্রকরণ চলিতেছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাঁহাদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিয়া লইব।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

হিন্দু সৎকর্ম্মমালা।

বরাহ নগর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বাদশ খণ্ডে পূর্ণ।

ইহাতে হিন্দুসমাজের প্রয়োজনীয় প্রায় যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড, ব্যবস্থা টীকা টীপ্পনী অনুবাদ এবং অনুষ্ঠান প্রণালী বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছে। মূল্য ও সুলভ প্রতিখণ্ড চারি আনা মাত্র। নূতন সংস্করণে সন্ধ্যা ও গায়ত্রীতত্ত্ব, গ্রহতত্ত্ব এবং শ্রাদ্ধ ও পরলোক তত্ত্ব প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ শাস্ত্রীয় তত্ত্বব্যাখ্যা বড়ই প্রয়োজনীয়।

প্রাপ্তি স্থান—

মহেশ লাইব্রেরি।

১৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

"উৎসবের" নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য।৴০ আনা। নমুনার জন্য।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

[illegible] বর্ষ।] চৈত্র, ১৩৩৫ সাল। [১২শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মুল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
[illegible] মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধুপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীচন্দ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক।

১৩৩৫ সালের বিজ্ঞাপন।

শ্রীভগবানের কৃপায় "উৎসব" আগামী বৈশাখ মাসে চতুর্ব্বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। "উৎসবে" যেভাবে "ত্রিপুরা রহস্য," "যোগবাশিষ্ট," জাবালঃ দর্শনোপনিষদ এবং অন্যান্য প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছিল সেই ভাবেই প্রকাশিত হইবে। অনেকের ইচ্ছায় আমরা গৌড়পাদীয় "অলাত শান্তি" প্রকরণ ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। পরম পূজ্যপাদ ভার্গব শ্রীশ্রীশিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বহু সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লেখা আছে। তাঁহার লেখা পাঠে যদি কেহ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে উহা প্রকাশ করিতে পারিব আশা করি।

"উৎসব" পত্র আমরা নানা চেষ্টা করিয়াও মনের মত চালাইতে পারিতেছি না। এখন দেখিতেছি শুধু আমাদের নিজের চেষ্টায় হইবে না। এই জন্যই আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহোদয়দিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি, তাঁহারা দয়া করিয়া যেন আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য এই পত্রের বহুল প্রচারের চেষ্টা করেন।

"উৎসব" পরিচালনায় নানা কারণে আমাদের ভ্রম ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতে পারে। আমাদের প্রার্থনা, গ্রাহক মহোদয়গণ যেন আমাদিগকে এই কার্য্যের সেবক বোধে ক্ষমা করেন।

নববর্ষের অগ্রিম চাঁদার জন্য ১ম সংখ্যা "উৎসব" **১৫ই বৈশাখ হইতে ভি, পি, ডাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিব।** যাঁহারা বুক পোষ্টে কাগজ লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন চৈত্র সংখ্যা পাইয়াই দয়া করিয়া মনিঅর্ডারে চাঁদা ৩ৎ পাঠাইয়া দেন। ভি, পি, ডাকে কাগজ লইলে ৵০ অধিক লাগিবে এবং ২য় সংখ্যা পাইতে বিলম্ব হইবে। কারণ ভি, পি, পির সমস্ত টাকা আদায় না হইলে ২য় সংখ্যা পাঠান হয় না।

এই বৎসরের টাকা যাঁহারা পাঠান নাই, আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই সংখ্যা পাইয়াই টাকা পাঠাইয়া দেন, নচেৎ আমরা আগামী বর্ষের কাগজ পাঠাইতে পারিব না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী বর্ষে যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া এই সংখ্যা পাইয়াই আমাদিগকে সংবাদ দিয়া বাধিত করেন। কারণ ভি, পি, পি ফেরৎ দিলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। ইতি

বিনয়াবনত—**শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়**

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ

// উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৩শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩৫ সাল। { ১২শ সংখ্যা

বর্ষ বিদায়ে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে বঙ্গে নারীমঙ্গল।

(প্রথম দিন)

স্ত্রী—বঙ্গে বহু সংসারে এই যে অসন্তোষ—এই যে অশান্তি ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ?

স্বামী—সকল প্রকার দুঃখেরই প্রতিকার আছে। করিলেই হয়।

স্ত্রী—আহা! লোকে আজকাল বড় কষ্ট পাইতেছে। যাহাদের অর্থের অভাব তাহাদের জ্বালা ত শত প্রকারের। যাহাদের অর্থ স্বচ্ছলতা আছে তাহাদেরও ত বহুপ্রকারের ক্লেশ দেখা যাইতেছে। সংসারে ত প্রায় কাহারও সুখ নাই। ছেলে মেয়ে বাপ মাকে মানে না। ছেলে মেয়ের কঠিন কথা সাপের বিষ অপেক্ষা হৃদয় জ্বালাইয়া তোলে। বধূ শাশুড়ীর কথা শোনে না—শাশুড়ীও বধূকে ঠিক পথে চালাইতে পারেন না, স্বামী-স্ত্রীর বনিবনাও হয় না, পুত্রগণ পিতাকে ফাঁকি দিয়া পিতার সম্পত্তি নিজের করিয়া লইতে চায়—ভাই ভাই ত কথাই নাই—মামলা মোকদ্দমা—

স্বামী—কত আর বলিবে—সবই ত স্বচক্ষে দেখিতেছি।

স্ত্রী—বলনা—কি উপায়ে এই অশান্তি দূর হয় ?

স্বামী—তোমার সংসার পূর্ব্বে কি ছিল আর এখন ?

স্ত্রী—তাইত। মন তখন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকিত—এখন কিন্তু সকল অবস্থাতেই আমি সন্তুষ্ট হইতে শিখিয়াছি—ইহা কিন্তু তোমার কৃপায়।

স্বামী—আমার কৃপায় নহে—আর একজনের কৃপায় ইহা হইয়াছে।

স্ত্রী—তা যাই হউক—এখন দুঃখ দূর করিবার উপায়ের কথা বল।

স্বামী—এই যে পরিবার মধ্যে সকলেই অসন্তুষ্ট ইহার কি কোন কারণ নাই ?

স্ত্রী—বহু সংসারে দেখি স্ত্রী বলে আমার স্বামী অতিশয় স্বার্থপর, নিজের সুখটি নিজের সুবিধাটি হইলেই হয়—আর সব মরুক বা বাঁচুক তার খবর নাই। আপনারটি ষোল আনা চাই—অন্য সংবাদ নাই।

স্বামী—আর স্বামী কি বলে ?

স্ত্রী—তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি। স্বামী বলে যে দিন হইতে বিবাহ হইয়াছে তার দিন কতক পরেই দেখিয়াছি আমার সুখ আর হইতেই পারে না। সর্ব্বদাই অসন্তোষ, সর্ব্বদাই বিবাদ, সর্ব্বদাই রাগ আর আমার উপর রাগ করিয়া পুত্রকন্যাকে প্রহার। সকলের উপর কর্কশ ব্যবহার। গুরু লঘু কেহ নাই। কাহারও কথা গ্রাহ্য করা নাই। স্ত্রীও সেইরূপ। কেন এমন স্থানে বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া পিতামাতার উপর দোষারোপ। এই সমস্তই প্রায় গৃহে দেখিতেছি। যাহারা কিছু ধীর তাহারাও মনে মনে বিরক্ত হইয়া অতি কষ্টে সংসারের কাজ করে মাত্র। আজকালকার সংসার দেখিলে মনে হয়, আহা! মানুষের দুঃখের অবধি নাই। বল ইহার প্রতিকার কি ?

স্বামী—দুঃখে পড়িয়া যাঁহার দিকে চাহিলে ইহার প্রতিকার হয় তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন মানুষকে সন্তুষ্ট রাখিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। আর একজনের কৃপাও চাই কিন্তু সেই কৃপা পাইবার জন্য মানুষকেও ত কিছু করিতে হয়।

স্ত্রী—বল দেখি মানুষ কি করিবে ?

স্বামী—দেখ এই যে তোমার ভাগ্যে এইরূপ ঘটিতেছে এত দুঃখ আসিতেছে, এইরূপ স্থানে বিবাহ হইয়াছে, এইরূপ বনিবনাও হইতেছে না ইহার কারণ কি কিছু নাই। মানুষ যে দুঃখ পায় তাহাতে কি অপরের দোষ সমস্ত ? নিজের কোন অপরাধ নাই ?

স্ত্রী—নিজে নিজের কর্ম্ম অনুসারে মানুষের সুখদুঃখ আইসে এই ত বলিতে যাইতেছ ?

স্বামী—কথা ত তাহাই। সুখ বা দুঃখের দাতা কেহই নাই। নিজের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই দুঃখরূপে আইসে। আর ঐ যে মানুষ মনে করে—ইহা না হইয়া যদি অপরের সহিত মিলন হইত তবে ত আমি সুখী হইতে পারিতাম। ইহাই মানুষের অতিশয় ভ্রম। মানুষ কর্ম্মসূত্রে গাঁথা হইয়া আছে—ইচ্ছা করিলেই কি মনের মত সব হয় ? মনের মিলন একবারে হয় না, ইহার জন্য আর একজনের আজ্ঞামত চলিতে হয়, তবে তাঁহার দয়া পাওয়া যায় তখন মানুষ দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া সুখী হইতে পারে। সুখই আসুক বা দুঃখই আসুক—সহ্য করিতে না শিখিলে মানুষের শান্তি হইতেই পারে না। তুমি নিজে যে কর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছ তাহা কি অন্য কেহ অর্জ্জন করিয়া দিতে পারে ? সন্তুষ্ট মনে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। তবে এক-দিন দেখিবে যে যেমনটী চাও তাহাই সে দিতেছে।

স্ত্রী—ইহা ত বুঝিতেছি—যে সহ্য করিতে চেষ্টা না করে সে কখন সংসারে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু সহ্য করাও ত বড় দুষ্কর কর্ম্ম।

স্বামী—তাহার জন্যইত উপদেশ।

স্ত্রী—কি করিবে ?

স্বামী—যখন তোমার কর্ম্মফলেই সুখ বা দুঃখ আইসে তখন তোমাকে মনে রাখিতে হইবে যে যখন সুখ ভোগ হইতেছে তখন তোমার পূর্ব্বকৃত পুণ্যক্ষয় হইতেছে আর যখন দুঃখ আসিতেছে তখন তোমার পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এইভাবে সুখেও বেহুঁস হওয়া চাই না আর দুঃখেও অধীর হওয়া উচিত নহে।

স্ত্রী—ইহা মনে রাখা কি সহজ ?

স্বামী—না সহজ নহে। এই জন্যই ত যিনি তোমায় সংসারে কর্ম্মক্ষয়ের জন্য পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে ডাকিতে হয়।

স্ত্রী—তাইত। ভগবানকে দূরে ফেলিয়া দিয়া যাহারা সংসার করিতে যায় তাহারা ত কষ্টই পাইবে।

স্বামী—তাহাই ত হইতেছে। কোন কিছু দিয়া মানুষকে সুখী করা যায় না। সকল মানুষের ভিতরেই আনন্দের আধার আছেন। নিজে ভিতরের

আনন্দ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্যই ভগবানকে ডাকা চাই। ভগবানকে ডাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় করা যাইবে না। মানুষ এই দিকে চেষ্টা করুক আর দেখুক মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে "বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথাপাতি লয়" সেইরূপে দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারে কি না। দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে তিনি ত ভাল অবস্থা আনিয়া দেন ইহা মানুষ পরীক্ষা করিরা দেখুক। যে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারে না তার পাপই ঈশ্বরকে ডাকার একমাত্র প্রতিবন্ধক। এইরূপ ব্যক্তিও যদি শাস্ত্রমত তিন সন্ধ্যায় একটু একটু বসিতে অভ্যাস করে আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুঃখের প্রতিকারের জন্য তাঁরে ডাকিতে ডাকিতে প্রার্থনা করে —অনেক পাপ করিয়া ফেলিয়াছি, অনেক অপরাধ হইয়া গিয়াছে, তুমি ক্ষমা কর —ক্ষমা করিয়া আমাকে তোমার দাস বা দাসী বলিরা একবারটি গ্রহণ কর তবে আমার জীবন সার্থক হইবে। এই জন্যইত বলি দুঃখ যে সে দেয় তাহাও প্রাণকে কাতর করিরা তাহার দিকে চাহিবার জন্য। ইহা না করিয়া যে নিজের নিজত্ব ছাড়িতে চায় না তাহার ফলে নিজের বৈধব্য টানিয়া আনে। তার পরে বৈধব্য কেন হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

১৩৩৫ শেষে মায়ের উদ্দেশে কথা।

জগৎ প্রসবিনী তুমি --জগজ্জননী তুমি। যাহাকে আমরা বর্ষ বলি তাহা তোমার উপরে কতকগুলি ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব। বর্ষ তাহার সমস্ত ঘটনা লইয়া তোমার স্পন্দনস্বরূপে ডুবিয়া গেল—আমরা বলিলাম বর্ষ শেষ হইল। যে ঘটনা ডুবিল তাহা আবার কোন কল্পে এইরূপ যোগাযোগে আবার আসিবে —একই ঘুরিয়া ফিরিয়া আইসে—চিরদিন এইরূপ আসিতেছে—চিরদিন এইরূপই আসিবে।

এ সব কথা বলিয়া কি হইবে? একটা কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি এই জগৎজীবের মা তবে আমারও মা। শাস্ত্রে শুনি তুমি তোমার পুত্র কন্যাকে কখন পরিত্যাগ করনা। পুত্রের জন্য ধ্রিয়া মা পলায়ন করেন না।

মা সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকেন। সৃষ্টির সময়ে মা—স্থিতিতে মা—আবার সংহারেও মা। শাস্ত্রে শুনিলাম মাত্র—বিচার করিয়া কতক কতক বুঝিলাম মাত্র। ইহাতে কথঞ্চিৎ বুদ্ধির তৃপ্তি জন্মিল সত্য—তাহাতেও আমার হইল না। বুদ্ধি জুড়াইলেও আমার সব জুড়াইয়া গেল না। আমার বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই যদি জুড়াইয়া যাইত তবে ত আমার হইত। কিন্তু বুদ্ধি স্থির হইলেও হৃদয় গলিয়া যায় না কেন? তুমি যে আমারও মা তাহা কি আমি অনুভব করিলাম? তোমার কোলে আমি যে নিরন্তর আছি তাহা আমার অনুভবে কতটুকু আসিল? তোমার ক্রোড়ে থাকিয়াও আমার স্বভাব কেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল না? কেন আমার পাপ গেলনা? কেন আমার অপরাধ পদে পদে হইতে লাগিল? বুঝিলাম—আমার মা বলা—তোমাকে মা বলা—ইহা হৃদয় দিয়া হইল না।

এখন জিজ্ঞাস্য তোমার ক্রোড়ে আমি সর্ব্বদা আছি এই অনুভব আমার সর্ব্বদা থাকিবে কিরূপে? শুধু বিচারে নয় অনুভবেও। অনুভবে আনিতে পারিলেই সিদ্ধি—যতদিন সিদ্ধি না আসিতেছে ততদিন সাধনা ত চাই? এই সাধনা কিরূপে করিতে হইবে তাহার আলোচনাই করিতে ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেও তোমার করুণার প্রয়োজন।

আমির—আমার অন্তরের শুদ্ধি না হইলে তোমার করুণার—তোমার অনুগ্রহের দৃঢ় ধারণা আমার আসিবে না। "আমি" যখন যাহার সঙ্গ পায় তখন তাহার সহিত মিশিয়া তাহাই হইয়া হৈ হৈ করে। আমিটা সর্ব্বদাই মিশে মনের সঙ্গে। মনের সঙ্গে মিশিয়া এমন ভাবে মিলিয়া যায় যেন মনই হইয়া যায়। মনের সহচর ইন্দ্রিয়াদি। ইহারা সর্ব্বদা বাহিরে ইহাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। বাহিরে বাহির হইলেই মহামায়ার মোহ রাজ্যে আসিয়া পড়ে তখন কেবল প্রতারণায় নিরন্তর জ্বলিতে পুড়িতে থাকে—শান্তি কিছুতেই পায় না। কিন্তু যদি তোমার করুণায় মন যাহার উপর নাচিতেছে তাহার দিকে একটু ফিরিতে পারে তবে আর একটা অপূর্ব্ব জগৎ ইহার চক্ষে খুলিয়া যায়। তবেই কথা হইতেছে মনকে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু ফিরিবে কিরূপে? ফিরেনা কেন? মন ফিরেনা—ইহা অশুদ্ধ বলিয়া। অশুদ্ধও যে হয় ইহা তোমাকে না দেখিয়া—তোমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া। প্রথম কথা তবে হইতেছে তোমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূর করিতে হইবে। দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে, শাস্ত্র প্রদর্শিত পথে তোমার ধারণা করিয়া পুনঃ

পুনঃ তোমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তোমার আজ্ঞা পালনে যত্ন করিতে হইবে।

তোমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা কিরূপে হইতেছে আর যাইবেই বা কিরূপে? বলিতেছি।

মা তুমি জগজ্জননী—তুমি জগদম্বা। কিন্তু তুমি ত মহামায়া। এই সম্বন্ধে মহামায়াই প্রশ্ন তুলিয়াছেন মহাদেবের নিকটে। শক্তি যদি মায়াই হইল তবে

ভগবন্ দেব দেবেশ মিথ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ॥
শ্রদ্ধা ন জায়তে ক্বাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ।
দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো॥

মায়া ত মিথ্যা এই কথা সর্ব্বত্র শুনা যায় তবে শক্তি বা মায়শ্রিতা দেবীর উপাসনা করিয়া মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে কিরূপে? মিথ্যা যাহা তাহাতে ত কখন শ্রদ্ধা জন্মেনা। হে প্রভো! দেবীর উপাসনাও ত মায়াশ্রিতা বলিয়া শুনা যায়।

এই প্রশ্নের উত্তরে দেবাদিদেব বলিতেছেন—

নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে ক্বচিৎ।
মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যং উপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্॥

সুমুখি! আমি কখন মায়াকে উপাসনা করিতে হইবে বলি নাই। মায়া যে চৈতন্যের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন সেই চৈতন্যের উপাসনার কথাই বলিয়াছি।

দেবীভাগবতে দেবাদিদেবের এই তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রয়োগ সাগর তন্ত্রের কথা একটু আলোচনা করিতে হয়। প্রয়োগ সাগরে পাওয়া যায়—"শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্মৃতা" ইতি। শক্তি যখন শিবোন্মুখী হয়েন তখন তিনি পুরুষ হইয়া যান—শিব হইয়া যান। শক্তির অস্তিত্ব স্পন্দনে। এই স্পন্দশক্তি বহির্মুখে নাচিয়া নাচিয়া মোহ বিস্তার করিয়া জগৎ রচনা করেন। কিন্তু যখন ইনি চৈতন্যমুখী হয়েন তখন পরমশান্ত চিন্ময় পুরুষকে স্পর্শ করিবামাত্র—শিবকে আলিঙ্গন করিয়া মাত্র আর তাঁহার স্পন্দনাত্মিকা বৃত্তি থাকে না। শান্তকে স্পর্শ করিয়া তিনি শান্তই হইয়া যান।

শান্তশক্তিও যাহা চৈতন্যও তাহাই। এইখানে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ; মায়া ও চৈতন্য এক—এখানে দুই নাই এক চৈতন্যই থাকেন। যদি বলিতে হয় বল—শক্তি নিগুর্ণা হইয়া আপন পূর্ব্ব স্বভাব—স্পন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া তুরীয়ভাবে অবস্থান করেন। তুরীয়—নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপরে স্বভাবতঃ যখন তাঁহার শক্তির স্ফুরণ হয় তখন নিগুর্ণ ব্রহ্মই শক্তি মণ্ডিত হইয়া সগুণ ব্রহ্ম হয়েন। নিগুর্ণাশক্তিকে বা তুরীয় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।

চৈতন্যের যে শক্তি তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। যোগিনী তন্ত্রে দশম পটলে পাওয়া যায়—

স্বপ্রকাশং মহা দেবি! ব্যাপ্যব্যাপক বর্জ্জিতম্।
নাধেয়ঞ্চৈব নাধারমদ্বিতীয়ং নিরন্তরম্।
ইদং হি সকলং দেবি! সর্ব্বং মায়াময়ং পুনঃ।
মিথ্যৈব সকলং দেবি! সত্যং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥

ব্রহ্ম আপন স্বরূপে স্বপ্রকাশ। হে মহাদেবি—ইনি এই অবস্থায় ব্যাপ্যও নহেন, ব্যাপকও নহে। যখন তিনি আপনি আপনি থাকেন—যখন নিগুর্ণ ভাবে থাকেন তখন ত আর কিছুই নাই—ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব থাকিবে কোথা হইতে? ইঁহার তখন কোন আধারও নাই, কোন আধেয়ও নাই। আর কিছুই নাই—তিনি কাহাকে ধরিয়া থাকিবেন, কাহার দ্বারাই বা ধৃত হইয়া থাকিবেন? আপন আধারে আপনিই আধার—আপনিই আধেয়। সর্ব্বদাই তখন ইনি অদ্বিতীয়—দ্বিতীয় কিছুই নাই। তারপরে যখন ব্রহ্মের স্পন্দনাত্মিকা শক্তি আপনা হইতে—স্বভাবতঃ তাঁহার উপরে স্ফুরিত হইল তখন তিনি শক্তিমণ্ডিত হইয়া হইলেন—সগুণ ব্রহ্ম। সূর্য্য কিরণে যেমন মরীচিকা ভাসে সেইরূপ ব্রহ্মের প্রভায়—ব্রহ্মের স্পন্দশক্তিতে জগৎ মরীচিকা তাঁহাতেই ভাসে, যেমন শুভ্রপটে চলচ্চিত্রের (বায়স্কোপের) ছবি ভাসে সেইরূপ। এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু দেখা যায় হে দেবি! সেই সমস্তই মায়াময়—মায়ারই খেলা মাত্র। এই সমস্তই মিথ্যা। সমস্ত ভাসমান বস্তুই মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য। বেদ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া তন্ত্রেও ইহা পাওয়া যায়, বেদান্তে ইহা পাওয়া যায়, যোগবাশিষ্ট মহারামায়ণে, ভাগবতে

চণ্ডীতে, গীতাতে, অধ্যাত্মরামায়ণে সর্ব্বত্রই ইহা পাওয়া যায়। সত্য মিথ্যার বিচার যিনি করিতে পারেন, আচারবান্ হইয়া, অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি দেখিতে শিখিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন একমাত্র সত্য বস্তু এই পূর্ণ চৈতন্যই আর সমস্তই—যাহা চৈতন্যের উপর ভাসিতেছে তাহা তাহার মায়াকৃত—তাহা মিথ্যা। শক্তি ত ব্রহ্মেরই প্রভা। শক্তি আমরা ধরিতে পারি স্পন্দন দিয়া। এই স্পন্দন যখন বহির্ম্মুখে প্রধাবিত হয় তখন ইনি জগৎ বিস্তার করেন—তখন শক্তি মোহ উৎপাদন করেন। মমতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া—"আমি" "আমার" রূপ মোহগর্ত্তে পড়িয়া জীব নিরন্তর দুঃখ ভোগই করে। যাঁহারা মহামায়া কে, ইহা বুঝাইতে গিয়া ব্যাখ্যা করেন "জগন্মাতা মহা-মায়া যখন তাঁহার সন্তানসন্ততি লইয়া সংসার ক্রীড়ায় রত থাকেন তখন তিনি জীব সকলকে মোহে নিপাতিত করিয়া রাখেন" তাঁহার এই মিথ্যার, এই অজ্ঞানের ক্রীড়াকেও যে ভাল বলিতে চান ইহা তাঁহাদের অতি ভক্তি। ফলে অবরণীয় 'ভর্গ' কোনকালে উপাস্য নহেন। রজস্তমঃকে পরি-বর্জ্জন করিয়া সত্ত্বগুণের প্রকাশ ধরিয়া চৈতন্যোন্মুখী হইতে পারিলে অজ্ঞানের হস্ত হইতে—পাপের কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শক্তি শিবোন্মুখী হইলে শক্তি যাহা হয়েন তিনিই উপাস্যা। বরণীয় ভর্গই উপাসনার বস্তু—অবরণীয় ভর্গ নহেন।

মা তোমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা কিরূপে হয় তাহার কথা তোমার কৃপায় কথঞ্চিত আলোচনা করা হইল—ইহাতে দেখান হইল- মানুষের পাপ কোথা হইতে হয়—ইহা গীতাতেও বলা হইয়াছে।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ বলপূর্ব্বক তাহাকে পাপ কর্ম্মে নিযুক্ত করে—অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে?

যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন জগন্মাতা নিজ সন্তান সন্ততি লইয়া রঙ্গ করেন মাত্র—মায়ের রঙ্গে যে ছেলে যাতনায় ছটফট করে, ইহা কিন্তু মায়ের কার্য্য নহে—যাতনা দেওয়া মায়ের স্বভাব নহে। মায়ের রজস্তমোগুণই মৃত্যুমুখে লইয়া যায় এই স্বভাবে মায়ের উপাসনা নাই। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহপাপ্মা বিদ্ধেনমিহ বৈরিণম্॥

অর্জ্জুন! পুরুষের পাপাচরণের হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা কাম—আর কাম প্রতিহত হইলে যাহা হয় তাহাই ক্রোধ। এই কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা মহাশন—ইহাদের ক্ষুধা কিছুতেই পূর্ণ হয় না—ইহারা অপূর্ণোদর—ইহাদিগ হইতেই অত্যুগ্র পাপ আচরিত হয়—ইহারা সংসারে পরম শত্রু। যা কোন কালেই শত্রু নহেন।

ভারতের সুপুত্র ও সুকন্যা কাহারা।

মানব জীবনে শ্রীশ্রীচণ্ডীর আবশ্যকতা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে মানুষ যতদিন সংসারে ডুবিয়া থাকে ততদিন শ্রীভগবানে একাগ্র হইতে পারেনা। সংসার ও ভগবান্ তবে পরস্পর বিরোধী। লোকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি মানুষ সংসার করিবে না? ভারতের ঋষিগণ উপদেশ করেন যে, সংসার তোমার কর্ম্মের ফলে আসিয়াছে, তুমি যখন সংসার করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া উঠ, যখন সংসারের স্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া তুমি ইহা হইতে মুক্ত হইতে চাও তখনও তুমি সংসার ছাড়িতে পারনা। পরে তোমাকে মরিতে হয়। তখনও কিন্তু তোমার কর্ম্ম তোমায় ছাড়েনা। শত সহস্র গাভীর মধ্য হইতে গোবৎস যেমন আপনার জননীর নিকটে ছুটিয়া যায় সেইরূপ তুমি যেখানেই থাক, যাহার মধ্যেই থাক কর্ম্ম তোমাকে বাছিয়া লইবে এবং কর্ম্ম তোমার অনুসরণ করিবেই। তোমার কর্ম্মফল তোমায় ভোগ করিতেই হইবে। ঐ যে প্রশ্ন করিতেছিলে তবে কি মানুষ সংসার করিবে না ইহার এই মাত্র উত্তর পাওয়া গেল যে তুমি ইচ্ছা করিয়া সংসার করনা—তোমার কর্ম্মে তোমাকে সংসার করায়। এই

অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্যই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিলেন "তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ। মানুষ সংসার-স্নেহের দুঃখ জানে তথাপি মহামায়ার মোহশক্তিতে আমি আমি আমার আমার এই বুদ্ধি আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মোহগর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংসার স্থিতির কারণ হয়।

অবিদ্যাবৃতা চিৎস্বরূপা মহামায়ার প্রভাবেই তবে জীব মোহ প্রাপ্ত হইয়া সংসার করে। মেধস ঋষির উপদেশ বুঝিবার জন্য রাজা পুনরায় ছয়টি প্রশ্ন করিলেন।

(১) কা হি সা দেবী মহামায়া·· সেই দেবীমহামায়া—কে ?
(২) কথমুৎপন্নসা—কি প্রকারে তিনি উৎপন্ন হন ?
(৩) অস্যাঃ কর্ম্ম চ কিম্ –ইহার কার্য্যই বা কি ?
(৪) যৎস্বভাবা চ সা দেবী—ইঁহার স্বভাব কি ?
(৫) যৎস্বরূপা –ইঁহার স্বরূপ কি ?
(৬) যদুদ্ভবা—কাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব ?

সুরথ রাজার এই ছয়টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর শ্রীশ্রীচণ্ডী খুলিবার কুঞ্জী বা চাবী। শুধু চণ্ডীর চাবী নহে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিবার উপায় পাওয়া যায় এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে। শ্রীশ্রীচণ্ডী ধারণা করিবার কথা পরে বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাইবে, এইক্ষণে এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন কেমন করিয়া হয় তাহাই বলা যাইতেছে।

প্রথম কথা—বেদ বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম বা মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করা—অজ্ঞান মুক্তির আর অন্য পথ নাই। যাঁহারা ভারতের বাহিরের জ্ঞান গুরুর পদাশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে কেহ জানিতে পারেনা—কেহ জানেও না কারণ ঈশ্বর চির অবিদিত এবং তাঁহাকে কখন জানা যাইবে না। চির অবিদিত ঈশ্বর আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ইহা বিশ্বাস করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া অজানা ঈশ্বরের পশ্চাৎ ছুটিতে

থাক—কেবল চল, কেবল চল—এই ভাবে চলিতেই থাক—কখন এই চলা তোমার শেষ হইবে না—ইত্যাদি। এই যে শিক্ষা এ শিক্ষা ভারতের নহে—এ শিক্ষা বিদেশী পণ্ডিতের শিক্ষা। ইহাতে পণ্ডা বা আত্মবিষয়িনী বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা চিরদিন ভারতের শিক্ষার দোষ দিয়া থাকেন, ভারতের আচার ব্যবহার নিতান্ত দুষ্ট বলিয়া থাকেন তাঁহারাই এই মতের পোষকতা করেন। এই সকল ব্যক্তি বেদও মানিতে পারেন না। বেদ বা শ্রুতি যে কাহারও রচিত নহে বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদই যে ব্রহ্ম ইহাও তাঁহাদের অভারতীয় বুদ্ধিতে কখন উদিত হইতে পারে না—কারণ তাঁহারা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিয়া মনকে গঠন করিয়াছেন তাহাতে ঋষিগণের সূক্ষ্ম বিচার বুঝিবার সামর্থ্যই জন্মে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ২৬ খণ্ডে ৭ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" উপদেশ শুনিয়া সুবিধাধর্ম্মী যাঁহারা তাঁহারা যে বলিবেন আহারের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব নাই—ইহা বালকেও বুঝিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম আহার শুদ্ধি না হইলে বেদের "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইহা সুবিধাবাদী যাঁহারা তাঁহারা মানিতেই পারিবেন না। যাহা তাহা আহার করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে ব্রহ্মকে পরমাত্মাকে বা ঈশ্বরকে জানা যায়, পাওয়া যায়, তাঁহাদের ভারতীয় সংস্কার থাকায় তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন মাত্র, কিন্তু রাজনৈতিক পথে চলিতে গিয়া তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও নিজের জীবনে নানা প্রকারে শাস্ত্র লঙ্ঘনে স্বার্থ সাধন করেন। এবিষয়ে অধিক বলিবার আর প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তিনি এইরূপ লোক দিয়াও অমঙ্গলের মধ্য-দিয়া মঙ্গলই আনয়ন করেন।

এখন আমারা বেদের "তমেব বিদিত্বা"তে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা কিরূপে আসিতেছে তাহাই দেখাইব।

বেদ বলিতেছেন ব্রহ্মকে জান; শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজাও মেধস ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। ব্রবীতি—ইত্যাদি অর্থাৎ ভগবন্ সেই দেবী, কে? যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন? মহামায়াকে জান—চণ্ডীর প্রথম কথা এই। এখানে প্রশ্ন উঠিবে মহামায়া ও ব্রহ্ম কি একই বস্তু যে বেদের কথাও চণ্ডীর কথা এক হইল? সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা হইতেছে ভারতে যে দেবীর উপাসনা

হয় তিনিই ব্রহ্ম। কিরূপে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তদুত্তরে আমরা বলি— পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি—যে দেবী অর্থে শক্তি, এই শক্তিই মহামায়া। এই মহামায়া আপন স্পন্দশক্তি দ্বারা জগৎ রচনা করেন আবার যখন তিনি চৈতন্যোন্মুখী হন তখন তিনি স্ত্রী থাকেন না, পুরুষ হইয়া যান। তন্ত্রে স্ত্রীর নাম শিবা আর পুরুষের নাম শিব অথবা এই শিব ও শিবাই হইতেছেন চৈতন্য ও শক্তি। প্রয়োগ সাগরে বলা হইয়াছে "শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতা" ইতি। স্পন্দরূপিণী জগন্মাতা যখন পরম শান্ত, সর্ব্ববিধ চলন রহিত, শ্রুতি যাঁহাকে বলেন "অনেজদেকং"—এই পরম শিবকে স্পর্শ করিতে প্রধাবিত হয়েন তখন তাঁহাকে এই জগতের খেলা গুটাইয়া লইতে হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নির্ব্বাণ প্রকরণের উত্তর খণ্ডের ৮১ অধ্যায়ের ১০২ শ্লোকে মহাপ্রলয়ে প্রলয়তানন্দমগ্না, ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিষধর ভুজঙ্গ সকল গ্রাসকারিণী ভগবতী কালরাত্রিরূপিণী এই মহাদেবীর অতি ভীষণ নৃত্যের কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—

> ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা ঝম্যঝম্যং প্রঝম্যং
> নৃত্যন্তী শব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
> পূর্ণং রক্তাসবানাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায় পাণৌ
> পায়াদ্ বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যা॥

যোঃ নিঃ উ ৮১।১০২।১৩৩

ঐ মহাগ্রন্থের ঐ প্রকরণের অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে শিবোন্মুখী শক্তির কথা আবার বলা হইয়াছে—

> বদ্ধা খড়্গাঙ্গশৃঙ্গে কপিলমুরুজটা মণ্ডলং পদ্মযোনেঃ
> কৃত্বা দৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
> যা দেবী ভুক্তবিশ্বা পিবতি জগদিদং সাদ্রিভূপীঠমত্যং
> সা দেবী নিষ্কলঙ্কা কলিততনুলতা পাতু নঃ পালনীয়ান্॥

যোঃ নিঃ উঃ ১৩৩।৩০॥

আমরা বলিতে যাইতেছি বেদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামায়া তিনিই। উপরের দুইটি শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রলয়-তানন্দবিহ্বলা শিব স্পর্শনোন্মত্তা দেবী চণ্ডীর আরও একটু সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের কালরাত্রিস্বরূপিণী দেবীর নৃত্য বর্ণনায় শ্লোক দুইটী সাধকের বড়ই আনন্দের কণ্ঠহার।

ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহামায়ার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—অবিদ্যাবৃতা চিৎ-স্বরূপা, নিখিল সংসারচিত্রে দেদীপ্যমানা, বিদ্যাবলে অবিদ্যা-মালিন্য দূরীভূত হইলে নির্ম্মল প্রশান্ত আকাশস্বরূপিণী—বিশাল শরীরী ভৈরবী দেবী অনন্ত-আকাশব্যাপিনী হইয়া অতি ভৈরবরূপী কল্পান্ত-রুদ্রের পুরোভাগে নৃত্য করিতেছেন। আর কল্পান্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া নিখিল সংসার বনভূমি দগ্ধ করিয়া স্থাণু মাত্রে অবশেষ করিতেছে। প্রচণ্ড নৃত্যাবেশে দেবী প্রবল প্রলয় বাত্যা-বিধূনিত অরণ্যশ্রেণির ন্যায় দুলিতে-ছেন আর নৃত্য করিতে করিতে আকাশের ন্যায় ভীষণদেহ-কল্পান্তরুদ্রকে অর্চ্চনা করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে কল্পান্তরুদ্রদেবও দেবীর ন্যায় বিশাল শরীর ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

হে শ্রোতৃবর্গ! যে দেবি রক্ত ও মাদকদ্রব্যে পূর্ণ যম মহিষের মহাশৃঙ্গ হস্তে ধারণ করিয়া ডিম্ব ডিম্ব সুডিম্ব পচ পচ ঝম্য ঝম্য প্রঝম্য ইত্যাদি তাল ব্যঞ্জক শব্দ বাদ্যে নৃত্যপরায়ণা, যে দেবী গলদেশে মুণ্ডমালার মালা পরিয়া শোভমানা, যে দেবী গরুড়ের পক্ষ দ্বারা শিরোভূষণ করিয়াছেন, প্রলয়ে জগদ্-ভক্ষণ করিয়া কালরাত্রিরূপিণী যে দেবী প্রলয়আনন্দবিহ্বলা, সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে যে মহাভৈরবকে অর্চ্চনা করিতেছেন—কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্য-মান সেই মহারুদ্র—হে শ্রোতৃবর্গ তিনি তোমাদের জ্ঞান-প্রতিবন্ধক দোষ সকল নিরাস করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

হে ভৈরব! হে কালরুদ্র! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ডিম্বকে, অনর্থভোগের উপাধি স্বরূপ এই স্থূল শরীরাদি প্রপঞ্চবর্গকে ভক্ষণ করিয়া থাক [আঝম্য—ঝমু অদনে] পরে ডিম্বকে—সূক্ষ্ম শরীরাদি প্রপঞ্চকেও ভক্ষণ কর [ঝম্যং]; পুনরায় সুডিম্বকে—মূলোপাধিভূত কারণ শরীরকেও চরম সাক্ষাৎকারে তত্ত্ব আবির্ভূত করিয়া প্রঝম্য—সম্যগরূপে—নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া থাক। ভক্ষণ করিয়া পঞ্চমাদি যোগভূমিকা রোপণ করিয়া, সহসা অতি শীঘ্র পচ পচ—সপ্তমভূমিকা পর্য্যন্ত সম্যকরূপে পরিপাক করিয়া থাক। কালরাত্রি কর্ত্তৃক বিদেহ-কৈবল্য দ্বারা তুমি স্তূয়মান। আহা! এই নৃত্যপরায়ণা কালরাত্রির সহিত আমরাও তোমাকে নমঃ করি—ন মম—আমার কিছুই নাই—সব তোমার অনুভব করি। তুমি আমাদের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ সকল নিরাস করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

সর্ব্বশরণ্যা কালরাত্রিস্বরূপিণী ময়ূরী মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড কোটি বিষধর সমূহকে গ্রাস করিয়া যখন নৃত্য করেন তখন উঁহার রূপ কি ভীষণ! যে দেবী মহাকল্পান্তে সংহৃত পদ্মযোনি ব্রহ্মার কপিলউরুজটামণ্ডল খড়্গাগ্রশৃঙ্গে বন্ধন করেন, যে দেবী দৈত্যগণের মস্তক দ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া আপন গলদেশে ঝুলাইয়া রাখেন, যে দেবী সংহৃত গরুড়ের পর্ব্বতাকার পক্ষ দিয়া শিরোভূষণ করেন, যে দেবী বিশ্বের প্রাণিজাত ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বত ও ভূপীঠের সহিত এই জগৎ পান করেন, এইরূপে সর্ব্বনাশকারিণী হইয়াও যিনি নিষ্কলঙ্কা—দোষ লেশ শূন্যা, শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপা, যে দেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কলিত-তনুলতাশরীর স্বীকার করেন, আহা! হরিহরব্রহ্মাদি বন্দিতা সেই দেবী অবশ্য পালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মহামায়ার এই যে পরিচয় তাহাতে কি পাওয়া গেল? পাওয়া গেল ইনি অবিদ্যামণ্ডিতা চিৎস্বরূপা। ইঁহার অবিদ্যানৃত্যে জীবের মোহ কিন্তু চিৎস্বরূপে ইনি পূর্ণচিৎকে স্পর্শমাত্রেই ইনি সেই ব্রহ্মরূপেই অদ্বৈতা। তখন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। একমাত্র তিনিই আছেন। সমস্ত অবিদ্যা ইহাঁরই প্রভায়—ইহাঁরই অঙ্গে ভাসে। স্পন্দনাত্মিকা এই মায়া আবরণ সরিয়া গেলে মহামায়াই ব্রহ্মরূপিণী।

এই যে ছয়টি প্রশ্নে সুরথ রাজা শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বেদে "তমেব বিদিত্বা" তে এই কথাই লক্ষ্য করা হইয়াছে; সর্ব্বশাস্ত্রেই "বিদ্মহে"র উপদেশ প্রথমে। তাহার পরে ধীমহি। শাস্ত্র বলেন "দেবে পরিচয়োনাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ।"

প্রথমে পরিচয়, পরে পূজা, পরে দর্শন, শেষে দর্শনে অভীষ্ট সিদ্ধি। "তমেব বিদিত্বা" তে শ্রুতি নির্গুণ—সগুণ ব্রহ্মের পরিচয় লইতে বলিতেছেন। এই জন্য ভারতের নরনারী যেখানে যে আছে তাঁহারা যাঁহারই উপাসনা না করুন তাঁহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতে হয়। বৈদিক গায়ত্রীতে খণ্ড চৈতন্যকে অখণ্ড চৈতন্য দেখাইবার জন্য যাহা করিতে হয় তান্ত্রিক গায়ত্রীতে তাঁহারই রূপ, লীলা ও গুণ ধরিয়া সেই অখণ্ড চৈতন্যকেই ভাবনা করিতে হয়। উভয় উপাসনাতেই ধ্যান আছে। বৈদিক গায়ত্রীতে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই ভাবনা করিতে হয় ইনিই সৃষ্টিপ্রাক্কালে বিশাল গগনাঙ্গনে প্রণবরূপিণী ইনিই দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজমানা। ইনিই সেই ক্রীড়াশীল দীপ্তিশীল জগৎ প্রসবিতার উপাসনীয় 'ভর্গ', সর্ব্বদাই শিবোন্মুখী এই শক্তি পরম

চৈতন্যরূপিণী নিগু'ণ-সগুণ ব্রহ্মই। এস ইহাঁকে আমরা ধ্যান করি। ইনিই আমা-দিগকে গন্তব্যপথে লইয়া যান। এই বৈদিক গায়ত্রীও যাহা তান্ত্রিক গায়ত্রীতে যে মূর্ত্তির ধ্যান করিতে বলা হইতেছে—মূর্ত্তি অবলম্বনে সেই পরাচিন্ময়ীই তিনি।

আজ এই কলিযুগে আমরা "বিদ্মহের" মধ্যে যে পরিচয় লইবার উপদেশ আছে তাহার আবশ্যকতা তত দেখিনা বলিয়া আমাদের উপাসনার অনুষ্ঠান সমস্ত প্রাণহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এইজন্য ধ্যানও হয় না—"প্রচোদয়াৎ" তে আমরা পৌঁছিতেই পারি না। আমরা উপাস্যের যে পরিচয় লইয়া থাকি তাহা যেন মুখের কথায়। ঐ যে সঙ্গীতে বলা হইয়াছে যে—"তোমাতে আমাতে দুটো মুখের কথাতে হবে কিহে পরিচয়" এই বিলাপই যেন ঠিক। মুখের কথায় পরিচয় না লইয়া গুরু ও শাস্ত্রমত উপদেশ লইলে তবেই "তমেব বিদিত্বা" বা "বিদ্মহে"র কার্য্য করা হইবে।

বলিতেছিলাম (১) প্রথমেই শুনিতে হইবে—যাঁহার উপাসনা করি তিনি কে? (২) কি প্রকারে তিনি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন? (৩) তিনি কোন কর্ম্ম করিবার জন্য উৎপন্ন হন? (৪) তাঁহার স্বভাবটি কিরূপ? (৫) তাঁহার স্বরূপটি কি? (৬) কাহা হইতে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজার এই ছয় প্রশ্নের উত্তর যেমন দেওয়া হইয়াছে, বেদও এই জানাকেই সংসার সাগর অতিক্রম করার পথ বলিতেছেন, এতদ্ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই তাহাও বলিতেছেন।

যাহা চণ্ডীতে পাওয়া যায় তাহাই অন্য শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। ভগবান্ বাল্মীকি, রামায়ণের প্রথমেই এই "বিদ্মহের" কথা তুলিয়াছেন। দেবর্ষি নারদকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন

> কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
> ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্য বাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
> চারিত্রেন চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
> বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ॥
> আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যূতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
> কস্য বিভেতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

মানুষের মধ্যে এমন সর্ব্বগুণাধার পুরুষোত্তম কেহই নাই যিনি গাম্ভীর্য্যে—

অগাধাশয়ত্বে সমুদ্রের মত, ধৈর্য্যে হিমাচলের মত, যিনি মনে মনেও অধৃষ্য, ইষ্টবিয়োগেও অনভিভূতচিত্ত—রণস্থলে সর্ব্বপ্রকার সহায়শূন্য হইয়াও অটল, তেজে বিষ্ণুর সমান, পূর্ণচন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন, ক্রোধে প্রলয়াগ্নির মত, ধর্ম্মার্থে কুবেরের সমান, সত্যবাক্যে ধর্ম্মের মত; শুধু প্রেমময় নহেন কিন্তু অধর্ম্ম বিনাশে বজ্রাদপি কঠোর। মহাগ্রন্থ রামায়ণেও সুরথ রাজার পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

আবার রামায়ণে স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন উত্তর তাপনীতে এবং অধ্যাত্মরামায়ণে তাহা অতি স্পষ্ট। চৈতন্য ও শক্তি অথবা শিব শিবা যেমন জগতের মূলে সেইরূপ রাম সীতা ও ব্রহ্ম এবং অবিদ্যামণ্ডিত চিৎশক্তি। ত্রিপুরা রহস্যে যাহাকে বলা হইয়াছে—

"ওঁ নমঃ কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী।
বিরাজতে জগচ্চিত্র চিত্রদর্পণরূপিণী॥"

উত্তর তাপনীতে তাঁহাকেই বলা হইতেছে—

শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা॥

অধ্যাত্মরামায়ণে ভগবান্ শ্রীরামকে বলা হইয়াছে—

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানাং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

এই রাম নির্গুণ ব্রহ্ম। আর সীতা?

মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা॥

এই সীতাই পরচিন্ময়ী। অযোধ্যা নগরে জন্ম হইতে রামায়ণের সমস্ত ঘটনাই—এমন কি "মৎপাণিগ্রহণং" পর্য্যন্ত সমস্ত সীতাই করিয়াছেন। আর রাম—

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ—
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি॥

চণ্ডীতেও যে কথা রামায়ণেও তাই। গীতাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে ভাগবতেও ইহা।

দেখা গেল সর্ব্বশাস্ত্রে এক উপদেশই পাওয়া যাইতেছে—এই উপদেশ সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের মোহ দূর করিয়া কর্ত্তব্যহীনকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্যই। গীতাতে শ্রীভগবানের উপদেশ শুনিয়া অর্জ্জুন যেমন বলিয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

হে অচ্যুত! আমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার অনুগ্রহে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান—অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ধারণা করিতে পারিয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালনে স্থির নিশ্চয় করিলাম; আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে এখন তোমার আদেশ পালন ক'রব—সকল শাস্ত্রের লক্ষ্যই ইহা—সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই মোহ বিনাশ।

আমরা এখন সুরথরাজার প্রশ্নের উত্তরে মেধস ঋষি যাহা বলিলেন তাহার কতক আলোচনা করিয়া চণ্ডী পাঠ ক্রমের বিষয় বলিব।

মেধস ঋষি বলিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

সেই দেবীই নিত্যা; এই জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি; তিনিই এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার আবির্ভাব আমার নিকটে নানারূপে শ্রবণ কর। দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া লোকে অভিহিত হয়েন।

ঋষির এই উত্তরে রাজার দুই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আমরা আগামী প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে এই দুই প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করিব।

এই আলোচনার পূর্ব্বে আর একবার শ্রীচণ্ডীর আবশ্যকতা উল্লেখ করা উচিত বিবেচনা করি। আমার মন সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে চায় না—এই সার্ব্বজনীন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর অভ্যুদয়।

সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার সীমা কতদূর তাহাও অবগত হওয়া আবশ্যক। সাধারণ মানুষে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজনের উপর নিষ্ঠুর হওয়াকে সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া বলে। কিন্তু যাঁহারা ঋষিগণের উপদেশ কিছু জানিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই দেহকে আত্মা বোধ করাই প্রকৃত সংসার। যতদিন দেহকে আমি বলিয়া জানা থাকে, যতদিন দেহের সহিত সম্পর্ক থাকে ততদিন সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে; ফলে দেহে "আমি" "আমার" বোধ থাকে বলিয়াই স্ত্রীপুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। সংসার সুখদুঃখাদি সাধক।

জগতে যাহা কিছু দুঃখ তাহার মূল হইতেছে এই দেহ। দেহ জন্মায় কর্ম্ম হইতে। দেহে যে কর্ম্ম চলে তাহা পুরুষের অহংবুদ্ধি দ্বারা। অহংকার কিন্তু অনাদি। ইহা জড়। অহংকারের জন্ম হয় অবিদ্যা হইতে। ইহা চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা অগ্নিযোগে অয়ঃপিণ্ডের মত তপ্ত হইয়া—জড় হইলেও চিতের সহিত তাদাত্ম্যতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চেতন মত দাঁড়ায়।

আমি দেহ এই যে বুদ্ধি ইহা আত্মার অহং অভিমানেই জন্মে। দেহে অহং-বুদ্ধি হইতেই সংসার হয়—সংসারটা সুখ দুঃখাদি সাধক।

নির্ব্বিকার আত্মার তাদাত্ম্যতা সর্ব্বদাই মিথ্যা, জীব আমি দেহ আমি কর্ম্ম কর্ত্তা এই সঙ্কল্পে সর্ব্বদা কর্ম্ম করে।

ক্ষেপার ঝুলি।

(দ্বার ও পথ।)

চেলা। ঠাকুর বলিতে পারেন এবার মরিয়া কোথায় যাইব ?

ক্ষেপা। খুব পারি তুমি যদি আমার কথার সত্য উত্তর দাও।

চেলা। বলুন কি কথা।

ক্ষেপা। বলিতেছি—দেখ কাল ঠাকুরটী বলিয়াছেন যে নরকের বড় বড় তিনটা দরজা আছে, সেই তিনটা দ্বারের নাম "কাম ক্রোধ লোভ" তাহা ত্যাগ করিয়াছ কি বাপু ?

চেলা। আজ্ঞে তাহাত পারি নাই।

ক্ষেপা। এবার মরিয়া নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর কি প্রকারে নরকের দ্বার ত্যাগ করা যায় ?

ক্ষেপা। সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই কাম মরিয়া যাইবে, কাম মরিলেই ক্রোধ থাকিবে না। সকল বস্তুর অসারতা চিন্তা করিলে লোভ থাকে না। শাস্ত্র পথ অবলম্বন করিলে লোভ খুব সহজে নষ্ট করা যায়, ধর তোমার মাছ মাংসে খুব লোভ আছে কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে শাস্ত্রমত মাছ মাংস খাইবে; শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন অষ্টমী চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা সংক্রান্তি রবিবার দশমী একাদশী দ্বাদশী উভয় পক্ষের হিসাব করিয়া ১৬।১৭ দিন মাছ মাংস খাইতে নাই। অপ্রসাদী মাংসের কথাইত নাই এইরূপ শাস্ত্রমত চলিলে মাছ মাংসের লোভ স্বতঃই নষ্ট হইয়া যাইবে। শুধু লোভ বলিয়া কেন শাস্ত্রপথে চলিলে খুব শীঘ্র নরকের দ্বার তিনটা রুদ্ধ করা যায়। হাঁ আর একটা নরকের দ্বারের কথা ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"দ্বারং কিমেকং নরকস্য—নারী"

"কি এক নরকদ্বার রমণীরতন" বুঝিলে বাবা যতক্ষণ নারীতে আসক্তি থাকিবে ততক্ষণ পোঁটলা-পুঁটুলী বাঁধিয়া নরকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক যেমন মরিবে সঙ্গে সঙ্গে নরকে যাইবে। কি জান বাপু যতদিন মাতৃজাতিকে মাতৃমূর্ত্তিতে না দেখিবে—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, জানিয়া নম-

স্তস্থৈ নমস্তস্থৈ করিতে না পারিবে, যতদিন "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" ঠিক না হইবে ততদিন নিস্তার নাই, মরিলেই নরক এ সম্বন্ধে অলমিতি বিস্তরেণ।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর কে কোথা হইতে আসিয়াছে কেমন করিয়া জানা যায়?

ক্ষেপা। মানুষকে দেখিলেই বুঝা যায় কে কোথা হইতে আসিয়াছে নরক গত মানুষের চিহ্ন এইরূপ—

সরোগতা সাধু জনেষু বৈরং
পরোপতাপ দ্বিজ বেদ নিন্দা।
অত্যন্ত কোপ কটুকাচ বাণী
নরস্য চিহ্নং নরকে গতস্য॥

গর্গসংহিতা—অশ্বমেধ খণ্ড।

সরোগতা, সাধুজনে শক্রতা পরোপতাপ ব্রাহ্মণ ও বেদের নিন্দা, অত্যন্ত কোপ এবং কটুবাক্য যাহাতে দেখিবে বুঝিবে সে নারকী জীব। আবার স্বর্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের লক্ষণ শুনিবে—

স্বর্গাগতানামিহ জীবলোকে
চত্বারি চিহ্নানি সদাবসন্তি।
দান প্রসঙ্গো মধুরাচ বাণী
দেবার্চ্চনং ব্রাহ্মণ পূজনঞ্চ॥ ৪১

গর্গসংহিতা—অশ্বমেধ খণ্ড।

স্বর্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের এই চারিটী চিহ্ন থাকিবে দান প্রসঙ্গে মধুরবাণী দেবতার অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণের পূজা। গরুড় পুরাণে কর্ম্মবিপাকে নরকাগত ও স্বর্গাগত জীবের লক্ষণ কিছু বেশী দেখা যায় তাহা এইরূপ, নরকাগতের লক্ষণ পরনিন্দা কৃতঘ্নতা পরমর্ম্মাবঘাত নিষ্ঠুরতা নির্ঘৃণত্ব পরদার সেবা পরস্ব হরণ অশৌচ দেবতার নিন্দা বঞ্চনা কৃপণতা ইত্যাদি। স্বর্গাগতের লক্ষণ সর্ব্বভূতে দয়া পরলোকের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য এবং ভূতহিতকর বাক্য বেদ

প্রামাণ্য দর্শন গুরু, দেব ও ঋষিগণের পূজা কেবল সাধুসঙ্গ, সৎক্রিয়ার অভ্যাস ও মৈত্রী। বাবা এই লক্ষণগুলি বেশ করিয়া জানিয়া রাখ কাহার কোথা হইতে শুভাগমন হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

চেলা। আর যায় কোথা—দেখিলেই চিনিয়া লইব, আচ্ছা ঠাকুর যেমন নরকে যাইবার দ্বার আছে, সেইরূপ স্বর্গে যাইবার দ্বার ত আছে ?

ক্ষেপা। আছে বৈ কি সাতটা দ্বার আছে—

তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ
হ্রী রার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা।
স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তঃ
দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্॥

মহাভারত।

তপ দান শম দম হ্রী সরলতা সর্ব্বভূতে দয়া এই সাতটী স্বর্গের দ্বার। যে মানবে এই সাতটী দেখিবে বুঝিবে তিনি স্বর্গপথের যাত্রী। এই তপস্যা দানাদির কথা কাল ঠাকুরটী তাঁহার গীতায় বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর ধর্ম্মের কোন পথ আছে।

ক্ষেপা। আছে বৈ কি গো—

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি তপঃ সত্যংধৃতিঃক্ষমাঃ।
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মশ্চাষ্টবিধঃস্মৃতঃ॥

যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপস্যা সত্য ধৈর্য্য ক্ষমা অলোভ এই আটটী ধর্ম্মের পথ তুমি যদি ধার্ম্মিক হইতে চাও তাহা হইলে এই আটটীকে আশ্রয় করিবার জন্য প্রাণপণ কর, তুমি ধার্ম্মিক হইলে ধর্ম্ম তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। কাল ঠাকুরটী ধার্ম্মিককে বড় ভাল বাসেন, সেইজন্য ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত বার বার তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হয়। কখন কূর্ম্ম কখন বরাহ কখন নৃসিংহ কখন বামন কখন পরশুরাম কখন রাম কখন বলরাম কখন বা বুদ্ধ কখন কল্কীরূপ ধারণ করিতে হয়; কখন কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া আগমন করেন। এই সেদিন একটী তাঁহার জন্মদিন গিয়াছে এই ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেক কীর্ত্তিই করিয়াছেন। মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত হরিবংশ

বিষ্ণুপুরাণ গর্গসংহিতা এই সব গ্রন্থগুলিতে সেই কাল ঠাকুরটীর কীর্ত্তি কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ যদি এই গ্রন্থগুলি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া লীলাধ্যান করে তাহা হইলে লঘুপায়ে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ যুগে যুগে কাল ঠাকুরটীর যাতায়াত আছে বলিয়াই আজ ভারত অধ্যাত্ম রাজ্যের মুকুটমণি, জ্ঞানী ও যোগিগণের পুণ্য তপোবন॥

চেলা। ধর্ম্মের পথ শুনিলাম আচ্ছা ঠাকুর মোক্ষের পথ আছে।

ক্ষেপা। আছে বৈ কি যেমন নরকের তিনটা দ্বার তেমনি মোক্ষের তিনটা পথ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ॥
অধ্যাত্মরামায়ণম্।

কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এই তিনটী মোক্ষপ্রাপ্তির পথ।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি কাহাকে বলে।

ক্ষেপা। যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কাম জ্ঞানে যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্মযোগ। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞান। জ্ঞানের পথ বিচার, ব্রহ্ম কি আমি কি জগৎ কি জগৎ কোথা হইতে আসিল ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু আছে কি না এই সব বিচারের নাম জ্ঞান। এই বিচারের দ্বারা মানুষ সদ্যোমুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

চেলা। আর তাহা যাহারা না পারে।

ক্ষেপা। তাহারা ভক্তি পথ অবলম্বন করিবে। ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি ইহা শাণ্ডিল্য বলেন, নারদ বলেন "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা" ব্যাস বলেন "পূজাদিষনুরাগ", "কথাদিষনুরাগ" গর্গ, আরও ভক্তি সূত্র শুনিবে "সানুরাগ রূপা" স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধাতিরেকাদলৌকিকেশ্বরানুরাগরূপা" একথা অঙ্গিরা বলেন। শঙ্কর বলেন "আত্মানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধিয়তে" গোপাল তাপনী শ্রুতিতে দেখা যায় "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাশ্যে নামুষ্মিন মনঃকল্পনমেব তদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং" বুঝিলে?

চেলা। কিছু না আপনি সংস্কৃত ছাড়িয়া সহজ করিয়া বলুন।

ক্ষেপা। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদ সেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন এই নববিধা ভক্তি। এই ভক্তি সাধনে মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়। ভক্তি

লাভের আরও উপায় আছে—ভক্ত সঙ্গ, নিরন্তর ভগবান ও ভক্তের সেবা, একাদশীর উপবাস আদি, ভগবৎ পর্ব্বানুমোদন ইহার দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যাহার যেরূপ সংস্কার, সে বর্ত্তমান জন্মে সেই পথই গ্রহণ করিবে।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর, মোক্ষের দ্বার আছে?

ক্ষেপা। আছে বৈকি—মোক্ষের একটী দ্বার "নিঃসঙ্গ"। এই দ্বারে চারিজন দ্বারপাল পাহারা দিতেছে। সেই চারিজনের নাম শম, বিচার, সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, যদি এক জনেরও সঙ্গে কোন প্রকারে ভাব করিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আর কোন চিন্তা নাই, অনিবার্য্য মোক্ষলাভ করিবে। ইহারা এত শক্তি সম্পন্ন যে প্রত্যেকের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবার শক্তি আছে।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর যে শম বিচার সন্তোষ সাধুসঙ্গ কিছু পারে না তাহার মোক্ষলাভ করিবার কোন উপায় কি আপনার পুঁথিতে লেখা আছে। আপনাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু আমি যে আকুল পাথার দেখিতেছি। আমি যে ভক্তির সাধন জ্ঞানের সাধন কিছুই করিতে পারি না। আমি যে কোন প্রকারে নরক দ্বার রোধ করিতে পারিতেছি না। দিন দিন নরকের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। আমি কেমন করিয়া নিস্তার পাইব। বলুন, বলুন ঠাকুর আমার কি কোন উপায় আছে আমায় রক্ষা করুন আমি আপনার শরণাগত।

ক্ষেপা। আছে আছে উপায় আছে, সে বড় কঠিন কিছু নয়, দুইটী অক্ষর সর্ব্বদা উচ্চারণ করিলে আর কোন চিন্তা থাকিবে না, সব হইয়া যাইবে। একজন বিখ্যাত দস্যু সেই দুইটী অক্ষর জপ করিয়া (তাহাও বাস্তাক্ষর) ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থই এ কলিযুগে সাধন কুণ্ঠ জীবের লঘুপায়। সেই গ্রন্থ পাঠে শ্রবণে মননে মানব পরমগতি লাভ করে।

আর ঐ ক্ষেপা ঠাকুর শ্মশানে মশানে সর্ব্বদা সেই দুইটী অক্ষর জপ করিতেছেন। এক মুখে বলিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় পঞ্চমুখ হইয়া নাম করিতেছেন। ভোলা অবিরাম নাম করিয়া প্রেমে পাগল বাহ্যজ্ঞানশূন্য। নামের বলে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। আপনি অনুক্ষণ নাম লইয়া আছেন আর কাশীতে মুমুর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে নাম শুনাইয়া শুনাইয়া মুক্তি দিতেছেন।

আবার ইহার যিনি অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনি ত নামে পাগলিনী, এই ত গেল পাগল পাগলিনীর কথা।

আর একজন চারি মুখে অবিরাম ঐ অক্ষর দুইটী জপ করিতেছেন সেই জপের বলে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা।

আর একজন ঠাকুরটীকে বলিয়াছিলেন ঠাকুর তোমার নাম জপ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আমি যেন চিরকাল নামই জপ করিতে পারি অদ্যাপি যেস্থানে নাম হয় তিনি সেই স্থানে মস্তকে কৃতাঞ্জলি করিয়া সজল নয়নে আসিয়া নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন।

আর একজন স্ত্রীসর্ব্বস্ব ব্যক্তি ঐ অক্ষর দুইটী সম্বল করিয়া দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার সময় একখানি তরণী রাখিয়া গিয়াছেন সেই তরণীতে আরোহণ করিয়া কত কোটি কোটি হিন্দুস্থানবাসী মুক্তি পথে যাত্রা করিতেছেন।

ঠাকুরের অন্য নামের দুইটী অক্ষর জপ করিয়াই একজন ভক্তি বন্যায় এই বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। শুধু বঙ্গদেশ বলি কেন সে মহাপ্লাবনে কত মহাদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। নবদ্বীপ শান্তিপুর নীলাচল বৃন্দাবন সে প্লাবনে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সে অক্ষর দুইটীর অধিক কি পরিচয় দিব উপনিষদ্ পুরাণ কাব্য ইতিহাসাদি শাস্ত্র গ্রন্থ সকল যদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ তাহা হইলে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবে ঐ অক্ষর দুইটীই মুক্তির বীজ। যে যাহা চাহিবে সে তাহাই পাইবে। সে অক্ষর দুইটী কি জান "রাম" "কৃষ্ণ"—

শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপন্তি চ সর্ব্বদা।
তেষাং মুক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

এ নাম যাহারা জপ করে তাহারা যে ভুক্তি মুক্তিলাভ করিবে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই? যেমন জন্মিলে মরণ নিশ্চিত, যেমন দিনের পর রাত্রি নিশ্চিত, সেইরূপ সর্ব্বদা রাম নাম জপকারীর ভুক্তি মুক্তি নিশ্চিত, ভোগ প্রার্থনা করিতে হয় না। ভোগ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুণ্যক্ষয় করিয়া দিয়া যায়। সর্ব্বদা নাম কর নরকের দ্বার আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। নাম যে করে তাহার আর অজ্ঞাত কিছু থাকে না।

রাম নাম প্রভাদিব্যা বেদ বেদান্ত পারগা।
যেষাং স্বান্তে সদাভান্তি তে পূজ্যাভুবনত্রয়ে॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

এই রকম নামের দিব্যাপ্রভা বেদ বেদান্তের পার গমন করিয়াছে। যাহাদের হৃদয়ে এ নাম সর্ব্বদা থাকে তাহারা ত্রিভুবনের পূজ্য।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর একটী কথা বলিব?

ক্ষেপা। বল না কি কথা।

চেলা। যদি নামের দ্বারা সব হয় তাহা হইলে বেদ উপনিষদ্ সংহিতা পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রের কি প্রয়োজন?

ক্ষেপা। প্রয়োজন নামে অনুরাগ আনয়ন, কেমন করিয়া নাম করিতে হয়, নামের দ্বারা কি হয় নামীরস্বরূপ নামীর লীলা এই সব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শাস্ত্র না পড়িলে নামে অনুরাগ আসিবে কেন, নামে বিশ্বাস হইবে কেন, নামে ডুবিতে পারিবে কেন সেইজন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন। দেখ মানুষ ইচ্ছা করিলেই সদাসর্ব্বদা নাম করিতে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় সেই চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য স্মৃতি শাস্ত্র, কখন উঠিতে হইবে কিরূপ ভাবে স্নান সন্ধ্যা পূজা তর্পণ অতিথিসেবা গো সেবা করিতে হইবে কিরূপ আহার বিহার করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত ভগবন্ময় হয় স্মৃতি শাস্ত্র তাহাই বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। মানবের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে দিন যাপন করিতে হইবে স্মৃতি তাহা একটীও বাদ দেন নাই। কিরূপ বৃত্তি কিরূপ আচার বিচার গ্রহণীয় সবই বিস্তৃত ভাবে স্মৃতিতে লিখিত আছে। তুমি যদি পুরাকালের পচা আইন বলিয়া ঋষিবাক্য অবজ্ঞা কর তাহা হইলে তোমার চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, তুমি সর্ব্বদা নাম করিতে পারিবে না। অহরহঃ তুমিই জ্বলিতে থাকিবে। বুঝিলে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রয়োজন।

তাহার পর পুরাণ না থাকিলে লয় বিক্ষেপ ক্ষুব্ধ মনকে কে বলিত যে "মরা" "মরা" জপ করিয়া যখন রত্নাকর উদ্ধার হইয়াছেন, মৃত্যু কালে পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়া অজা মল পরমাগতি লাভ করিয়াছেন, তখন মন তোমার ভয় কি, তুমি যে কোন প্রকারে ডাকিয়া যাও তাহাতেই কাজ হইবে। তুমি তাঁহার কৃপা লাভে সমর্থ হইবে। ভগবান ভক্তকে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন পুরাণ না থাকিলে ইহা কে বলিত, সুপ্ত প্রাণকে জাগরিত করিবার জন্য কে শুনাইত অম্বরীষে রাজার অমৃত ময়ী কাহিনী। মহাভারত না থাকিলে কে শুনাইত দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ, কে শুনাইত দশ সহস্র শিষ্য সহ অভুক্ত দুর্ব্বাসার করে পাণ্ডবের পরিত্রাণ, কে শুনাইত পদে পদে পাণ্ডবের রক্ষা, কে বলিত মরণের পরপার হইতে পতি ভক্তি বলে সাবিত্রীর স্বামী আনয়ন। যে

গীতার সুমধুর ঝঙ্কারে আজ সমগ্র জগৎ মুখরিত কে তুলিত গীতার সে সুতান! শাস্ত্রের সমস্ত পরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই কিছু কিছু বলিতেছি মাত্র। পুরাণ না থাকিলে কে বলিত অস্ত্রে শস্ত্রে হস্তী পদ তলে গরলে অনলে সলিলে পর্ব্বত চাপনে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা। কে শুনাইত গজেন্দ্রমোক্ষণ, কে বলিত পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুবের অপূর্ব্ব হরিভক্তি। কে শুনাইত কৃষ্ণ সখা শ্রীদামের প্রতি ঠাকুরটীর কৃপার কাহিনী। কে বলিত মার্কণ্ডেয় নারদের ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণের ভগবদনুরাগ। কে শুনাইত হনুমান সুগ্রীব গুহক জটায়ু বিভীষণ শবরীর শ্রীভগবানের প্রতি অনন্যা ভক্তির কথা। সুখে দুঃখে অযোধ্যার রাজভবনে, নিবিড় কাননে,স্বামী সঙ্গে স্বামীবিরহে পঞ্চবটীবনে অশোক কাননে সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া কে শিখাইত ভক্তকে রাম রাম করিতে। সেইজন্য বলিতেছি—নাম করিবার জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন, শাস্ত্র না পড়িলে নামে অনুরাগ আসিবে কেন।

তাহার পর বেদ উপনিষদ না থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কে উপদেশ করিত, কে স্বরূপহারা জীবকে স্বরূপ দেখাইত, কে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কথা বলিত, এখন বেদ বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়া ঋষিগণ সংহিতা পুরাণের উপদেশ করিয়াছেন। ইতিহাস পুরাণ পঞ্চম বেদ, কোনটী ত্যাগ করিবার নাই।

উপনিষদ না থাকিলে কে বলিত "ঈশ্বরের দ্বারা সব আচ্ছাদন কর"। দেবাসুর সংগ্রাম ছলে কে জানাইত যাহা কিছু মহিমা সে তাঁহারই, তোমাদের কর্ত্তৃত্বের অভিমান মিথ্যা তৃণটী তুলিবার শক্তি পর্য্যন্ত তোমাদের নাই। কে বলিত সত্যকামের কাহিনী, শ্রদ্ধা ও তপস্যা দ্বারা তুষ্ট দেবগণের অযাচিত ভাবে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের ষোড়শ কলার উপদেশ দান। কে জানাইত একটীকে জানিলে সব জানা হইয়া যায়। বাবা, ত্যাগ করিবার কিছুই নাই—নিজ নিজ সাধনার অনুকূল শাস্ত্র আলোচনা না করিলে নামে একান্ত অনুরাগ আইসে না। মানুষ ব্রহ্ম সাগরে ডুবে একটী শব্দ লইয়া, যেখানকার শাস্ত্র সেই খানেই থাকে। কেবল সত্য নির্ণয় করিয়া একটীতে একাগ্র হইবার জন্য শাস্ত্র। ডুবিতে হইবে একটী শব্দে—ধর ওঁ—অ উ ম। বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র ছাড়িয়া গ্রহণ করিলে গায়ত্রী, গায়ত্রী ছাড়িয়া প্রণব শেষ পর্য্যন্ত তারপর অ কে উতে উকে মতে বিলোপ করিয়া তবে তুমি নিরোধ অবস্থালাভে সমর্থ হইবে। শাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝিলে ত?

চেলা। আজ্ঞা এতদিনে সকল কথার মীমাংসা হইল।

ক্ষেপা। তবে আর কি—যাহাতে সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পার এইরূপ শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন কর তাহাতেই কৃতার্থ হইবে। সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সর্ব্বদা।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সোহি সাক্ষাৎ রামাত্মকঃসুধী॥
অঙ্গিরস পুরাণ।

বুঝিলে বাবা চালাও রাম রাম।

লুব্ধা।

কিবা ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম,
নবীন নীরদ জিনিয়া বরণ
জান কি তাহার নাম।
তার মধুর বাঁশরী করে
হৃদয় মাঝেতে সতত ধ্বনিছে
অতীব মধুর স্বরে।
সখি সকলি মধুর তার
পরাণ ভুলান মধুর হাসিতে
হয়ে যায় একাকার।
তার এমন সুবাস গায়
পারিজাত ভ্রমে মন ভৃঙ্গ মোর
পড়ে রহে সদা পায়।
কিবা সুললিত গতি মরি
তাই ভয়ে ভয়ে থাকি অনুক্ষণ
যদি না ধরিতে পারি।

সখি মুরতি তাহার স্মরি'
হৃদয় আসনে বসায়ে যতনে
পূজিতে বাঞ্ছা করি।
সে যে পাগল করিল মোরে
মোহন বাঁশরী শুনেছে যে জন
রহিতে না পারে ঘরে।
কেহ জান কি তাহার ধাম;
জান যদি বল কোথায় যাইব
পূরিবে কি মনস্কাম;
তার উপমা নাহিক পাই
বিরহ বিধুর অধীর পরাণে
খুঁজি শুধু নানা ঠাঁই।

রাজসাহী।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

সাধুবাবার নিকট একদিন কৈলাস পাহাড়ে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন মানুষ নিজেকেই নিজে সকলের অধিক ভালবাসে। তার সুষুপ্তি অবস্থা প্রত্যেকের নিকটই অতিশয় আরামপ্রদ, সুতরাং উহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রার্থনীয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সেদিন যে গল্পটী বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—একস্থানে এক রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি পুত্র কামনা করিয়া বহু যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাপুরুষের কৃপায় ঐ রাজার একটী পুত্রসন্তান লাভ হইল। পুত্রকে রাজা অতি আদর যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং সে ক্রমে ক্রমে বড় হইলে রাজা তাহার নানাবিধ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্তানটী ক্রমে বেশ উপযুক্ত হইয়া বিবাহের বয়ক্রম প্রাপ্ত হইলে রাজা অতি আনন্দ সহকারে মহাসমারোহে তাহার বিবাহের আয়োজন

করিলেন। ঐ রাজকুমারের বিবাহ স্থির হইয়া গেল, তখন রাজা নানাস্থানে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিলেন। বহুদেশ হইতে রাজার অনেক বন্ধু বান্ধব রাজা মহারাজাগণ রাজধানীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের উপযুক্তরূপ অভ্যর্থনার জন্য রাজা সমস্ত দিবস নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া করিয়া তাঁহাদের সকল প্রকার সুবিধা হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করা এবং কখন কাহার কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে চিন্তা পূর্ব্বক সে সকল পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করা ও নিমন্ত্রিত বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধবদের যথোপযুক্ত-রূপ পরিতোষ সহকারে আহার করান ইত্যাদি ব্যাপারে সমস্ত দিবস যার পর নাই ব্যস্ত থাকায় অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর রাজা কার্য্যান্তে সন্ধ্যাবেলা শ্রান্ত কলেবরে অন্তঃপুরে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাজার অতি প্রিয় মহিষী নিকটে আসিয়া রাজার পদসেবা করিতে গেলে রাজা তাহা বারণ করিলেন। পুত্র মনে করিল পিতার সমস্ত দিবস ভালরূপ আহার হয় নাই, এখন পিতার আহারের প্রয়োজন, তন্নিমিত্ত সে পিতাকে আহারের জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত বিনীত ভাবে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। অমন প্রিয়মহিষীর সযত্নে সেবা কিম্বা প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্রের তাঁহাকেই আহার করাইবার জন্য সাগ্রহে আহ্বান, কিন্তু তখন কিছুই তাঁহার নিকট ভাল লাগিতেছিল না। পরিশ্রান্ত শরীর তখন সুষুপ্তিতেই অধিক তৃপ্তি ও আরাম বোধ করিতেছিল।

দেশে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে একদিন সাধুবাবার নিকটে গিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম, "কয়েক দিন তন্তরঃই ত দেশে চলিয়া যাইতে হইবে, আবার কবে এখানে আসিতে পারিব জানি না। এখানে আসিয়া বাবার নিকট বসিয়া, বাবার সুমধুর উপদেশ শ্রবণে কত সময় কত আনন্দানুভব করিতাম। আমার বাক্য শ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, "মা! আনন্দ ত আপনার অন্তরেরই জিনিষ! নানা প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নানা কর্ম্মের মধ্যে সে আনন্দ অনুভব করে, যেমন কৃষক মাঠে তাহার নিজ কর্ম্ম করিতে করিতে সানন্দে গান গাহিতে থাকে; সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে করিতে জননী তাহার বদনে হাস্য দর্শনে কত আনন্দানুভব করিয়া থাকে; এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে যে আনন্দানুভব করিয়া থাকে তাহাতে বুঝিতে হইবে আনন্দ মনুষ্যের ভিতরকারই বস্তু।" কৃষ্ণমূর্ত্তি ও

বলিয়াছেন, "Kingdom of happiness is within you." অর্থাৎ আনন্দ রাজ্য তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।

পরে আমাদের দেশে ফিরিবার দিন স্থির হইলে এক দিবস অপরাহ্নে আমরা সাধুবাবার নিকট পাহাড়ে বিদায় লইতে গিয়া তাঁহার মুখে শুনিলাম সেই দিন প্রাতে বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় পূর্ব্বদিকে একটী ব্যাঘ্র বাহির হইয়াছিল। ব্যাঘ্রটীকে দেখিতে পাইয়া বহুলোক অস্ত্র সহ উহার পশ্চাৎ আক্রমন করায় ব্যাঘ্রটী দৌড়াইয়া এই কৈলাস পাহাড়ের নীচ দিয়া পলাইতেছিল।

সাধুবাবা পাহাড়ের উপর দাড়াইয়া ঐ ঘটনা দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন ব্যাঘ্রটী দৌড়াইয়া পশ্চিম দিক যাইতে যাইতে দূরে গিয়া সম্মুখে একটী ছাগল পাইয়া তাহাকে ধরিয়া মুখে করিয়া লইয়া দিগিরিয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম বটে কিন্তু জসিডিতে এইরূপ ব্যাঘ্রের উৎপাত প্রায়ই উপস্থিত হয়। ১৩৩৫ সালে গ্রীষ্ম কালে এইরূপ প্রাতঃকালে ঐ পাহাড়ের নীচে একটী ব্যাঘ্র মারা পড়িয়াছে। শুনিলাম ঐ ব্যঘ্রটী চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সুবৃহৎ বাগানের নিম্নে একটী গর্ত্তের মত নীচু স্থানেই নিদ্রা যাইতেছিল উহাকে দেখিতে পাওয়ায় স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি অস্ত্রাদি সহ প্রস্তুত হইয়া উহাকে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্রটী হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া প্রথমে মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া পলাইয়াছিল। পরে যখন আক্রমনকারীগণ সেস্থানেও তাহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া যায় তখন ব্যাঘ্রটী উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ঐ কৈলাস পাহাড়ের সাধুবাবার বাসস্থানে উঠিয়াছিল ও ঐ স্থানে একটী লোক পাইয়া আক্রমণ করিয়াছিল। আক্রমনকারী ব্যক্তিগণ তখন কোন প্রকারে ব্যাঘ্রটীকে মারিয়া তবে ঐ ব্যক্তিটীকে রক্ষা করিয়াছিল। যদিও ঐ ব্যক্তিটী ব্যাঘ্র হস্তে কিছু আহত হইয়াছিল কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সে আরোগ্য লাভ করিয়া ছিল। আমরা যখন ১৩৩৫ সালে বাবার নিকট গেলাম তখন দরজা জানালায় ব্যাঘ্রের নখের আঁচড় এবং আক্রমনকারীদের অস্ত্র চিহ্ন ভিতের গাত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিলাম। সাধুবাবা বলিলেন সেই সময় তিনি ঘোরালাস নামক গ্রামে এক ব্যক্তির অনুরোধে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, আমরা কল্য সন্ধ্যার পর দেশে রওনা হইব বলিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া বলিলাম, তাঁহারও খুব ইচ্ছা ছিল বাবার নিকট

আসিয়া বিদায় হইয়া যাইবেন, কিন্তু তিনি আসিতে পারিলেন না কারণ তাঁহার পায়ে সামান্যভাবে কুকুরের দাঁত লাগায় সেই স্থান নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়া পুড়াইতে গিয়া ঐ স্থানে অধিক পুড়িয়া যাওয়ায় গভীর ক্ষত হইয়াছে। সেইজন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে একেবারে হাঁটিতে নিষেধ করিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া সাধুবাবা বলিলেন,“যে সময় কুকুরের দাঁত লাগিয়াছিল সেই সময় যদি ঐ ক্ষত স্থানে সুরমা দেওয়া হইত তাহা হইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হইয়া যাইত অধিকন্তু তাহাতে এইরূপ ক্ষত হইয়া অনর্থক কষ্টভোগ করিতে হইত না।” শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট আশ্রমে গিয়া উক্ত ক্ষত সম্বন্ধে গল্প করিলে তিনিও বলিয়াছিলেন, যে সময় কুকুরের দাঁত লাগিয়াছিল, সেই সময় তৎক্ষণাৎ ঐস্থানে কিছু লঙ্কা বাঁটিয়া লাগাইয়া দিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, তিনি দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে সাধুবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে পারায় এবং তিনি অসুস্থ আছেন বলিয়া সাধুববা বলিলেন, “কল্য প্রাতে আমিই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।” সাধুবাবার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম। কারণ কোন লোকালয়ে তাঁহারা সাধ্যপক্ষে যাইতে ইচ্ছুক নহেন। আমাদের প্রতি স্নেহ বশতঃ কৃপা করিয়াই এইরূপ স্বেচ্ছায় তিনি আমাদের বাড়ী আসিতে চাহিলেন ইহা যে আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলাম।

পরদিন প্রভাতে সাধুবাবাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য একজন আত্মীয়কে তাঁহার পাহাড়ে পাঠান হইল ও আমরা পশ্চিমের উন্মুক্ত বারাণ্ডায় সাধুবাবাকে বসাইব স্থির করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম। সাধুবাবা আগমন করিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থে সম্মুখে সুগন্ধ ধূপ শলাকা জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রাণামান্তে বারাণ্ডায় উঁহার নিকটে সকলে বসিলাম। সাধুবাবা পূর্ব্ববৎ প্রসন্নবদনে আমাদের কুশল প্রশ্ন ও দুই চারিটী অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলিয়া বলিলেন,—“যখন আসিয়াছি তখন একটী গল্প শুনাইয়া দিয়া যাই।” সেদিনের গল্পটী এইরূপ—

একজন খুব বড় সাধু ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি অতি মনোরম ও পবিত্র একটী সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিবেন এবং তাহাতে যে সকল ব্যক্তি সৃজন করিবেন তাহারা অতি পবিত্র জীবন যাপন করিবে। তাহাদের কোনরূপ অভাব অভিযোগ রহিবে না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাহাই সাধিত হইল। তখন সেই সাধু তাঁহার সৃজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটী করিয়া

চিন্তামণি রত্ন প্রদান করিলেন। ঐসকল ব্যক্তিগণ সেই চিন্তামণি রত্নের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা জানাইলে তাহাদের সকল অভাব পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ঐ স্থানের অধিবাসীগণ পরমসুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের কোন অভাব রহিল না। উহাদের সুস্থ সবল শরীর ও পরম আনন্দে দিন অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া সাধু অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বহুদিবস ভ্রমণান্তর সাধুর বাসনা হইল তাঁহার সৃষ্ট স্থানটীর পূর্ব্বাবস্থা আছে কিনা একবার গিয়া পরিদর্শন করা যাউক। সাধু তাঁহার সেই আনন্দময় স্থান তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়া সেস্থানের দুর্দ্দশা দর্শনে মহাদুঃখিত হইলেন। কারণ তাঁহার সেই রমণীয় স্থান পঞ্চশঠের অধিকারাধীন হওয়ায় তাহা একেবারে শোভাসৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেশবাসীগণ সকলে নানাবিধ অভাবে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সকলের আকৃতি ভয়ানক শীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে সাধু জানিলেন যে তাঁহার সৃষ্ট এই মনোরম পুরীতে অন্যস্থান হইতে পঞ্চজন দুষ্ট ব্যক্তি শিকার খেলিতে আসিয়াছিল। ঐ স্থানের অধিবাসীদের এরূপ অটুট স্বাস্থ্য, সবল সুন্দর আকৃতি এবং সুখ সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ অবস্থা দর্শনে তাহারা অনুমান করিল নিশ্চয় ইহার কোন গুহ্য কারণ আছে। অনুসন্ধানে তাহারা জানিতে পারিল এক চিন্তামণি রত্নই ইহাদের সকল অভাব মোচন করিতেছে ও যত আনন্দের মূলই ঐ চিন্তামণি রত্ন। তখন ঐ পঞ্চশঠ স্থির করিল যে উহাদের কোন প্রকারে ভুলাইয়া ঐ চিন্তামণি রত্ন হইতে যে উহারা পরমানন্দ ভোগ করিতেছে তাহা হইতে উহাদের বঞ্চিত করিতে হইবে। কি কৌশলে তাহা সাধিত হইতে পারে তাহা উহারা চিন্তাপূর্ব্বক স্থির করিল। প্রথমে উহারা চিন্তামণি রত্নটী কিরূপ জানিয়া লইবার জন্য উহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন মানসে সর্ব্বদা ঐ দেশবাসীর নিকট আসা যাওয়া করিতে লাগিল ও ক্রমে ক্রমে ঐস্থানে বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া বসিয়া অবশেষে মাঠে চাষ দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এক স্থানে অবস্থান ফলে যখন ঐ দেশবাসীর সঙ্গে উহাদের ক্রমে ক্রমে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন সেই সুযোগে উহারা উহাদের প্রস্তুত এক একটী নকল চিন্তামণি গৃহস্থদের গৃহে গৃহে রাখিয়া গেল। ঐ দেশবাসীগণ নূতন মণির চাকচিক্য দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং পুরাতন প্রকৃত চিন্তামণি রত্নের কথা দিন দিন বিস্মৃত হইয়া যাইতে লাগিল। উহা অযত্নে অবহেলায় উহাদের গৃহকোণে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে তাহার উপর কত

আবর্জ্জনা পড়িতে লাগিল। নূতন রত্নগুলি প্রথম দর্শনে সুন্দর বোধ হইলেও উহা প্রকৃত চিন্তামণি রত্নের তুল্য উহাদের কোন অভাব দূর করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং ঐ দেশবাসীগণ তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাবে ক্রমে ক্রমে এরূপ দরিদ্র ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। সাধুর সৃষ্ট স্থানের এরূপ দুর্দ্দশা এবং অধিবাসীদের এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে সাধু অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও পুনর্ব্বার উহাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে চারিখানা পত্র লিখিয়া উহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহাতে যখন বিশেষ কিছু সুফল ফলিল না, তখন তিনি অষ্টাদশ খানি পত্রে চিন্তামণিরত্ন অনুসন্ধানের উপায় লিখিয়া জানাইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাদৃশ ফল হইল না, ঐ দেশবাসীগণ পঞ্চশঠের আয়ত্ত্বাধীনেই রহিয়া গেল। তখন আর কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি স্বয়ং তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া উহাদের প্রত্যেককে বলিতে লাগিলেন যে এক চিন্তামণি রত্নের অভাবেই তোমাদের এরূপ হীন অবস্থা ঘটিয়াছে। পুনর্ব্বার প্রকৃত চিন্তামণির উদ্ধারসাধন করিতে পারিলেই তোমাদের সকল অভাব মোচন হইবে। যে চিন্তামণি রত্নের অভাবে তোমাদের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তোমাদেরই গৃহকোণে তোমাদের অবহেলায় অযত্নে মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কাইত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পরিশ্রম পূর্ব্বক মৃত্তিকা খুঁড়িয়া চেষ্টা করিলেই উহা পুনরায় বহির্গত হইবে। কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াও তমোভাবাচ্ছন্ন ঐ দেশবাসীর চৈতন্যোদয় হইল না এবং তাহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক উহার আবরণ অপসারিত করিয়া চিন্তামণি রত্নটীর উদ্ধারের নিমিত্ত তাদৃশ যত্নশীল হইল না। তবে কেহ কেহ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সাধু মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়া চিন্তামণি রত্নটীর উদ্ধারের জন্য যত্নশীল হইয়া সাধনা দ্বারা কৃতকার্য্য হইল।

এই কাহিনী বলিয়া সাধুবাবা বলিলেন এই সাধু মহাত্মা হইলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার ইচ্ছা হওয়ায় এই সুন্দর শোভা সৌন্দর্য্যময় বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি হইল ও তাহাতে তিনি বহু পবিত্র চরিত্র নির্ম্মল চিত্ত মনুষ্যের সৃজন করিলেন এবং তাহাদের অন্তঃকরণে স্বয়ং চিন্তামণিরূপে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" ১০॥ ২০॥ গীতা।

এই চিন্তামণির সাহায্যে সকলই লাভ হইতে পারে। সতত চিন্তামণির চিন্তনে যে সুদুর্ল্লভ আত্মানন্দ সকলেই লাভ করিতে পারে তাহা তিনি তাহা-

দিগকে জানাইয়া দিলেন, কিন্তু কিয়ৎদিবসপরই এই প্রলোভন পূর্ণ বিশ্বরাজ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কাররূপী পঞ্চশঠ আসিয়া পৃথিবীর রাজ্যে অধিকার স্থাপন করিয়া বসিল। যতই দিন গত হইতে লাগিল ততই জীবকুল বাহ্যিক অনিত্য মায়াময় বস্তুর সংস্পর্শে আসায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতে লাগিল ও ঈশ্বর দত্ত সকল সম্পদ ক্রমে ক্রমে হারাইয়া ফেলিতে লাগিল। মনে যত লোভের বৃদ্ধি হইতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে ততই অভাবের দুঃখ সৃষ্টি হইতে লাগিল। আত্মবিস্মৃত হওয়ার প্রাণের নির্ম্মল আনন্দের উৎস ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল। ঐ পঞ্চশঠ নকল চিন্তামণিরূপ বিষয়ানন্দ দিয়া সকল মনুষ্যকে এইরূপে প্রতারিত করিল তাহারা বিষয়ানন্দের মোহে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িল যে অন্তরের চিন্তামণি (আত্মানন্দ) বিস্মৃত হইয়া গেল এবং তাহারা বিষয় ভোগে রজস্তমের মোহে ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। উহারা যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিয়া আর অন্তরের চিন্তামণির অনুসন্ধান করিল না। তখন শ্রীভগবান জীবের এই অনন্ত দুঃখ কষ্ট ও দুরবস্থা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া হইয়া জীবের হিতার্থ চারখানি বেদ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে যখন তাদৃশ ফল লাভ হইল না তখন জীবের উদ্ধার সাধন জন্য অষ্টাদশ পুরাণের সৃষ্টি করিলেন। এই বেদ পুরাণাদি মহাগ্রন্থে কিরূপে সাধনা দ্বারা চিন্তামণিরূপ অন্তরের ব্রহ্মকে লাভ কতা যায়, তাহা নানাভাবে অশেষ প্রকারে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মনুষ্যকুল পঞ্চশঠ রূপী দুরন্ত রিপুর অধীন হইয়া পড়িয়া বিষয়ানন্দের মোহে মুগ্ধ ও রজ তমোভাবে আচ্ছন্ন থাকায় যথেষ্ট পরিশ্রম পূর্ব্বক সাধন করিয়া চিত্তকে নিত্য সত্বস্থ ও পবিত্র করিয়া চিন্তামণি লাভের জন্য যত্নশীল হইতে ইচ্ছুক হইল না। তখন তিনি স্বয়ং জীবের উদ্ধারার্থে অবতার হইয়া ধরণী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন ও তাহাদের নিকট বলিতে লাগিলেন, "তোমরা এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলে চলিবে না। এসকল বাহিরের বস্তুতে তোমরা ভুলিয়া ডুবিয়া রহিও না। বহির্মুখ হইতে দৃষ্টি ঘুরাইয়া উহা অন্তর্মুখী কর। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই কোটী সূর্য্য সদৃশ তেজস্কর অপরূপ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান কর। প্রথমে পরিশ্রম পূর্ব্বক যে সকল আবর্জ্জনা উহার উপর পড়িয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। উহার উপর হইতে সামান্য কিছু মৃত্তিকা অপসারিত করিতে পারিলে অর্থাৎ স্বস্বরূপে পৌঁছাইবার জন্য নিয়ত সযত্নে নিয়মিত অভ্যাস করিলেই চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইতে থাকিবে এবং উহার ততই উপলব্ধি হইবে। ইহার নিমিত্ত কোন দূর প্রদেশে গমন করিতে হইবে না, প্রত্যেকের মধ্যেই উহা উজ্জ্বল প্রভায় বিরাজমান রহিয়াছেন, চাই কেবল আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম সহকারে একান্ত অন্তরে সেই চিন্তামণির অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধার সাধন করা। যে কেহ আন্তরিকতার সহিত উহার সন্ধানে রত থাকিবে, সেই উহার সন্ধান পাইবে।" যে ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল, যে তাঁহার শরণ লইল, সেই ব্যক্তি অন্তরের চিন্তামণি রূপ ব্রহ্মলাভে সক্ষম হইল।

জনৈক ভদ্র মহিলা—রাজসাহী।

মথুরা।

সখি আছেতো পরাণে মথুরা নগরে
আমার পরাণ বঁধু
পুরব মতন দেখিলে কি সই?
ভরিত বদন বিধু?
সখি সে বাঁকা নয়নে তেরছ চাহনি,
আছে কি তেমনি পারা
নব ফুলদল সম ঢল ঢল,
অধরে হাসির ধারা!
পঙ্কজ নয়নে রাখি থির দিঠি,
এলায়ে ঈষৎ কায়
মৃদুল সমীরে, শিখি পুচ্ছ সহ
চূড়া তো শোভিছে বায়?
অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে ভঞ্চ আঁখি জলে
কস্তুর চন্দন রেখা,
আছে তো সজনী, অঙ্কিত তেমনি
যশোদা হাতের আঁকা?
জড়িত নূপুরে কুসুমিত পদ
গুঞ্জরে ভ্রমর প্রায়
অক্ষয় কবচ সদৃশ সজনী,
ধবে যে হৃদয়ে তায়।
জিজ্ঞাসি তোমায়, কহ সত্য সখি
একটি কথা গো আর
আকুল পিয়াসে, ঝঙ্কারে কি বাঁশী
রাধা বলি বার বার?
সখি বহে কি যমুনা উজান তথায়,
শ্যামের বাঁশীর গানে,
উতলা অবলা শ্যামলী ধবলা
শবদ পরশ টানে!

সখি যমুনার ঘাটে, কদম্ব তলায়,
দাঁড়ায়ে আমার শ্যাম,
দশদিশি ভরি অকুল আহ্বানে
স্মরিছে অভাগী নাম।
সে নগরে সই, নাহি কি নাগরী,
কেমন কঠিন হিয়া,
অকৃত্রিম রাগে কেন না প্রবোধে,
সমগ্র পরাণ দিয়া।
পরতে পরতে, পরাণে পরশে
চির পরিচিত স্বর
কম্পিত হৃদয়ে অশ্রুভরা চখে,
চাহি শুধু মুখোপর।
শ্রীমতী রাজবালা দাসী।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১। আত্মোন্নতি মূল্য ।।৹ শ্রীভুবন মোহন দাস এম, এ প্রাপ্তিস্থান ১০ এ শ্রীনাথ দাসের লেন, কলিকাতা ও কলিকাতা পুস্তালয়।

২। গড্ এণ্ড হিজ ভিষনস্ (ইংরাজী) মূল্য নির্দ্ধারিত নাই, গ্রন্থকার প্রাপ্তিস্থান—পূর্ব্বোক্ত।

৩। দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক (বাক্যসুধা) মূল্য ১।৹ শ্রীদুর্গা চরণ চট্টোপাধ্যায় অনুবাদক। প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ "রত্নপিটক গ্রন্থাবলী ১৮ নং কামাখ্যা লেন, সিটি বেনারস।

৪। জীবন্মুক্তিবিবেক মূল্য ৩৲ অনুবাদক শ্রীদুর্গাচর চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান কার্য্যাধ্যক্ষ রত্নপিটক গ্রন্থাবলী ১৮ নং কামাখ্যা লেন, সিটি বেনারস।

৫। ভক্তিতত্ত্ব মূল্য ১৲ শ্রীরাধিকা প্রসাদ বেদান্ত শাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান ম্যানেজার বঙ্গধর্ম্ম মণ্ডল শ্রীমহামণ্ডল ভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

৬। ভগবৎ প্রসঙ্গ মূল্য ১।৹ শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান (১) গ্রন্থাকরের নিকট ১৫২ হরিশ মুখুয্যে রোড্ ভবানীপুর কলিকাতা (২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

গুরুগীতা—মূল্য ।৹ শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, জেসিডি জংশন।

ত্রিপুরা রহস্যে জ্ঞানখণ্ডে—

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

(বঙ্গানুবাদ অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য)

প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা সম্প্রষ্টুমুপচক্রমে ।
ইত্যাজ্ঞপ্তো জামদগ্ন্যঃ প্রণম্যাঽত্রিসুতং মুনিম্ ॥১
ভগবন্ গুরুনাথার্য সর্ব্বজ্ঞ করুণানিধে ।
পুরা মে নৃপবংশেষু ক্রোধঃ কারণতো হ্যভূত্ ॥২
তদ্ভূয়োনিহতং ক্ষাত্রং সগর্ভং সন্তনন্বয়ম্ ।
ময়া ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বৈ ক্ষত্রাসৃগ্ভরিতে হ্রদে ॥৩
সন্তর্পিতাঃ পিতৃগণাস্তুষ্টা মদ্ভক্তি গৌরবাৎ ।
মৎক্রোধং শাময়ামাসুঃ শান্তঃ পিত্রাজ্ঞয়াপ্যহম্ ॥৪
সংপ্রত্যয়োধ্যামধ্যাস্তেং সঃ শ্রীরামো হরিঃ স্বয়ম্ ।
ক্রোধান্ধস্তেন ভূয়োঽহং সঙ্গতো বলদর্পিতঃ ॥৫
তেন দর্পাদ্ভগবতা চ্যাবিতশ্চ পরাজিতঃ ।
জীবন্ কথঞ্চিন্নির্যাতো ব্রহ্মণ্যেনানুকম্পিনা ॥৬
অথ মামুপসংপ্রাপ্তো নির্বেদঃ পরিভাবিতম্ ।
ততোঽত্যন্তং পথিময়া বহুধা পরিদেবিতম্ ॥৭
সংবর্ত্তমবধূতেন্দ্রং মার্গেঽকস্মাৎ সমাসদম্ ।
ভস্মাচ্ছন্নাগ্নিবদ্ গূঢ়ং কথঞ্চিদবিদন্তদা ॥৮
সন্তপ্ত ইব নীহারং তং সর্ব্বাঙ্গ সুশীতলম্ ।
সঙ্গম্যৈবাতিশিশির ভাবমাসাদয়ন্তদা ॥৯
ময়া স্বস্থিতিমাপৃষ্টঃ প্রাহামৃতসুপেশলম্ ।
সুসারপিণ্ডবৎ সর্ব্বং নিক্ষ্যাং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ১০—

অত্রাধ্যায়ে বেদমিতৈঃ পদ্যৈঃ কর্ত্তব্য দূষণম্ ।
ক্রিয়তে সুবিচারস্য জনিস্ততিরপীর্যতে ॥

পৃচ্ছেত্যাজ্ঞপ্তঃ প্রশ্রয়ঃ বিনয়ঃ । ১ । স্বস্য নির্ব্বেদপ্রাপ্তি প্রকারমাহপুরেতি ॥ ২ ॥ তৎ ক্রোধাদ্ধেতোঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ পরিদেবিতং প্রলপিতম্ ॥৭ । সমাসদ মাসাদিতবান্ ॥ ৮ ॥ কীদৃশং সংবর্ত্তং কথং বিধো রাম আসাদিতবান্ তদাহ—সন্তপ্তেতি । সঙ্গফলমাহ—সঙ্গম্যেতি ॥ ৯ ॥ পেশলম্ সুন্দরম্ । সর্ব্বং

নাথং বদশকং প্রষ্টুং রঙ্কো রাজ্যং যথাতথা।
ভূয়ঃ সংপ্রার্থিতঃ সোঽহং ভবন্তং মে বিনির্দিশং ॥১১
তদ্ভবচ্চরণদ্বন্দ্বং তত আসাদিতং ময়া।
অন্ধো জন সমাযোগমিবাত্যন্ত সুখাবহম্ ॥১২
তন্মে ন বিদিতং কিঞ্চিদ্ সংবর্ত্তমুনিরাহ যৎ।
শ্রুতং মাহাত্ম্যমখিলং ত্রিপুরা ভক্তি কারকম্ ॥১৩
সা ভবদ্রূপিণো দেবি হৃদি নিত্যং সমাহিতা।
এবং মে বর্ত্তমানস্য কিং ফলং সমবাপ্যতে ॥ ১৪
ভগবন্ কৃপয়া ব্রূহি যৎ সংবর্ত্তঃ পুরাবদৎ।
অবিদিত্বা চ তন্নাস্তি কচিচ্চ কৃত কৃত্যয়া ॥ ১৫
তত্তক্তমবিদিত্বাতু যন্মচ্চ ক্রিয়তে ময়া।
তদ্বালক্রীড়নমিব প্রতিভাতি সমন্ততঃ ॥ ১৬
পুরাময়া হি বহুশঃ ক্রতুভির্দক্ষিণোচ্ছ্রয়ৈঃ।
প্রভূতান্নগণৈরিষ্টা দেবাঃ শক্রমুখা নমু ॥ ১৭
তদল্পফল মেবেতি শ্রুতং সংবর্ত্তবক্ত্রতঃ।
মন্যে তদহমল্লং যদ্ দুঃখমেবেতি সর্ব্বথা ॥ ১৮
অসুখং নহি দুঃখং স্যাৎ দুঃখমল্পং সুখং স্মৃতম্।
যতঃ সুখাত্যয়ে দুঃখং ভবেৎ গুরুতরং কিল ॥ ১৯
নৈতাবদেব চৈতস্মাদধিকং চাস্তি বৈভবম্।
মৃত্যুপযোগো যদ্ভূয়ো ন তন্ন স্যাৎ কদাচন ॥ ২০

প্রশ্নার্থম্। ১০। তৎ সংবর্ত্তোক্তম্। রঙ্কঃ দরিদ্রঃ। ১১।১২। তৎ সংবর্ত্তোক্তং শ্রবণাধিকারং স্বস্মিন্নাহ শ্রুতিমিতি। ১৩। ভবদ্রূপিণো গুরুরূপিণো। ফলস্য দেবতাকার-চিত্তবৃত্তেঃ প্রাপ্তত্বাৎ পুণরুপাসনং পিষ্টপেষণবদিত্যাহ—এবমিতি ১৪। কিং সম্বর্ত্তোক্তেন উপাসনমেব কুর্ব্বিতি চেদাহ অবিদিত্বেতি ॥ ১৫॥

তদবিদিত্বোপাসন মন্যদ্বা কর্ম্মং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ—তত্তক্তমিতি ।১৬। নমু ন ব্যর্থঃ কর্ম্মাদীনাং ফল সত্ত্বাদিতি যন্নেত্যাহ-পুরেতি দক্ষিণানাং উচ্ছ্রয় আধিক্যং যেষু ॥১৭॥

তদল্পেতি। এবম্বিধোক্তমকর্ম্মণামল্পফলত্বে কিমন্যেষামিতি ভাবঃ। অল্পফলত্বেঽপি ন ফলাভাব ইত্যাশঙ্ক্যাল্পফলস্য দুঃখমূলত্বেন দুঃখাত্মতৈবেত্যাহ মন্য ইতি ॥ ১৮

এবমেব ভবেদ্‌যন্মে ক্রিয়তে ত্রিপুরাবিধৌ।
বালক্রীড়েব মে ভাতি সর্ব্বং তন্মানসংযতঃ ॥ ২১
এতদ্‌ যদুক্তং ভবতা কর্ত্তুং তস্যাদিতোঽন্যথা।
নিয়তং চাপ্যন্যথা তদ্বচোভেদ সমাশ্রয়াৎ ॥ ২২
আলম্বভেদতশ্চাপি বিবিধং প্রতিপদ্যতে।
কথমেতৎ ক্রতুসমমম সত্যফলসম্মিতম্‌ ॥ ২৩
অপ্যসত্যাত্মকং যস্মাৎ কথং সত্য সমং ভবেৎ।
অথাপি নিত্য কর্ত্তব্যমেতন্নাস্যাবধিঃ ক্বচিৎ ॥ ২৪
লক্ষিতো মে স ভগবন্‌ সম্বর্ত্তঃ সর্ব্বশীতলঃ।
কর্ত্তব্য ক্লেশ বিষম বিষ জ্বালা বিনির্গতঃ ॥ ২৫

এতদেব নিরূপয়তি-অসুখমিতি। তত্রহেতুঃ—যত ইতি ॥ ১৯ ॥

নন্ন কৃত কর্ম্মধারয়ান্নসুখধারা প্রাপ্তেঃ কিং জ্ঞানেনেতি চেদাহ—নৈতাবদিতি। ভয়মেকহ—মৃত্যুপেতি। মৃত্যুগ্রসনং কর্ম্মভিঢ়্নিবারমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

নন্নু কর্ম্মৈবং বিধমেব। উপাসনন্তু পরদেবতা সম্বন্ধান্নৈবমিত্যাশঙ্কোপাসনমপি শুষ্ক কর্ম্ম তুল্যমেব ফলত ইত্যাহ-এবমিতি। যে ময়া ত্রিপুরোপাসনবিধৌ ক্রিয়মাণং কর্ম্মবেদেত্যর্থঃ। অতএব বালক্রীড়বেতি। তত্র হেতুঃ—মানসংযত ইতি ॥২১

উপাসনস্য কর্ম্মতুল্যতামাহ-এতদিতি। যত উপাসনম্‌। বচোভেদঃ শাস্ত্রভেদঃ। শাস্ত্রাণাং বিবিধত্বেন ভবদুক্ত প্রকারেণান্যথা বা কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থ ॥২২

শালিগ্রাম নার্মদাদ্যালম্বন ভেদেন চান্যথা কর্ত্তুং শক্যম্‌। এবমনেকধা প্রতিপদ্যমানত্বাৎ ক্রত্বাদি কর্ম্ম সমমেতদুপাসনমসত্য ফলত্বেন সম্মিতং নিশ্চিতম্‌। ক্রতু সমং কথং ন ভবদেতি শেষঃ ॥ ২৩

মানসত্বাৎ স্বরূপতোঽপ্যসত্যং যস্মাৎ তস্মাৎ কথং সত্যফলজনকং ভবেৎ। না সত্য কৃতঃ কৃতেনেতি বচনাদিতিভাবঃ। শাস্ত্রস্যেশ্বর সঙ্কল্প রূপত্বেনাচিন্ত্যত্বান্নৈবং বক্তুংযুক্তমিতি চেদাহ অথাপীতি ॥ ২৪

নন্নু যাবজ্জীবং কুর্ব্বত এব পরশ্রেয়ঃ প্রাপ্তিরিতি চেদাহ—লক্ষিত ইতি মে ময়া। ন তেন শ্রেয়ঃ প্রাপ্তমিতি চেদাহ—সর্ব্বশীতল ইতি। ন প্রত্যক্ষ দৃষ্টেবিপ্রতিপত্তিরিত্যাশয়ঃ। কুত এবং স সর্ব্বশীতল সত্ত্বয়া জ্ঞাতঃ। তদাহ—কর্ত্তব্যেতি। যতো বিনির্গতঃ ততঃ শীতলঃ ॥ ২৫।

হসন্নিব লোকতন্ত্রমভয়ং মার্গমাশ্রিতঃ।
বনে দাবাগ্নি সঙ্কীর্ণে হিমাম্বুস্থ গজোপমঃ॥ ২৬
সর্ব্বকর্ত্তব্য বৈকল্যামৃত সংস্বাদনন্দিতঃ।
কথমেতাং দশাং প্রাপ্তো যচ্চ মামাহ তৎ পুরা॥ ২৭
সর্ব্বমেতৎ সুকৃপয়া গুরো মে বক্তুমর্হসি।
কর্ত্তব্যকালভুজগনিগীর্ণং মাং বিমোচয়॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ মূর্দ্ধ্না গৃহীত্বা দণ্ডবন্নতঃ।
অথ দৃষ্ট্বা তথাভূতং ভার্গবং মুক্তি ভাজনম্॥ ২৯
দয়মান স্বভাবোঽথ দত্তো বক্তুমুপাক্রমৎ।
বৎস ভার্গব ধন্যোঽসি যস্য তে বুদ্ধিরীদৃশী॥ ৩০
অব্ধৌ নিমজ্জতো নৌকা সম্প্রাপ্তিরিব সঙ্গতা।
এতাবদেব সুকৃতিঃ ক্রিয়াভিরূপ সঙ্গতঃ॥ ৩১
স্বাত্মানমারোহয়তি পদে পরম পাবনে।
সা দেবী ত্রিপুরা সর্ব্বহৃদয়াকাশরূপিণী॥ ৩২

ন চ স কেবলং মূঢ় পাপ ফলভাক্, যতোঽভয়ং মার্গমাশ্রিতঃ লোকব্যবহার হসন্নিবাস্তে। তস্য সর্ব্বশীতলত্বে দৃষ্টান্ত বন ইতি। ২৬

কর্ত্তব্যবৈধুর্য মাত্রেণ কথং স মহাসুখী তদাহ সর্ব্বেতি। কর্ত্তব্যতৈব মহা দুঃখহেতুঃ। ব্যবহারে শ্রান্তিদর্শনাৎ তদভাবাদেব সুখম্। সুষুপ্তৌ সুখ দর্শনাদিতি ভাবঃ। এতাং দশাং কর্ম্মত্যাগাদভয়দশাং সম্বর্ত্তঃ প্রাপ্তঃ। ২৭

কিমেতেন তে প্রয়োজনমিতি চেদাহ—কর্ত্তব্যেতি॥ ২৮

তথাভূতম্ আর্ত্তং মুমুক্ষুম্॥ ২৯

কর্ত্তব্যস্য দুঃখ হেতুত্ব বুদ্ধিঃ॥ ৩০

বুদ্ধিং স্তৌতি অব্ধাবিতি। তে সঙ্গতেত্যন্বয়ঃ। উপাসনাং বালক্রীড়বৎ ব্যর্থমিতি রামেণোক্তে ফলপ্রদর্শনেন প্রত্যাহএতাবদিতি। বুদ্ধি প্রাপ্তি মিত্যর্থঃ। ৩১

উপগঙ্গত আরোহয়তীতি সম্বন্ধঃ। পরম পাবনে নির্দ্দোষে মোক্ষাখ্যে। কথং ক্রিয়াভিঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত্যা পদারোহস্তদাহ-সেতি। হৃদয়াকাশেঽভিব্যক্ত্যা-তদ্রূপিণী॥ ৩২

অনন্য শরণং ভক্তং প্রত্যেবং রূপিণী দ্রুতম্।
হৃদয়ান্তঃ পরিণতা মোচয়েন্মৃত্যু জালতঃ ॥ ৩৩
যাবৎ কর্ত্তব্য বেতালান্ন বিভেতি দৃঢ়ং নরঃ।
ন তাবৎ সুখমাপ্নোতি বেতলাবিষ্টবৎ সদা। ৩৪
নৃণাং কর্ত্তব্যকালাহি সন্দষ্টানাং কথং শুভম্।
করাল গরল জ্বালাক্রান্তাঙ্গা নামিব ক্বচিৎ॥ ৩৫
কর্ত্তব্য বিষ সংসর্গ মূর্চ্ছিতং পশ্য হৈব জগৎ।
অন্ধীভূতং ন জানাতি ক্রিয়াং স্বস্য হিতাত্মিকাম্॥ ৩৬
অন্যথা চেষ্টতে ভূয়ো মোহমাপদ্যতে পুনঃ।
এবংবিধো হি লোকোঽয়ং কর্ত্তব্য বিষ মূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৭
অনাদি কালতো ভীমে পচ্যতে বিষ সাগরে।
যথা হি কেচিৎ পথিকাঃ প্রাপ্য বিন্ধ্যং মহানন॥ ৩৮
ক্ষুধাভরসমাক্রান্তাঃ ফলানি দদৃশুর্বনে।
বিষমুষ্টিফলান্যাশু নিন্দুকস্য ফলে হয়া॥ ৩৯॥
ভক্ষয়ামাসুরত্যন্ত ক্ষুধানষ্ট রসেন্দ্রিয়াঃ।
অথ তে তদ্বিষজ্বালাজ্বলিতাঙ্গাঃ সুপীড়িতাঃ॥ ৪০

এবং রূপিণী প্রোক্ত বুদ্ধিরূপিণী। প্রোক্ত বুদ্ধ্যা রূপেণ পরিণতা সৈব মোচয়েদিতি ভাবঃ॥ ৩৩

অস্যা বুদ্ধেব্যাতিরেক মুখেন পদ সাধনতামাহ যাবদিতি॥ ৩৪

সর্পদষ্টানামিব কর্ত্তব্যযুতানাং ন সুখমিত্যহ—নৃণামিতি॥ ৩৫

ন জানাতি। এবং রূপং জগৎ পশ্য॥ ৩৬

অন্যথেতি। হিতসাধনা যৎ সাধনং বিহায়ান্যথা চেষ্টতে। অত্র হেতুর্ব্বিষ মূর্চ্ছিত ইতি॥ ৩৭

এবং মোহো জীবস্য কদাভূতি সম্পন্ন ইতি চেদাহ—অনাদীতি। অত্র দৃষ্টান্তত্বেনাখ্যায়িকামুপক্রমতে—যথেতি॥ ৩৮।৩৯

ননু বিষ মুষ্টিতিন্দুক ফলয়োরাকৃতিসাম্যেঽপি ন রসসাম্য মিত্যত আহ—নষ্ট-রসেন্দ্রিয়া ইতি॥ ৪০

মুষ্টিফলং ভক্ষিতমিত্যবিদিত্বা॥ ৪১

অন্ধীভূতা বিচিন্বন্ত স্তবিষোষ্ণ প্রশান্তয়ে।
অবিদিত্ব মুষ্টিফলং তিন্দু ফল নিঃষবণাৎ ॥ ৪১
মত্বা জ্বালাং নিজে দেহে ধস্তূর ফলমাসত্বঃ।
ভ্রান্ত্বা জম্বীর বুদ্ধ্যা তৎ সর্ব্বেরাসীৎ সুভক্ষিতম্ ॥ ৪২
উন্মত্তাশ্চ ততোঽভুবন্ মার্গাদ্ ভ্রষ্টাশ্চ তে তদা।
অন্ধীভূতাতি গহনে পতন্তো নিম্নভূমিষু ॥ ৪৩
কণ্টকৈশ্চিত সর্ব্বাঙ্গা ভগ্ন বাহূরুপাদকাঃ।
অধিক্ষিপন্ত শ্চান্যোঽন্যং কলহঞ্চক্র রুচ্চকৈঃ ॥ ৪৪
মুষ্টিভিশ্চ শিলাভিশ্চ কাষ্ঠৈর্জঘ্নুঃ পরস্পরম্।
অথতে দীর্ণ সর্ব্বাঙ্গাঃ পুরং কশ্চিৎ সমাসত্বঃ ॥ ৪৫
নিশীথে দৈববশতঃ পুরদ্বারমুপাযযুঃ।
পুরদ্বারাধিপালৈ স্তে প্রতিরুদ্ধাঃ প্রবেশনে ॥ ৪৬
দেশকালানভিজ্ঞানাৎ কলহঞ্চক্ররুচ্চকৈঃ।
অহ তে প্রহৃতাদ্বারপালৈ রতিতরাং যদা ॥ ৪৭
তদা পলায়ন পরা বভূবুঃ পরিতস্ত তে।
পতিতাঃ পরিখে কেচিদ্ ভক্ষিতা মকরদিভিঃ ॥ ৪৮
কেচিৎ খাতেষু কূপেষু পতিতাঃ প্রাণমুৎসৃজুঃ।
অপরে তৈর্বিনিহতাঃ কেচিজ্জিব গ্রহং গতাঃ ॥ ৪৯
এবং জনা হিতেচ্ছাভিঃ কর্ত্তব্যাবিষমূর্চ্ছিতাঃ।
অহো বিনাশং যান্তচ্চৈ মোহেনান্ধীকৃতাঃ খলু। ৫০
ধন্যোঽসি ভার্গব ত্বন্ত যস্মাদভ্যুদয়ং গতঃ।
বিচারঃ সর্ব্বমূলং হি সোপানং প্রথমং ভবেৎ ॥ ৫১

তিন্দুফল জামে বাঙ্গে জ্বালাং মত্বা আসত্বঃ প্রাপ্তাঃ। তৎধস্তুর ফলম্ ॥ ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ ৪৬ ॥

দ্বারাধিপৈঃ কলহঞ্চক্রুঃ ॥ ৪৭ ॥

পরিখজলস্থ মকরাদিভিঃ ॥ ৪৮ । ৪৯ ।

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—এবমিতি ॥ ৫০

মোহসাগরোত্তীর্ণত্বাৎ ধন্যোঽসি। কোঽসাবভ্যুদয় স্তদাহ—বিচার ইতি। মূলং ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

পরশ্রেয়ো মহাসৌধপ্রাপ্তৌ জানীহি সর্ব্বথা।
সুবিচারমৃতে ক্ষেম প্রাপ্তিঃ কস্য কথম্ভবেৎ ॥ ৫২
অবিচারঃ পরো মৃত্যুরবিচার হতা জনাঃ
বিমৃশ্যকারী জয়তি সর্ব্বত্রাভীষ্ট সঙ্গমাৎ ॥ ৫৩
অবিচার হতা দৈত্যা যাতুধানাশ্চ সর্ব্বশঃ।
বিচার পরমা দেবাঃ সর্ব্বতঃ সুখভাগিনঃ ॥ ৫৪
বিচারাদ্বিষ্ণু মাশ্রিত্য জয়ন্তি প্রত্যরীন্ সদা।
বিচারঃ সুখবৃক্ষস্য বীচামঙ্কুরশক্তিকম্ ॥ ৫৫
বিরাজতে বিচারেণ পুরুষঃ সর্ব্বতোধিকঃ।
বিচারাদ্বিধিরুৎকৃষ্টৌ বিচারাৎ পূজ্যতে হরিঃ ॥ ৫৬
সর্ব্বজ্ঞস্তু বিচারেণ শিব আসীন্মহেশ্বরঃ।
অবিচান্মৃগাসক্তো রামো বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ ৫৭
পরমামাপদঃ প্রাপ্তো বিচারাদথ বারিধিম্।
বদ্ধা লঙ্কাপুরীং রক্ষোগণাকীর্ণাং সমাক্রমৎ ॥ ৫৮
অবিচারাদ্বিধিরপি মূঢ়ো ভূত্বাভিমানতঃ।
শিরশ্ছেদং সমগমদিতি সংস্তুত মেব তে। ৫৯
মহাদেবো বিচারেণ বরং দত্বা সুরায় বৈ।
ভস্মীভাবাৎ স্বস্য ভীতঃ পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ৬০
অবিচারাৎ হরিঃ পূর্ব্বং ভৃগুস্ত পত্নীং নিহত্যতু।
শাপেন পরমং দুঃখ মাপ্তমত্যন্ত দুঃসহম্ ॥ ৬১
এবমন্যে সুরা দেবা যাতুধানা নরা মৃগাঃ।
অবিচার বশাদেব বিপদং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ৬২

যত এবমতঃ সৌধ প্রাপ্তৌ প্রথমং সোপানং জানীহি। অতএবাহ—সুবিচারেতি ॥ ৫২। ৫৩ ॥

অবিচারেণ কে হতাঃ কে বা বিচারেণ সুখিনস্তদাহ—অবিচারেতি ॥ ৫৪ ॥ দেবা! প্রত্যরী-দৈত্যাজীন্ জয়ন্তি অঙ্কুরশক্তিমিতি। ন নিষ্ফলং বীজমিতি ভাবঃ। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৬০। ৬১। ৬২

বিচার পরান্ স্তৌতি— মহেতি ॥ ৬৩ ॥

অকর্ত্তব্যমেব দুঃখদমবিচারাৎ কর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্যসর্ব্বতো মুহ্যন্তি। অপার সঙ্কটৈঃ অপরিহার্য্যদুঃখপ্রাপকৈঃসহ সর্ব্বেভ্যো দুঃখেভ্যঃ ॥ ৬৪

মহাভাগাস্তে হি ধীরা যান্ কুত্রাপি চ ভার্গব ।
বিজহাতি বিচারো নো নমস্তেভ্যো নিরন্তরম্ ॥ ৬৩
কর্ত্তব্যমবিচারেণ প্রাপ্যমুহ্যন্তি সর্ব্বতঃ ।
বিচার্য কৃত্বা সর্ব্বেভ্যো মুচ্যতেঽপার সঙ্কটৈঃ ॥ ৬৪
এবং লোকাং শ্চিরা দেবোঽবিচারঃ সঙ্গতোঽভবৎ ।
যস্যাবিচারো যাবৎ স্যাৎ কুতস্তাবদ্বিমর্শনম্ ॥ ৬৫
গ্রীষ্ম ভীষ্মকরাতপ্তে মরৌ ক শিশিরং জলম্ ।
এবং চিরাবিচারাগ্নি জ্বালামালা পরীবৃতে ॥ ৬৬
বিচারশীতলস্পর্শঃ কথং স্যাৎ সাধনং বিনা ।
সাধনস্ত্বেকমেবাত্র পরমং সর্ব্বতোঽধিকম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বহৃদ্ পদ্ম নিলয় দেবতায়াং পরাকৃপা ।
তাং বিনা স্যাৎ কথং কস্য মহাশ্রেয়ঃ সুসাধনঃ ॥ ৬৮
বিচারার্কোঽবিচারান্ধহাধ্বান্ত নিবর্হণঃ ।
তত্র মূলং ভবেদ্ভক্ত্যা দেবতাপরিরাধনম্ ॥ ৬৯
রাধিতা পরমাদেবী সম্যক্ তুষ্টা সতী তদা ।
বিচার রূপতাং যাতি চিত্তাকাশে রবির্যথা ॥ ৭০
তস্মান্নিজাত্মরূপাং তাং ত্রিপুরাং পরমেশ্বরীম্ ।
সর্ব্বান্তরনিকেতাং শ্রীমহেশীং চিন্ময়ীং শিবাম্ ॥ ৭১

বিচারাবিচারয়োবিরোধং সদৃষ্টান্তমাহ—যস্যেতি ॥ ৬৫

নন্ু গ্রীষ্মেঽপকস্মাদ্বৃষ্ট্যাগম ইব বিচারঃ স্বয়মেবোদেষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ—এবমিতি ॥ ৬৬

সাধনং প্রসিদ্ধং কর্ম্ম স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—একমেবেতি । সর্ব্বতঃ ইতর—ফলসাধকেভ্যঃ সাধনেভ্যোঽধিকম্ । অবশ্যফল পর্যবসানাদিতিভাবঃ ॥ ৬৭

তৎকিন্তদাহ-পরাকৃপেতি ॥ ৬৮

অন্ধস্য জন্মাধ্যস্য যন্মহাধ্বান্তং সূর্য্যৈন্যেরনিবার্যং তত্র কৃপায়াম্ ॥ ৬৯

দেবতারাধনাৎ বিচারোদয় প্রকারমাহ—রাধিতেতি । কৃপয়া স্বয়মেব বিচাররূপা ভবতীর্থঃ । কৃপোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং সৈবাবিচাররূপা চাসীদিতি তাৎপর্যম্ । অতএবোক্তং চণ্ডীস্তবে—সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরে শ্বরীতি । ৭০ ।

তদপ্যারাধনং নেন্দ্রচন্দ্রাদিরূপায়াঃ কিন্ত্বন্তর্যামিরূপায়া ইত্যাহ নিজাত্মেতি ॥ ৭১ ।

স মূঢ়ঃ কাঞ্চনং ত্যক্ত্বা লোষ্টং গৃহ্নাতি সুব্রত ॥২২
জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥২৩
লোকত্রয়েঽপি কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্নাস্ত্যাত্মবেদিনাম্ ॥২৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মুনেঽহিংসাদি সাধনৈঃ।
আত্মানমক্ষরং ব্রহ্ম বিদ্ধি জ্ঞানাত্তু বেদনাৎ ॥২৫
ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রশ্নোত্তরে বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন। সামবেদীয় শান্তিমন্ত্রের অর্থ কি ?

উত্তর। জাবালদর্শনোপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত। শান্তিমন্ত্রের পাঠ প্রথমেই আবশ্যক। আচমন করিয়া ওঁ তৎ সৎ হরিঃ ওঁ স্মরণ কর। পরে তীব্র ইচ্ছাকর—

আমার অঙ্গ সকল আপ্যায়িত হউক। আমার বাক্—অগ্নিরূপে, আমার প্রাণ—জগৎ প্রাণ—বায়ুরূপে, চক্ষু—বিরাট্‌চক্ষু—সূর্য্যরূপে, শ্রোত্র—দিগ্‌দেবতারূপে, আমার বল—ইন্দ্ররূপে আপ্যায়িত হউক। আমার অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলও—স্বস্ব বিরাটরূপ লাভ করিয়া আপ্যায়িত হউক। এই জগৎ উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই—মায়িক নামরূপকে মিথ্যা দেখিতে পারিলেই ব্রহ্মের উপরে যে জগৎ ভাসিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাইতেছিল তাহা থাকে না—তখন ব্রহ্মই থাকেন। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকৃত-অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত না করি। ব্রহ্মও যেন আমাকে নিরাকৃত—আপনার স্বেচ্ছাকৃত মায়া আবরণে আবৃত না করেন। ব্রহ্ম হইতে আমার এই অনিরাকরণ হউক। আত্মনিরত ব্যক্তিতে উপনিষদ্ নির্দ্দিষ্ট যে শমদমাদি ধর্ম্মসমূহ উদিত হয়। তৎ-সমুদায় আমাতে আবির্ভূত হউক। আমাতে প্রস্ফুটিত হউক।

আত্মজ্ঞানার্থ বেদাধ্যয়নকালে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উপদ্রবের শান্তি হউক। * হরি ওঁ।

প্রশ্ন। স্বরূপে স্থিতি ভিন্ন কেহই ত আপ্যায়িত হইতে পারে না—তবে অঙ্গসমূহ আপ্যায়িত হইবে কিরূপে?

উত্তর। তোমার বাগ্দেবতা অগ্নি, প্রাণ দেবতা বায়ু, চক্ষুদেবতা সূর্য্য, শ্রোত্রদেবতা দিক্, বলের দেবতা ইন্দ্র। তোমার অঙ্গদেবতা সমূহ তোমার কর্ম্মানুসারে জড়গোলকের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই অজ্ঞান-কল্পিত ক্ষুদ্রতা অতিক্রমের জন্যই উপনিষদ্ দেবীর নিকট এই প্রার্থনা। আপনার অঙ্গদেবতা সমূহকে—আধিভৌতিককে আধিদৈবিকরূপে ভাবনা করিতে পারিলে বিরাটরূপে স্থিতি লাভ করা যায়। আর বেদজ্ঞ নিখিল দেবতা যেখানে অধি-নিষন্ন সেই পরম ব্যোমই হইতেছেন সকলের স্বরূপ। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদু স্তইমে সমাসতে॥ ঋগ্বেদ সংহিতা ২।৩।২১। পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের ব্যাখ্যা অবলম্বনে লিখিত।

প্রশ্ন। জাবালদর্শনোপনিষদ্ কি ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে?

উত্তর। মহাযোগী দত্তাত্রেয় গুরু। মুনিবর সাঙ্কৃতি দত্তগুরুর শিষ্য। শিষ্য গুরুকে সাষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

প্রশ্ন। প্রথম দুই মন্ত্রের অর্থ কি?

উত্তর। পৃথিব্যাদি ভূত সকলের স্রষ্টিকর্ত্তা, মহাযোগী, ভগবান্, চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু এই দত্তাত্রেয় আর ইনি যোগসাম্রাজ্য দীক্ষিত। সাঙ্কৃতি হইতেছেন মুনিশ্রেষ্ঠ ভক্তিমান্—ইনি দত্তগুরুর শিষ্য। ইনি একদিন একান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন অষ্টাঙ্গ যোগের কথা।

---

* শান্তিঃ শান্তিঃ পুনঃ শান্তি দোষত্রয় নিবর্ত্তয়ে।
কৃত্বৈবং প্রার্থনামাত্মজ্ঞানার্থং পুনরাস্তিকাঃ॥ ৭। সূতসংহিতা-যজ্ঞবৈভবখণ্ড ১৬ অধ্যায়। পৃঃ ৪৭৪।

প্রশ্ন। ভগবান্ দত্তাত্রেয় ত অত্রি ভগবানের ঔরসে এবং সতীশ্রেষ্ঠা অনুসূয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে কেন ?

উত্তর। অনুসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা মানসে এক সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অত্রিমুনির আশ্রমে আসিয়া অনুসূয়ার নিকটে প্রার্থনা করেন আপনি উলঙ্গিনী হইয়া আমাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে পারেন কি না ? স্বামীর অনুমতি লইয়া অনুসূয়া তাহাতেই সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি হস্তস্থিত জল মন্ত্র-পূত করিয়া ঐ তিন দেবতার অঙ্গে প্রোক্ষণ করিয়া বলেন যদি আমি সতী হই তবে তোমরা বালক হইয়া যাও। এই ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বালক করিয়া তিনি আপন কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং শেষে তাঁহাদিগকে বলেন যে আপনারা আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন। সেইজন্য ভগবান দত্তাত্রেয় এক সঙ্গে ঐ তিন দেবতা।

প্রশ্ন। যোগসাম্রাজ্য দীক্ষিত ইহার অর্থ কি ?

উত্তর। যোগরাজ্যে ইনি দীক্ষা সিদ্ধ। রুদ্রজামলে দীক্ষার ব্যুৎপত্তি এই ঃ—

দদাতি শিবতাদাত্ম্যং ক্ষিণোতি চ মলত্রয়ম্।
অতো দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা দীক্ষাতন্ত্রার্থ বেদিভিঃ ॥

লঘুকল্পসূত্রে—দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপপদ্ধতিঃ ॥
তেন দীক্ষোচ্যতে মন্ত্রে স্বাগমার্থবলাবলাৎ ॥

যোগিনীতন্ত্রে—দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনং।
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
তেষাং বিশেষা করণী পরম জ্ঞানদা যতঃ ॥

বিশ্বসারে—দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রস্য সম্মতা ॥

* * * *

যস্যা বিজ্ঞান মাত্রেণ দেবত্বং লভতে নরঃ ॥

তন্ত্রের অর্থ যাঁহারা জনেন তাঁহারা বলেন দীক্ষাগ্রহণে দীক্ষা শিবের সহিত একত্ব দান করেন, এবং বাক্যের মল, শরীরের মল ও মনের মল ক্ষয় করেন এই জন্যই মন্ত্রগ্রহণরূপ ব্যাপারকে দীক্ষা বলে। দীক্ষা মন্ত্রে, আগমার্থ বলপূর্ব্বক পরমজ্ঞান-স্বরূপ জ্ঞান দান করেন এবং পাপের সমস্ত ধারা ক্ষয় করিয়া দেন এই জন্য ইহাকে দীক্ষা বলা হয়। তত্ত্বচিন্তকেরা বলেন হে দেবেশি! ইহাকে দীক্ষা বলা হয় এই জন্য যে স্বরূপ জ্ঞান দান করেন এবং অষ্টপাশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন। মন কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা যে সমস্ত পাপ মানুষ উপার্জ্জন করে তাহা দীক্ষা নিঃশেষ করেন যেহেতু ইনি পরম জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নি, সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মান্ এই সমস্ত কর্ম্মই ভস্মসাৎ করেন—কেবল প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়। যেহেতু দীক্ষা দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং তৎপরে পাপক্ষয় করেন সেই জন্য ইহাঁকে দীক্ষা বলে ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের মত।

দীক্ষার জ্ঞান মাত্রেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে। শাম্ভবী, শাক্তি এবং মান্ত্রী এই ত্রিবিধ দীক্ষার কথা তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুর দর্শনে স্পর্শে এবং সম্ভাষণে যে জ্ঞান জন্মে তাহা শাম্ভবী দীক্ষাতে হয়। শাক্তী দীক্ষাতে গুরুশিষ্যের মধ্যে জ্ঞান ফুটাইয়া তুলেন আর মান্ত্রী দীক্ষা ক্রিয়াবতী।

সাঙ্কৃত—ভগবান্ অষ্টাঙ্গ সহিত যে যোগ তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হয়। ইহা বিজ্ঞাত হইলে আমি জীবন্মুক্ত হইতে পারি॥ ৩।

দত্তগুরু—সাঙ্কৃতে! অষ্টঅঙ্গের সহিত যোগ বলিতেছি শ্রবণ কর। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি হে মুনে! এই আটটি যোগের অঙ্গ। ৪॥

যম দশ প্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব (সরলতা) ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার এবং শৌচ। ৬।

সাঙ্কৃত—অহিংসা কাহাকে বলে?

দত্তগুরু—যমের দ্বিতীয় অঙ্গ সত্য যিনি প্রাপ্ত হন তাঁহার অহিংসা

আপনা হইতেই হয়। ইহা না পাইলেও বেদোক্ত বিধানে শরীর, মন, বাক্য দ্বারা যে হিংসা তাহার নাম অহিংসা। অহিংসা অন্যরূপে হয় না। অর্থাৎ বেদবিধি মত হিংসা না করিয়া শুধু শরীর মন ও বাক্য দ্বারা যাহাকে তাহাকে দয়া দেখান তাহা অহিংসা নহে।

হে মুনে! বেদান্তবেত্তাগণ যে শ্রেষ্ঠ অহিংসার কথা কহেন তাহা হইতেছে আত্মা সকল প্রাণীর—সকল বস্তুর সার পদার্থ; এই আত্মাকে নষ্ট করা যায় না, এই আত্মাকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না এই যে বুদ্ধি তাহাই।৮

সাঙ্কৃত—বেদোক্ত প্রকারে শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা যে হিংসা তাহাকেই শ্রুতি যে অহিংসা বলিতেছেন তাহার দৃষ্টান্ত কি?

দত্তাত্রেয়—যজ্ঞে পশু বধ করা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে শত্রু বধ করা,—এই সমস্ত অহিংসা।

সাঙ্কৃত—সত্য কি?

দত্তগুরু—ব্যবহারিক জগতে সত্যের রূপ এক প্রকার কিন্তু পূর্ণসত্য অন্য প্রকার। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখ, কর্ণ দিয়া যাহা শ্রবণ কর, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আঘ্রাণ কর—এক কথায় ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ কর, পল্লবিত না করিয়া তাহার যথাযথ উক্তিই সত্য। হে বিপ্র—ইহার অন্যথা যেখানে সেখানে মিথ্যা বলা হয়।৯

যাহা দেখ যাহা শুন—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—জগৎ নহে সমস্তই সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম—অন্য কিছুই নহে, এই যে নিশ্চয় ইহাই শ্রেষ্ঠ সত্য—বেদান্তের শেষ সীমায় যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা ইহা বলেন।১০

সাঙ্কৃত—এই জন্যই কি বলিতেছেন পরম সত্য স্বরূপ আত্মাকে যিনি জানিয়াছেন—যিনি জানিয়াছেন জগতে পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী আত্ম-চৈতন্যই একমাত্র সত্য বস্তু—অন্য যাহা দেখি বা যাহার কথা শ্রবণ করি তাহা, সূর্য্যের প্রভাবে মরুভূমিতে যেমন মারীচিকা ভ্রম উৎপন্ন হয় সেইরূপ আত্মচৈতন্যের প্রভাতে আত্মচৈতন্যের দীপ্তিতে এই মায়িক জগৎ মরীচিকা উঠিয়াছে মাত্র ইহা যাঁহার বুদ্ধিতে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে

তিনিই অহিংসা জানেন। যিনি সর্ব্বত্র এক আত্মাকেই দেখেন তিনি আর হিংসা কাহার করিবেন ?

দত্তগুরু—হাঁ ইহাই। সেই জন্য ৭ মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন "বেদোক্তেন প্রকারেণ বিনা সত্যং তপোধন" ইত্যাদি। এখন বুঝিয়া দেখ পূর্ণ জ্ঞানীই অহিংসা কি জানেন, কারণ সত্যকে ধরা অতিশয় কঠিন। ব্যবহারিক সত্য যাহা তাহার আচরণ কত কঠিন দেখ। সাধারণ মানুষ যাহা দেখে তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া দৃষ্ট শ্রুত বিষয়কে লোকরঞ্জনের জন্য কত পল্লবিত, পুষ্পিত করে। ইহাতে সত্য বলা হয় না। যথাযথ উক্তি যেখানে নাই তাহা মিথ্যা। আবার জ্ঞানী যিনি তিনি দেখেন একমাত্র আত্মাই সত্য—মায়িক জগৎ—মরীচিকার মত—গন্ধর্ব্বনগরের মত আত্মপ্রভায় ভাসে মাত্র।
সত্য মিথ্যার বিচার করিয়া যিনি মিথ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্যে থাকিতে চেষ্টা না করেন তিনি একত্বে স্থিতি লাভ করিতে পারেন না। মিথ্যাকেও কোন কোন স্থানে সত্য বলিয়া ব্যবহার করিতে হয়; মিথ্যাও স্থান বিশেষে ধর্ম্মের অঙ্গ। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বলিয়াছিলেন তুমি আমাদিগকে বনপথে রাখিয়া যখন ফিরিবে তখন পিতাকে বলিবে আপনি যে রথ থামাইতে বলিয়াছিলেন তাহা আমি শুনিতে পাই নাই। শ্রীভগবান্ এখানে মিথ্যা কথা কহিতে বলিলেন, কারণ ব্যবহারিক জগতে যেখানে প্রাণহানীর আশঙ্কা থাকে সেখানে মিথ্যা বলিয়াও প্রাণরক্ষা করিতে হইবে—এক্ষেত্রে ইহাই ধর্ম্ম।

সাঙ্কৃত—অস্তেয় কি ? চুরি না করা কি ?

দত্তাত্রেয়—অপরের কোন কিছুতে-তৃণে, রত্নে, কাঞ্চনে বা মৌক্তিকে যে মনের নিবৃত্তি-অর্থাৎ মনে মনেও গ্রহণে অনিচ্ছা তাহাকেই পণ্ডিতেরা অস্তেয় বলেন।১১।

হে মহামতে! আত্মজ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা বলেন আত্মাতে অনাত্মভাবের ব্যবহার না করাই অস্তেয়।

সাঙ্কৃত। আত্মাকে অনাত্মভাবে ব্যবহার না করার অর্থ কি ?

দত্তগুরু। আত্মা পরিপূর্ণ-আত্মা কিছুই করেন না—আত্মা স্থূলও

নহেন, গৌরও নহেন, কৃষ্ণও নহেন। কাজেই আমি করি, আমি যাই, আমি দেখি,আমি শুনি—আত্মাতে এই সমস্ত অনাত্মভাবের ব্যবহার যে বর্জ্জন তাহাই অস্তেয়।

সাঙ্কৃত। আত্মাকে অনাত্মভাবে ব্যবহার—ইহাতে চুরি কিরূপে হয়?

দত্তগুরু। আত্মা পরিপূর্ণ—আত্মা কিছু করেন না কিছু করানও না ইহা পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই আত্মা মায়া অবলম্বনে যখন সগুণ হয়েন এবং যখন অবতার হয়েন তখন তিনি সমস্ত সৎগুণের আধার। কাজেই যখন তুমি নিজের রূপ দেখিয়া বা নিজের একটু গুণ দেখিয়া অভিমান কর তখন তুমি সমস্ত রূপের ও গুণের আলয় শ্রীভগবান হইতে রূপ গুণ চুরী করিয়া অপনাকে বা অন্যকে রূপবান্ করিতে ইচ্ছা কর মাত্র। মানুষের রূপ দেখিয়া বা গুণ দেখিয়া তাহার পশ্চাতে যখন ছুটিয়া যাও তখন তুমি শ্রীভগবানকে দূর করিয়া দাও মাত্র। কাহারও কিছু ভাল দেখিয়া যখন তুমি সমস্ত ভালর আধার যিনি তাঁহাতে যখন যাও তখন তোমার চুরী হয় না। মানুষ রূপ গুণ কোথায় পাইবে? সমস্তই যে ভগবানের—তাঁহার বস্তু তাঁহাকে না দিয়া ব্যবহার করাই চুরী। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলেই চুরী করা হয়। বল দেখি এজগতে তোমার কি আছে? তবে যে তুমি নিরন্তর আমার আমার কর ইহাই ত চুরী; এই চুরী ত্যাগ করিয়া সমস্তই শ্রীভগবানের ধারণা কর তোমার অস্তের অভ্যাস হইল। অধিকাংশ মন্ত্রে যে নমঃ শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় তাহা এই অস্তেয় অভ্যাস জন্য। নমঃ শব্দে অর্থ শ্রুতি করিতেছেন ন মম। নমো নারায়ণায়, নমঃ শিবায়, নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যাস করিতে বলা হইতেছে সবই তোমার, আমার কিছুই নাই—ইহাই অস্তেয়—ইহাই চুরী না করা।

সাঙ্কৃত—ভগবান্ সাধারণ মানুষ ত সর্ব্বদাই চুরী করিতেছে। সর্ব্বদাই ত আমার আমার করিতেছে। আহা! যদি অস্তেয়টি বুঝিয়া অস্তেয় অভ্যাসের জন্য নমঃ শব্দ যুক্ত মন্ত্র সর্ব্বদা স্মরণ করে তবে ত তাহারা সহজেই সর্ব্বদা ভগবান্ লইয়া থাকিতে পারে।

দত্তাত্রেয়—আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার এই শুভইচ্ছা পূর্ণ হউক ! নমঃ বা ন মমের অভ্যাস সর্ব্বদা করাই অস্তেয় ।

সাঙ্কৃত—ব্রহ্মচর্য্য কি এক্ষণে তাহাই বলুন ।

দত্তগুরু—শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা স্ত্রীলোক ত্যাগ করা, ঋতুকালেও আপন আপন ভার্য্যা সঙ্গ না করা—ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে ।১৩।

হে পরন্তপ ! ব্রহ্মভাবে মনের যে বিচরণ তাহাই ব্রহ্মচর্য্য ।

সাঙ্কৃত—শরীর বাক্য ও মন দ্বারা স্ত্রীলোক বর্জ্জন ইহা কিরূপ ?

দত্তগুরু—স্ত্রীলোকের চক্ষুতে চক্ষুস্থাপন করিয়া স্ত্রীলোক দেখা, স্ত্রীলোককে চাটুবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা জানান যে তুমি বড় সুন্দরী তোমার মত গুণ আর কোথাও দেখি নাই—এমনটি আর নাই এবং মনে মনে স্ত্রীলোকের ভাবনা—এই সমস্ত বর্জ্জনে ব্রহ্মচর্য্য হয় ।

সাঙ্কৃত—তবে কি স্ত্রীজনের গুণের আদর করাতে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় ?

দত্তগুরু—কাহারও রূপ গুণ দেখিয়া তুমি যদি ঈশ্বরকে চিন্তা না করিতে পার তবে চুরী করাও বন্ধ হয়না এবং ব্রহ্মচর্য্যও হয় না। ঈশ্বর কে মানুষ পাইতে পারে নিজেরই ভিতরে ; তিনি সর্ব্বরূপে রূপবান্ সর্ব্বগুণে গুণবান্ । অন্যের রূপ গুণ চক্ষে পড়িলেও তুমি তদবলম্বনে নিজে ভিতরের ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে যদি না পার তবে তুমি পাপই কর। রূপগুণ কাহার কি থাকিবে বল ? সবই যে তাঁর । তাঁহার একটু অংশ পাইয়া যদি বলা যায় আমার ইহা আছে, উহার ইহা আছে তবেইত চুরী হইল। যেখানে চুরী সেই খানেই পাপ । পাপের দণ্ড—আজ হউক বা কাল হউক আসিবেই আসিবে। মানুষ আত্ম প্রতারণা ধরিতে পারে না । মোহাক্রান্ত মানুষ ভাবে যে, যে মন্দিরে মূর্ত্তি ফুটে সে মন্দির ও ত পূজার জিনিষ। সকল মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা—সেই একজনই—সেই আত্মাই। আত্মা ছাড়িয়া পর মন্দিরকে যে আত্মা বলা—ইহাও মূঢ়তা। এইরূপ মূঢ়নরনারী সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন তৃষিতো জাহ্নবী তীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতি—ইহাই দুষ্টবুদ্ধির গঙ্গাতীরে কূপ খনন। মানুষ কামে বা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ঈশ্বরকে সুন্দর

বর্ষ-সূচী—১৩৩৫।

"অ"

"আ"

"এ"

"উ"

"ক"

গ

প

ব

ভ

ম